দ্বাদশবর্ষের লেখক ও প্রবন্ধসূচী

লেখকের নাম	প্রবন্ধ-সূচী	পৃষ্ঠাঙ্ক
অনাথনাথ বসু	সমাজ, প্রয়োগার ও লোকশিক্ষা	১২৫
আশিনাথ সেন	কৃষ্ণনাথ কলেজের শতবার্ষিকী	২৩৪
	ব্যাপক শিক্ষা	৩, ৩৫
কণা সেনগুপ্ত	কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ও শিক্ষক	১১৮
	বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের হাতের লেখা	৫৯
	বিদ্যালয়ে সুস্থতা ও স্বাস্থ্য শাসন	২৩৭
কাজী সাহেব কামেলকর	বুনিয়াদী শিক্ষা	২৭
কোটারী, ডি, এস্	বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা	২৮৫
গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	নূতন পাঠশালা	২০৫
	শিশুর খেলা	২৭৩
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি	আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা	২৪৯
জীবনময় রায়	শিক্ষায় ব্যভিচার	২২৭
জীবেন্দ্রকুমার দে	বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন	৯৪
দিলীপকুমার বিশ্বাস	গ্রীস দেশের শিক্ষা	২০৯
	আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা—ভূমিকা	২৮২
	নিরক্ষরতা	১৪১
	শিক্ষা ব্যবস্থা পুয়েরটো রিকো দ্বীপ	৬৩
	মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও তাহার উন্নতি	১০৯
দীনেন্দ্রমোহন দত্ত	স্মৃতিতর্পণ	১৯৭
নীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	শিশু ও শিল্প	৪৬
	সামাজিক জীবনে শিশুর ক্রমপ্রবেশ	১৮৮
পবিত্রকুমার চক্রবর্তী	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি	২৫৮
পার্থসারথি গুপ্ত	অক্সফোর্ডের চিঠি	৮৮, ১৬২
প্রিয়রঞ্জন সেন	পুস্তক-পরিচয়	৭২, ১২০, ১৪৪, ১৯২, ২৬১
বকুলরাজা সেন	'আমরা' কবিতার শেষ স্তবক	১১
	পরীক্ষা	২৬৭
	শিক্ষক ও সমাজ	১৩২
	শিক্ষকের সমস্যা	৬৫
	সাহিত্যে দীক্ষা—গৃহে	২৫১
	সাহিত্য শিক্ষা—বিদ্যালয়ে	১৮২

লেখকের নাম	প্রবন্ধ-সূচী	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিমলকুমার ভট্টাচার্য	বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিল্প	২৪৫
বিমল লাল চট্টোপাধ্যায়	আর্থিক জে. টমেনবি	১০১
	শিক্ষক ও সংস্কৃতি	৫২
	শিক্ষা ও পরিবার	২৪৪
বিনোবা ভাবে	নঈ তালিমে জীবন দর্শন	৭৬
	নঈ তালিম	১৭২
	নঈ তালিমের কথা	২২০
	নারীশিক্ষা	২৭০
	শিক্ষা কি ? সংসঙ্গ	৯৯
বীরেন্দ্রনাথ গুহ	গুড শিক্ষা, অগুড দৃষ্টি	১৮০
মহীন্দ্র কুমার ঘোষ	বুনিয়াদী পদ্ধতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান	৮১
মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	প্রবাসের সমস্যা	২০০
যোগেশচন্দ্র বাগল	একটি দিনের কথা	৪৪
রামশরণ উপাধ্যায়	বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মীদের কথা	১৪৪
রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়	পাঠক্রমের সংশোধন	১৬৬
ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়	পরীক্ষায় দুর্নীতি ও তাহার প্রতিকার	১৩৭
শঙ্করনাথ ঘোষ	শিক্ষাব্যবস্থা—অভিভাবকের দৃষ্টিতে	৮৯
শান্তা দেবী	অপরাধপ্রবণতা	১৩০
	ব্রতকাহিনী	২০
	এডেন ও পোর্ট সৈয়দ	
শ্যামানন্দ কর	কোন পথে	৬১
সুধাময় মুখোপাধ্যায়	আশা ও আত্মবিলাপ	১১৬
সুনীলচন্দ্র মজুমদার	পত্র	১৫
	বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন	১৬, ৩৮
সুনীলচন্দ্র রায়	ইস্কুলের অবসর সময়	১৫৮
	বাংলা ভাষা ও বানান	৮
	শিক্ষক—গিরীশ চন্দ্র দে	১০৩
	ডায়েরির এক পাতা	৭৮
সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত	শিক্ষা মূলক পরিভ্রমণ	২৫৪
স্বর্ণপ্রভা সেন	অবলে মঙ্গল	৮৪

130589

অনুধ্যান ১-১২
১৩৬০-১৩৬১

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

370.5—
শি ৮৭

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

(শিক্ষা)

ম হি কল্যাণকৃৎ কস্তিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ফাল্গুন—১৩৬৮ } ১ম সংখ্যা

আলোচনা

দ্বাদশবর্ষের সূচনা

লেখক, পাঠক ও উৎসাহদাতাদের অনুগ্রহে শিক্ষা আজ দ্বাদশ বর্ষে পড়িল। শাস্ত্রে আছে, লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ—এই নীতি অনুসারে আমাদের পত্রিকা এখনও তাড়নার উপযুক্ত। বন্ধুবান্ধবদের এবং পাঠকদের সমালোচনা আমাদের আত্মপরীক্ষায় সাহায্য করিবে। বাংলা শিক্ষাশাস্ত্রের আলোচনা, বুনিয়াদি শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু চর্চা, ভারতের অন্যত্র যাহা বলা বা লেখা হয় তাহার কিছুটা পরিচয়—ইহাই দিবার চেষ্টায় শিক্ষার জন্ম হয়। এদেশে শিক্ষার প্রতি সহজ ঔদাসীন্যকে অনুরাগে পরিণত করিবার চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ মিলাইতে চাই। শিক্ষকসমাজে শিক্ষাশাস্ত্রের আলোচনা জাগাইবার পক্ষে যতটুকু সহায়তা করিতে পারি, ততটুকুই আমাদের লাভ, ততটুকুই সার্থকতা।

আয়তন ও মূল্যের বৃদ্ধি

এগার বৎসর কাল এই পত্রিকা পরিচালনার ফলে আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া শিক্ষকসমাজে, এমন একদল লেখক বর্তমান কালেও আছেন যাঁহারা অভিজ্ঞতা ও আলোচনার দ্বারা শিক্ষাশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশদ ভাবে চর্চা করিবার অধিকারী। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া আমরা এবার আমাদের আয়তন বৃদ্ধিতে করিলাম। লেখকগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন প্রকাশযোগ্য রচনা পাঠাইয়া আমাদের আয়তন প্রসারের এই চেষ্টাকে স্থায়ী করিয়া তোলেন, আর গ্রাহকদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন বর্ধিত হারে চাঁদা পাঠাইয়া আমাদিগকে ক্ষতির হাত হইতে বাঁচান। আয়তন বৃদ্ধিগুণ হইল, দুই কর্মার স্থানে তিন কর্মা। বার্ষিক মূল্য কিন্তু তিন টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা ধার্য করিতেছি। আমরা জানি, শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকদের সক্রিয় শুভকামনা হইতে বঞ্চিত হইব না।

বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মেলন

গত ১৩ নভেম্বর আসানসোল জেলার অন্তর্গত চিটারঞ্জনে বুনিয়াদি শিক্ষক সম্মেলনের

সবয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বুনিয়াদি শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে আমাদের দেশে পনের বৎসর পূর্বে। কর্মী সম্মেলন উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া ডাঃ হুসেনও বার বে অভিভাষণ দেন তাহাতে নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিক খাদ্য ও স্বাভাবিক পরিশ্রমের কথা বলিয়াছেন—কৃত্রিম খাদ্য ও কৃত্রিম ব্যায়াম (ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ইত্যাদি) উভয়েরই নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কৃত্রিম ব্যায়াম বাদ দেওয়া হইতে পারে, হইতে পারে কেন, অবশ্যই বাদ দেওয়া, তবে উহা অবৈজ্ঞানিক কেন তাহা বোঝা কঠিন। জগতের সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া থাকা কতখানি সম্ভব!

মুখ্য সম্মেলনে নয়ী তালিমের পাঠক্রম, গ্রাম রচনা বা সমাজ গঠন, সাংস্কৃতিক জীবন আবিষ্কার এবং স্বাবলম্বন সিদ্ধান্ত আলোচিত হয়। কাকা-সাহেব কালেলকর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, তাঁহার ওজস্বী ভাষণ আমরা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত করিব বলিয়া আশা করি।

আগামী নিখিল ভারত শিক্ষক সম্মেলন

আর প্রায় এক পক্ষের মধ্যে কলিকাতায় শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। শিক্ষার নানা দিক দিয়া আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হইবে, বিচার বিতর্ক ও মেলামেশার দ্বারা সম্মেলনের কার্য চলিবে। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব মনীষী আছেন তাঁহারা একত্র হইয়া শুধু প্রস্তাব গ্রহণই করিবেন না, আমাদের প্রদেশে তাঁহাদের আগমনের ফল শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রেও প্রকট হইবে, আমরা এরূপ আশা পোষণ করি এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রে যেন ইহাতে যোগদান করেন এইরূপ অনুরোধ করি।

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষকবৃত্তি

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সরকারের নিকট শিক্ষকদের জন্য যে বেতনের হার সুপারিশ করিয়াছেন, সরকার হইতে এ পর্যন্ত সে বিষয়ে কিছু বলিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা শুনিয়াছি, সরকার এখনও এ বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। বিবেচনার কাল কিন্তু আর দীর্ঘ না হওয়াই উচিত। অতিরিক্ত মোট কত ব্যয় সরকারকে দিতে হইবে, অবশ্যই তাহা হিসাব করিয়া একটা সিদ্ধান্তে আসা চাই। কিন্তু তাহারও একটা কালগত সীমা আছে। অন্যান্য প্রদেশে কেমন করিয়াছে, কত বেশি দিয়াছে তাহাও দেখিতে হইবে—বেতনের হিসাবে কত কম রাখিয়াছে তাহা নয়, কত বেশি রাখিয়াছে তাহারই হিসাব।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ধর্মঘট অথবা কর্ম-বিরতির প্রস্তাব শিক্ষক সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। কর্মবিরতি আমরা শিক্ষার কোনও ক্ষেত্রেই অনুমোদন করি না, এবং আমরা মনে করি, এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে সকলের পক্ষেই অমঙ্গল। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুকূল হইলে এবং উপযুক্ত কালে প্রকাশিত হইলে রাষ্ট্রের এই অমঙ্গল নিবারিত হইবে, এবং তাহাই আমাদের কাম্য।

ব্যাপক শিক্ষা

[শ্রীআশিসনাথ সেন]

গড় হিসাব

যাহারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা ভাবেন এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা নিজেদের সম্পর্কিত মুষ্টিমেয় সংখ্যার কথাই বলেন। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিতে বেশির ভাগ দেশবাসীর কোন স্থান নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। প্রথমে কি কি বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবে, কলেজে আর্টস্ কি সায়েন্স পড়িয়া পরে কি চাকুরীতে সুবিধা হইবে, তাহাই কেবল শুনিতে পাই। আমাদের দেশে স্বতন্ত্র ভাবে অনেক রকম শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তাহাদের সামঞ্জস্য করিয়া, একতালে নীচ হইতে উচ্চ পর্যন্ত মিলাইয়া সম্পূর্ণ পরিকল্পনার অভাব রহিয়াছে।

আশা করা যায় যে শীঘ্রই সর্বসাধারণের জন্য আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। হয় তো প্রথমে ১২ বৎসর, পরে ক্রমে ১৪ বৎসর এবং প্রবেশিকা স্তরে ১৬ বৎসর পর্যন্ত এই আবশ্যিক শিক্ষার সীমা প্রসারিত হইবে। অবশ্য এই বয়সের গণনা মানসিক উন্নতির ভিত্তিতে, প্রকৃত জীবিত কালের ভিত্তিতে নহে।

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২। কোটি, তন্মধ্যে ছয় কোটি কৃষিতে জীবিকা নির্বাহ করে। পূর্বে গ্রামদেশে শতকরা ৮৫ জনের অধিক কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। বর্তমানে নানা কারণে অনেকে কৃষি ছাড়িয়া দেওয়াতে সমস্ত লোকের দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় ৮৫% হইবে আশা করা যায়। ইহাদের ছেলেমেয়েরা বর্তমানে দুই এক বৎসর পড়িয়াই স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াতে প্রায় নিরক্ষরই থাকিয়া যাইতেছে। ইহাদের সংখ্যাও সমগ্র ছাত্র সংখ্যার ৮০% ধরা যাইতে পারে। তাহাদের প্রথম ১২ (ক্রমে ১৪, ১৬) বৎসর পর্যন্ত আবশ্যিক লেখা পড়া শিখিয়া ৫দশতি প্রথায় গ্রামে পিতার কৃষিতেই নিযুক্ত হওয়া সুবিধা, কারণ ইহারা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের পক্ষে সুপরিচিত কার্যে নিযুক্ত হওয়াই আকর্ষণীয় এবং সুফলদায়ক হইবে আশা করা যায়। বারো বৎসর বয়সে, কিছু শক্ত পরিশ্রমের কাজ সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। কতক ছাত্র, অবশ্য অন্য প্রকার জীবিকার উপর ঝোঁক থাকিলে, সেই দিকে যাইবে। কৃষি হইতে অন্য কিছু এইভাবে চলিয়া গেলেও, ৮৫% কৃষিতে নিযুক্ত থাকিবে ধরা যায়। আবশ্যিক শিক্ষা পাইয়া হয়তো শতকরা আরও ১০টি ছেলে, কতক গ্রামে কতক সহরে, তাহাদের পিতার স্থলাভিষিক্ত বংশানুক্রমী শিল্পকার্যে নিযুক্ত হইবে। শিল্পীর সংখ্যা বর্তমানে ৫ লক্ষ বা ২% নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু পূর্বে অনেক বেশি ছিল এবং আমাদের লক্ষ্য ১০% হইবে আশা করা যায়। অল্পসংখ্যক শিল্প ছাড়িয়া উচ্চশিক্ষাপ্রার্থীও হইবে। বাকি শতকরা ৫ জন মাত্র বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে।

আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষার ১২ বৎসর পর্যন্ত ব্যবস্থা হইলে, অবস্থাপন্ন কৃষকের পুত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইলে, উচ্চশিক্ষায় কোন বাধা নাই। মেধাবী ছাত্র পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া পড়ে। পরিশ্রমী, উপযুক্ত এবং মেধাবী ইত্যাদি বিবেচনায় বাছিয়া নিয়া সরকারের ব্যবস্থিত বৃত্তি সাহায্যে (উচ্চশিক্ষার্থী সমস্ত ছাত্রসংখ্যার ২৯%) পড়াশুনার ব্যবস্থা হইবে। উচ্চশিক্ষার অধিকার সকলেরই সমান,

এই ভিত্তিতে অবৈতনিক এবং বিশিষ্ট স্থানে (যেমন হরিজনের) খোলা থাকিবে (২৫%)। বাকি প্রায় অর্ধেক উচ্চ হারে বেতন দিবে। যাহারা দিতে পারে, তাহারাই দিবে, স্কুল সাহায্যই উচ্চ হারের উদ্দেশ্য। এইরূপে ১৪ ও ১৬ বৎসর পর্যন্ত আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেও গড়ের হিসাব ইহাই থাকিবে। ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে শিক্ষা চলিবে। ইহার পরে বিশেষ উদ্দেশ্য শিক্ষা পাইয়া নানাবিধ অর্থকরী জীবিকার উপার্জনের চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ উচ্চ বা নিম্ন ধাপের (যোগ্যতা অনুসারে) ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়র, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, মাস্টার, শাসনসংক্রান্ত চাকুরে ইত্যাদি হইবে।

উপরোক্ত মোটামুটি গড় হিসাবের অবশ্যই আন্দাজী—সন্দেহ থাকিলে, যুক্তিস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন ধাপের স্কুল

পাঁচ ছয় বৎসর হইতে ১১।১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে বা সহরে প্রাথমিক স্কুলে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়িবে। ইহার পরে পরবর্তী ধাপে শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া হেড মাস্টারের সার্টিফিকেট পাইলে, কোন পরীক্ষা না দিয়া নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হইবে। এই বয়সে স্কুলের পরিবর্তন সুফলদায়ক, ইহা সর্ববাদিসম্মত। এই বয়সে বালকবালিকার শারীরিক ও মানসিক বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। স্কুল পরিবর্তনের পরে ছেলে ও মেয়েদের ভিন্ন স্কুলে পড়িবার ব্যবস্থা থাকিবে। পাশ্চাত্য দেশেও সর্বত্র এই রীতি। বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা উপরের দিকে ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকে। এই কারণে চার পাঁচটি গ্রামের কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলের জন্য একটি মাধ্যমিক স্কুল। শিক্ষা আবশ্যিক হইলে এই পরিস্থিতি থাকিবে না। তখন ষতটি প্রাথমিক স্কুল ততটি মাধ্যমিক স্কুলেরই দরকার হইবে। যে পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষার বয়স উত্তীর্ণ না হয়, ১২ বৎসরে, বাধ্যতার সীমার পরে, নিজের কার্যে যোগ দেওয়াতে মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেদের সংখ্যা কমই হইবে। অবশ্য কতক মেয়েও পড়াশুনা ছাড়িয়া মায়ের গৃহকার্যে সাহায্য করিতে যাইবে এবং যথাসময়ে বিবাহিত হইবে। তবুও যদি ছেলে ও মেয়েদের ভিন্ন স্কুল হয়, তবে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি হইবে মনে হয়। তবে এই মধ্যবর্তী কালে, স্কুলের অবস্থায় না কুলাইলে ছেলে ও মেয়েদের ভিন্ন উচ্চ শ্রেণীর বন্দোবস্ত হইলে অথবা সকালে বিকালে ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন সময়ে ক্লাস করিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থাৎ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা প্রাথমিক স্কুল হইতে কম হওয়াতে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের অসুবিধা হয়। ইহা কতক পরিমাণে থাকিয়াই যাইবে।

শিক্ষা পদ্ধতি

প্রাথমিক স্কুল

আবশ্যিক শিক্ষার এক উদ্দেশ্য, ছাত্রদের ডিমোক্রেসির উপযুক্ত মানুষে পরিণত করা। রাজনীতির কুটিল চক্রের, জাতীয় ভালমন্দ বিবেচনা এবং সমাজের শুভাশুভের যথেষ্ট জ্ঞান প্রত্যেকের অর্জন করা উচিত। কুযুক্তিদুষ্ট মনস্তুষ্টিকর বক্তৃতায় প্রভাবিত না হইয়া (বিশেষত বেকার অবস্থায়), সামাজিক গতিপথের শুভ ধারণা করিয়া, নিজ মতানুযায়ী আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় ভোট দিতে হয়। বাস্তবপক্ষে লেখাপড়ার উদ্দেশ্য, বুদ্ধির বিকাশ, অর্থ উপার্জন, অর্থের ব্যবহার। স্থিতি, কাল, আপেক্ষ বস্তু, ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্বপরিচয়; স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির জন্য লেখাপড়া শেখা অতিশয় প্রয়োজনীয়। সমাজের অশিক্ষিত অজ্ঞান জনসংঘের অধিক মতিগতি প্রতিরোধের উপায় একমাত্র শিক্ষা। আবশ্যিক উচ্চতর শিক্ষা, শা পাওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা, অনেকের

পক্ষেই দেয়, এবং অন্যদেরও শিক্ষাসোপানের প্রথম ধাপ। উচ্চতর স্তরে শিক্ষা বিশেষ ধারায় চলে। ধারা যতই উচ্চে ততই সংকীর্ণ। উচ্চতর শিক্ষায় আর্টস্ ও সায়েন্স ভাগ, ও পরে উচ্চতম শিক্ষায় বাংলা, দর্শন, অঙ্ক ইত্যাদি এক একটিতে নিবদ্ধ।

প্রাথমিক স্কুলকে অন্য জাতীয় স্কুল হইতে পৃথক কিন্তু স্বয়ংপূর্ণ ভাবে চালাইতে হইবে, অথচ ইহা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক, ও সাধারণ ভাবে উচ্চতর শিক্ষা পাইতে হইলে, অবশ্য গ্রহণীয়। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের অন্য সময় অপেক্ষা দ্রুত শিক্ষা লাভ হয়। যাহা শিশুদের আশু আকর্ষণ করে, এই রকম কাজ ও অভিজ্ঞতার উপর এই শিক্ষার ভিত্তি। বিবিধ জ্ঞান অর্জনের অথবা নানারকম ঘটনা জানিবার সময় হইল, পরে মাধ্যমিক স্তরে। কোন রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা পরীক্ষার বা স্কুলের চাহিদার চাপ থাকিবে না। বিশেষ কথা এই যে, জীবিকা অর্জনের উপায়ের সঙ্গে এই শিক্ষার কোন সম্পর্কই নাই। ইহা শারীরিক ও মানসিক উন্নতির, বিশেষত চরিত্রগঠনের জন্য শিক্ষা। স্বাস্থ্য, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার হিতকর অভ্যাসের জন্য মাঠে আকর্ষণীয় ও উদ্দীপনীয় খেলা; বুদ্ধি বিকাশের জন্য ক্লাসে সদয় ও সোৎসাহ সাধারণ উপদেশ; সামাজিকতা ও পরস্পর শুভ-কামনা ইত্যাদির জন্য একত্র পরিবেশ। অবাধ শাসন হইতে এই সব ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী। বর্তমানে কড়া শাসনের যুগ চলিয়া গিয়াছে।

এই বয়সে সকলের একসঙ্গে শিক্ষা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র শিক্ষা হইতে বেশি ফলপ্রদ—যেমন সকলে একসঙ্গে সুর করিয়া পড়িলে নামতা শীঘ্র মুখস্থ হয়। বাংলা লিখনপঠন ও অঙ্কের বিধিবিহিত অভ্যাসের উপর, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং মনের ভাব পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টার উপর নজর রাখিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল ও হাইজিন ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি গল্পচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছন্দ অঙ্গভঙ্গী ও সঞ্চালন, কর্তব্য কাজে মনোনিবেশ এবং নিয়মানুবর্তিতা এই শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য। ভাল হস্তলিপি, চিত্রাঙ্কন, গান বাজনা, এবং সহজ জিনিস তৈয়ারি ইত্যাদি শিখিতে গিয়া আঙুলের ব্যবহার সহজ হইয়া যাইবে এবং নিজ কিছু করিবার বা গঠনের আনন্দ উপভোগ করিবে। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে চক্ষু, স্পর্শের (হাতের) এবং মনের কাজের উৎকর্ষসাধন জন্য নিয়মমত চরকায় সুতা কাটা, কাগজের কাজ ইত্যাদি অতি কম খরচে অবাধে চলন করা যায়। খেলাধূলা, দলবদ্ধ হওয়ায় সকল, প্রত্যেকের বিভিন্ন খেয়ালের সামঞ্জস্য করিয়া, কিছু করিবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে।

মাধ্যমিক স্কুল

একই বা ভিন্ন স্কুলে, নিম্ন মাধ্যমিক (১২ হইতে ১৩ বৎসর বয়স) ও উচ্চ মাধ্যমিক (১৪ হইতে ১৬, প্রবেশিকার বয়স)—দুই ধাপে ভাগ করা যায়। মাধ্যমিক স্কুলের দুই ধাপেই মাতৃভাষা বাংলা (বিশেষভাবে), ইংরেজী ও হিন্দি সাহিত্য এবং অঙ্ক। ইতিহাস, ভূগোল, হাইজিন ও বিজ্ঞান বাংলার মাধ্যমে শিখাইতে হইবে। এগুলি আবশ্যিক। ইহাদের সঙ্গে আরও অনেকগুলি ঐচ্ছিক বিষয়ের বন্দোবস্ত রাখা দরকার, যাহা হইতে নির্দিষ্টসংখ্যক বাছিয়া লওয়া যায়। কিন্তু বহু বিষয় একসঙ্গে লওয়া ঠিক নহে। অনেক বিষয়ে সামান্য জ্ঞান যেরূপ আবশ্যকীয়, সেইরূপ এই ধাপে অল্পবিস্তর খুব বেশি জানার লাভ নাই—কোনটাই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ নহে। সকল ছাত্রই, একই সময়ে, অথবা সমস্ত স্কুল জীবনে, সমস্ত বিষয় পাঠ করিবে, এমন কথাই হইতে পারে না। সাধারণ জ্ঞান না হইলে কোনরূপ শিক্ষাই সম্যক লাভ হইতে পারে না বলিয়া, একটি সাধারণ ব্যাপক ভিত্তিতে, একই রকম বন্দোবস্তে, একই স্কুলে বিভিন্ন ধারায়, অথবা স্থানীয় পরিস্থিতি এবং চাহিদা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে, এক বা

অধিক নীচের আবশ্যিক ৬ বৎসর ঐচ্ছিক ধারাগুলি শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিবে—

১। সাহিত্যের ধারা—ভাষা শিক্ষার উপর জোর; ইতিহাস, ভূগোল।

২। বিজ্ঞানের ধারা—অঙ্কের উপর জোর, বিজ্ঞান ও আস্থাবিজ্ঞান।

ছাত্রছাত্রী সকলেই নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এই দুই ধারায় আবশ্যিক শিক্ষা পাইবে। অল্প ছাত্রের উচ্চতর শিক্ষার সম্ভাবনা থাকিলেও, বেশির ভাগ ছাত্রের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত হইবে না, এই বিবেচনায় একটি সীমা পর্যন্ত স্বয়ংপূর্ণ শিক্ষারই বন্দোবস্ত থাকিবে।

৩। শিক্ষকের ধারা—স্কুলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছাত্রই এই ধারায় থাকিবে, কারণ ইহারাই প্রাথমিক স্কুলে, মেয়েদের বেলে, অন্যান্য মাষ্টারের কাজ করিবে। সুতরাং বহু শিক্ষকের দরকার হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের দুই বৎসর এই শিক্ষা দিতে হইবে। শাখাটি ৪০ জন ছাত্রের ক্লাসে, ৮টি মাষ্টার হিসাবে, ছাত্রসংখ্যার কিছু অংশ শিক্ষকসংখ্যা দরকার—বাকি উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইবে। এইজন্য এই শিক্ষা স্বয়ংপূর্ণ হইবে এবং পরে এক বৎসর বৃত্তি নিয়া বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক ভাবে ব্যবহারিক শিক্ষা পাইয়া, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইবে।

ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই গ্রামে ও সহরে এই তিনটি "মৌলিক" ধারা, নীচের সমস্ত "আধুনিক" ধারা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। মৌলিকের মতো শিক্ষকের ধারাই ঐচ্ছিক করা যাইতে পারে।

৪। কলা বিভাগ বা আর্টসের ধারা—চিত্রাঙ্কন, গান ও বাজনা, হাতের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে। ঐচ্ছিক হইলেও নিম্ন, উচ্চ মাধ্যমিক উভয় স্তরেই ইহার বন্দোবস্ত থাকিবে।

৫। টেক্‌নিক্যাল ধারা—ছেলেদের জন্য কাঠ-কামার হাতের কাজ; মেয়েদের জন্য সুতার, উলের, চামড়ার কাজ ইত্যাদি। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সকলেরই এই ধারা আবশ্যিক। উচ্চ মাধ্যমিকে, ঐচ্ছিক।

এই ধারাটি ছেলেদের পক্ষে অতিশয় বিস্তৃত। কৃষি যেমন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে মূল্যবান, সেই রকম এই ধারা, বাসগৃহ এবং পরিধান বস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয়। ইহারাই মানবের জীবন ধারণের তিনটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান প্রস্তুতি শেখায়।

ব্যাপক ভাবে সমস্ত আধুনিক ধারাই এই পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে এবং স্বতন্ত্র শিল্পকার্য ইহারই অঙ্গ। ইহাতে প্রধানত কাঠের ও লোহার কাজ। সর্বত্রই কাঠ ও লোহার, একান্ত আবশ্যকীয় বাড়ী ঘর নির্মাণে, প্রায় এগুলিরই ব্যবহার। সুতরাং ছুতার ও কামার গ্রামে সহরে সর্বত্র শিল্পীর ন্যায় সর্বত্রই দরকার। এইভাবে সুবিধিত্ত কাঠের কাজই উচ্চ মাধ্যমিকের "বি" গ্রুপে শিক্ষার ব্যবস্থা। সহরে ফিটার মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ঢালাই ও কালাই (ধাতব বস্তুর ও চাদরের) ইত্যাদি কারিগরের বিশেষ চাহিদা। ছুতার, কামার ব্যতিরেকেও ইহাদের হাতে কলমে শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, মফঃস্বলের সহরে মুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল চলিতেছে। মৌলিক শিক্ষার উপর এই ধারার স্বতন্ত্র ক্লাসে মেন্‌সুরেশন, ড্রইং, এস্টিমেটিং ইত্যাদি বিষয়ের এবং গৃহাদি নির্মাণের মালমসলার ব্যবহারে এবং গৃহের সৌষ্ঠব, ইঞ্জিন, মোটর ও অন্যান্য ইঞ্জিনের শক্তির ব্যবহার ইত্যাদির সহজ আলোচনার মোটামুটি ধারণা করাইতে হইবে।

অনেক ছেলেদের এই ধারের পর শিক্ষা সমাপ্ত হইবে বলিয়া ইহা স্বয়ংপূর্ণ হওয়া চাই। অথচ যাহারা উচ্চতর ধাপে যাইবে তাহাদেরও ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ৪ বৎসর শিক্ষার পর, ইহারা বিভিন্ন কারখানায় অথবা স্বতন্ত্র শিল্পকার্যে (বৈত্রিক হইলে আরও ভাল) নিযুক্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের (এবং কতক

যেসব কারি) শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র, এক-মেড় বৎসরে এই ধারায় শিক্ষা দিতেছে। কুলী সাধারণত অকৌশলী (unskilled) শিল্পী অপেক্ষা বেশি রোজগার করে, কিন্তু কৌশলী শিল্পীর রোজগার অনেক বেশি। বেশীর লোকে কুলীর কাজ করিতে চাহে না। আবশ্যিক শিক্ষা পাইলে আরও চাহিবে না। সুতরাং অকৌশলী শিল্পী হইয়া লাভ নাই।

খাদ্যদ্রব্যের ও বাসস্থানের মতই বস্ত্রপরিধানের নিত্য প্রয়োজনে, তাঁতে কাপড় বোনা গ্রামের একটি বিশেষ শিল্প। পাট, উল, নারিকেলের ছোবড়া ইত্যাদি বুনিবার শিক্ষাও চলিতেছে। বহুদিন যাবত কতকগুলি ভ্রাম্যমান স্কুলে এবং প্রদর্শন দলে (ডিমনষ্ট্রেশন পার্টি), গ্রামে গ্রামে নানা রকম শিল্পী গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ ছাতা, কাঁসার কাজ, সাবান, কাগজ, জুতা তৈয়ারি শেখান হয়।

৬। গার্হস্থ্যের ধারা—শুধু মেয়েদের জন্য, সমাজ কল্যাণের কাজ, সাঁধাবাড়া, কাপড় ধোয়া, সেলাই, রোগীর সেবা ইত্যাদি বিষয়ে। ইহার পর অনেকে ঘর সংসার করিতে যাইবে। নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ইহার ব্যবস্থা থাকিবে।

আর্টস্ ও গার্হস্থ্যের ধারাগুলি গ্রামে চলিলেও, সহরেই প্রবল।

৭। ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা—উচ্চ মাধ্যমিকে টাইপ করা, শর্ট হ্যাণ্ড, হিসাব রাখা ইত্যাদি বিষয়। এই শিক্ষা কেবল সহরেই, কিন্তু বিস্তৃত ভাবে, চলিতেছে। এই ধারে ছোট বড় বহু প্রতিষ্ঠান আছে। উচ্চ মাধ্যমিকে "সি" ক্লাসে ইহার ব্যবস্থা। এই ধারার জন্য শেষ পর্যন্ত কলেজে ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও স্বয়ংপূর্ণ শিক্ষারই বন্দোবস্ত থাকিবে।

৮। কৃষিকার্যের ধারা—স্কুলের বাগান, গৃহ-পালিত পশুপক্ষী, পোকা-মাকড় ইত্যাদি বিষয়। ছেলেদের জন্য এই ধারা কেবল গ্রামেই চালু করিতে হইবে। বেশির ভাগ ছেলেই এই ধারায় ঢুকিবে এবং আবশ্যকীয়তা বিবেচনায় নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় স্তরেই ইহার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে বন্দোবস্ত হইলে এই আধুনিক ধারার স্কুলগুলির জুনিয়ার আর্ট, টেক্‌নিক্যাল, হোম ট্রেনিং, কমার্শিয়াল ও এগ্রিকাল্‌চারাল স্কুল আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। একই স্কুলে একাধিক বিষয়ের ব্যবস্থা হইলে, পলিটেক্‌নিক বলা যায়। ইহাদের উদ্দেশ্য—

(ক) হাতের কাজে অভিরুচি জন্মান,

(খ) জীবিকা উপার্জনের জন্য শিক্ষা, এবং

(গ) যাহারা পূর্ব হইতেই কাজে ঢুকিয়াছে, তাহাদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য এবং হেঁচ শিক্ষার্থীর জন্য সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে বা বৈকালিক বা সান্ধ্য ক্লাসে শিক্ষা।

বেশির ভাগ ছাত্রের জন্য সমস্ত দিন টেক্‌নিক্যাল স্কুলের কারখানায় কাজের এবং ক্লাসে পাঠের বন্দোবস্ত আছে। প্রথম দুই বৎসর নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে, অভিরুচি জন্মাইবার জন্য, বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। কতকগুলি বিষয়ে বর্তমানেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সব স্কুলেই একাধিক ধারার বন্দোবস্ত থাকা দরকার। ধারা বদল করিয়া, কোনটি ছাত্রের পছন্দমত হইবে, পরবর্তী জীবনে জীবিকার জন্য ধারা বাছিয়া লওয়া যায়। নিম্ন মাধ্যমিকে দুই বৎসর শিক্ষার পর উচ্চ মাধ্যমিকে একটি ধারা বাছিয়া নিতে হইবে। পরে সাধারণত ধারা বদলান সম্ভব হইবে না। তবে কেহ উচ্চ মৌলিক ধারায় যাইতে চাহিলে, কারখানার কাজ বাদ দেওয়ার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না। অর্থাৎ ইহাদের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় মৌলিক ধারার উপর বিশেষ জোর দিয়া অন্যগুলি ঐচ্ছিক করা বা বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এবিষয়ে শিক্ষাবিদ্‌গণ উপযুক্ত ভ্রাম্যমান পরামর্শদাতার সাহায্য অতিশয় কার্যকরী হইবে। এই পরামর্শ-দাতারা স্থানীয় সুধীমণ্ডলী লোকেদের সঙ্গে, অভিভাবকদের অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, বৃত্তি অথবা অবৈতনিক বা বিশিষ্ট স্থানগুলি নির্বাচন করিবেন, যেন পক্ষপাতিত্ব না হয়।

(ক্রমশঃ)

বাংলা ভাষা ও বানান

[শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়]

শিক্ষার ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, বিদ্যালয়ের মধ্যে বানান ভুল হওয়ার কারণগুলো কেমন করে এসে জোটে, আর তার নিরসনের উপায়ই বা কি। প্রধানত শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা বলেছি। ছাত্রদের দৃষ্টি-শক্তি, শব্দ-পরিচয়, উচ্চারণ-শুদ্ধতা প্রভৃতির কথা বলেছি। বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে এবং বাংলা ভাষার বৃহত্তর পোঁথির সাহায্যে বানান সম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগ গ্রহণ করব।

বানান-কে যথাযথভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে আমরা নানা উপায় স্থির করে নিয়েছি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা ভাষার এতগুলো শব্দের মধ্যে কতগুলো বানান-পদ্ধতি আমরা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরব? বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির রীতি হচ্ছে, যত বেশি পারি তত শেখাব তা নয়, বরং যত কম পারি তত শেখাব; ইংরেজি রীতিতে বলে, ছেলেদের বয়সের মাপে তার গতীর মধ্যেকার শব্দই আমরা তাদের সামনে আনব; আমেরিকার শিক্ষাবিদের নীতি—অত্যাবশ্যিক শব্দগুলো মাত্র।

যে-নীতিই আমরা মানিনা কেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি—বয়স অনুপাতে শব্দের পৌনঃপুনিকতা আমাদের স্থির করে নিতে হবে। বর্তমান কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তককে অন্তর্ভুক্ত করেও আমরা দ্বিতীয়-মানের উপযোগী যেসব বই পাঠ্য-তালিকায় পাই তাতে প্রায় সবগুলি কঠিন কঠিন কথাই অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি। এ সব বইয়ের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ (আনুমানিক) শব্দই ছেলেদের প্রয়োজনের বাইরে। চিত্তাকর্ষক ছাড়া তৃতীয় মান আর চতুর্থ মানে বিশেষ পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই শব্দ-মালার বয়স-স্তর অনুপাতে পৌনঃপুনিক তালিকা করা বিশেষ প্রয়োজন, আর সে কাজ নিশ্চয়ই পাঠরতী ছাড়া সম্ভব নয়। তার মধ্য থেকেই আমরা তালিকা করব—

(১) প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের পৃথক বানান; যেমন অর্ঘ, অর্ঘ্য,

(২) যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রকৃতি ভেদ—ক্ত, ক্ষ;

(৩) হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বর;

(৪) সন্ধিঘটিত বিপর্যয়

ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে এগুলি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এই ব্যাপারের জন্যে শিক্ষা-অধিকারকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা-পর্ষৎকেও ঘরের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যেমনভাবে নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়ে এসে থাকেন।

বানানের মধ্য দিয়ে আমরা ছেলে-মেয়েদের চরিত্রগঠন আর অভিজ্ঞতার প্রকাশ দেখতে পাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশের অব্যবস্থায় তাদের চরিত্র গড়িয়ে পড়ছে, দানা বাঁধতে পারছে না। এর জন্যে দায়ী শিক্ষক নন, শিক্ষার্থী নন, পরীক্ষক নন, পরীক্ষা-কর্তা নন; দায়ী বাংলার শিক্ষিত সমাজ আর রাজ্যের বৃহত্তর গোষ্ঠী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক বানানটি সত্য প্রতীক কি না, এবং এই বানান অক্ষুণ্ণ রাখা কতখানি সম্ভব, কতখানি প্রয়োজন প্রভৃতি বিচার করা।

ভাষার উচ্চারণকে লিপিবদ্ধ করতেই আমাদের

বানানের প্রয়োজন হয়। উচ্চারণের সুর-তরঙ্গ যেমন মনে বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করে, বানানের মধ্য দিয়েও চোখের মাধ্যমে সেই উচ্চারণকে পড়া করে মনের সেই আবেগ সৃষ্টি করবে।

এই কথা আমরা পূর্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত বলেছি। এখানে আমাদের বক্তব্য, শুধু বানানই কি আমাদের সেই সুরসৃষ্টির একমাত্র উপাদান? 'একমাত্র' কথাটা কিছুতেই বলা যায় না। শুধু শব্দ যেমন সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করে না, শুধু বানানও নয়। এর সঙ্গে থাকে বাক্যগঠন। বাক্যগঠনে সুরকে এনে দেয়। বাক্যগঠনই সুরকে বদলে দেয়। কথা-সাহিত্য আর প্রবন্ধ পড়লেই আমরা একথা উপলব্ধি করতে পারি। এই সুরই আবার উচ্চারণকে বদলে দেয়; কিন্তু বাক্যগঠন শক্তি বানানকে বদল করতে পারে না; বানানটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। কিন্তু বানান-কে বদল করে উচ্চারণ।

উচ্চারণ আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম; দশকের স্বরভেদেও ভিন্নতা ঘটে। কিন্তু কতগুলো শব্দ ও বর্ণমালা আছে যা সমস্ত অঞ্চলে সমস্ত স্তরে একই রকম ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন বজ্র—বজ্‌র্‌; পদ্ম—পদ্‌ম; রক্ষা—রক্‌খা।

এই রকম শব্দগুলো লিখবার বেলায় এক রকম, বলবার বেলায় অন্য রকম বলি। ভাবতে হবে, এই রীতিকে পরিবর্তন করা উচিত, কি, নয়। 'জ'-কে ভেঙে ছেলেদের যেখান যায় এ-জ; কিন্তু 'জ্ঞ'-কে ভাঙা যায় না। অথচ ছেলেরা লিখবার সময় অভিজ্ঞ লিখতে দেখে 'অভিজ্ঞ'। 'লক্ষণ' আর 'লক্ষণ'—এও ঐ ভুল। পূর্ব প্রবন্ধে বলেছি 'বিশ্ব'-কে চোখের সামনে তুলে ধরা ছাড়া উপায় নেই; ছেলে সুবিধা করে গোপন-কোঠায় উচ্চারণ করে 'বিস্‌-ব', 'নক্‌-ব'। এ-রকম উচ্চারণে আমরা নিশ্চয়ই উৎসাহ দেব যেন না। দর্শন-প্রতীক খুব উচ্চ স্তরের চিন্তার ফল নয়। কাজেই এসব যাবগায় তো বানান রীতি বদলানোর বিশেষ প্রয়োজনই পড়ে গেছে। বস্তুত, বর্তমান কালে বিদ্যালয়ে ইংরেজি-পড়ানোর মতো। সরকারকে ফাঁকি দিয়ে প্রথম যান থেকেই এ-বি-সি-ডি শেখাতে হবে! যে নিয়মে গোপন-অনিয়ম, সে নিয়ম নাই বা থাকল। বাইরে যদি বন্ধ করতে গিয়ে যদি ভেতরের বাড়ি ভেঙে যেতে থাকে, তবে সে নিষ্ঠায় কি লাভ?

'ব'-ফলা, 'ম'-ফলা, 'র'-ফলা 'ঐ-ঐ' 'ঔ' 'ঔ' 'ই-ঈ; উ-ঊ' সমস্ত বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। বাংলার সমগ্র জনসাধারণের সাধারণ প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের ভাষা গড়তে হবে। আর সেই নির্দেশ একভাবে, একযোগে সমস্ত বিদ্যালয়ে দিতে হবে। পুরোনো পুঁথি-পত্তর বিদ্যালয়ের স্তরে আসতেও তেমনি লাফিয়েই আসতে হবে।

বাধা আমাদের অনেক আছে; রক্ষণশীলতার বাধা, আর ব্যবসায়ীদের বাধা। শিক্ষাবিদ্‌ এবং রাষ্ট্রের এই বাধা কাটানোর মতো শক্তি তো থাকা চাই। নতুবা সে রাষ্ট্রের উপর তলাহ-লোকে নির্ভর করবে কি করে?

পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, বানানে প্রখর দৃষ্টি রাখায় ছেলেদের রচনা শক্তিতে ব্যাঘাত জন্মে কি না। বানানের নির্ভুলতার দিক দিয়ে আমরা তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক মাপতে পারি বটে, তার ঠিক-ঠিকটি দেখা, প্রখর দৃষ্টি, সতর্কতা, ধীর-স্থিরতা প্রভৃতি অস্থিতার অনেক রূপ দেখে থাকি। কিন্তু বানান যে আসলে ভাষার অংশ সে কথা ভুললে তো চলবে না। বানান ঠিক করতে যদি তাদের প্রকাশ ক্ষমতা বিপন্ন হয়ে পড়ে তবে আর বানানে কি দরকার?

এই বছরে 'মে'-মাসের দিকে বিলেতে ওয়েস্ট-মল্যাণ্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, "বানান অথবা হাতের লেখার দিকে খুব বেশি মন দেওয়া বা ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।"

ও-দেশে এই নিয়ে খুবই বিতর্ক চলছে। শিক্ষাবিদ্-মনোবিদেরা নানা অভিজ্ঞতা আর নির্দেশ নিয়ে কাগজে কাগজে খাওয়া করছেন।

ঐ অঞ্চলের পরীক্ষকেরা প্রশ্নপত্রের মারফৎ ছাত্রদের কাছে থেকে কি চেয়েছেন? প্রকাশ-ক্ষমতা, নানা নিয়ম থেকে মুক্ত করে তাঁরা ব্যবহার করার নিপুণতা। কিন্তু রচনাত্মক লেখায় এমনি পরীক্ষা কি সঠিক পরীক্ষা?

হৈ চৈ হতে থাকুক। কিন্তু আমরা ভাবছি পরীক্ষকেরা এমন নির্দেশ দিলেন কেন? কি অনুবিধায় ছাত্র পড়ে যেত অত বিধি নিষেধে? কতখানি প্রমাণ আছে, ঐ সুফলের?

হিন্দী গানের বিরুদ্ধে বা ছবির বিরুদ্ধে যখন আমরা কাগজে-কাগজে 'গেল গেল গেল মান' বলি, তখন একথাও ভাবতে হবে—কেন অমন চঙ্ দেখে চলে? তেমনি এখানেও ভাবতে হবে—কেন পরীক্ষকেরা অমন কথা বলেন?

বানান বেসামাল হলে রচনা যে ব্যাহত হয় একথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছন্দের বাঁধুনিতে যেমন চিন্তাসূত্রের পরিবর্তন ঘটে, তেমনি বোল যেমন গানের বিস্তারকে বেঁধে ফেলে।

বলার বেলায় আমরা মনের কথা যেমন তখনি বলি, লিখবার বেলায় যে তা পারি নে, তা অনেকটা স্বীকৃত।

কিন্তু ছন্দের বাঁধনে বাধা হয়ও পায়; তেমনি বোলে গানে মিষ্টিত্বও আসে। একটা বাঁধন ছাড়লে আর একটা বাঁধনেরও দরকার।

'রচনা' যখনই বলেছি, তখনই লিখবার কথা বলেছি। বানান যদি উপেক্ষাই করি, তবে লিখব কি? সে-কথাও আমার শিক্ষার মধ্য দিয়ে চোখে-কানে-হাতে ধরা দিয়েছে—তাকে আমি যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারিনে। কাজেই ঐ নির্দেশের মধ্যে 'চয়ন' স্বাধীনতা দেওয়া নেই। যে-শব্দটি কথায় বলছি, উপযুক্ত বলে মনে করছি অথচ সাধারণযাত্র বানানের গোলমালের জন্যে ব্যবহার করতে পারছিনে, সেই স্থানেই অভয় দেওয়া হল। একটি ছাত্রের কথা মনে পড়ছে; সে ইংরেজি পত্রের উত্তর করতে হঠাৎ 'people' বানানটা ভুলে গেল; কেবলই মনে হচ্ছে 'pupil', কাজেই সে 'moon' কথা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়; অথচ ও-টি মুষ্ট প্রয়োগ নয়। এই রকম স্থানেই বোধ হয় অভয় দেওয়া হল। কিন্তু 'অর্থ'-আর 'অর্ঘ্য' কথায় বা 'people' আর 'pupil' কথার অর্থেই পার্থক্য। কাজেই এসব স্থানে ভুল বানান বোধ হয় মাপ করা যায় না।

এই রকম অনেক জায়গা আছে যেখানে স্বাধীনতাও দেওয়া হয়, শাসনও করা হয়। তা ছাড়া বিশেষ-বিশেষ কথায় রচনা-লেখা যাহোক হলে বেশি কিছু মনে করা হয় না। এই জন্যে রচনায় মোটামুটি বানানে এমনি স্বাধীনতা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাই বলে, ভুল বানানকে শিক্ষাক্ষেত্রে উপেক্ষা করা কোন মতেই চলতে পারে না।

উপসংহারে এইটুকু বলছি, যে বানান বর্তমানে চলছে শিক্ষককে তা মাপ করতে হবে। কিন্তু শিক্ষাবিদ্দেরও মাপ করতে হবে তাঁদের-কখনো লোক-প্রবণতা। সমস্ত দিক বিবেচনা করে, বৈজ্ঞানিক পন্থায় নতুন করে সুসহ নীতির প্রবর্তন করতে হবে। নতুবা যতই 'সেন্সর বোর্ড' থাকুক, উলঙ্গ-সিনেমা-ছবির মতো বানান ভুল ছাত্র-শিক্ষকে করে যাবেই।

"আমরা" কবিতার শেষ স্তবক

[শ্রীবকুলমালা সেন]

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতাটি বহুকাল যাবৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ সঙ্কলনে স্থান পাইয়া আসিতেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্বাচনেও ইহার পূর্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

কাব্যসৌন্দর্য ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইহা যে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহা আশা করি প্রত্যেক শিক্ষকশিক্ষিকাই স্বীকার করিবেন। ইহার ছন্দের দোলা কিশোরবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মনে বাংলার অতীত গৌরব ও ভবিষ্যতের আশাকে উদ্বেল করিয়া তোলে।

আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষায় নোটবুকের প্রভাব কতখানি তাহা সকলেই অবগত আছেন। নোটবুককে স্থানচ্যুত করিবার পথ প্রায় রুদ্ধ বলিলেই চলে। সুতরাং পাঠ্যাংশের কোন বিশেষ অংশের ব্যাখ্যায় নোটবুক এবং শিক্ষকের অভিমতে পার্থক্য ঘটিলে ছাত্রছাত্রীদের চিত্ত দ্বিধায় পীড়িত হয়। ছাপার হরফের একটি বিশেষ আবেদন আছে, তাই নোটবুকের অবজ্ঞা সহিত করা সহজ হয় না। ব্যক্তিমানসের প্রবণতায় পার্থক্যের জন্য সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া বহুর মনে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে তালরূপ যাচাই না করিয়া পথ ছাড়িয়া দেওয়া চলে না।

পাঠ সঙ্কলনে গৃহীত "আমরা" কবিতার শেষ স্তবকটি এইরূপ একটি বিশেষ অংশ। কবিতাটি সাতটি স্তবকে বিভক্ত। কবি প্রথম স্তবকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করিয়া তাহারই পটভূমিকায় বাংলার সংস্কৃতির পরিচায়ক বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্তবকে বীর্য, তৃতীয় স্তবকে সাহিত্য দর্শন, চতুর্থ স্তবকে কলাবিদ্যা, পঞ্চম স্তবকে আমাদের জীবনী শক্তির মূল উৎসরূপে আধ্যাত্মিকতার কথা বলিয়াছেন। এই পর্যন্তই অতীত গৌরবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ স্তবকে কবি আধুনিক কালে, বিংশ শতকে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ যুগের দুঃখদুর্দশা ও জাতির অপরিসীম অবনতির সঙ্গে কবি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, সেইজন্য গৌরব বর্ণনা করিতে গিয়াও যে বেদনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত কবি-মনের নিভৃতে অবিরোধ বহিয়া চলিত, তাহার যেন দ্বারে দ্বারে আত্মগোপন করিতে পারে নাই। তাই সেই আচার্যদেবের বিজ্ঞান সাধনার কথা বলিতে গিয়া কবি যখন জড়বস্তুতে প্রাণের সাড়া পাওয়ার কথা বলিয়াছেন, তখন জাতির জড়ত্বের কথাও যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে জাগিয়াছে। জড়বস্তুতে প্রাণের আবিষ্কারের যেন শুধু বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটন নয়, ব্যক্তিগত মনীষা জাতির মননশীলতার অবরুদ্ধ দুয়ারও যেন উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বিপরীত-ধর্মী ধাতব পদার্থের মিলন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য তো বটেই, কিন্তু তাহাই সবটুকু নয়। দেশের বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে লজ্জাজনক বৈষম্য দেশের সার্বজনীন উন্নতির পরিপন্থী, সেই বৈষম্যের ব্যথা কবি মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। তাই তিনি আশা করিতেছেন বাঙালীর যে প্রতিভা বিষম ধাতুর মধ্যে মিলন ঘটাইয়াছে, সেই প্রতিভার বলেই সে একদিন দেশব্যাপী এই বিভেদ সম্পূর্ণরূপে দূর

করিতে পারিবে। ইহা শুধু সম্ভাবনা নয়। কবি আশাবাদী। কবিতার উদ্বোধন যখন ব্যক্তি-হিতৈষণার মধ্যে হইয়াছে, তখন প্রধান বাধা অপসারিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া চলে। এই শক্তির প্রয়োগে ভবিষ্যতে যে কার্য সুসম্পন্ন হইবে তাহার একটি কাল্পনিক ছবি তিনি কবিতামধ্যে তাঁহার আমাদের সাহিত্যরসপিপাসু মনের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই জন্যই বিষয় ধাতুর মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাহসের বিধানের প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মানবীয় মহামিলনের কথা মনে পড়িয়াছে "বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান।" এই মহা-মিলনের বার্তা রূপে যশে অভিদিক্ত হইয়া ব্যক্ত হইয়াছে বাংলার নিধি, ভারতের গৌরব, বিশ্বমানবের সুসন্তান রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। সুতরাং আমাদের ভয় নাই। বর্তমান যেমনই হোক, "ভবিষ্যতের পানে যেতে চাই আলো-ভরা আহ্বানে।"

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারই ছায়ায় আমরা নিমাব জগতের শতকোটি।
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে ধ্রুব,
বিধাতার ধ্রুবে ভরিবে নূতন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভার ধ্রুবে সে ঘটনা হবে লাগিবে না তার বেশি,
লাগিবে না তাহে কারু বাহুবল, লাগিবে না মেকামেকি।
মিলনের মহাযজ্ঞে মানবে ডাকিছে কবি বীরে,
মুক্ত হইব সেবকগণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

কবি বাঙালীর মহিমা কীর্তন করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। তাই বর্তমানের নৈরাশ্যের মধ্যেও তিনি আশার বাণী শুনাইতেছেন। এই দুর্দিনের পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইলে যাহা চোখে পড়ে তাহাই একমাত্র সত্য নহে, ইহার যে সামগ্রিক রূপ দূর হইতে দেখা যায়, তাহাও মিথ্যা নহে। যে বাংলায় আচার্য জগদীশ আছেন, আচার্য প্রফুল্ল আছেন, বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ আছেন, আমাদের কালাচে যত দুঃখই পুঞ্জীভূত হইয়া থাক না কেন, সে বাংলার নিরাশ হইবার কিছু নাই। বর্তমান যেমনই হোক, ভবিষ্যৎ যে অভ্যুজ্জ্বল রূপ লইয়া দেখা দিবে, এ বিষয়ে কবির মনে কোন সন্দেহ নাই। বাংলা আজ শ্মশানতুল্য হইয়া গিয়াছে বটে, জনসাধারণের মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দন এখন আর অনুভব করা যায় না সত্য, কিন্তু "শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী।"

শ্মশানে পঞ্চবটী রোপণ করিয়া তপশ্চর্যা করার রীতি আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। পঞ্চবটীর শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ায় উপলব্ধ সত্য ক্রমশ জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া আমাদের সাধারণকে উচ্চতর পর্যায়ে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে, এমনি করিয়াই যুগ হইতে যুগান্তরে চলার পথ আবিষ্কৃত ও উন্মুক্ত হয়। আজিকার শ্মশানতুল্য প্রাণস্পন্দহীন মরুভূমিতেও পঞ্চবটীর মতই অনেকের মহামনীষী প্রতিভার অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়াছেন। তাহারই আলোয় বাংলার সাংস্কৃতিক সকল দিকের পুনরুজ্জীবন হইবে। কবির আশা, সেদিন বাঙালীর শক্তি শুধু আপনাকে উচ্চতম বিষয়ে আকৃষ্ট করাইয়াই নিঃশেষিত হইবে না। তাহার শক্তিতে তাহার প্রেরণায় বিশ্বজন তাহারই নির্দেশিত পথে চলিয়া পরম মঙ্গলের অধিকারী হইবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরোধের চির অবসান ঘটিবে। প্রাচ্যের অন্তর্মুখীনতা ও পাশ্চাত্যের বহির্মুখীনতা বিশ্বজনকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মানবতার পরিপূর্তির পথে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, সাংস্কৃতিক সম্মিলন ঘটাইয়া তাহা বিচূর্ণ করাই বিধাতার অভিপ্রায়। এই ভাগবত অভিপ্রায় সফল করাই হইবে বাঙালীর সর্বপ্রধান কীর্তি।

পূর্বাপর আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, কাব্যানুভূতির দিক দিয়া যেরূপ পরিণতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, শেষ স্তবকে কবিতাটি সেই পরিণতিই লাভ করিয়াছে। সুতরাং

কাব্যরচনার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক রীতি ইহাতে অক্ষুণ্ণ আছে এবং সেই জন্যই ইহা কবির মনোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম।

এইবার আমরা নোটবুকগুলির ব্যাখ্যা লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। অধিকাংশ নোটবুকেই—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ফলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে বাণী দক্ষিণেশ্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই এ তত্ত্বকের মূলিত বিষয় বলা হইয়াছে। তাহাদের মতে "যত মত তত পথ", শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার এই সার নির্যাস—যাহা স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যতে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করিবে; তাহার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসই কবি এই তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ব্যাখ্যানুসারে আমরা দেখিতে পাই, সাময়িক উন্নয়নের তরঙ্গশীর্ষে পা দিয়া, সেইরূপ ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া অকস্মাৎ কবি তাহা ত্যাগ করিয়াছেন ও আংশিক উন্নয়নকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। এই তাব-বিরোধ মনকে প্রথমেই বিমুখ করিয়া দেয়। এই অর্থকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, কবিহাটি কবিমানসের স্বত উৎসারিত ভাব হইতে জন্মলাভ করে নাই। কবিতার এই ত্রুটি মানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলে প্রথম পংক্তিতেই দ্বিতীয়বার হোঁচট খাইতে হয়। পংক্তিটি পড়িয়া মনে এই ভাবই আসে যে "শ্রীধামের বুকে পঞ্চবটী রোপণ" করাই বাঙালীর একটি বিশেষ কীর্তি। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের সংলগ্ন পঞ্চবটী রচনার মধ্যে কি বাঙালীর কোন বিশেষ কীর্তি প্রকাশ পাইয়াছে? রাণী রাসমণির ধর্মপ্রাণতা ও রৌপ্যমুদ্রাই কি ইহা রচনা করে নাই? বলা যাইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিকসাধ্য সাধনার স্মৃতিকল্পে "পঞ্চবটী" শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাকে স্বীকার করিয়া লইলে বলিতে হয়, পংক্তি দুটির শব্দ-বিন্যাসের সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। শুধু তাই নয়, পঞ্চবটীকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার স্মৃতিকল্পে উল্লেখ করা যায় কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক জীবনের এমন কোন বিশেষ ঘটনা কি ঘটিয়াছিল, যাহার জন্য ইহাকে তাঁহার সাধনার প্রধান স্থানরূপে গণ্য করা চলে? প্রধান ঘটনাবলীর কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল। অধিকাংশ সময়, অন্তত পক্ষে উল্লেখযোগ্য সময়ও কি তিনি পঞ্চবটীতে সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন? যখন তিনি মাতৃভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, তখনকার ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থল ছিল ভবতারিণীর মন্দির। বৈদান্তিকের দীক্ষার সময়ে তিনি 'মায়ের' মায়া কাটাইয়া অদ্বৈতের উপলব্ধিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তাহাও পঞ্চবটী নহে। অন্যান্য ধর্মমতে সাধনা করিবার জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মমন্দিরে গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির স্মৃতিকল্পে পঞ্চবটীর উপস্থাপন অসমীচীন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ইতিহাস সম্বন্ধে কবি অজ্ঞ ছিলেন, ইহা মনে করা চলে না। সুতরাং মানিয়া লইতে হয়, ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ নিতান্তই ছন্দের মিল ঘটাইবার প্রচেষ্টায় এমন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ভাবানুযঙ্গ শব্দচয়নের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। এই ত্রুটি মানিয়া লইয়া আরও অগ্রসর হইলে আবার বাধা খাইতে হয়। পঞ্চম স্তবকে বাঙালীর আধ্যাত্মিকতার জন্য গৌরব প্রকাশ করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়"। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী যে অভিন্ন, কবি কি তাহা জানিতেন না? যদি মনে করা যায় জানিতেন, তাহা হইলে বলিতে হয়, এই কথাই কবি একবার

পঞ্চম স্তবকে এবং দ্বিতীয়বার সপ্তম স্তবকে বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের বাহক ও প্রচারক হইলেও তাঁহার অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জন্য পৃথক করিয়া তাঁহার কথা উল্লেখ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করা শক্ত বটে, কিন্তু প্রধানত অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কেই যদি উভয়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে একই স্তবকে উভয়ের স্থান পাওয়া কি স্বাভাবিক নয়? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের বীজ যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার কার্যের মধ্যেই উপ্ত হইয়াছে, তাহা একবার পঞ্চম স্তবকে বলিয়া আবার সপ্তম স্তবকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ফলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আশা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহা কি একই ভাবের অভিব্যক্তি নহে? সুতরাং শেষ স্তবকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার কথাই বলিয়াছেন, এ অর্থ গ্রহণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে কবিতাটিতে ভাবপ্রকাশের শৈথিল্য ঘটিয়াছে।

অনাদিঅন্ত কবিদের কবিতায় কোথাও কোন ত্রুটি থাকিতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। সুতরাং কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা' কবিতাটিতে যদি বহুতর ত্রুটি আবিষ্কৃত হইয়াই থাকে, তাহা সত্যেন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই যে অসম্ভব বলিয়া ফতোয়া দেওয়া চলিবে না—ইহা ঠিক। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত প্রমাণীভূতরূপে গ্রহণ করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা দরকার, প্রকৃত ত্রুটি কোথায়? কাব্য-রচনায়, না কাব্যের ব্যাখ্যায়? অন্তরীয় চিহ্নাঙ্কিত একটি ব্যাখ্যা প্রথমত ছাপ করাইয়া তাহার সঙ্গে যেখানে যেখানে খাপ খাইতেছে না, সেখানে কবির বা কাব্যের ত্রুটি ধরা নিশ্চয়ই সঠিক বিচার পদ্ধতি নহে।

আলোচনার প্রারম্ভে আমরা দেখিয়াছি যে মুষ্টি শব্দ প্রয়োগের সাহায্যে মূর্তিমান ভাব প্রকাশের পথ ধরিয়া কবিতাটি সাবলীলগতিতে অগ্রসর হইয়া উহার পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা কোথাও ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু নোটবুকের বেড়াজাল ভিঙাইয়া স্বাধীন উপলব্ধির ক্ষেত্রে না দাঁড়াইলে ছাত্রছাত্রীরা ইহার রসমাধুর্যে অবগাহন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

মূল আলোচ্য বিষয়টির সমাপ্তি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্নের ভিড় রোধ করা যায় না। পরবর্তী প্রথম প্রশ্ন হইতেছে—ইহাই যদি সত্য ব্যাখ্যা, তবে পাঁচ সাতটি নোটবুকের প্রত্যেকটিতেই অপর ব্যাখ্যাটির অবতারণা করিয়াছে কেন? তাহারা সকলেই কি ভুল বুঝিয়াছে? ইহার উত্তর—সাহিত্যোপলব্ধিতে অঙ্কের মত ভুল বা শুদ্ধতার প্রশ্ন অচল। যে অর্থ মনের তারে ঝঙ্কার তুলিয়া রসের উৎসমুখ খুলিয়া দেয়, সাহিত্যের বিচারে তাহাই সত্য। যে অর্থ শব্দের সীমান্তেই আবদ্ধ করিয়া রাখে, তদতিরিক্তের আভাস দেয় না, কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে তাহা সত্য নহে। বহুজন দ্বারা সমর্থিত হইয়া একদিন ভগবান ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং বহুজনের সমর্থন সর্বদা সত্যের প্রকাশক না হইতেও পারে। দ্বিতীয় প্রশ্ন—কাব্য যেখানে মনোপলব্ধির প্রয়োজন মিটাইয়াই কর্তব্য সমাপন করে না, পরীক্ষায় নম্বর অর্জনেও সহায়তা করে, সে ক্ষেত্রে বহুজন সমর্থিত মতের সত্য-মিথ্যা বিচার কি কতিকর নয়? ইহার উত্তর—বিদ্যালয়ের শিক্ষায় নম্বর এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া-না-হওয়ার একটা বিশেষ স্থান আছে বটে, কিন্তু ইহাকে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেওয়া চলে না। রসের আস্বাদনে সাড়া দিতে পারার যোগ্য করিয়া চিত্তের প্রস্তুতিই সাহিত্য পাঠনার উদ্দেশ্য। কারণ যত জোরালোই হউক না কেন, উদ্দেশ্য সাধনের পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া শিক্ষকের পক্ষে অমার্জনীয়।

পত্র

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার]

মাননীয়

"শিক্ষা" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ভাদ্র সংখ্যা "শিক্ষায়" শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র কর্মকার মহাশয় আমার "রাষ্ট্র ও শিক্ষা" প্রবন্ধের একটি কথার আলোচনা করিয়াছেন দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, দেশে Post-Basic নামক যে সকল শিক্ষায়তন বর্তমানে আছে তৎসম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। সুতরাং অনধিকার বশত তাহাদের সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছুই আমি বলি নাই। তবে যে সকল ছাত্র মানসিক শিক্ষার অযোগ্যতা বশত অর্থ পথে স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হয় তাহাদের শ্রমিক শিক্ষার জন্য কতগুলি শিক্ষালয় খোলার প্রয়োজনীয়তার কথাই আমি বলিয়াছি। নামের কোনই অর্থ নাই। এ সকল শিক্ষালয়কে যে নামেই অভিহিত করা যায় না কেন, যেন ছেলেদের কিরূপ বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতে হইবে সে বিষয়ে আমি সন্দেহের কোন অবকাশ রাখি নাই। 'গ্রামের প্রয়োজন গুলি', 'কৃষি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ', 'শ্রমের মর্যাদা' কথাগুলি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে honest labour দ্বারা জীবিকার্জন শেখার কথাই আমি বলিয়াছি। সুতরাং "ভিক্ষা করে ও জীবিকা অর্জন করা যায়। ব্ল্যাক মার্কেটকেও ....." ইত্যাদি উক্তি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক মনে করি।

আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে আমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিহার। ওয়ার্ধা বা অন্য কোন স্থানে ভাল শিক্ষায়তন থাকিতে পারে না ইহা আমার ধারণাও নয়, বলার অভিপ্রায়ও নয়। হাঁ, এখানে আশে পাশে কিছু Basic ও Pre-Basic স্কুল খুলিয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু সভয়ে বলি যে তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কাহারও ধারণা ভাল নয়। সেখানে শিক্ষকেরা শুধু অধিক মাহিনা ও সরকারি বৃত্তির প্রলোভনেই যান, কিন্তু অনেকের এখনও তাথাজ্ঞানও নাই। ভাদ্র সংখ্যাতেই শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বক্সী মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে বঙ্গদেশের বুনিয়াদি শিক্ষালয়গুলিও সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

যাহা হউক আমি সাধারণ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহাতে যে দোষ ত্রুটি দেখিয়াছি, তাহারই আলোচনা করিয়াছি। ওয়ার্ধা পরিকল্পিত Basic পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলি যদি ঐসকল দোষযুক্ত হয় তবে দেশের যাবতীয় বিদ্যালয়গুলিকে কেন Basic শ্রেণীভুক্ত করা হইবে না, তাহারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না।

বিনীত

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার]

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত ছাত্রদের যে ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তদতিরিক্ত নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির অনুরূপ প্রশ্নও মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যাহাতে ছাত্রদের বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এগুলির অধিকাংশ প্রশ্নই মৌখিক হওয়া উচিত, কিন্তু কিছু পরীক্ষার এবং আরও কিছু পূর্বাহ্নেই এক্সপে জিজ্ঞাসিত হওয়া উচিত যাহা ছাত্রেরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেরা খোঁজ করিয়া সমাধান করিতে পারে। প্রক্রিয়ার চেয়ে পর্যবেক্ষণের উপর এবং পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে সাধারণ বুদ্ধির উপর আমি বেশি জোর দিতে চাই। নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়গুলিতে ছাত্রেরা শিক্ষিত জিনিসগুলিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে কিনা, এবং বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা (correlate) করিতে পারে কিনা, তাহারও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। পুস্তক মুখস্থ করিয়া বুদ্ধির বিকাশ হয় না। কিন্তু ছাত্রদের যদি পরে পরে উপস্থিত সমস্যাগুলির জন্য ভাবিতে হয়, তবে নিশ্চই তাহাদের বুদ্ধি প্রখরতা লাভ করিবে। ছাত্রের বয়স বিচার করিয়া প্রশ্নগুলির শ্রেণী বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। উত্তর যাহাতে পূর্ণ বাক্যে হয় তাহাও দেখা উচিত।

আট বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদের জন্য

(১) তোমার মাথা, হাত, পা, নাক, কান, চক্ষু, দাঁত ও জিহ্বা দেখাও।

(২) তুমি একটি ছোট ছেলে, না ছোট মেয়ে?

(৩) তোমার নিজের, বাবার, কাকার ইত্যাদির নাম বল।

(৪) এই জিনিসগুলি কি? (চোখি, চাকু, পয়সা, কলম, চিরুণী ইত্যাদি)

(৫) এই বলগুলির মধ্যে কোন্‌টার কি রং বল।

(৬) তোমার ডান হাত, বাঁ পা, ডান চোখ, বাঁ কান দেখাও।

(৭) পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকগুলি দেখাও।

(৮) তোমার হাতে কয়টি আঙুল?

(৯) তিনটা শক্ত সমস্ত কাটা দা?

(১০) চার খানা পোস্টকার্ডের দাম কত?

আট হইতে তের বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের জন্য

১। ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

(১) সূর্য, চন্দ্র, মাটি, জল, গাছপালা ও জীবজন্তু কে প্রস্তুত করিয়াছেন?

(২) বৃষ্টি কেন হয়, গাছে ফল ধরে কেন, মায়ের বুকে দুধের আবির্ভাব কেন হয়?

(৩) এই সবগুলি প্রভুর প্রতি আমাদের কি করা উচিত?

(৪) যদি স্কুলে কেহ কাহারও বই ফেলিয়া গিয়াছে, তো কি করিবে?

(৫) কৈকেয়ীর পক্ষে তাহার ছেলের জন্য সিংহাসন চাওয়া কি উচিত হইয়াছিল?

২। বুদ্ধির পরীক্ষা

(১) একসের তুলা ও একসের লোহার মধ্যে কোন্‌টা বেশি ভারী?

(২) এক পাউণ্ড সোনা ও এক পাউণ্ড লোহার মধ্যে কোন্‌টা বেশি ভারী?

(৩) চক্ষু, কান, নাক ও জিহ্বার ব্যবহার কি?

(৪) এগুলির প্রমাণ কি—

(ক) আমরা চক্ষু দিয়াই দেখি, (খ) কানও

সূর্য উঠিবে, (গ) তোমার প্রতিবেশীর কয়টি হাত ছিল।

(৫) জন্ম হইতে কালা মানুষ বোবাও কেন হয়?

(৬) আঘাতে স্থান ফোড়া বা মনে হয় কেন?

(৭) খাদ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ কি কি?

(৮) তোমার ভগিনী-পতির ছেলের মামী তোমার কি হয়?

(৯) ৬টা ও ৭টার মধ্যে কখন ঘড়ির কাঁটা মিলিত হয়, তাহা চিত্র আঁকিয়া দেখাও।

(১০) একটি কুঠুরী যাহা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, তাহাতে ক ও খ নামক দুই ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেল। ক এর শরীর বিশ্লিষ্ট এবং খ এর শরীর ঝুলিতে ঝুলান। উহাদের মধ্যে কে আগে মরিয়াছে ও কিরূপে?

(১১) এগুলির জন্য কি জিনিসের দরকার হয়—(ক) ঘর পরিষ্কার করিতে, (খ) পেন্সিল কাটিতে, (গ) মসলা বাটিতে, (ঘ) খারাপ চোখের জন্য?

(১২) এক গাছে দশটি পাখী বসিয়াছিল। একটিকে গুলি করিয়া মারিলে গাছে আর কয়টি পাখী থাকিবে?

(১৩) নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে কি কি ভুল আছে?

(ক) আমার তিন ভাই আছে—রাম, শ্যাম ও আমি নিজে।

(খ) মানুষটা তিন টুকরা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং অনুমান করা হয় যে সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

(গ) রোজ প্রাতর্ভ্রমণ করাটা আমার অভ্যাস—তা সে দশটাতেই হোক আর বারটাতেই হোক।

(ঘ) মাছের ঝোল রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ পাত্রটি ভাঙিয়া গিয়া সব মাছগুলি আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইল; সুতরাং সেদিন তাহাকে শুধু ঝোল দিয়াই খাইতে হইল।

৩। চিত্র-পাঠ

(দেওয়ালে নানারূপ চিত্র টাঙাইয়া দিতে হইবে)

(১) এখানে কয়টা ঘোড়া আছে? ছেলেরা কি করিতেছে?

(২) লোকটা দৌড়াইয়া পলাইতেছে কেন? (পিছনে বাঘ)

(৩) এই ছবিতে কি কি ভুল আছে? (যথা, ছায়া সূর্যের বিপরীত নয়, সূর্য উঠার সময় ঘড়িতে ১২টা, চাঁদ সূর্যের নীচে, বা চাঁদের শিং সূর্যের দিকে, বিড়ালের গোঁফ নাই, ইত্যাদি)

(৪) এই ছবিগুলি দেখিয়া গল্প রচনা কর।

৪। চিত্রাঙ্কন

(১) দুইটি সমকাহ ত্রিভুজ ও দুইটি বৃত্ত এরূপে মিলাইয়া আঁক যাহা দেখিতে সুন্দর হয়।

(২) অসমাপ্ত চিত্রটিকে সমাপ্ত কর।

(৩) একটী শালিখ পাখীর রেখাচিত্র এবং কাল, হলুদে ও বাদামী রং দেওয়া আছে। চিত্রটী ঠিক মত রং দিয়া কর।

৫। পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা

(১) গরুর কান ও শিং এর মধ্যে কোন্‌টা বেশি সম্মুখে?

(২) টাকায় রাজার মাথা ডান দিকে না বাঁ দিকে ফেরানো?

(৩) মাছি, মৌমাছি, মাকড়সা ও কাঁকড়ার কয়টি পা?

(৪) ধান হইতে মুড়ি, দুধ হইতে ঘি এবং শামুক হইতে চুণ কিরূপে প্রস্তুত হয়?

(৫) এরূপ চারিটি বন্য পক্ষীর নাম বল, যাহার মাংস মানুষে খায়।

(৬) ইঁদুর, চামচিকা, কুমীর ও সাপের ভিম হয় না বাচ্চা হয়?

(৭) কি মাসে ব্যাং বেশি দেখা যায়? মাছে

ডিম কখন হয়? কুসুমের রঙ কি রকমে হয়? বসন্তকালে এদেশে কি কি পাখী আসে? শীতকালে কি কি তরকারি খাও?

(৮) রান্নাঘরে কি কি রং আছে? (শিশু নিজে গণিয়া দেখিবে)

(৯) তোমার কয়টী দাঁত? (শিশু নিজে গণিয়া দেখিবে)

(১০) ইহাদের মধ্যে প্রভেদ বল—(ক) গরু ও ঘোড়ার পায়ে, (খ) বিড়াল ও কুকুরের পায়ে, (গ) গরু ও ঘোড়ার দাঁতে।

(১১) ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টা জলে ভাসে?—বরফ, ডিম, চা-খড়ি, হাতী-দাঁত।

(১২) ঘড়ি দেখিতে বল, চাঁদ কোন্ সময় দেখিতে উঠে। কেন?

(১৩) এই কয়টা জ্যোতিষের মধ্যে কোন্‌টা তারা, কোন্‌টা গ্রহ? (সূর্য—১ সপ্তাহ)

(১৪) এপ্রিল মাসে পূর্ব হইতে বায়ু বহিলে কি অনুমান করিবে? ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন সারাদিন বৃষ্টি হইল। ইহা কোন্ কোন্ শস্যের পক্ষে উপকারী হইবে?

(১৫) একটি বাক্সে কয়গুলি ধার (side), কিনারা ও কোনা আছে?

(১৬) দাঁড়কাক ও পাতি কাকে কি প্রভেদ? পাতি কাকের কোন্ কোন্ অংশ ধূসর? ঐরূপ চিল ও বাজে, বক ও সারসে, ঘুঘু ও কবুতরে, বোলতা ও ভীমরুলে, শিকী ও মাগুর মাছে, মোরগ ও মুরগীতে প্রভেদ বল (অথবা রঙীন ছবি গুলিতে দেখাও)।

(১৭) এই গাছগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি চিন—ইক্ষু, অশ্বত্থ, আম, কাঁঠাল, বেল ও নিম?

(১৮) বস্তু নির্দেশ (identify) কর (প্রকৃত বস্তু অথবা রঙীন ছবি দেখাইয়া)—(ক) গোখুরা, কইকুত, ঢোঁড়া প্রভৃতি সাপ (কোন্ গুলি বিষাক্ত?), (খ) কোকিল, শালিখা, প্রভৃতি পাখী (তুমি কোন্ পাখী ভাল বাস বা হইতে চাও?), (গ) যুঁই, বেলা, গন্ধ, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল (কোন্ ফুল ভাল?), (ঘ) মাঝা জাতীয় চারা-গাছ (কোন্‌টা খাও, কোন্‌টা বিষাক্ত ও কোন্‌টা ঔষধে লাগে?), (ঙ) ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের চিত্র।

(১৯) (ক) ডাক হইতে পাখী চেন (গাছে কোন্ পাখী ডাকিতেছে?), (খ) গন্ধ হইতে ফুল ও মসলা চেন, (গ) স্বাদ হইতে ফলের নাম বল, (ঘ) পাতাগুলি স্পর্শ করিয়া কোন্ কোন্ গাছের পাতা বল। (শিশুর চক্ষু বাঁধিয়া পরীক্ষা-গুলি করিতে হইবে)

(২০) বালকবালিকারা স্লেটে কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিবে। প্রত্যেকের কাগজে পূর্বেই একটি বড় বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত থাকিবে ও তাহা নয়টি ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত থাকিবে। শিক্ষক একখানা এরূপ বড় বর্গক্ষেত্র চার্ট ক্লাসে অতি অল্প কালের জন্য ঝুলাইয়া দিবেন যাহার নয়টি ঘরে নয়টি অক্ষর ছবি থাকে। পরে শিশুরা নিজ নিজ কাগজের যথাস্থানে অক্ষরগুলির নাম লিখিবে।

(২১) শিক্ষক অল্প কালের জন্য আবরণ তুলিয়া টেবিলের উপর সজ্জিত জিনিসগুলি দেখাইবেন। শিশুরা তাহার যতগুলি পারে নাম লিখিয়া দেখাইবে।

৬। রচনা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

(১) নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফটি পড় এবং পরে নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ।

(২) (ক) যদি তুমি হঠাৎ ১০০০ টাকা পাও, (খ) যদি তোমাকে হেডমাষ্টার করা হয় অথবা (গ) যদি বাঙ্গালার গভর্ণর করা হয়—তো কি করিবে, লেখ।

(৩) তোমার নিজের জীবন সম্বন্ধে বা তোমার প্রিয় খেয়াল (hobby) সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ।

(৪) কল্পনা কর, ইংলণ্ডের কোন ছেলের সঙ্গে

তোমার পত্র ব্যবহার আছে। এদেশের গ্রীষ্মকাল বর্ণনা করিয়া তাহার নিকট এক পত্র লিখ।

(৫) কল্পনা কর যে তুমি লক্ষ্মণ। মাতা সুমিত্রার নিকট চৌদ্দ বৎসর বনবাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

(৬) মনে কর তোমার ছোট ভাই পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া একখানা পত্র লেখ।

(৭) মনে কর তুমি এক একার ঘোড়া। নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা কর।

(৮) মনে কর এক বন্ধুর নিকট হইতে তুমি নিমন্ত্রণ পাইয়াছ। উহাতে সম্মিলিত হইবার অক্ষমতা জানাইয়া তাহাকে এক পত্র লিখ।

(৯) কিছুদিন পূর্বে যে ভৌগোলিক ভ্রমণ (trip) বা চড়ুইভাতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহার বর্ণনা কর।

(১০) রেকর্ডে বা রেডিওগ্রোগে সেদিন যে নাটিকা শুনিলে তাহার আখ্যানভাগ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(১১) এক ধোপা ও নাপিত বা এক উকীল ও ডাক্তার—কাহার পেশা বড়, তাহা লইয়া তর্ক করিতেছে, তাহা কথোপকথন রূপে লেখ।

(১২) মনে রাম ও ভরতের বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কাল্পনিক কথাবার্তা লিখ।

৭। রুচি পরীক্ষা (Appreciation Test)

(১) কোন্ কবি তোমার প্রিয়? কেন? তাঁহার কোন্ পংক্তিগুলি তুমি বিশেষভ পছন্দ কর?

(২) কার ছবিগুলি বেশি সুন্দর? এপ্রাজ ও বীণার মধ্যে কাহার সুর মধুর? কোকিল ও পাপিয়ার মধ্যে? তুমি কোন্ পাখী হইতে চাও? কোন্ ফুল তুমি সবচেয়ে ভালবাস?

(৩) কোন্‌টা বেশি পছন্দ কর—(ক) রাজতন্ত্র না প্রজাতন্ত্র, (খ) ক্যাথলিক না প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম, (গ) গ্রীষ্ম না শীত, (ঘ) ডাক্তার না উকীল, (ঙ) বাঘ না ভল্লুক?

(৪) কাহার কাণ উচিত ছিল—(ক) মূষিকের না গোপের, (খ) মুরগীছানার না মহাকায় খাদের, (গ) ভীমের না বিভীষণের, (ঘ) আইনস্টাইনের না এডিসনের?

(৫) ইহাদের মত কি সমর্থন কর—ব্রোণ, বালী, শূদ্রক, হিমু, জোয়ান অব আর্ক?

৮। পৌরাণিক প্রশ্ন

(১) দশ অবতার কি কি? দশ মহাবিদ্যা কি কি? চারি যুগ কি কি? চতুর্দশ ভুবন ও সপ্ত সমুদ্র কি কি?

(২) কৃষ্ণ মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকা গেলেন কেন? অর্জুন এক বৎসর একা ভ্রমণ করেন কেন? রাম লক্ষ্মণ-বর্জন কেন করিয়াছিলেন? শিবের নাম নীলকণ্ঠ ও ত্রিপুরারি কেন হইয়াছে?

(৩) বালক শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি অতিমানুষিক কার্য বর্ণনা কর।

(৪) পৃথিবী, গঙ্গা, সন্ধ্যা, রাবণবধ, চন্দ্রের কলঙ্ক ও রামায়ণ সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী কি?

(৫) যুধিষ্ঠির ও লক্ষ্মণের সহোদর ভাই কে কে ছিলেন?

ভ্রমণ কাহিনী—এডেন ও পোর্ট সৈয়দ

[শ্রীশান্তা দেবী]

অনেক দিন ধরে বিলাত যাত্রীদের কাছে এডেনের কথা শুনেছি। এবার স্বচক্ষে দেখলাম। আমরা একটা আন্দাজ দুপুরে এডেন পৌঁছিলাম। সকাল বেলা ন'টা দশটা থেকেই কৃষ্ণ পাহাড় দূরে দেখা যাচ্ছিল। উঁচু উঁচু খোঁচা খোঁচা পাহাড়, অনেক চূড়াই ক্যাথিড্রির সুরকোষ মিনারের মত। সেগুলিতে কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। রাজপথের ধারে বা দাহের-সুবোধের বাংলো বাড়ির সামনে যা দুই একটা গাছপালা আছে তা অনেক যত্নে বসানো এবং লালিত হলেই বোধ হয়। ঐ সব গাছের জন্য বহু দূর থেকে মাটি আনতে হয়।

আমরা ৪টা আন্দাজ নামতে পেলাম। স্টীব লঞ্চে করে সান্ত ক্রুজ পেলাম সহর দেখতে। আমরা নিজেরা পাঁচ জন ছাড়া ছটি গুজরাটি মহিলা আমাদের সঙ্গী হলেন। তাঁরা সহর দেখার চেয়ে জিনিস কেনাতেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। স্টীব লঞ্চ তীরে নামিয়ে দিল। কতটুকুই বা দূর! একটা জায়গায় নামলাম, সেটা বোম্বাইপাড়ার মত অর্থাৎ সাহেবি ধরণের দোকান। সেখানে ঘড়ি, টাইপ রাইটার প্রভৃতি ইউরোপীয় নানা জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমাদের জাহাজের এক অফিসারি দেখলাম সস্তায় একটা টাইপ রাইটার এবং অন্য কিছু কিছু জিনিস কিনে হুহাতে ঝুলিয়ে জাহাজের দিকে ফিরে চলেছেন। তাঁর বিলাত যাবার নানা কারণের মধ্যে একটা কারণ এই ছিল যে তিনি সস্তায় এডেনে জিনিস কিনবেন। এডেনের বন্দরে মাশুল না দিয়েই বিদেশী জিনিস আমদানী করা যায়। তাই অনেকেই এখানে ঐ কারণে একবার নামেন। আমাদের গুজরাটি মহিলাদের নিয়ে আমরাও সে দোকানে ঢুকলাম। কিন্তু প্রথম দোকানেই সওদা না করে আরও দু চারটা দোকান দেখার ইচ্ছায় আমরা এগিয়ে চললাম।

শেষে ঠিক হল ট্যাক্সি করেই বেড়ানো ও বাজার করা হবে। ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের দেশের পাঞ্জাবী মুসলমানের মত দেখতে। সারা সহর ঘুরিয়ে আনতে ৭ জনের জন্য ১৪ শিলিং নেবে বলল। প্রথমে খুবই হুজ্জুত করল। আমরা নেমে নেমে কয়েকটা দোকান বাজার দেখলাম। পোর্টের কাছ থেকে দূরের দোকানগুলি সাহেবি ধরণের মোটেই নয়। দিল্লি বাজারের মত ছোট ছোট দোকান পাশাপাশি। বেশি ছোট দোকানে তারা কি ভাষা বলছে এবং আমরাই বা কি বলছি পরস্পরকে বোঝানো যায় না; কাজেই সেখানে জিনিস কেনা শক্ত। তবে একটু বড় দোকানে ইংরিজি বোঝে। সেই সব আমদানি সুগন্ধি দ্রব্য, ঘড়ি পোষাক প্রভৃতি অর্ধেক দামে পাওয়া যায়, কারণ মাশুল লাগে না। গুজরাটি মহিলারা ঘড়ি, ড্রেসিং গাউন, সেন্ট অনেক কিছু কিনলেন।

রাস্তায় নেমে খানিকটা ঘুরলাম। চারধারে অসংখ্য ভিখারী, রোগা কালো লম্বা কাফ্রী ধরণের কতক লোক, আর কতক পাঞ্জাবী মুসলমানের মত, তবে তাদের চেয়ে নাক মুখ একটু কোঁতা। স্ত্রীলোক দেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পর্দার আড়াল থেকে দুই একজন উঁকি মারছে, এ ছাড়া বিশেষ কাউকে দেখলাম না। তারা কালো বোরখা পরা একটু অন্য ধরণের মেয়ে। ওখানকার সব মানুষই

কি রকম অবাঙালী ভাবাপন্ন বন্দরের, অন্তত বাজারে তো তাই বটে।

সহরে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। মরুভূমির মত দেশ। মাঝে মাঝে পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ করেছে। তার ভিতর দিয়ে গাড়ি যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘুরে ঘুরে অনেক পক্ষবাহুর দেখলাম, তন্মধ্যে Dairy farm। একটা কোনো কনডেন্ট বন্দরের দুধের বাস্ চোখে পড়ল। সুতরাং মেষে দুধও আছে। সাধারণের জন্য বাসও চলছে। তবে আমরা ভারতবাসী বলে কিনা জানিনা, যেখানে বাজার দেখানেই ভারতবাসীর দেখছিলাম সেখানেই মনে হচ্ছিল যেন একটু মার্জিত শ্রী দেখা যাচ্ছে। এটা আমাদের মনের ভ্রম হতেও পারে, তবে সত্য বলেই মনে হয়। এডেন সুয়েজ পোর্টসৈয়দ প্রভৃতি বন্দরে ভারতবাসী অর্থাৎ সিন্ধি গুজরাটি এবং কিছু কিছু পাঞ্জাবী দেখা যায়। তাদের দোকানপাট বেশি গোছানো, স্বদেশীদের একটু আধটু সাহায্যও করে এবং খুব সস্তায় রোজগার খুব ভালোই করে। কিন্তু বাঙালী কাউকে এসব জায়গায় দেখলাম না। অপরের কাছেও শুনেছি, ক্বচিৎ কদাচিৎ ছাড়া বাঙালী এসব জায়গায় দেখা যায় না। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালী এডেনে আছেন শুনেছি। তিনিও সম্প্রতি ইউরোপীয়ান বিবাহ করেছেন।

আমরা ঘুরে ফিরে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে চালককে ১৪ শিলিং দেওয়াতে সে মার মার করে উঠল। অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করল, রাস্তায় প্রায় ভীড় হয় আর কি। লোকটা ৪০ শিলিং চায়। শেষে জনকয়েক সিন্ধি দোকানদার ৩০ শিলিঙে রফা করে দিল। যা বেড়িয়েছিলাম তা কলকাতায় হলে ১৫ শিলিং লাগত কিনা সন্দেহ।

পোর্ট সৈয়দের চেহারাটা আর একটু ভাল। জাহাজ ঘাটে লাগে নি, তবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমরা স্টীম লঞ্চে করে পারে গেলাম। কারণ আমাদের মতলব ছিল কাইরো দেখবার। তীরে নেমে হলদে রঙের উপর নেমে লাল কাজ করা সব ছোটখাটো দোতলা পাকা বাড়ি। এদেশের মানুষেরা আমাদের ভারতীয়দের অথবা আধুনিক বাঙালীদের চেয়ে অনেক পরিশ্রমী। ঐ মরুভূমির দেশে মাটি ও জল দিয়ে দিয়ে ফুলফুটা প্রভৃতি সুন্দর ফুলের গাছ করেছে। আর আমরা কলকাতায় ইডেন গার্ডেনের নন্দন কাননকে ছারখার করেছি। লেকপাড়ার লেকের ধারে ধারে পানবিড়ির দোকান করেছি, ভদ্রলোকের বাড়ির দেয়ালে জোর জবরদস্তি করে উদ্ভ্রান্ত ঘুঁটের চাপ করি এবং পথে ঘাটে পাবলিক পায়খানা করেছি। সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের পারিপ্লব সৃষ্টির পর থেকে বাংলা দেশে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মানুষ ক্রমেই অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। পরাধীন বাংলার যেটুকু সৌন্দর্য ছিল এখন তা কাদা পাঁক নোংরার তলায় তলিয়ে গিয়েছে।

যে তেল নিয়ে পৃথিবীতে এত মারামারি, এটিকটা হচ্ছে সেই তেলের দেশ। সারাক্ষণ বড় বড় Oil Tanker চলেছে, তলের উপর এবং নীচ দিয়ে মোটা মোটা pipe পাতা, দেখলেই তেল নেওয়ার নানা ব্যবস্থা বোঝা যায়। তারপর সুয়েজ খালের ধার দিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের অগুন্তি ছাউনি। তখন যুদ্ধ ছিল না, তাই তারা সারাদিন খেলায় মত্ত। গরম দেশ, কাজেই প্রধান খেলা জলবিহার। যেখানে সেখানে খালে এবং পুষ্করিণীতে সৈন্যরা সাঁতার কাটছে। অনেক জায়গায় মাথায় রবারের টুপি পরে তাদের মেডিটেরিনী সঙ্গিনীরাও জলে নেমেছে।

(ক্রমশ)

P30587

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক (শিল্প বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত (বিজ্ঞপ্তি নং ২২ টি. বি. ২৯।১১।৫০ দ্রষ্টব্য)

ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দমোহন গুপ্ত প্রণীত

কথা-শেখা

শেখা যায় বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দিতে যথেষ্ট সময় অপব্যয় হয়। অথচ বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে ছবি ও বস্তুর সাহায্যে অতি অল্প সময়েই বর্ণপরিচয় ও বাক্যগঠন প্রণালী শেখানো যাইতে পারে।

'কথা-শেখা' বইখানিতে তিনরঙা ছবির সাহায্যে বর্ণপরিচয় ও বাক্য গঠনের জন্য অক্ষরের পরস্পর সাদৃশ্যকে ভিত্তি করিয়া সুললিত ছন্দে বর্ণযোজনা করা হইয়াছে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুরা অক্ষর চিনিয়া সহজ বই পড়িতে পারিবে। পদ্ধতানুগতিক ভাবে যেখানে ছয় মাসেও শিশুদের কিছু শেখানো যায় না সেখানে দুই মাসেই শিশু নিজে নিজে সহজ বই পড়িতে পারিবে।

যুক্তাক্ষর বর্জিত মজার গল্প, মন ভোলানো ছড়া ও পাতায় পাতায় রঙিন ছবি বইখানির বৈশিষ্ট্য। দাম মাত্র চৌদ্দ আনা।

দি সিটি বুক কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

কি

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২ রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন ৮ কোটী টাকা

গৃহীত মূলধন ৪ কোটী টাকা

আদায়কৃত মূলধন ২ কোটী টাকা

সংরক্ষিত তহবিল ৭৫ লক্ষ টাকা

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান এবং মালয় দেশের বড় বড় সহরে এবং হংকংএ ও লণ্ডনে এই ব্যাঙ্কের শাখা আছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই এজেন্সীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। ভারত ও ভারতের বাহিরে সর্বত্র ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের সুব্যবস্থা আছে।

জি. ডি. বিড়লা
চেয়ারম্যান

বি. ই. ঠাকুর
জেনারেল ম্যানেজার

একাদশবর্ষের প্রবন্ধসূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা	অদিতি রায়	২৭
" লেখাপড়া	গৌরী সেন	১৪২
অনুপ্রেরণার উৎস	মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	৯
আলোচনা		১,১৭,৩৩,৪৯,৬৫,৮১,৯৭, ১১৩,১২৯,১৪৫,১৬১,১৭৭
উলটা পিঠ	মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	১৩২
কবিতা পাঠনার অলঙ্কার ও প্রতিরূপ	সুধীরচন্দ্র রায়	৪৪,৬০
কমেনিয়াস	ধীরেন্দ্রকুমার দে	১২৪
চিঠি	দিলীপকুমার বিশ্বাস	১২৭
চিঠি	স্ফটিকচন্দ্র বর্মকার	১৫৯
ছড়ায় শিশুশিক্ষা	বকুলমালা সেন	৪১
ছাত্রদের চিত্তবিক্ষেপ	সুধাময় মুখোপাধ্যায়	৮৪
নম্বর ও পুরস্কারের প্রভাব	বকুলমালা সেন	১০৯
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন	সুমন বাৎস্যায়ন	১৬
নিবেদিতা	কুমুদবন্ধু সেন	২১
পরীক্ষা পদ্ধতি	মণীন্দ্রকুমার ঘোষ	২৪
পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা	বিমলকুমার ভট্টাচার্য	৬
প্রথম শ্রেণীতে পাঠদান	সুবোধকুমার সেনগুপ্ত	১০০
প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার আদর্শ	ভক্টর রমা চৌধুরী	১৬৩
প্রাথমিক শিক্ষা	গিরিরঞ্জন সেন	১১৪
পুস্তক পরিচয়	"	৩১,৯৪,১২৮,১৬০,১৭৩
ফ্রান্সে শিক্ষা ব্যবস্থা	দিলীপকুমার বিশ্বাস	১৫৫
বস্তির আদি শুকতুল	ধীরেন্দ্র মজুমদার	৬৪
বর্ণপরিচয় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়	জ্ঞানপ্রকাশ মিশ্র	৭১
বানান ভুল	সুকৃতিরঞ্জন গুপ্ত	১৫
"	সুধীরচন্দ্র রায়	
বাংলা শব্দের বহুবচন	প্রদ্যুম্নকুমার বক্সী	৪৮
"	বৈদ্যনাথ পাল	১০৫
বিদ্যালয়ে অনুবাদ শিক্ষা	বৈদ্যনাথ পাল	১২০

বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির কয়েকটি অসুবিধা	মণীন্দ্রলাল বসু	১৪৮
ভগিনী নিবেদিতা ও বুনিয়াদী শিক্ষা	প্রিয়রঞ্জন সেন	৫১
ভাষা ও অনুবাদ	মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	৩৬,৬৮
ভাষা সমস্যা—হ্রস্ব উচ্চারণ	আদিনাথ সেন	১৭৩
ভূগোল পড়ানো	বকুলমালা সেন	১৫৯
ভূদেববাবুর শিক্ষাব্রতের এক পর্ব	প্রিয়রঞ্জন সেন	৪
মহেশ গল্পের ট্র্যাজেডির মূল উৎস	সুধাময় মুখোপাধ্যায়	১০৭
মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট	ডক্টর নলিনীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৫০
রাষ্ট্র ও শিক্ষা	সুধীরচন্দ্র মজুমদার	৭৩,৮৭
শিক্ষকের দায়িত্ব	বকুলমালা সেন	১৬১
শিক্ষাবিদ্ রুইটিনিয়ান	জীবেন্দ্রকুমার দে	২৯
শিক্ষার সমস্যা	ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন	৫৫

CALCUTTA UNIVERSITY
LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | পৌষ ১৩৬০ | ২য় সংখ্যা

আলোচনা

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন বেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মূল সভাপতি শ্রীসদাশিবনের বক্তৃতাটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। বয়স্ক-শিক্ষা-বিভাগের উদ্বোধন কালে মাননীয় ডাঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং সভাপতি শ্রীঅনাথনাথ বসুর ভাষণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল। সম্মেলনের ফলাফল বুঝিতে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তাহার ফলাফল দেখিয়া। আমরা সেই ফলাফলের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ও পরস্পর অভিজ্ঞতার বিনিময়, এই দুইটি সম্মেলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাব্রতীরা ও শিক্ষাকর্মীরা যদি এবিষয়ে সাড়বান হইয়া থাকেন তবেই সম্মেলন সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে।

বর্তমান সমস্যা

আজ শিক্ষাক্ষেত্রে দুইটি বড় সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একটিকে ছাত্র-সমস্যা বলা যায়। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের ও শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সম্পর্ক এই সমস্যার মূল কথা। ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য-বোধ, প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ব-বোধ—এই সমস্যার বিচার্য বিষয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর এই সম্বন্ধ একতরফা বিচারের নয়। উচ্চমুখী এই সমস্যার মীমাংসার দিকে শিক্ষা-সম্মেলনে সমবেত শিক্ষাব্রতীরা কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই ইঙ্গিত যথাযথ রূপায়িত হইলে ছাত্র সমাজের কল্যাণ, ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের কল্যাণ।

দ্বিতীয় যে সমস্যা আজ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহা শিক্ষকের সমস্যা। শিক্ষকদেরও বাঁচিতে হইবে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, সামাজিকতা লৌকিকতা বজায় রাখিতে হইবে। ইহাই বড় কথা নয়। যে মহৎ কাজে তাঁহারা ব্রতী, তাহার উপযুক্ত মর্যাদা তাঁহাদের প্রাপ্য আর সমাজকেই তাহা মিটাইতে হইবে। কতদিন আর মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া উচ্চ আদর্শ ধরিয়া চলিবার মহৎ উপদেশ দিয়া সমাজ নিশ্চেষ্ট থাকিবে? আজ, দেশের বর্তমান অবস্থায়

মোটা ভাত কাপড়ই কি এই সব আয়ে সংগ্রহ করা সহজ।

শিক্ষার মান বাড়াইবার কথা আমরা বলি। মিশনারি ইস্কুলে কেন পড়ানো ভাল হয়, সেখানে ছেলেমেয়েকে পাঠাইবার জন্য কেন অভিভাবকদের এই অত্যধিক আগ্রহ, আমাদের ইস্কুলগুলিতে কেন তেমন ভাল পড়ানো হয় না, কেন শৃঙ্খলাবোধ জাগানো হয় না এই সব বিষয়ে আজ সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। শুধু মুখের কথা বলিলে চলিবে না। শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ জাগাইতে হইবে তাহা যেমন সত্য, তেমনি নিরপেক্ষ চিত্তে শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার দিকে মন দিতে পারেন তাঁহাদের এমন অবস্থা রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করিয়া দিতে হইবে, ইহাও তেমনই সত্য।

আজ যখন আমরা আদর্শগত নানা বিক্ষোভের সম্মুখীন তখন স্থিতধী, দৃঢ়চিত্ত, কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকগণই একমাত্র দেশের আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারেন। আর তাহাতেই শিক্ষক ও ছাত্র উভয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাই আমরা এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও জাতীয় পরিকল্পনা

দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখন ভারতবাসীর এক মুখ্য আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কয়েক বৎসরে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, আগামী পাঁচ বৎসরে আমাদের আরো কতদূর অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা—ছোট বড় সকলের মুখে আজ এই কথা। ইহা একদিকে আশার কথা সন্দেহ নাই। দেশবাসী সচেতন হইলে উন্নতি অনিবার্য।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথাও উঠিতেছে। সরকারি, বেসরকারি সব মহলেই শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে। একাধিক দিক হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলা হইতেছে—কোথাও উদাসীনভাবে, কোথাও আলগোছে না বাঁচাইয়া, আবার কোথাও পরিপূর্ণ বিশ্বাসভরে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, শেষোক্ত দলের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অনেকেই বলিতেছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা একদিন ভাল আসন গাড়িয়া বসিবেই, অতি সহজে তাহাকে বিদায় করা যাইবে না—কিন্তু কতটা তাহাকে চালিয়া সাজান যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। আমরা বর্তমান সংখ্যা 'শিক্ষায়' বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, বহুদর্শী, বিচক্ষণ অধ্যক্ষ কাকাসাহেব কালেলকারের একটি সময়োপযোগী অভিভাষণ তুলিয়া দিলাম। পাঠক হইতে ভাবিবার অনেক খোরাক পাইবেন।

বর্তমানে যাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রের সকল ভাল-মন্দের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা যদি কাকা-সাহেবের নির্দেশিত ধারায় একবার চিন্তা করেন তবে সর্বহিতাত্মক এই রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণকর কাজ করিবেন।

ত্রিকূপতিতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়

নূতন অন্ধ্র সরকার স্থির করিয়াছেন যে আগামী শিক্ষা-বর্ষের প্রারম্ভেই তিরুমালাই ত্রিকূপতিতে এক নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। প্রধান মন্ত্রী শ্রী টি প্রকাশম বলিয়াছেন যে আগামী বাজেট অধিবেশনে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা হইবে। দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে রায়লসীমার একটি বহু দিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ও এখানকার কৃষ্টিসম্পদ স্থানগুলিতে শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয় নব প্রেরণার দ্বার খুলিয়া দিবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর রায়লসীমার চারটি কলেজ, অনন্তপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, মুরমুলের ট্রেনিং কলেজ সবই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অন্ধ্র সরকার আর একটি কথা বিবেচনা করিতেছেন, তাহা হইল বিশ্ব-

বিদ্যালয়টিকে আবাসিক করা হইবে কি না। অন্ধ্র সরকারের শিক্ষাসচিব এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করিয়া দেখিতেছেন।

নূতন অন্ধ্র প্রদেশ সকল বিষয়ে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। ইহার অগ্রযাত্রা সার্বজনীন হউক।

ভাষার মাধ্যম

সম্প্রতি প্রকাশিত এক খবরে দেখিতে পাইতেছি, ব্রিটেন, ফ্রান্স বেলজিয়াম প্রভৃতি পাঁচটি দেশের শিক্ষকগণ পশ্চিম ইউরোপে একটি মাত্র ভাষার প্রচলনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, প্রদেশগুলির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সেই সেই প্রদেশের জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব। রাজনৈতিক কারণে কোন প্রদেশের ভাষাকে চাপিয়া দিয়া অন্য ভাষা ভাষী করিতে যাওয়া সেই প্রদেশের পক্ষে ক্ষতিকর। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর।

তবে অবশ্য তাঁহারা বলেন, মাতৃভাষা আয়ত্ত হইবার পর একাধিক বিদেশীয় ভাষা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

আমরা একাধিক বার শিক্ষায় বলিয়াছি, শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষার ছাড়া হইতে পারে না, তবে পরবর্তী স্তরে অন্য ভাষা, আমাদের ক্ষেত্রে হিন্দী ইংরেজি শিক্ষাক্রমের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অনেক সময়ে অপরিহার্য।

বুনিয়াদী শিক্ষা

[কাকা সাহেব কালেলকর]

আজ আমরা ভারতের উত্তরপূর্ব কোণের একটি প্রদেশে মিলিত হইয়াছি। এই প্রান্ত আজ আর ছোট নাই, আজ এই প্রদেশ সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। আজ হিন্দুস্থানের যে সমস্যা এই প্রদেশেরও সেই সমস্যা। আসাম বিশাল নদী, উচ্চ পর্বতমালা, সুজলা সুফলা ভূমি, আর ভূমিকম্পের দেশ। এখানে আসিলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোক একত্রে থাকিলে কত সমস্যা আর প্রতিবন্ধ উদ্ভব হয়, আর পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কি ভাবে তাহাদের মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে।

ভারত, ব্রহ্মদেশ আর চীন, এই তিনটি প্রগতিশীল দেশের মাঝখানে পাহাড়ে আর জঙ্গলে ভরা এই দেশ আসাম। আসামকে এমন কতকগুলি সমস্যার সমাধান করিতে হয় যাহা সারা বিশ্বেরই সমস্যা, যেমন ভূমিকম্প, নদনদীকে আয়ত্তে রাখা, বিভিন্ন জাতির লোকের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ইত্যাদি। হয়তো বা আসামের মাটিতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এই প্রদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টীয়, সকল ধর্মই বিরাজমান, আর অনায়াসে লোকের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উপযোগী মনোবৃত্তি প্রস্তুত করার চেষ্টা চলিতেছে। বুঝিবা এই সাংস্কৃতিক মিলনের বলেই বর্তমান দুর্যোগ অতিক্রম করার পথ মিলিবে।

আমার মনে পড়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জায়গায় বলিয়াছিলেন, ভারতের সমস্যা রাজনৈতিক ততটা নয়, যতটা সামাজিক। মহাত্মা গান্ধীও তাহাই মনে করিতেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে, স্বাধীনতা না আসিলে ভারতের অন্য সব সমস্যার

সমাধান হইবে না। এজন্য তিনি গঠনাত্মক কাজের প্রতি সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি এমনও বলিয়াছিলেন, যেদিন আমার গঠনাত্মক কার্যক্রম পুরাপুরি পালন করিবে সেই দিনই দেশের স্বাধীনতা আপনি আসিয়া যাইবে। যে সব ভারতবাসী স্বাধীনতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৃপতিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন, তিনি তাহাদের বলিয়াছিলেন, তোমরা গঠনমূলক কাজে সকল শক্তি দিয়া লাগিয়া যাও, রাজন্যবর্গের প্রশ্ন আমার হাতে ছাড়িয়া দাও। পরবর্তী ঘটনা হইতেও আমরা দেখি, তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন একটি ঘরোয়া বাট্টি গড়িয়া তুলিতে পারি নাই যাহা আপনার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারে।

দেশের সংস্কৃতিতে আস্থাশীল কোন কোন সংস্কারক মনে করেন, দেশের পুনরুত্থান একমাত্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন দ্বারাই সম্ভব। বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অনেক ধর্মবিষয়ক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এক আশ্চর্য উপায়ে বিভিন্ন ধর্মসংস্কারগুলিকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছিলেন, আর সকলের সমবেত শক্তিকে দেশের স্বাধীনতা আনিবার ও দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

অনেকবার প্রতিক্রিয়াবাদীর মুক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তখন মহাত্মাজী বিপুল ধৈর্য-সহকারে সকলের কাছে কাজ আদায় করিতেন। আর এমন ভাবে চলিতেন যে, সেই সংগঠিত শক্তির বলে হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, পুরা ভারতেরই স্বাধীনতা আন্দোলন করিতে পারিয়াছিলেন।

আমার চিরদিনের বিশ্বাস, আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, যাহা কিছু বল, সব সমস্যারই সমাধান সম্ভব শিক্ষার দ্বারা। যখন আমি বিপ্লবী দলের হিংসাত্মক পথে চলিতেছিলাম তখনও বিশ্বাস ছিল, হিংসাত্মক বিপ্লবের পথেও জনসাধারণ প্রস্তুতির জন্য চাই শিক্ষা, আর আজ যখন বুঝিয়াছি হিংসার পথ ভারতের জনচিত্তের প্রতিকূল, তখন এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে যে কেবল শিক্ষা দ্বারাই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব, অন্য পথ নাই। ধর্মবিপ্লবের জন্যও খাঁটি শিক্ষা-শাস্ত্রীদের এক বিশাল বাহিনীর প্রয়োজন। ভারতের সামাজিক সংস্কারের প্রশ্ন অতি কঠিন, কেননা ধার্মিক ভাবধারা আর ঐতিহ্যের সহায়তায়ই এখানকার উগ্রপন্থীরা বাঁচিয়া আছেন। সেজন্য এদেশের সমাজসংস্কার কেবল তখনই সম্ভব হইবে যখন জনসাধারণ দ্বিধাভাবে পুরাপুরি শিক্ষা লাভ করিবে। আজ অন্য দেশের সঙ্গে ভারতও আর্থিক পুনর্গঠন আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, সামাজিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক বিপ্লব না আনিতে পারিলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি কখনও সন্তোষপ্রদ হইবে না। আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য স্বভাবতই শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রব্যাপী পরিপূর্ণ বিপ্লবের প্রয়োজন। ভারতের অগণিত সংস্কৃতি আর সভ্যতা পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার ফলে, কখনও বা প্রবল সংঘর্ষ সত্ত্বেও একত্র বিরাজ করিতেছে। এই সকল সভ্যতার সমন্বয় সাধন করিয়া একটি সুসঙ্গত সভ্যতার ধারা আমাদের রচনা করিতে হইবে। সেই কাজেই রাষ্ট্রব্যাপী শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক। শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে, শিক্ষাব্যবস্থার নূতন প্রাণ সঞ্চারের উপরই ভারতের পুনর্গঠন নির্ভর করিবে। এই নূতন শিক্ষা পদ্ধতি ভারতের প্রকৃতির অনুকূল হওয়া চাই, তাহাতেই বর্তমানের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর, তাহার সঙ্গে সারা দুনিয়ার মানবের জন্য উপযুক্ত শক্তি আর সভ্যতার বিকাশ সাধন করিয়া যে গৌরবের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহারও জন্য চাই শিক্ষা।

নিজে সদাচারী না হইয়াও সদাচারের সুফল লাভ করিবার আর দুরাচার হইতে দূরে থাকিয়া দুরাচারের কুফলবিপাক হইতে বাঁচিবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক—সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরণের একটা কথা আছে। মহাত্মাজীর দ্বারা অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা সংগ্রামের নৈতিক হইলেও আমাদের মধ্যে এখনও সঙ্কীর্ণতা বর্তমান। যে গঠনমূলক কর্মের শক্তিতেই কেবল এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে স্থির ও সুরক্ষিত করা যায় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই—ফলে এই স্বাধীনতা আজ বিপদের সম্মুখীন। সমাজের ত্রুটিগুলি পদে পদে রাষ্ট্রের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। মহাত্মাজী তাঁহার সমস্ত গঠনাত্মক কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষাকে একটি বিশেষ স্থান দিয়াছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে, ওয়ার্ধায় বুনিয়াদি শিক্ষাপরিষদের প্রথম সম্মেলনের পর আমাদের অনেককেই ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, দেশ ও অবস্থার অনুকূল করিয়া এই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি আপনারা রচনা করুন, কারণ, আমার বিশ্বাস রাষ্ট্রের জন্য এই শিক্ষাপদ্ধতিই আমার শ্রেষ্ঠ অবদান। আমার সমগ্র অনুভূতির নির্যাস এই শিক্ষাপদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে ভারতের জীবনধারা নবকলেবর লাভ করিতে পারিবে, ভারতীয়দের জীবনে নূতন তেজ সঞ্চারিত হইতে পারিবে, সব জীবনের সঞ্চার হইবে।

কিন্তু রাষ্ট্রশিক্ষার এই মহান অবদানকে আমরা কতখানি আপনার করিয়া লইয়াছি? এই পদ্ধতির প্রথম খসড়া তো কংগ্রেস বিশেষ বিচার না করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ ইহার গভীরতা বিবেচনা করিবার মত প্রবৃত্তি কংগ্রেসের ছিল না। সকলের দৃষ্টি তখন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিই নিবদ্ধ—গান্ধীজির কথাগুলি সব নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া মাত্র তাহাদের কাজ। কিছুদিন যাবৎ দেখা গেল, ভারতের গতানুগতিক পন্থার বিশ্বাসী, ব্রিটিশ শিক্ষাপদ্ধতির অন্ধ অনুরাগী শিক্ষাবিদ্‌গণ আপত্তি তুলিলেন—তাঁহারা বলিতে লাগিলেন আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে গান্ধীজির এই বুনিয়াদী শিক্ষার মোটেই মিল নাই। ইহাতে সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়। এই শিক্ষায় শরীরশ্রমের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে, আর তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করিবে। কিন্তু তাঁহারা একটা ভুল করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের প্রগতির ক্ষেত্রে ভারতের এই বুদ্ধিবিলাসীরা নিজেদের 'সিগমি' বলিয়াই প্রমাণিত করিলেন। এই বিদ্বানেরা বড় বড় ব্যাখ্যান তো দিতে পারেন, কিন্তু ভারতের বৃহৎ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিলেন কি? দেশের বেকার সমস্যার কিছু উপায় করিতে পারিলেন কি? এখন তাঁহারা বলেন, বর্তমান বেকার সমস্যার মূলে এই বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী। এইসব কথা বাহিরজগতের পরিচয় দেয় না। প্রকৃত পক্ষে আজকাল শিক্ষিত লোকই কেবল বেকার সমস্যার রব তুলিয়া চীৎকার করিতেছে, আর এই সোরগোলের ফলে গ্রামের লোকের চরম দারিদ্র্য, কাজের অভাব, আর তবে 'নিত্য আকাল' সমস্যার দিকে মন দিবার অবসর রাষ্ট্রের মিলিতেছে না।

শিক্ষা আজ নিজের গৌরবের আসন হইতে বিচ্যুত হইতে বসিয়াছে, আর শিক্ষক ছাত্র দুইয়ের মধ্যে যেন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্ঘ দাঁড়াইয়াছে। ব্রিটিশের চাপানো শিক্ষাপদ্ধতি আর বেশি দিন চলিবে, এমন আমার মনে হয় না। ঐ শিক্ষা আমাদের বিনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহার স্থানে যদি কোন উন্নততর প্রণালী প্রবর্তিত না হয়, তবে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, একথা ধ্রুব সত্য।

তবে ইহাও ঠিক যে ছোট ছোট সংস্কারের দ্বারা শিক্ষার প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। কোন কোন স্থানে পাঠক্রমের সংশোধন হইয়াছে, কোথাও সরকারি অর্থ সাহায্যের নিয়ম বদলানো হইয়াছে,

কোথাও বা শিক্ষা বিভাগের জন্য অধিক অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে, আর কোথাও বা কিছু কিছু ভাল বই প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ভাবে এ সমস্যা মিটিবে না। ইহার জন্য চাই বিপ্লব। "কেরিয়ারিস্ট" পদলোলুপ বা অর্থলিপ্সুদের হটাইয়া দিয়া কোটি কোটি গরিব, পিছনে পড়িয়া থাকা জনগণের প্রকৃত দেশকর্মীদের হাতে সরকারি সেবাকার্য ও শিক্ষার ভার গঁপিয়া দিতে হইবে। পদলোলুপ ব্যক্তি জানে, একমাত্র ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাই শিক্ষা, আর তাহার জোরেই উচ্চ পদবীতে পৌঁছানো যায়। আর এই পদলোলুপ ব্যক্তিদের হাতেই আজ শাসনযন্ত্র। বড় বড় ব্যবসায়ের প্রতিও এই সকল লোকেরই দৃষ্টি। শিক্ষা-সঙ্কোচনের ভার ইহাদেরই হাতে, আর এই ভাবে ভারতের পুনর্গঠনের জন্য বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার পথে বাধার সৃষ্টি করাই যেন ইহাদের সঙ্কল্প।

একথা খুব ঠিক যে ভারত আজ পূর্ণ স্বাধীন। ইহাও ঠিক যে আমাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিধানে ইংরেজের প্রভাব আর নাই। আবার ইহাও ঠিক যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই আজকার শাসন-কর্মে সর্বেসর্বা, আর, শিক্ষামন্ত্রী আন্তরিক ভাবে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার কামনা করিলেও শাসনতন্ত্রের প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়া যায়। যতদিন এই অদ্ভুত শাসনতন্ত্র ইহাদের হাতে আছে, ততদিন বিপ্লবাত্মক মনোভাবকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিবে।

সর্বপ্রথম শিক্ষার মাধ্যমের কথাই ধরি। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে রচিত কোন শিক্ষাপ্রণালী কখনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। গোড়ার কথা হইল, শিক্ষা সেই ভাষায় দিতে হইবে লোকে যাহা সহজে বোঝে। অতএব প্রাদেশিক ভাষায়ই তাহা হওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে নানা দেশের সংগঠনের প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। অজ্ঞান আর অযোগ্যতার সংগঠন করা অনাবশ্যক, উহাতে ভারতের নব জীবন লাভ হইবে না। আবার এ কথার অর্থ নয় যে, ইংরেজি ভাষার সম্পদশালিতা, আন্তর্জাতিক উপযোগিতাকে আমি অস্বীকার করিতেছি। এক শতাব্দীরও অধিক কাল সর্বপ্রথমে ইংরেজি ভাষায় যতটুকু আমরা শিখিয়াছি, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখাই আমাদের পক্ষে দায়। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োগ আমাদের ইংরেজি ভাষার মারফতেই জানিতে হইবে। অতএব আমাদের শিক্ষাক্রমের মধ্যে ইংরেজি ভাষার স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজি ভাষা চলিতে পারে না। সেইরূপেই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীও সকল প্রদেশে শিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে না। বাঙালী, আসামী, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাতি, তামিল বা তেলেগু যে প্রদেশের যে ভাষা তাহাই সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া চাই। ইহার বিপরীত নিয়ম করিয়া যদি আমরা ইংরেজি বা হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়া সর্বদেশকে সংগঠিত করিতে চাই, তবে সেই সংগঠন কর্মজোর হইতে বাধ্য—সফল হইতে পারে না।

তবে যতদিন প্রাদেশিক ভাষা সরকারি কাজের ভাষা না হয় অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজকর্ম না হয় ততদিন এই ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা সম্ভবপর নয়। স্বরাজ্যের একটি বিশেষ অর্থ যে, রাষ্ট্রের কাজ এমন ভাষায় হইবে যাহা জন-সাধারণ বোঝে, যাহাতে জনসাধারণ কথা বলে, আর যাহা তাহারা সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যেই শিখিতে পারে। অতএব যতদিন 'ভাষাবার' অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক শাসনতন্ত্রের জন্য আন্দোলন না চলিবে ততদিন প্রাদেশিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিবার আন্দোলনও সফল হইবার সম্ভাবনা কম।

'ভাষাভিত্তিক শাসন' কথাটা আমাকে স্পষ্ট করিতে হইল "ভাষাভিত্তিক প্রদেশ" আন্দোলন হইতে ইহার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য।

প্রত্যেক ভাষা আর সেই ভাষার সাহিত্যেরই এক একটি ভিন্ন সংস্কৃতি এমন কথা আমি স্বীকার

করি না। তেমনই আমি ইহাও স্বীকার করি না যে বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশগুলি প্রত্যেকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রাষ্ট্র, যাহাদের ডিপ্লোমেসী এক রাষ্ট্রনৈতিক সংঘের মাধ্যমে মিলিত করা যায়। তাহা যায় না। ভারতবর্ষ সুদৃঢ় এক মৌলিক সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ। ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যের বিচারধারা আর আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা সাম্য আছে। প্রকৃতপক্ষে একই মূল ধারার ইহাদের বিকাশ। সারা ভারতে বৈষ্ণবধর্ম, শক্তিপূজা বা শৈবধর্ম পাশাপাশি উত্থানপতনের পথে চলিয়াছে। আর সেইজন্যই সকল ভাষার সাহিত্যেই একই ধারা বর্তমান। ইংরেজি ভাষাকে যখন শিক্ষার মাধ্যম করা হইল তখন প্রাদেশিক ভাষাগুলি একই রকম ভাবে বলশালী হইয়াছিল। কাজেই একথা ভুল যে এক একটি ভাষা এক একটি ভিন্ন সংস্কৃতির বাহন। এখন ভাবিবার কথা হইল যে, সরকার প্রত্যেক অঞ্চলে সেদেশের লোকের ভাষায় শাসনতন্ত্র চালাইবেন, না প্রত্যেক ভাষাভিত্তিক প্রদেশে সম্পূর্ণ পৃথক রাজতন্ত্র থাকিবে; ভারতবর্ষে ভিন্ন ভাষাভাষী লোক আপন আপন রাজ্য সৃষ্টি করুক এমন প্রয়োজন নাই। যদি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম আর বর্ণের লোক একত্র থাকিতে পারে তবে বিভিন্ন ভাষাভাষীরা একত্র মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিবে না? কিন্তু যদি জনসাধারণকে রচনাত্মক রাজনীতিতে শিক্ষিত করিতে হয়, তবে প্রাদেশিক ভাষাতেই শাসনকার্য চালনা করা আবশ্যক। যত বেশি দিন ইংরেজি ভাষায় সরকারি দপ্তরের কাজকর্ম চলিবে ততই আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে আর সরকারের ও জনসাধারণের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়িয়া চলিবে। বৈজ্ঞানিক বা পারিভাষিক শব্দসমস্যা তেমন বড় সমস্যা নয়। জনসাধারণের মধ্যে যেমন যেমন শিক্ষার বিস্তার হইবে তেমনিই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী শব্দও রচিত হইবে। বিদেশী শব্দ আমাদের মস্তিষ্কে ভার হইয়া চাপিয়া থাকে। অবশ্য যতদিন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন আর প্রয়োগ আমাদের করিতে হইবে ততদিন উহাদের পরিভাষার ব্যবহার আরও কিছুদিন আমাদের করিতে হইবে আর তাহার জন্য আমাদের লজ্জারও কোন কারণ নাই।

লেখা-পড়া জানা লোকের উৎসাহের অভাবে আজ পর্যন্ত আমাদের লিপি সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হইল না। আমরা সকলেই চাই, সর্বভারতীয় একটি লিপি প্রচলিত থাকুক, কিন্তু কেহই নিজের লিপি বর্জন করিতে প্রস্তুত নই। আমার মনে হয় সকল ভাষাভাষীর জন্য একটি বর্ণমালার এই যুক্তি আরও কিছুদিন পর্যন্ত অচলই থাকিবে। প্রথমে আমাদের সকল প্রদেশের লোককে হিন্দী শিক্ষা দিয়া দেবনাগরী লিপির সহিত পরিচয় ঘটাইতে হইবে, তারপর যখন এই লিপির সঙ্গে সকলের পরিচয় পাকা হইবে তখনই কেবল ইহাকে সর্বসাধারণের লিপি করার প্রস্তাব উত্থাপন করা চলিবে। ইতিমধ্যে প্রচলিত নাগরী লিপির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য আন্দোলন করা আবশ্যক। আর জনসাধারণের মধ্যে অক্ষর পরিচয়ের প্রচেষ্টা এবং প্রিন্টিং, টাইপরাইটিং, স্টেনোগ্রাফিং প্রভৃতি কাজ এই লিপি প্রচারে প্রচুর সহায়তা করিবে।

এতক্ষণ আমি শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান ও বড় বড় প্রশ্নগুলিই আলোচনা করিলাম। এখন বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথায় আসা যাক। বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের বিচারধারার মধ্যে এক মহা বিপ্লব আনিয়া দিয়াছে। ভাষা ভালই হউক, জ্ঞান প্রদান করিতে বা বিচার বিবেচনার আধার প্রদান করিতে ইহার যতই উপযোগিতা থাকুক, ইহা শিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে না। মানুষ নিজে চিন্তা করে এবং নিজের আর প্রকৃতির মধ্যে সেই চিন্তার প্রয়োগ করিয়া আপনার কল্পনার বিকাশ সাধন করেন। সে আপনার চক্ষু, কান, হাতের আঙুলও সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করিয়া

আপনার ছাতিয়ার প্রস্তুত করে। প্রকৃতির উপর সে জয়ী হইতে চায়। যাওয়া আসার নিত্য নূতন জিনিষ তাহার আবিষ্কার করা চাই। এই সকল কাজ তাহার রচনাত্মক প্রবৃত্তির ফল। অর্থাৎ এই সৃজনাত্মক বুদ্ধিই আসলে মানুষের শিক্ষার মাধ্যম। যেমন, কারিগর মাত্রই জানে যে তাহার এই কারিগরি বিদ্যা বড় বড় কথার ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যকে দেওয়া যায় না। নিজের কাজের মধ্য দিয়াই শুধু দিতাটি দেওয়া যায়। শিখাইবার দৃষ্টিতে একটি দুইটি ইঙ্গিত দেওয়াই শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট। হাতে কলমে কাজ করিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ দ্বারাই শিল্পী আপন শিষ্যকে তাহার কারিগরি কৌশল শিক্ষা দেয়। ওস্তাদ আর শাকরেদ কথা দুটির ইহাই মর্মকথা। শাকরেদ ওস্তাদের সঙ্গে হাতে হাতে কাজগুলি করে। শিল্পী জিনিষগুলি তৈয়ারি করে, শাকরেদ বসিয়া বসিয়া মন দিয়া তাহা দেখে। ওস্তাদের নকল করে আর যখন গুরুর অপেক্ষা সুন্দরতর জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে, গুরু সস্নেহ-প্রশংসায় শিষ্যের পিঠ চাপড়াইয়া দেয়। আমরা ছাত্রদের বি এ, এম এ, যে উপাধিই কেন না দিই এই প্রশংসার মূল্য তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশি।

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কেবল কলম চালাইতে শেখায়। এই শিক্ষায় কেবল তিন আঙুলের সাহায্যে কলম বা তুলি চালাইবার বিদ্যা হয়। আর তাহার বদলে বুনিয়াদী শিক্ষায় সবটি আঙুলকে চালাইতে শিক্ষা দেয় আর সেই জন্যই সেই শিক্ষা পূর্ণ শিক্ষা।

বুনিয়াদী শিক্ষা আর বেকার জীবন দুইটি পরস্পর বিরোধী শব্দ। বুনিয়াদী শিক্ষার বিদ্যার্থী জীবনের যে কোন অবস্থার জন্য নিজেই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লয়। সে কেবল রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় জিনিষই উৎপন্ন করে। সে সামাজিক জীবন যাপন করে এবং এই শিক্ষায় সে সমাজজীবনের সমস্যা সকলের সমাধান করিতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার বিদ্যার্থী জনসাধারণের একজন; শুধু তাহাই নয়। যাহারা আপনার কর্তব্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া নিজেদের অসহায় মনে করে এই ব্যক্তি তাহাদের নেতৃত্ব করিবার শক্তি রাখে।

কিন্তু জনমানসের দিকে চাহিয়া এবং বুনিয়াদী শিক্ষার সাফল্যের কথা ভাবিয়া সরকারের ঘোষণা করা উচিত যে, সরকারি চাকুরিতে বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রাপ্তদের দাবি প্রথমে বিবেচনা করা হইবে। ভারতবর্ষের অনেক প্রতিক্রিয়াবাদী ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধে এখনও একই মনোভাব পোষণ করেন। আর সেই জন্যই বুনিয়াদী শিক্ষার তেমন বিকাশ হইতেছে না। যদিও এই শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্র বিভাগে যাহারা নিজেদের মহাত্মাজীর শিষ্য বলেন যদিও সেইসব বড় বড় লোকেরা রাজ্যের মধ্যে এই শিক্ষা চালাইতে চাহেন। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগ ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী আর পুরাতন যুক্তিবাদী লোকে ভরা।

ইহাদের বিশ্বাস শিক্ষা শুধু বড় বড় পদ পাইবার জন্য। সেবার জন্য শিক্ষা, জীবনের জন্য শিক্ষা এই সব দিকে ইহাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। সেই জন্যই তো জীবনের বড় বড় সমস্যার ইহারা মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না, উপরন্তু নিজেদের পুরাতন সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে চলিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি কাঁচা করিয়া ফেলিতেছেন।

কংগ্রেস সরকার জানিয়া রাখুন, যদি বুনিয়াদী শিক্ষাকে সম্মানের উচ্চ পদবীতে না উঠাইতে পারেন তবে জনসাধারণের উপর তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আর বেশিদিন স্থায়ী হইবে না, কেননা একমাত্র এই শিক্ষা দ্বারাই দেশের জনসাধারণের উন্নতি বিধান করা সম্ভব।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক সরকারি চাকুরির পিছনে পিছনে ঘুরুক তাহা আমি চাই

না। কিন্তু আমি চাই যে ভবিষ্যতে যাহারা সরকারি কাজ করিবেন তাহাদের উপর যেন এই শিক্ষার প্রভাব থাকে। তবেই কেবল সরকারের প্রাণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হইবে।

সরকারি চাকুরির প্রসঙ্গে একই কথা বলিতে হয়। ইহার মধ্যে বৃহৎ পরিবর্তন আসা চাই। যতদিন বিদেশী সরকার ছিল আর সরকারি কাজ করা অর্থ ছিল বিদেশী সরকারের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে সহায়তা করা ততদিন আমরা যুবক যুবতীদের সরকারি কাজে আগ্রহশীল হওয়া পছন্দ করি নাই। কিন্তু আজ যখন আমরা স্বাধীন হইয়াছি, শাসনভার আমাদের হাতে আসিয়াছে, তখন শাসন-যন্ত্র এমন সব লোকের হাতে থাকা উচিত যাহাদের চিত্ত ভারতের প্রকৃত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, যাহারা সারা সংসারের সেবা করিতে প্রস্তুত। অতীতের অ-রাষ্ট্রীয় ছাঁচে ঢালাই, ইংরেজি শিক্ষায় মানুষ হওয়ার ফলে শ্রদ্ধাসাধ্য কাজ করিতে অক্ষম, এমন সব লোক আমাদের শাসনতন্ত্রে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

আর এক কথা, সর্বহিতকারী (Welfare) রাষ্ট্রে অধিক সংখ্যক যুবক কর্মকর্তা থাকা আবশ্যক, কারণ আমাদের রাষ্ট্রকে সকল বিভাগে মজবুত করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্য, সরকারের যদি সত্যই গান্ধীবাদী শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি আস্থা থাকে, তবে ঘোষণা করা কর্তব্য, বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রার্থীদেরই প্রথম অধিকার দেওয়া হইবে। ফলে কি হইবে, না স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাবে শিক্ষা সংস্কার করা হইবে; শিক্ষা বিভাগ আজিকার অলস কর্মবিমুখ কর্মীকে সরাইয়া দিবে, এবং বর্তমান সরকারের প্রাণহীন, অর্থহীন নিয়মাবলী ও চাল চলনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা কেবল সূত্রের শিক্ষা নয়। ইহা কেবল গৃহোদ্যোগের শিক্ষাও নয়। ইহা বুদ্ধির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের শিক্ষা। বুদ্ধির বিকাশের ও সংস্কৃতির সুউচ্চ শিখরে পৌঁছানো এই শিক্ষার আদর্শ। শব্দ বা গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা নয়, জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে অধ্যয়ন, এই দুইয়ের মাধ্যমে সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ এবং প্রাকৃতিক সাধনগুলিকে মানুষের আবশ্যকীয় কাজে লাগাইবার সমুচিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

বুনিয়াদী শিক্ষা জনগণের ভাষার দিকে সমধিক দৃষ্টি দিবে। উর্দু, অবনত বা কম অগ্রসর কোন ভাষাই অবমাননা হইবে না। কারণ ইহার প্রত্যেকেই কোন না কোন ভারতীয়ের মাতৃভাষা হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসংখ্যা কম, তাহাদের ভাষার সাংস্কৃতিক বিকাশ হয় নাই। বুনিয়াদী শিক্ষা এই রকম জনগণের ভাষারও ব্যবস্থা করিবে।

জনসেবা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ও শেষ কথা। ইহার গতি সামাজিক উন্নতি অভিমুখী, আর আধ্যাত্মিক মূল্য বিচারপূর্বক সমাজের সংগঠন ইহার লক্ষ্যস্থল। আধ্যাত্মিক মূল্য ও মানবতার আদর্শ ত্যাগ করিলে কোন শিক্ষাপদ্ধতি এই দুনিয়ায় সফল হইতে পারে না।

এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা পশ্চাতে পতিত, অবহেলিত, অবদমিত, অত্যাচারিত, নিরাশ জনসমাজকে উন্নত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। এই শিক্ষা সেই সমাজের আত্মাকে চিনিতে শিখিবে আর উহাদের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দিবে।

আমি ভারতের সর্বত্র যতই ভ্রমণ করিতেছি, আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছে যে একমাত্র এই শিক্ষাপদ্ধতি চালু করিতে পারিলেই আমাদের সকল সমস্যার নিরাকরণ সম্ভব।

আমাদের রাষ্ট্রের নেতাগণ আজ রাজ্যের কাজেই এত ব্যস্ত যে রাজ্যগঠনের আর নূতন মানবতার বিকাশের সুদূরবিস্তারী পরিকল্পনার দিকে

মন দিবার তাঁহাদের সময় নাই। যদি তাঁহারা একটু অবসর সৃষ্টি করিয়া লইয়া এক আধ মাস শান্তভাবে কোন আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বসিয়া আত্মচিন্তা করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, শিক্ষায় যারা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা ভিন্ন মানুষের কোন পরিকল্পনাই সার্থক হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিকাশ বা উন্নতি বলিতে আমি কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না। আমাদের উন্নতির জন্য অসাম্প্রদায়িক কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন।

মাঝে মাঝে অভিযোগ শুনিতেছি যে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি কঠোরতাপন্থী হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ দুইই আছে। আর এজন্য ইহার নিজস্ব একটি প্রণালী গড়িতে হইয়াছে। আজ যদি এই শিক্ষার পণ্ডিত ব্যক্তিদের কঠোর মনে হয়, তাহার কারণ তাঁহারা সংখ্যায় বড় কম। এই অসুবিধা দূর করিবার একমাত্র উপায় ইহাকে ব্যাপক করিয়া তোলা। যত বেশি লোক এই পথের দিকে আসিবে আর সাহসভরে ইহার প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিবে ততই সমগ্র ভারতে, শুধু ভারতে কেন, সমগ্র জগতের জন্য এমন এক শক্তিশালী শিক্ষাপ্রণালী রচিত হইবে, যাহার কদর করিবে সমগ্র জগত।

আজিকার এই বুনিয়াদী শিক্ষাসম্মেলন ভারতব্যাপী এক শিক্ষা-বিপ্লবের সূচনা করুক, এই আমার আশা। সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান গুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আর শিক্ষামন্ত্রীরা সুচিন্তে এই বিষয়ে বিচার বিবেচনা করুন, বুনিয়াদী শিক্ষার সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদন করিয়া নূতন উৎসাহে তাহাদের প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করুন। হয়তো আমরা ভুল করিতেও পারি। কিন্তু "মোটা মাহিনার চাকুরির" জন্য যে শিক্ষা তাহাকে বর্জন করিয়া "সেবায়" উদ্বুদ্ধ শিক্ষার প্রচলন করিতে আমরা অবশ্যই সমর্থ হইব।*

* অখিল ভারত নঈ তালিম সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

ব্যাপক শিক্ষা

[শ্রীআশুতোষ সেন]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান

প্রথম তিনটি মৌলিক ধারার পরিণতি, উচ্চ-শিক্ষার অন্ত, ইউনিভার্সিটির প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া, কলেজে অধ্যয়নে। আর্টস্ ও সায়েন্স ধারা নির্দিষ্ট—প্রথম দুই বৎসরে আই, এ ; আই, এস্-সি ; আই, কম্ ইত্যাদি। পরে দুই বৎসর বি, এ ; বি এস্-সি। এম্ বি, বি.ই ইত্যাদির স্বতন্ত্র এবং উচ্চতর বি এস্ ; এম, এ ইত্যাদি ডিগ্রির ধারা। ইহারও পরে গবেষণামূলক কাজে ডাক্তার উপাধি। কিন্তু বর্তমানে অনেক উকীল, মোক্তার, ডাক্তার বসিয়া আছে—অন্তত বেশির ভাগেরই কাজ নাই। এমন কি কেরানীগিরিও দুর্লভ। সরকারি চাকুরির বহু উমেদার হইতে অল্প কয়েকটি বাহিয়া লওয়ার পর, তাহারাও বেকার। শূন্য মন শয়তানের কারখানা বলা হয়। কিন্তু শিক্ষিত বেকার ছাত্রের মন অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হওয়াতে, ইহারা মরিয়া হইয়া অতি সহজে, ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া, প্রতি আন্দোলন ও বিপ্লবের দিকে প্রভাবিত হয়। ক্রমে কাজ করিবার বা জীবনে উন্নতি করিবার উৎসাহ একেবারেই চলিয়া যায়।

শিক্ষকদের ধারায় এখনও শুধু চাপ না পড়িলেও, যথেষ্ট ভিড়। নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের সাধারণ শিক্ষক পাওয়ার জন্য, শিক্ষকদের এক একটি স্বয়ংপূর্ণ ধারা সরকারি গুরুট্রেনিং বা নর্মাল এবং ইউনিভার্সিটির এল্ টি। এল্ টি ও বি টি, এর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বি-এ ধারার মত একটি ধারা থাকিলে ভাল হয়। এই সব শিক্ষার অবসানে ছাত্রকে শিক্ষকতাবে বৃত্তিসহ বৎসরাধিককাল বাস্তবক্ষেত্রে কাজ শিখিয়া উপযুক্ত হইতে হইবে। বি-এ-এর পরে বি টি ক্লাস। ইহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

ইউনিভার্সিটির বাহিরে, আর্টসের ধারা ও সাইন্সের ধারার উচ্চতর শিক্ষা এখন সুনির্দিষ্ট নাই। কিন্তু শিক্ষা যথেষ্ট হইতেছে, বোধ হয়।

টেক্‌নিকেল ধারার ছেলেদের, ইউনিভার্সিটি হইতে স্বাধীন স্বয়ংপূর্ণ ব্যবস্থা আছে। ইতিপূর্বে এই শিক্ষার পরে ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রিতে পৌঁছাইবার বন্দোবস্ত ছিল। এই সুব্যবস্থা সকল ধারারই বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ব্যবস্থার বিপরীত দিকে গতি। মৌলিক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে যেমন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করা দরকার, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের (যেমন কলিকাতা, কাঁচড়াপাড়া, ইছাপুর, খড়গপুর, যাদবপুর ইত্যাদি) প্রবেশ পরীক্ষা পাশ করা দরকার। এই সব শিক্ষার পরিচালক একটি সমিতি-বোর্ড অব কন্ট্রোল অব টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং। ইহারেরও একটি প্রবেশ পরীক্ষা আছে। এই সব পরীক্ষা পাশ করিয়া ছেলেরা উপরোক্ত উপরোক্ত সিনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুলে, ইউনিভার্সিটির ইন্টারমিডিয়েটের বরাবর, পড়িতে থাকে। এই শিক্ষা স্বয়ংপূর্ণ। কলিকাতায় সপ্তাহে দুই দিন স্কুল ও বাকী দিন কারখানায় কাজ করিতে হয়। যাহারা ইউনিভার্সিটি মারফত সোজা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যায়, তাহাদেরও পরে কোন নামকরা প্রতিষ্ঠানে বৎসরাধিক ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করিতে হয়। কলেজ-সংলগ্ন কারখানায় হাতের কাজ

মূল্যবান হইলেও, যথেষ্ট নহে। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গীর কাজের মধ্যে গত তফাৎ থাকাতে, দুই রকম হাতের কাজ শিক্ষাই প্রয়োজনীয়। একটিতে লোকসানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, 'কি' 'কেন' এবং 'কি ভাবে'—শিক্ষা হয়। অন্যটিতে কেবল লাভের দিকেই দৃষ্টি থাকে।

হাতের কাজ অবজ্ঞার চক্ষে দেখাতে কয়েকটি কুফল দৃষ্ট হয়। দেশবিদেশে কারখানার শিল্পের ও উচ্চস্তরের মধ্যবর্তী কর্মচারীর অভাব দেখা যায়, যেমন অন্য কারণেও দেশের লোকেরা অতি দরিদ্র ও অতিরিক্ত ধনবানী, দুই পর্যায়ে বিভক্ত হইতেছে। নিম্ন স্তর হইতে প্রমোশন নিষিদ্ধ। সময় সময় ইহাও দেখা যায় যে, এই প্রচারের ফলে, শুধু মৌলিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা অশিক্ষিত লোক, খুটির জোরে প্রকৃত হাতে কলমে শিক্ষিতদের উপর দিয়া প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়। অবশ্য শাসনকার্যে দক্ষ, দূরদর্শী লোক, জটিল প্রতিষ্ঠান গুছাইয়া দিতে বা সুচারু রূপিতে অধিকতর সমর্থ বলিয়া, সময় সময় নিযুক্ত করা হয়।

উপরের ধারাগুলি ব্যতিরেকেও, কয়েকটি ইউনিভার্সিটি হইতে স্বাধীন ধরণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও আছে, যেমন ছুতার (শ্রীরামপুরে), কাঁচের ও চামড়ার (কলিকাতায়), কাপড়ের (বানবাদে) ইত্যাদি। আশা করা যায় যে, কালে এই সব শিক্ষাও যথাযথে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত হইবে।

অন্যদিকে কোন নির্দিষ্ট ধারার জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে, সমস্ত দিন ব্যাপী স্কুলের কারখানার ও ক্লাসে শিক্ষা, অথবা যাহারা বাহিরে কাজে ঢুকিয়াছে তাহাদের ও প্রৌঢ়ের জন্য সান্ধ্য ক্লাসে শিক্ষা পাইয়া অনেকে সুবিধামত কাজ করিতেছে। কলিকাতায় এইভাবে প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক ওয়ারিং ও ফুপার-ভাইজিং' এয়ারেন্স ও ঘোড়াই কাঁজ, মোটরের কাজ, ফটোগ্রাফী, ব্লক তৈয়ারী, ইলেকট্রোপ্লেটিং ছাপাখানা, অফি এসিস্টান্সিপ ও ইলেক্ট্রিক ওয়েল্ডিং, রেডিও, টেলিগ্রাফি যন্ত্রব্যবহার শিক্ষা, ঢালাই ইত্যাদির সরকারি ও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু অধিকাংশেই হাতে কলমে শিক্ষা।

টেক্‌নিক্যাল ধারার বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষিত যুবকেরা অনেকটা কাজ পাইতেছে। প্রায়ই বসিয়া থাকে না। এই আকর্ষণে এবং এক দৃষ্টিতেই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না এবং বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি নূতন ছোট বড় প্রচেষ্টা মহা আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়াছে। বড় বড় পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান খোলা হইলে এই নূতন শিক্ষিত ছাত্রেরা কাজ পাইবে সন্দেহ নাই। কাঁচ ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতম গবেষণার প্রতিষ্ঠানও খোলা হইয়াছে।

বেকারদের কাজ সংগ্রহের ব্যবস্থা, সকল দেশেই সরকারের বিষম দায়িত্ব। ইহা শিক্ষা, ব্যবসা, অর্থনীতি, শুল্ক, কর ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। নীতি নির্দেশ করিলেও, সরকার বিভিন্ন সমিতি দ্বারা নানারকম শিক্ষা পরিচালনা করেন। পূর্বে উল্লিখিত বোর্ড অব কন্ট্রোল অব টেকনিক্যাল ট্রেনিং এর হাতে উচ্চতর টেকনিক্যাল শিক্ষা। এই সমিতিতে ব্যবসায়ী, যাহারা পরে চাকুরি দিবে, সরকারী প্রতিনিধি এবং দেশের বিশিষ্ট লোক আছেন। কার্যে নিয়োগকারী ব্যবসায়ী বা কারখানার কর্তাদের মতে, বাস্তবক্ষেত্রে হাতে কলমে না শিখিলে, কোন পুঁথিগত শিক্ষাই যথেষ্ট নহে। চাকুরি এই সব নিয়োগকারীর উপর নির্ভর করে বলিয়া, শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের মতামত লওয়া বিশেষ দরকার। ভাল কাজ তাহাদেরও বাঞ্ছনীয় বলিয়া, এই মতামত সহজেই পাওয়া যায় এবং তাহারা আর্থিক সাহায্যও করেন।

ব্যবসা বাণিজ্যের ধারায়ও ইউনিভার্সিটি শিক্ষার উপরে সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষার

বন্দোবস্ত আছে। সরকার নিযুক্ত একটি সমিতি উহার পরিচালনা করেন।

এই ভাবে রয়ন বোর্ড, রেশম বোর্ড, খাদি বোর্ড ইত্যাদি এবং সর্বোপরি ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড বিভিন্ন কাজ পরিচালনা ও তদারক করেন।

কৃষি সম্বন্ধে সরকার নূতন চেষ্টা করিতেছেন। অনেক কালের পুরাতন চেষ্টাগুলি শুধু ফলপ্রদ হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার গবেষণাসমন্বিত উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে সমস্যা অটিল এবং অক্ষরী-শিক্ষার ক্ষেত্র বা জমি, এবং ইহার উৎকর্ষ, খাদ্য বা উৎপাদন উভয়ই সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

বর্তমানে সকল দেশেই জীবনের নানাবিধ সুখ সুবিধা সাম্যভাবে সাধারণে বণ্টন অবশ্যম্ভাবী এবং প্রথম প্রচেষ্টায় জমি বণ্টনের সামঞ্জস্য করার বলিয়া স্থির হইয়াছে। জমির মালিকানা সম্বন্ধে সকল তর্কের অবসান করিয়া, সরকার সমস্ত জমি নিজের হাতে নিয়াছেন। কিন্তু কার হাতে ইহার ব্যবস্থার ভার দিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। আবার লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন, চাষের পরিমাণ এবং জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা উপস্থিত কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, যদিও নিকট ভবিষ্যতে ইহাও যথেষ্ট হইবে না, নিশ্চয়। তবুও জমি বণ্টন ও খাদ্য উৎপাদন, উভয়েই উপস্থিত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং একটি বাদ দিয়া অন্যটির উপর জোর দিলে ফল-লাভের সম্ভাবনা কম।

শেষ কথা

যেদিন হইতে একটি ভুল ধারণা সকল দেশেই চলিয়া আসিতেছিল যে মৌলিক শিক্ষাই মুক্তির একমাত্র পথ। হাতে কোনরকম কাজ করা অসম্মানজনক। বর্তমান অর্থনৈতিক চাপে এই মনোভাব অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে এবং অবস্থার তাড়নায় অনেকেরই আধুনিক বাবাগুলির উপর ঝোঁক পড়িয়াছে। আজকাল সকলেই মানিয়া নিয়াছেন যে, শুধু মৌলিক শিক্ষা হইতে হাতে কলমে কাজে দৃষ্টি বেশি হয়, কারণ, কার্যে সাফল্য অনিশ্চিততা দূর করিয়া জিনিষের মাপযোকের নির্দিষ্টতা, প্রতি অংশের শুদ্ধতা এবং কাজের দৃষ্টি সম্পাদন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এই সাফল্যই জীবিকা অর্জনের সাধনা, সুখের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা এবং অন্যান্য অভিলাষ পূর্ণ করে। নিয়মানুবর্তিতা এবং উন্নতির চেষ্টার অভ্যাস সকল কাজেই আশ্চর্যজনক সুফল প্রদান করে। পাশ্চাত্যে, জাতির স্থায়িত্ব যদি দৃঢ়তার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, তবে শ্রেষ্ঠ দুষ্কর্ম, দেশপ্রেম বা সাহস অপেক্ষা, শিল্প কৌশলের প্রকর্ষই হইয়াছে। হাতের কাজ, জিনিস গড়নের সঙ্গেই বহুমুখী মানসিক গতির সামঞ্জস্য করে। সুচারু কার্যক্রম না হইলেও, পছন্দ না করিলেও প্রত্যেকের হাতের কাজ অবশ্য কর্তব্য—সকল ছাত্রই অঙ্ক কষিতে বা সাহিত্য পাঠ করিতে পছন্দ করে না, যদিও উহারা আবশ্যকীয়।

ছোট কথা, হাতের কাজ ও পড়াশুনা পৃথক করা উচিত নয়। এগারোজন শিক্ষকের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে উহাদের একত্রীকৃত করার ফল বর্তমানে উপলব্ধি হয়। নানাবিধ শিক্ষার কাজের বন্দোবস্ত থাকিলে, পড়াশুনার সহিত, শিক্ষার্থী তাহার মনোমত এবং আয়ত্তমত কাজ চাহিয়া লওয়ার সুবিধা পায় এবং দ্রুত উন্নতি লাভ করে। বর্তমানে সাধারণ কার্যকুশলতা, কোন একটি বিষয়ে পটুতা অপেক্ষা বেশি ফলপ্রদ বলিয়া, একাধিক রকমের হাতের কাজ জানা ভাল। কারণ যেটি বেশি অর্থকরী অথবা পছন্দসই, উৎসাহী কর্মী সেইটিই গ্রহণ করিতে পারে। কোন বিশেষ কাজের, বিশেষ সময়েই চাহিদা হাকে, ইহা সর্বদা দেখা যায়। সুতরাং কোন কালেই তাহার জীবন যাত্রার অসুবিধা হইবে না, একথা নিশ্চিত হইয়া যায়।

বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্তর হইতে আঠার বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের জন্য—

১। সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান

(১) শিক্ষক একটী ইংরেজী প্যারাগ্রাফ বাঙ্গালায় অনুবাদের জন্য বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। পরদিন ঐ বাঙ্গালা অনুবাদ দেখিয়া ছাত্রদের তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিতে দিবেন—যতদূর সম্ভব মূলের ইংরেজী অনুসরণ করিয়া।

(২) বাঙ্গালায় কর্মকারকে "কে" বিভক্তি কিরূপ স্থলে উহ্য থাকে?

(৩) বাঙ্গালায় সম্প্রদান কারক ও ক্রীবলিঙ্গ স্বীকার করার প্রয়োজন আছে কি?

(৪) "বটে" এবং "হইতে" অব্যয় ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহার কর।

(৫) নিম্নলিখিত বাগ্‌ধারা (idioms)গুলি বাক্যে ব্যবহার কর—কাণে তুলে, হেসে নেচে, গুছিয়ে বলা, ঢেলে সাজা···।

(৬) বাঙ্গালার নিম্নলিখিত শব্দগুলির কিরূপ অর্থের পরিবর্তন হইয়াছে—আহ্লাদ এবং রাগ, হিংসা, বর্ষ, সাহস, আলাপ, সংবাদ, সুতরাং?

(৭) সংস্কৃত ও ইংরেজী ব্যাকরণে কারক (Case) ও বাচ্যের (Voice) মধ্যে যাবতীয় পার্থক্য কি? 'একদেশে'কে সমাস বলা কতদূর ঠিক?

(৮) বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে এরূপ বাক্যের উদাহরণ দাও যাহাতে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। ইংরেজীতে ঐরূপ স্থলে ক্রিয়াপদ উহ্য রাখা যায় কি?

(৯) কতগুলি এরূপ সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ের উদাহরণ দাও যাহার যোগে ভাববিশেষ (abstract nouns) প্রস্তুত হয়।

(১০) সত্যবতী কত্রিয়া ছিলেন কি ক্ষত্রিয়ী? তাঁহা সোমের আচার্য ছিলেন কি আচার্যানী?

(১১) নিম্নলিখিত ইংরেজী suffixগুলির অনুরূপ সংস্কৃত প্রত্যয় কি—-er, -able, -ness, -ing, -ed, -ly, -tion? ঐরূপ pro-, peri, con, inter-prefixগুলির অনুরূপ উপসর্গ কি?

(১২) দীর্ঘ ও লঘুস্বরের প্রভেদ কি? 'মেঘদূত' কোন্ ছন্দে রচিত? ম-গণ, য-গণ প্রভৃতির অর্থ কি? কোন্ গণ anapaestএর অনুরূপ? মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পার্থক্য কি?

(১৩) ভারতের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত একই বিজ্ঞাপন হইতে কোন্‌টি কোন্ ভাষা তাহা নির্দেশ কর। বিভিন্ন ভাষার বেতার ঘোষণা হইতে নির্দেশ কর উহা কোন্ ভাষা?

২। ইতিহাস

(১) দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ভারতের দুই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বল।

(২) অষ্টম হেনরী অথবা চতুর্দশ লুইএর সঙ্গে কোন্ ভারতীয় নৃপতির তুলনা করা যায়?

(৩) ভারতে ইংরেজ রাজত্বকালীন ধর্ম-সংস্কারকদের নাম কর। ঐ যুগে কে ভারতীয় ধর্ম ও আদর্শ পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করেন?

(৪) যদি তুমি আকবর হইতে তবে হিন্দু বা বৈরাগীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে?

(৫) সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া যদুনাথ বিদেশীর বাঙ্গালার জয় তুমি বিশ্বাস কর কি? কেন?

(৬) সভ্যতার পীঠস্থান হিসাবে নিম্নলিখিত দেশগুলি সম্বন্ধে—

পারস্য, রোম, মিশর, আরব, গ্রীস (যুনান) ও মেসোপটেমিয়া (ইরাক)।

(৭) রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক স্কটদের রাণী মেরীর হত্যা তুমি সমর্থন কর কি?

(৮) তোমাদের এই গ্রামে বাস কত দিনের? তোমার কোন্ পূর্বপুরুষ কবে এবং কোথা হইতে এখানে আসেন? তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কে কিরূপ বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন?

৩। ভূগোল

(১) পৃথিবীর গোলত্বের চারিটি প্রমাণ দাও। তুমি কোন্ প্রমাণ অধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে কর?

(২) পৃথিবীর আবর্তনজনিত বেগ কোথায় সর্বাধিক এবং ইহা ঘণ্টায় কত মাইল?

(৩) মাদ্রাজের লোকেরা সূর্যাস্ত অপেক্ষা সূর্যোদয় ভাল দেখে কেন?

(৪) নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কখনও সূর্য মাথার উপর আসে—কটক, রাঁচি, পাটনা?

(৫) সমুদ্রপথে পৃথিবীর হ্রস্বতম (shortest) পরিক্রমা করিতে হইলে কোন্ কোন্ সমুদ্র, বন্দর, খাল ও প্রণালী পড়িবে, ক্রম অনুযায়ী লিখ।

(৬) ইংলণ্ড হইতে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত সমুদ্র যাত্রায়, প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা অধিক সময় কেন লাগে? শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমুদ্র যাত্রায় কেন কম সময় লাগে?

(৭) কোন মহাদেশেই পূর্ব উপকূল প্রান্তে উচ্চ মরুভূমি দেখা যায় না কেন?

(৮) অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা কেন গ্রীষ্মকালে বড়দিন প্রতিপালন করে?

(৯) ইয়োরোপে যখন তাজা আনুর পাওয়া না, তখন তথাকার লোকেরা উহা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমদানি করে। কিরূপে?

(১০) কলিকাতার কলল অপেক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকার কললা গোয়াইতে সস্তা কেন?

(১১) আগামী বড় দিনের সময়ে যদি কোথাও বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাও তো কোন্ স্থান নির্বাচন করিবে এবং কেন? কোন্ রেলপথে যাইবে এবং পথে দর্শনীয় স্থান কি পড়িবে?

(১২) পাঁচটি তীর্থস্থান দর্শন করিবার জন্য তোমাকে কোন্ কোন্ রেলপথে যাইতে হইবে তাহা ভারতবর্ষের এক মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাও।

(১৩) নিম্নলিখিত স্কটকের ডায়েরী হইতে অথবা প্রদত্ত তাপ ও বৃষ্টিপাতের নক্সা হইতে অনুমান কর যে উহা কোন্ দেশ; কারণ দর্শাও।

(১৪) প্রদত্ত চিত্রগুলি দেখিয়া নির্ণয় কর উহারা কোন্ কোন্ দেশের দৃশ্য।

(কার্পাস ক্ষেত্রে কর্মরত নিগ্রো, চা বাগানে সাঁওতাল কুলী, ঘনতৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে বিচরণ-শীল ভেড়া, শীল শিকার, মরুস্থানে খর্জুর কুঞ্জ, ইত্যাদি।

(১৫) তোমার গ্রামের সন্নিকটে কোন ঐতিহাসিক অবশেষ, প্রাচীন দেবমন্দির বা এরূপ স্থান যেখানে বাৎসরিক মেলা বসে, তাহাদের বিবরণ দাও।

৪। নাগরিক শাস্ত্র

(১) এরূপ একটি কাল্পনিক রাষ্ট্রের চিত্র দাও যাহাতে (ক) পুলিশের ব্যবস্থা নাই, (খ) মুদ্রার প্রচলন নাই।

(২) কুটির-শিল্প ও যন্ত্র-শিল্পের মধ্যে কাহার অধিক প্রসার বাঞ্ছনীয়? কেন?

(৩) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর কোন প্রতিবন্ধক থাকা উচিত কি?

(৪) দেশে ধনের বিতরণ কিরূপ হয় তুমি পছন্দ কর?

(৫) ভারতীয় কৃষকদের আর্থিক উন্নতির জন্য কি নীতি অবলম্বন করিবে?

(ঙ) Nation কাহাকে বলে? ভারতবর্ষে এক nation অথবা বহু?

(চ) অনিচ্ছাপূর্বক হত্যার অপরাধীকে তুমি কি দণ্ড দিতে ইচ্ছা কর?

৫। তর্ক ও মন্তব্য

(১) নিম্নলিখিত সংজ্ঞা (definition) গুলি পরীক্ষা কর (ক) মনুষ্য যন্ত্রচালাই জীব, (খ) যে পশু যুদ্ধোদ্যমে করে তাহাকে অশ্ব বলে, (গ) যে বীরপুরুষ দেশের জন্য মরিতে প্রস্তুত তাহাকে সৈন্য বলে।

(২) নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ পরীক্ষা কর—মনুষ্যজাতি ইয়োরোপীয়, মুসলমান, আর্য ও আদিম নিবাসী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

(৩) তুমি কিরূপে জান যে, (ক) আমরা চক্ষু দিয়া দেখি ও কান দিয়া শুনি, (খ) মেঘই বৃষ্টির কারণ, (গ) পশুদেরও সুখদুঃখ বোধ আছে (ঘ) বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন।

(৪) নিম্নলিখিত উক্তি ও যুক্তিগুলি পরীক্ষা কর—

(ক) আজ অসহ্য গরম পড়িয়াছে। মেলাতে অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল।

(খ) বিদ্যুৎই বজ্রের কারণ, যেহেতু উহা সর্বদাই বজ্রনির্ঘোষের পূর্বে দেখা যায়।

(গ) রামমূর্তি নিরামিষভোজী, সুতরাং মাংসাহার অপেক্ষা নিরামিষাহার অধিক স্বাস্থ্যকর।

(ঘ) পর্দা নিশ্চয়ই উত্তম প্রথা, যেহেতু ভারতে আমেরিকার চেয়ে অনাচার কম।

(ঙ) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ ও সর্বপ্রেমী উভয়ই হইতে পারেন না, যেহেতু সংসারে দুঃখ আছে।

(চ) মনুষ্য নিজ কর্মের জন্য দায়ী নয়, যেহেতু ঈশ্বর যেরূপ করান সে সেইরূপই করে।

(ছ) বাদুড় নিশ্চয়ই এক রকম পক্ষী, যেহেতু উহার ডানা আছে ও উহা আকাশে ওড়ে।

(জ) জন পার্লামেন্টের মেম্বর, সুতরাং তাহার বিচার খুব পাকা, যেহেতু ইহা সকলেই জানে যে পার্লামেন্টের বিচার খুব পাকা।

(ঝ) ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন, কারণ বেদ তাহাই বলে। আর বেদের কথা মিথ্যা হইতে পারে না, কারণ তাহা ঈশ্বরের রচিত।

(ঞ) কর্ম, যোগ, মায়া ও মোক্ষ কথাগুলির অর্থ কি?

(ট) ভাষা ছাড়া চিন্তা করা সম্ভব কিনা—(ক) মানুষের পক্ষে, (খ) অন্য জীবের পক্ষে?

(ঠ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কি তুমি ধর্মের অঙ্গ মনে কর?

(ড) পূজায় পশু বলি দেওয়া তুমি সঙ্গত মনে কর কি?

(ঢ) কোন্‌টা বলা অধিক সঙ্গত—(ক) ঈশ্বর ন্যায়বান্, (খ) ঈশ্বর দয়ালু ও উদার?

(ণ) জগতে সুখ বেশি অথবা দুঃখ বেশি তুমি মনে কর?

(ত) প্রাকৃতিক শক্তিগুলি যদৃচ্ছা কাজ করিতেছে, না, কোন বিশ্ব উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছে?

(থ) মানুষ কি নিজ কর্তব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন?

(দ) ধর্ম, বুদ্ধি ও সুখ এই তিন বিষয়ে মানুষ ক্রমশ উন্নত হইতেছে কি অবনত? এই বিষয়ে (ক) ধর্মগ্রন্থাদির, (খ) আধুনিক পণ্ডিতদের ও (গ) তোমার নিজের মত দাও।

(ধ) তুমি ভক্তিমার্গী, অজ্ঞেয়বাদী না নাস্তিক?

(ন) ইহাদের কারণ বল—(ক) পূর্ণচন্দ্র উদয়কালে বেশি বড় দেখা যায়, (খ) কোন দিন হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়িলে সেদিন পুকুর বা কুয়ার জল গরম মনে হয়, (গ) মিঠাইয়ের পর চা খাইতে ভাল লাগে না, (ঘ) অন্ধকার রাত্রিতে তারাগুলি বেশি স্পষ্ট দেখা যায়।

৬। স্বাস্থ্য ও শরীর বিদ্যা

(১) শিরা ও ধমনীতে পার্থক্য কি? পাকস্থলী, যকৃত ও প্লীহা শরীরের কোন্ পার্শ্বে অবস্থিত? তোমার কয়টি পাঁজর আছে?

(২) স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত ভারতীয় রীতির উপর নোট লিখ—(ক) দাঁতন ব্যবহার, (খ) স্নানের সময় তৈল মর্দন, (গ) পান খাওয়া।

(৩) তোমার স্বাভাবিক উত্তাপ ও নাড়ীর স্বাভাবিক গতি কত?

(৪) সর্প দংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা কি? তোমার ছোট ভাইয়ের কাপড়ে হঠাৎ আগুন লাগিলে তুমি কি করিবে?

৭। জীব বিদ্যা

(১) জলের কোন্ অবস্থায় পা মোছান বা বরফ থলি ব্যবহার প্রয়োজন হয়? রোগীর ঘরে আলো কোথায় রাখা উচিত?

(২) কোন্ কোন্ শীতল-শোণিত জীবের চারিটি পা আছে?

(৩) বেশর-কীটের জীবনের চারিটি অবস্থান্তর কি কি? কোন্ কোন্ পতঙ্গে পুং, স্ত্রী ও ক্লীব এই তিন জাতি থাকে?

(৪) সিংহী কতদিন গর্ভধারণ করিয়া একসঙ্গে কয়টি বাচ্চা প্রসব করে?

(৫) ইহাদের গড় আয়ু কত—(ক) মুরগি, (খ) টিয়াপাখী, (গ) তালগাছ?

(৬) কোন্ কোন্ গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ভেদ আছে? মুরগীর পুং ও স্ত্রী পুষ্পে প্রভেদ দেখাও।

(৭) বট ও গরান (mangrove) গাছে অসাধারণত্ব কি?

(৮) গাছেরা আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারে কি কি কৌশল অবলম্বন করে?

(৯) নিম্নলিখিত গাছগুলির চাষে (ক) কোন্ মাস প্রশস্ত, (খ) কাহার বীজের প্রয়োজন হয়, কাহার পুনঃ রোপণ (transplantation) দরকারী?—ধান, আখ, আলু, পিঁয়াজ, কলা।

(১০) গাছের জীবনে আলোর প্রয়োজন কি? কোন্ ফসলে কোন্ সার দরকারী?

৮। বিজ্ঞান

(১) ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি শুদ্ধ ধাতু—পিতল, কাঁসা, সোনা, সঙ্কর, পারদ?

(২) সমুদ্রের জলে বা বদরীনাথ পাহাড়ে ভাত সিদ্ধ করা অসম্ভব হয় কেন?

(৩) মাটির কলসীতে জল ঠাণ্ডা থাকে কেন? খসখসের পর্দা ব্যবহারে ঘর ঠাণ্ডা থাকে কেন?

(৪) জল জমিবার সময় আয়তনে বাড়ে না কমে? তুমি কি জলকে গত ইচ্ছা গরম করিতে পার?

(৫) এক কৌটা জলের আয়তন কিরূপে সূক্ষ্মরূপে মাপিবে?

(৬) গভীর জলের মাছ উপরে আনিলে আয়তনে বাড়ে কেন?

(৭) বন্দুকে আগুন লাগিলে বারুদ প্রবল হইয়া উঠে কেন?

(৮) যদি জগতে (ক) বায়ুর চাপ, (খ) মাধ্যাকর্ষণ বা (গ) কৈশিকাকর্ষণ না থাকিত তবে কি হইত তাহার চিত্র দাও।

(৯) বজ্রধ্বনির পূর্বেই বিদ্যুতের ছটা কেন দেখিতে পাওয়া যায়?

(১০) উষাকালে সূর্য লাল দেখায় কেন? আকাশ নীল দেখায় কেন?

৯। জ্যোতিষ

(১) উত্তর মেরুতে সূর্যকে কিরূপে চলিতে দেখা যায়?

(২) চন্দ্র রোজ দেরি করিয়া উঠে কেন? রোজ কতক্ষণ দেরি করে? ইহা হইতে নির্ধারণ কর চন্দ্র নিজ কক্ষে কোন্ দিকে ঘুরিতেছে এবং কত সময়ে?

(৩) সেক্সটাণ্টে 'শিং' কেন সর্বদা সূর্যের উল্টা দিকে থাকে ?

(৪) ২১শে জুন এক নাবিক দেখিল যে মধ্যাহ্ন সূর্য ঠিক শিরোবিন্দুর ৬২ ডিগ্রী দক্ষিণে আছে এবং ঠিক সেই সময়ে ক্রোনোমিটারের সময় ৬টা সন্ধ্যা। ইহা হইতে জাহাজ যে বন্দরে নঙ্গর করিয়া আছে তাহার অক্ষ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় কর এবং মানচিত্র দেখিয়া সেই বন্দরের নাম বাহির কর।

(৫) পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব এবং পৃথিবীর নিজ কক্ষ পরিক্রমার সময় কত ? ইহা হইতে পৃথিবীর গতিবেগ সেকেণ্ডে কত মাইল তাহা নির্ণয় কর।

(৬) ঘড়ি দেখিয়া নোট কর যে কোন নির্দিষ্ট তারা (ক) আজ, (খ) একমাস পরে এবং (গ) ঠিক এক বৎসর পরে, কয়টায় উঠে এবং পরিবর্তনের কারণ বল।

(৭) আকাশে নির্দেশ কর বা চার্ট আঁকিয়া দেখাও—(ক) সপ্তর্ষি, (খ) কালপুরুষ, এবং (গ) ক্যাসিওপিয়া।

১০। গতিবিজ্ঞান

(১) একটি এক সের ও আর একটি এক ছটাক ওজনের দুইটি প্রস্তর খণ্ড উচ্চ স্থান হইতে একসঙ্গে ফেলিলে কোন্‌টি আগে পড়িবে ? প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ কর।

(২) ট্রেণের কামরার মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চ হইতে এক পাথরের টুকরা মেজেতে ফেল এবং কোথায় পড়ে লক্ষ্য কর। স্থির ট্রেণে ও চলন্ত ট্রেণে কোন পার্থক্য হয় কি ?

(৩) জল পাম্প করিয়া যত উচ্চে খুশী উঠাইতে পার কি ? কেন ?

(৪) মনে কর মধ্য নদী হইতে ঢেউ কিনারায় তোমার দিকে আসিতেছে। মধ্য নদীর জলই কিনারায় আসিতেছে কি ? প্রমাণ দাও।

১১। গণিত

(১) কোন্ কোন্ অবস্থায় দুইটি ত্রিভুজ সর্বতোভাবে সমান হয় ? যে কোন একটি প্রমাণ দাও।

(২) একটী ত্রিভুজের শীর্ষ কোণ ৬০° হইলে বাকি দুইটী কোণের সমষ্টির অর্ধেক কত ডিগ্রী হইবে ?

(৩) নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞার বিলোম (Converse) প্রমাণিত কর—"সমান্তরিক ক্ষেত্রে বিপরীত কোণ পরস্পর সমান হয়"।

(৪) চক্ষুর চক্ষুর্ত্বকের বিপরীত কোণদ্বয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে প্রয়োগ দ্বারা (experimentally) সিদ্ধ কর।

(৫) একটি সরল রেখা ক খ ১০ ইঞ্চি লম্বা। প একটি সচল বিন্দু ক হইতে খ পর্যন্ত ভ্রমণ করে। ক প এবং ইহার সঙ্গে ক প. প খ এর আয়তন কিরূপে পরিবর্তিত হয় তাহা গ্রাফ আঁকিয়া দেখাও।

(৬) এক আমিন কোন স্থান হইতে একটি পর্বতশিখরের উচ্চতা ৩০ ডিগ্রী দেখিল, কিন্তু ১০০ গজ নিকটে আসিয়া উহা ৬০ ডিগ্রী দেখিল। স্কেল ব্যবহার করিয়া ও ১ সেন্টিমিটার = ১০ গজ ধরিয়া পর্বতের উচ্চতা নির্ণয় কর।

(৭) চন্দ্রমণ্ডল, যাহা আড়াই লক্ষ মাইল দূরে আছে, তাহা তোমার চক্ষুতে মাত্র আধ ডিগ্রী কোণ রাখে, তবে চন্দ্রের ব্যাস কত হইবে ?

(৮) আড়াইটার সময় ঘড়ির দুইটি কাঁটা পরস্পরের সহিত কত কোণ উৎপন্ন করিবে ?

(৯) দশটি টীম এক লীগ ম্যাচে যোগদান করিল। মোট কতগুলি খেলা হইবে ?

(১০) x-এর মূল্য কত হইলে $5 - 4x - x^2$-এর মূল্য সর্বাধিক হইবে ?

(১১) প্রমাণ কর যে $3x^2 + 12x + 14$ সর্বদাই ধনাত্মক (Positive)।

(১২) ৫১০ গজ একটি রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমদূরবর্তী ৬০টি বৃক্ষ

রোপণ করা হইলে দুই দুইটি গাছের মধ্যে দূরত্ব কত হইবে?

(১৩) শতকরা ১২½ সুদে ১১৮ টা. ১৩ আ. ৮½ পাই কত সময়ে বিক্ষিপ্ত হইবে?

(১৪) যদি একঘীটর = ৩৯ ইঞ্চি এবং এক ঘন ফুট জলের ওজন ১০০০ আউন্স হয় তো এক প্রামে কত গ্রেন হইবে।

১২। সঙ্গীত

(১) শিক্ষক স্বরের ব্যাকগ্রাউণ্ড রূপে হার্মোনিয়মের একটি বিশেষ চাবি খুলিয়া দিবেন এবং এক একটি করিয়া অন্যান্য চাবি অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিবেন। ব্যাকগ্রাউণ্ডকে 'সা' ধরিয়া অন্যান্য সুরগুলি শুধু কানে শুনিয়া নির্দেশ (identify) কর।

(২) শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী একটি বিশেষ চাবিকে 'সা' ধরিয়া হার্মোনিয়মে শুদ্ধ সুরে বাজাইয়া যাও।

(৩) হার্মোনিয়মের একটি বিশেষ চাবির সহিত সঙ্গত করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এস্রাজের তার বা তবলা বাঁধ।

(৪) এমন একটি গতের আলাপ কর যাহাতে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়।

(৫) কাওয়ালী তালের সঙ্গে কোন্ ছন্দ মিলে? কজলী, মূলার ও বীর রসের সঙ্গীতে কোন্ কোন্ রাগিনী খাটে?

১৩। বালিকাদের জন্য বিশেষ প্রশ্ন

(১) মনে কর ঘরে একজন মাত্র অতিথি আসিয়াছেন, কিন্তু ঘরে শুধু আলু আছে। অতিথি সৎকারের জন্য কি কি রাঁধিবে?

(২) এক টাইফয়েডের রোগী একমাস অসুখের পর আম অপথ্য করিবে। তাহার জন্য কি রাঁধিবে ও কি মসলা সংযোগে?

(৩) অসাবধানতাবশত পায়ে গরম ভাতের ফেন পড়িয়া গেলে কি প্রতিকার করিবে?

(৪) পাঁচ জনের পরিবারের মাসিক খরচের জন্য বাজেট প্রস্তুত কর।

(৫) সীতার চরিত্রের বিশেষত্ব কি? মহাভারতের কোন্ নারীচরিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মনে কর? কেন?

(৬) মনে কর তোমার জন্মদিনে বাবা তোমাকে ২৫৲ দিয়াছেন। উহা কিরূপে খরচ করিবে?

১৪। সাধারণ জ্ঞান

(১) নোবেল প্রাইজ কি? নোবেল প্রাইজ বিজেতা নারী কে কে, ও তাঁহারা কি কি বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন?

(২) পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য কি কি আছে ও কি কি ছিল?

(৩) সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী ঔপন্যাসিক, উর্দু কবি, ইংরেজ মহিলা কবি, ভারতীয় ইংরেজ কবি, অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়, আমেরিকান মুষ্টিযোদ্ধাদের নাম কর।

(৪) আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট, বর্তমান পোপ, কংগ্রেসের সর্বপ্রথম সভাপতি, ভারতের সর্বপ্রথম সিভিলিয়ান এবং ইসলাম রাষ্ট্রের প্রথম চার খলিফার নাম বল।

(৫) রেডিয়ম, এক্স-রে, মাধ্যাকর্ষণ, আপেক্ষিক তত্ত্ব, ম্যালেরিয়া বীজাণু ও এভারেস্ট পর্বত কে কে আবিষ্কার করেন? টেলিফোন, বেতার, দূরবীক্ষণ, ব্যাবসিটার, ষীম ইঞ্জিন, ডায়নামো, ডিনামাইট কে কে আবিষ্কার করেন? পিরামিড, চীনের প্রাচীর, সুয়েজ খাল, জয়পুরের মানমন্দির, কুতুব মিনার, পরেশনাথের মন্দির, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনার লাইব্রেরি, টাটা সৌহশিল্প কে কে নির্মাণ করান? উত্তররামচরিত, শাহ্‌নামা, ইলিয়াড, এনিড, ফস্ট, ডিভাইনা কমেডিয়া, পৃথ্বীরাজ রাসো ও মহাবংশ কে রচনা করেন?

(৬) হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়,

ত্রিবিধ তাপ, ত্রিদোষ (আয়ুর্বেদোক্ত), অহিষ্ণু ও নবগ্রহ কি কি ? আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে এই সকল শ্রেণীবিভাগ কতদূর সঙ্গত ?

(৭) সৌর (বাঙ্গালা), চান্দ্র-সৌর (হিন্দী), ও চান্দ্র (মুসলিম) মাস ও বৎসরে পার্থক্য কি ? জন্মাষ্টমী শুক্ল পক্ষে না কৃষ্ণ পক্ষে হয় ?

(৮) প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতের প্রজাতন্ত্র রাজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়, মানমন্দির, আন্তর্জাতিক বন্দর এবং বীরাঙ্গনাদের নাম কর।

(৯) সর্বাধিক প্রচলিত মোটরকার, সাইকেল, রেডিও সেট, টাইপরাইটার ও দেলাইকল কি ?

(১০) আকাশে এই তারকাগুলি নির্দ্দেশ কর লুব্ধক (Sirius), অভিজিৎ (Vega), অগস্ত্য (Canopus) ইত্যাদি।

(১১) নক্ষত্রলতা বা গুচ্ছের আখ্যানভাগ লেখ, কিন্তু শেষ দিকে প্রথমটিকে দুঃখান্ত ও দ্বিতীয়টিকে সুখান্ত কাহিনীতে পরিণত কর।

(১২) (ক) পানিপথে মারাঠাদের জয় ও (খ) হিমালয় কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত কল্পনা করিয়া ভারতের কাল্পনিক (ক) ইতিহাস ও (খ) ভূগোল লেখ।

(১৩) ইহারা বর্ত্তমানে কোথায়—কোহিনূর, ময়ূর সিংহাসন, সোনা লিখা, বৃহস্পতি গ্রহ, আর্য্যভট্ট, অষ্টম এডওয়ার্ড, এবং শ্রীঅরবিন্দ, নূরজাহান আকবর ও রামমোহন রায়ের সমাধি।

(১৪) সর্বাপেক্ষা দাহ্য ও ভারি ধাতু কি ? সোনা ও লোহার মধ্যে কাল্পনিক বিবাদ বর্ণিত কর।

(১৫) লণ্ডনের একাংশের কটোতে বড় বাদামটি (সেন্ট পলের গির্জা) কি ? ঐরূপ, ছবিতে ক্যাণ্টারবেরী গির্জা, পার্লামেণ্ট ভবন, ভিক্টোরিয়া মৌধ, ঘুঘনেশ্বর, বুদ্ধগয়ার মন্দির, সীল, কাঙ্গারু, উটপাখী ও অন্যপ্রসিদ্ধ বস্তুগুলিকে নির্দ্দেশ কর।

(১৬) 'বন্দে মাতরম্' 'জনগণমন' ও 'হিন্দুস্থান হামারা' গানের রচয়িতা কাহারা ? এই শ্লোকটি গীতার কোন্ অধ্যায়ে আছে ?

[শিক্ষক দুই একটি সুপরিচিত শ্লোক বলিয়া প্রশ্ন করিবেন।]

(১৭) শিক্ষক ছাত্রদিগকে লইয়া কোনও সভায় চড়ুইভাতিতে বা অমনি বেড়াইতে লইয়া যাইবেন, ও প্রত্যাগত জিজ্ঞাসা করিবেন—(ক) কতদূর পথ হাঁটা হইয়াছে ? (খ) সমস্ত পথ চলিতে কত সময় লাগিয়াছে ? (গ) যে বোঝা লইয়া চলিয়াছ তাহার ওজন কত ? (ঘ) সভায় কত লোক ছিল ? (ঙ) যে জায়গাটি দেখিয়াছ তাহা কত বিঘা বা একর ? ছাত্রেরা নিজ নিজ আনুমানিক উত্তর লিখিয়া দিবে এবং যাহার উত্তর বেশি কাছাকাছি ঠিক, তাহাকেই মর্য্যাদা দেওয়া হইবে।

(১৮) প্রদত্ত তিনটি অঙ্কের মধ্যে একটি দিয়া পূর্ণ কর :—

(ক) কলম্বো হইতে এডেন—মাইল। (২১০০, ৬১০, ৭৬০০)

(খ) লাহোরে জুন মাসের গড় তাপ—ডিগ্রী। (৪০, ১১৫, ৯৩)

(গ) আবিসীনিয়ার ক্ষেত্রফল—কোটি বর্গ-মাইল। (১২, ৩২, ১০৩০)

(ঘ) ম্যাগিলান—সালে পৃথিবী পরিক্রমা করেন। (১১২৫, ১৫১৯, ১৭৯০)

(ঙ) —সালে গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। (১৮১২, ১৯৩৬, ১৬৪২)

(চ) এক গিলিং প্রায়—আনার সমান। (১, ৬, ১০)

(ছ) এক টন প্রায়—মণের সমান। (২৮, ৭, ১২)

(১৯) ইহাদের সম্বন্ধে কি জান ?

(ক) ধ্যান চাঁদ, উদয়শঙ্কর, সোমেন বসু, বলীপ সিংহ, সাধু, তেনজিং, সামা, বোদাহাই।

(খ) আইন্ ষ্টাইন, মার্কস, ফ্রয়েড, শ, চার্লি চ্যাপলিন, লেনিন, এডিসন, হেন্‌রী ফোর্ড।

(গ) মহেঞ্জো দাড়ো, বোরোবুদুর, অজন্তা, কাবা, ভ্যাটিকান, লুভার, মিনার্ভো।

(ঘ) আইনাসৌর, টেরোডেক্টিল, মাষ্টডন, ইচ্থাইওসোর, পিথেকেন্থ্রপাস।

(ঙ) মার্কো পোলো, ইবন্ বতুতা, ইৎসিং, হুয়ানচোঙ, সেপ্টপল, অলবেরুনী।

(চ) মুদা, পোলেয়ান, মনু, লাউৎসে, অবধূত, হাম্মুরাবি।

(ছ) হরিশ্চন্দ্র, ইকবাল, প্রেমচাঁদ, রবীন্দ্র, রামন্, ভাটনগর, ভূকাবাম, রহিমন, বৈজুবাওরা।

(জ) কণাদ, মাধবাচার্য, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, লীলাবতী, মল্লিনাথ, সায়ন, ঘাস্ক, ভারবি।

(ঝ) ওলিম্পিয়াড, হারাকিরি, গ্লাডিয়েটার, অশ্বমেধ, অহম্, সতী, টোটেম।

(ঞ) বিদুর, সত্যভামা, অরুন্ধতী, বীরবাহু, সোহ্রাব, ইউলিসিস, ইব্রাহিম, এজিদ!

(ট) সুজাতা, মীরাবাঈ, রাবেয়া, নাইটিঙ্গেল, প্লেস আলিং, ভারতী, অহল্যাবাঈ, ভবানী।

(ঠ) পটাশিয়াম সায়নাইড, নাইট্রো-গ্লিসারিন, অক্সি-এসিটিলিন, একোয়া রেজিয়া।

(১৯) নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে কি কি ভুল আছে?—

(ক) রবীন্দ্রনাথ মহান্ (noble) কবি বলিয়া জার্মান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দিয়াছেন।

(খ) কেহ তাহার বাচ্চাকে স্পর্শ করিলে সিংহী রাগে কেশর ফুলাইয়া গর্জন করিতে থাকে।

(গ) গ্রীষ্মকালে সূর্য পৃথিবীর নিকটে আসে। তখন দিনের দৈর্ঘ বাড়িয়া যায়, যেহেতু গরমে সবই বাড়ে।

(ঘ) শীতকালে জল হইতে এত বেশি বাষ্প উঠে যে আমরা চোখেই তাহা দেখিতে পাই।

(ঙ) এস্কিমোর মাসভূমি প্রায় হিমাংশের মাস-ভূমির মতই, কারণ উভয় দেশেই লাবা পাওয়া যায়।

(চ) বোম্বাই অঞ্চলের আর্দ্র অলবায়ু কার্পাস উৎপাদনের পক্ষে খুব সহায়ক।

(ছ) সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এবং চন্দ্র পশ্চিম দিকে। প্রথমটি দিন করে এবং দ্বিতীয়টি রাত।

(জ) ভোর বেলা চন্দ্রকলা শুকতারার সঙ্গে ডুবিয়া গেলে সূর্য উঠিয়া ফুলগুলি বিকশিত করিল।

(ঝ) কোকিল সারাদিন ডালে বসিয়া ফুলের গুলি খাইতে লাগিল এবং ভ্রমর ঐ গাছেরই ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিল। কিন্তু পূর্বাকাশে সন্ধ্যাতারা উঠা মাত্র কোকিল তাহার বাসায় ও ভ্রমর চাকে ফিরিয়া আসিল।

(ঞ) প্রথম নিজাম হায়দর আলি নিজ নামানুসারে হায়দরাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠা করেন।

(ট) গুপ্তবংশের দ্বাপতিত্য চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন।

(ঠ) প্রথম জেম্‌স তাঁহার ঐশ্বরিক অধিকারের দাবীর জন্য প্রজাদের বিশ্বাসভাজন হন। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ ষড়যন্ত্র করার ফলে সমস্ত লণ্ডন শহর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। রাজার কোনরূপে প্রাণরক্ষা হয় বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে চতুর্থ হেনরী রাজা হইয়া তাঁহাকে নিজ দরবারে বন্দী করিয়া রাখেন।

(ড) পোপ সেণ্ট অগষ্টাইন তাঁহার "Confession" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তিনি ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন।

(ঢ) নন্দের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাজা হন। তাঁহার স্ত্রী রাধা কর্ণকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণের অপর নাম রাধেয় হয়।

(৭) রিপ লিংকন এ এক পাউণ্ড এবং ২৮ পাউণ্ড-এ এক কোয়ার্টার; অতএব ৫৬০ লিংকন-এ এক কোয়ার্টার।

(৪) হাকিণাস্তো লিঙ্কনের ধনি এবং লণ্ডায় মুক্তার খনি আছে।

(৯) ইটালীর প্রেসিডেন্ট মুসোলিনী এবং আমেরিকার সম্রাট রুজভেল্ট তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে সুলতান কেমাল পাশার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন।

(১০) দিল্লীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান শুত্তরাগর মোরাব-জীর কারখানায় সোডা ওয়াটার ও লেমনেডের জন্য প্রচুর সোডা ও লেমুন ব্যবহার হয়।

(১৪) কখনও অসম্ভব প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করা উচিত নহে ছাত্রের প্রকৃত অবস্থা লক্ষ্য করে, অথবা উত্তর দিবার চেষ্টা করে। যথা—

(১) ২৫ টাকা ১২ আনাকে ৭ টাকা দিয়া গুণ কর।

(২) একটি ত্রিকূজ অঙ্কিত কর যাহার বাহুগুলি ১০, ৫ ও ৪ সেন্টিমীটার।

(৩) He is good বাক্যে is শব্দ কোন্ লিঙ্গ?

(৪) "মৃগাল উবাচ" সন্ধি করিলে কি হয়?

(৫) Black Death বা Ilbert Bill কে ছিলেন?

(৬) আফগানিস্তান বা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সামুদ্রিক বন্দর কি?

(৭) একটি বাহুড় একবারে কয়টি ডিম প্রসব করে?

(৮) তোমার জেলায় অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের মাসিক বেতন কত?

(৯) মহত্তম শব্দ কোন্ ব্যুৎপত্তি হয়?

(১০) এলিজাবেথের স্বামীর নাম কি ছিল?

(১১) সমীকরণ সমাধান কর:—

$$(x+4)^2+x(x+1)-x(2x+3)+2(3x+3).$$

সমাপ্ত

শিশু ও শিল্প

[শ্রীমতী হারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়]

শিক্ষাই সভ্যতার মাপকাঠি। শিক্ষার দ্বারাই মানবিক জীবন উন্নততর, রাষ্ট্রীয় মান শক্তিশালী, দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বলতর এবং ভবিষ্যৎ বংশধর গণের জন্য আদর্শ স্থাপিত হইয়া থাকে। শিক্ষিত জাতিই জগতে সম্মানিত আসনে স্থান পাইতে পারে।

মানুষ যতই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে ততই সে শিক্ষাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছে। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে একথা আমরা উপলব্ধি করিতেছি যে আমাদের পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি ত্রুটিহীন ছিল না। পূর্বকালের শিক্ষা 'বিষয় কেন্দ্রিক' ছিল অর্থাৎ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করা হইত এবং তাহা শিশুর মনে গাঁথিয়া দিতে পারিলেই শিক্ষাদান কার্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইত। যে শিশু শিক্ষালাভ করিবে তাহার কথা কিছুমাত্র বিবেচনা করা হইত না। এই শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদগণ বহুপ্রকার মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের এক খ্যাতনামা শিক্ষক বলিয়াছেন

"give me the first five years of a child and I donot care for the rest." শিশুর জীবনারম্ভের প্রথম পাঁচটি বৎসর যদি আমি পাই তবে আর পরবর্তী সমস্ত জীবনের জন্য আমি চিন্তা না। কথাটা সত্যি, জীবনের গোড়াপত্তনই হইল সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। ফুলের কুঁড়ি অবস্থায় তাহাতে কীট প্রবেশ করিলে সে ফুলের বিকাশ হয় না। জীবনের সুখ সৌন্দর্য ঐশ্বর্য জীবনের উপভোগ সবই নির্ভর করে ছাত্রগণের জীবনধারার উপর। ছাত্রজীবনেই জীবনের গোড়াপত্তন। ভিত আল্‌গা থাকিলে তাহার উপর তৈরি যিনারও যেমন নড়বড় করে, একটা ঝড়ঝাপটাতেই পড়াইয়া পড়িয়া যায়, তেমনি মানব জীবনের ভিত যাহাদের দৃঢ় নয় পরবর্তী জীবনে লোহার ঠেকনোও তাহাদের পতনকে নিবারিত করিতে পারে না।

শিশুকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দেওয়াই বর্তমান শিক্ষাবিদগণের অভিমত। সুতরাং বর্তমানে শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বা শিশুকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। শিশুকে প্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। শিশুরা যেমন মাতৃস্তন টানিয়া লইয়া নিজেদের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে, তেমনি স্বভাবের ভিতর হইতে নিজেদের পঞ্চইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞানের উদ্রেকে সাফল্য লাভ করে। বার তের বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পুঁথিপড়া জ্ঞানলাভ অপেক্ষা এটা সেটা করিতে খেলিতে ভাঙিতে গড়িতে পরখ করিতেই ভালবাসে। শিশু অতি মাত্রায় চঞ্চল, তাহাকে তখন পুঁথি লইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলে অত্যাচারই করা হয়। স্বভাবের প্রতিকূলে তাহার বাহ্যিক পরিবর্তন বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। কাজেই তাহার স্বাভাবিক কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে সন্তুষ্ট ভাবে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে সে আনন্দের সহিত দ্রুত উন্নতি করিতে থাকে। আমেরিকার বিশেষ সমস্যা সমাধান প্রণালী ও রাশিয়ার মিশ্রপ্রণালী এই নীতিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ। ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনাও এই নীতিরই পরিপোষক।

অতিশিশু বয়সেই পারিপার্শ্বিকতার গুণাগুণ শিশুমনের উপর খুব বেশিরকম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পিতামাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও ভগ্নীদের আচার ব্যবহার, বাড়ীর ঝি, চাকরদের আচরণ, সঙ্গীদের কার্যকলাপ শিশুরা অতিমাত্রায় অনুকরণ করে এবং ক্রমশ সেই সকল ভাবধারায় তাহাদের জীবন গঠিত হইয়া উঠিতে থাকে। মানবজীবনের ভবিষ্যৎ সাফল্য অসাফল্যের অনেকখানি তাহাদের শিশু বয়সের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাহাদের এই সময়টার উপর অতি সাবধান দৃষ্টি রাখা অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য।

Photo shines by its own background চিত্রের সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভর করে তাহার পৃষ্ঠপটের উপর; তেমনি মানব জীবনের সৌন্দর্যও নির্ভর করে শিশু বয়সের পারিপার্শ্বিকতার উপর।

শিশু গল্প শুনিতে ভালবাসে সুতরাং তাহাকে গল্পের আকারে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। শিশু খেলা করিতে ভালবাসে সুতরাং তাহাকে খেলার মাধ্যমে নানারূপ কাজ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এইভাবে অভ্যাস গঠিত করিয়া, স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি ঘটাইয়া পরবর্তী জীবনের জন্য আহার্য অন্বেষণে তাহাদের উন্মুখ করা সহজ সাধ্য হয়। বয়স্ক লোকের ন্যায় শিশুকে জ্ঞান দান করা সম্ভব হয় না। কারণ বয়স্ক মানুষ যেভাবে চিন্তা করে, যে দৃষ্টিতে কোন বিষয় বা জিনিষ দেখে শিশু সেভাবে চিন্তা করে না, সে দৃষ্টিতে বিষয় বা জিনিষকে দেখে না। শিশু কেবল একটা ক্ষুদ্র মানুষ নহে। রুচি, শক্তি, প্রবৃত্তি, চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ের শিশু বয়স্ক ব্যক্তি হইতে পৃথক।

শিশুর ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়া এই যে শিক্ষা ইহাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। এবং এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা একটি মহৎ সাধন।

শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা বলিতে আমরা আজ বুঝি শিশুর ক্রমবিকাশের সঙ্গে হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ফ্রয়েল, পেষ্টালট্‌সি, ফ্রয়েবেল, মণ্টেসরি প্রভৃতি সমীহিষ্ণুদেরও ইহাই মত। হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদানই অধিকতর উপযোগী। ইহাতে শিশুর অবসরতা কাটিয়া আসে, সৃষ্টির আনন্দে আত্মশক্তির চেতনা জাগ্রত হয়, মানসিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হয় এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সৃষ্টিমূলক ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গুরুত্ব হিসাবে এই শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাই প্রথম স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। কোন এক বিশেষ হস্তশিল্পকে অবলম্বন করিয়া ও উহার মাধ্যমে মানসিক শিক্ষা ও কৃষ্টি সমগ্র শিক্ষাপরিকল্পনার গোড়ার নীতি। হস্তশিল্পটি মহৎ শিক্ষা দিলে চলিবে না, শিক্ষার্থীকে প্রতিপদে ও প্রতি স্তরে কার্যকারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান দিতে হইবে। শুধু পণ্য হিসাবে হস্তশিল্প শিক্ষা দিলে চলিবে না, ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। গান্ধীজির মতে এক অথবা একাধিক বৃত্তির মাধ্যমে বালক বালিকার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয় সর্বাধিক। কাজেই বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত পঠনীয় বিষয় বস্তু নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণ শিক্ষার সহিত হস্তশিল্পের আনুকূল্যে এবং উহার অগ্রগতির সহিত যুগপৎ অগ্রসর হইতে পারিলেই অধিক সুফলপ্রদ। মূল হস্তশিল্পের সহিত অন্যান্য জ্ঞানমূলক এবং রুচিমূলক বিষয়বস্তুর অন্বয়ী সম্পর্কই তদার্থী শিক্ষাপরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য। কোন না কোন হস্তশিল্প এই শিক্ষাপরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র বলিয়া ইহাকে বুনিয়াদী শিক্ষা বলা হইয়া থাকে।

শিক্ষার্থীকে প্রতিপদে প্রতিস্তরে কার্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হইবে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষায় ব্যয় কম এবং সময়ও কম লাগে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রকৃতি, শক্তি ও ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাদান করা হয়, তথাপি শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাই কার্যকরী। শিশু গল্পশোনা ও অভিনয় করা ইত্যাদি হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিতে ভালবাসে বেশি এবং স্বচেষ্টায় ও স্বইচ্ছায় কাজের মাধ্যমে যে কোন শিক্ষাই অতিশীঘ্র আয়ত্তে আনিতে পারা যায়।

শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রত্যেক শিশুকে হস্তশিল্প শিক্ষাদানের এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। ইহাতে শিশুরা যাহা শিখে তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইতে পারে। শিশু একজন ছোটখাটো স্রষ্টা—শিল্পশিক্ষাই তাহার এই স্রষ্টামনকে জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম।

বস্তুত প্রথম হইতে এইরূপভাবে একটা হস্তশিল্প শিক্ষাদান করিতে হইবে যেন পরে সে তাহা একটা বৃত্তি হিসাবেও অবলম্বন করিতে পারে।

কোন হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের প্রস্তাব সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কোন শিল্পের সহিত বিভিন্ন বিষয়ের সম্পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না—যেমন ইতিহাস, ভূগোলের সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা সম্ভব নয়। সুতরাং শিশুকেন্দ্রিক ও শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা পাশাপাশি দিলে একে অন্যের পরিপূরকরূপে কাজ করিবে।

উপরোক্ত মতবাদ বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে বাদ দিলে চলিবে না—কারণ প্রত্যেক শিশুর সম্বন্ধেই রুচি নাও থাকিতে পারে। কাজেই শিশুর রুচি অনুযায়ী, শিশুকে কেন্দ্র করিয়া শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই উত্তম। এইরূপভাবে শিক্ষা পাইলে শিশু আপনা হইতেই আপন প্রতিভায় বিকশিত হইয়া উঠিবে।

CALCUTTA UNIV. CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম ছি কল্যাণতৎ কশ্চিদ্ দুর্মতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | মাঘ ১৩৬০ | ৩য় সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষক ধর্মঘট

আমরা যাহা আশঙ্কা করিতেছিলাম, অবশেষে তাহাই হইল। শিক্ষকগণ ধর্মঘট করিয়াছিলেন। আমরা পৌষের সংখ্যায় বলিয়াছিলাম, শিক্ষকদের দাবি কতদূর মানিয়া লওয়া চলে কর্তৃপক্ষের তাহা বিশেষ সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়া দেখা দরকার ছিল। ধর্মঘট পর্যন্ত গড়াইবার আগেই সরকার কমিশন নিয়োগ করিতে বা ব্যাপক আলোচনা চালাইতে পারিতেন।

শিক্ষকগণ রাজপথে শুইয়া পড়িয়া সত্যাগ্রহ করিতেছেন, এ দৃশ্য আমাদের চোখায় যেন বাধে। তাঁহারা বলিতেছেন অন্য পন্থা না পাইয়াই এই পথে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতি শান্ত ভাবে, ধৈর্যসহকারে সত্যাগ্রহ চালাইতেছিলেন। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সংঘবদ্ধতা ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মর্যাদা আরও বড় জিনিস। মর্যাদার হানি না হয়। তাঁহাদের সম্পূর্ণ দাবি মিটিলেও যে বেতন ও ভাতা তাঁহারা পাইবেন তাহাতেও বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে দশজনের সমকক্ষ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা চলে না, ইহাতে হয়তো ন্যূনতম মান বাঁচানো চলিবে। কিন্তু অতি অল্প উপার্জন সত্ত্বেও শিক্ষাব্রতীর জীবন যে মর্যাদায় গৌরবে সাধারণের সম্মানের জিনিস ছিল, সে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় আমরা চিন্তিত বোধ করিতেছি।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে অবশেষে শিক্ষকেরা সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ধর্মঘট আন্দোলন স্থগিত রাখিলেন। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসুক, শিক্ষকদের দাবি স্বীকৃত হউক, শিক্ষা সঙ্কটমুক্ত হউক, জাতিগঠনের ভূমিকায় পাকা হউক। তাহাতে সকলেরই আনন্দ, সকলেরই লাভ।

শিশু উৎসব ও শিশু রংমহল

শিশু রংমহল নামে শিশুদের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বৎসর দুই যাবৎ বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, আপন হাতে খেলার গণ্ডি পাতার গাথা খেলা, জগৎ পারাবারের তীরে

ছেলেরা করে খেলা। শিশু ভগবান খোঁজে না, ছুটি কুড়াইয়াই ধন্য বোধ করে, ঢেলা মারিয়াই আপনার বিশ্ব রচনা করে। তাহার বিশ্বে যে হাসির ঢেউ ওঠে তাহারই ঢোলা নামে পরিচিত মানুষের মনের দুয়ারে, আর সেই ঢেউয়ের স্পর্শে প্রাপ্তবয়স্কের চিত্তমরু হইতে নির্গত রসের ধারা পৃথিবীর বুকে শান্তি সিঞ্চন করে।

এই শিশু রংমহল বাঙলা দেশের শিশুদের প্রিয় হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ হয়। ইহার উদ্যোগে প্রতি বৎসরের মত এবারও ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে ছয় দিন ব্যাপী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই আনন্দের উৎসব বিশেষ ভাবে শিশুদের। নাচে, গানে, অভিনয় সবই তাহাদের। শ্রোতা আর দর্শকও বেশির ভাগ শিশুরাই, তবে বড়রাও আছেন। এই উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছে শিশুদেরই একজন, সুধারী শর্মিলা ঠাকুর। কলিকাতার প্রায় সব ইস্কুলের শিশুশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা এই উৎসবে যোগ দিয়াছে, আর সকলেরই কিছু কিছু দেখাইবার আছে এই অনুষ্ঠানটি ছয়দিন ধরিয়া চলিল।

যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইহাতে যোগ দিয়াছেন, তেমনই বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের বাছা বাছা কতগুলি গল্প, কবিতা, কথাচিত্রকে সঙ্গীতে ও নৃত্যে রূপায়িত করা হইয়াছে। ইহাতে শিশুদের কাছে সাহিত্যসম্পদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। সুন্দর জিনিস দেখিব, সুন্দর কথা শুনিব ও বলিব, সংস্কৃতির এই তিনটি সাধন ইহাদের কাছে শৈশব ও কৈশোর হইতে সহজ আনন্দময় পরিবেশের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইবে।

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সঙ্গীত কলা ছেলেমেয়েদের চরিত্র বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য অঙ্গ। শরীর, মন ও বুদ্ধি সুসমঞ্জস ভাবে চালিত করা সহজ কাজ নয়, কিন্তু এই সব সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ফলে শিক্ষকগণ শিশুদের প্রতিভা ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতে পারিবেন, সম্মান দিতে পারিবেন, তাহাদের দেশের ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

শিশুচিত্র প্রতিযোগিতা

বাঙালী তথা ভারতবাসী সকলেই আজ শঙ্করের বাঙ্ময় চিত্র ও সেই সঙ্গে শঙ্করের শিল্পানুরাগের সহিত পরিচিত। এই স্বনামখ্যাত শ্রীশঙ্করের উদ্যোগে দিল্লী সহরে কিশোর ও শিশুদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এক চিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। প্রথম প্রথম নির্দিষ্ট বয়সের শিশুরা তাহাদের অঙ্কিত চিত্র শঙ্করের নিকট পাঠাইয়া দিত, পরীক্ষকগণ বিচার করিতেন। ক্রমে নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষকগণের সমক্ষে এই প্রতিযোগিতা পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এখন এই আয়োজন আন্তর্জাতিক এক বিচার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। দেশবিদেশের শিশুরা তাহাদের কৃতিত্বের নমুনা পাঠায়। এই বৎসর কলিকাতা রাষ্ট্রভবনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের বহু শিশু এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছে।

শিশুমনীষার অপূর্ব পরিচয়ে, শিশুপ্রতিভার বিপুল সম্ভাবনায় বিচারকগণ বিস্মিত, দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, পরীক্ষক, বিচারক, শিক্ষক কেহ শিশুকে বিষয়নির্দেশের গণ্ডী টানিয়া দেন নাই। বরং তুলি পট সবেরই ব্যবস্থা ছিল, শিশুরা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায়, অন্তরের প্রেরণায় ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে, বিচারক শিশুর নিজস্ব সত্তার বিকাশের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। বয়সের অনুযায়ী শ্রেণী ভাগ করা ছিল—সেই অনুসারে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন অনুসারে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ বাহিনাযুক্ত ও সর্বক্ষণের জন্য হইয়াছে। সিনেটের নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে দুই জনের ও বাহির হইতে একজনের, এই

মোট তিনটি নাম নির্বাচন করিয়া চ্যান্সেলারের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে, তিনি ইহাদের মধ্যে একজনকে মনোনীত করিবেন, ইহাই হইল নূতন নিয়ম।

নূতন সিনেটের সদস্যগণ তিন জনকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিন জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও সুযোগ্য ব্যক্তি। আমরা প্রেসে যাওয়ার সময় খবর পাওয়া গেল, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। আমরা ডাঃ ঘোষকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি, তাঁহার পদাধিকার কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে।

মৌলানা আজাদের অভিভাষণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার :

দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শ বোর্ডের বার্ষিক অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহার কয়েকটির প্রতি আমরা শিক্ষা-ব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দেশের আজ যে অবস্থা, তাহাতে শিক্ষার ইতিহাসে নূতন যুগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই সিদ্ধান্তগুলি অনতিবিলম্বে কাজে পরিণত করেন তবে আশার কথা, সন্দেহ নাই। রাধাকৃষ্ণন কমিশনের অনুমোদনগুলি বহু পূর্বেই গৃহীত হইতে পারিত।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠন, শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষা-বিধি, পাঠ্যক্রম, ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব, শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে এই কমিশনের নির্দেশগুলির দিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের পড়ার সুবিধার জন্য বৃত্তিদান, এই দুইটি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ মনোযোগ দেন, ইহাই সমাজের মঙ্গল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন উপদেষ্টা বোর্ডের মতে ২০০৲ ধরা হইয়াছে, আমরা আশা করি রাধাকৃষ্ণন কমিশনের মতে যে সব ক্ষেত্রে ২৫০ টাকার বেশি ধরা হইয়াছিল, তাহাতে ঐ কমিশনের অনুমোদনই মানিয়া লওয়া হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন, প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসরে অন্তত একশত জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবে। শতকরা হিসাবে এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় বৎসরে একশত ছাত্র এমন কিছু বড় সংখ্যা নয়, তবু মন্দের ভাল বলিতে হইবে। অন্যান্য দেশে ছাত্রছাত্রী পড়ার যে সব সুযোগ পায়, ক্রমে আমাদের দেশেও যেন ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তাহা সম্ভব করিয়া তোলা হয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির আর্থিক অবস্থার কথাও মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া কলেজগুলি ছাত্রবেতনের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর না করিয়া চলিতে পারে, সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। বেসরকারি কলেজগুলিতে আর্থিক স্বাধীনতা থাকিলে ছাত্রদের লেখাপড়া ও নিয়ম শৃঙ্খলা উন্নয়ন দিকেই কার্য পরিচালনা করার সুবিধা হইত।

শিক্ষক জীবনী

শিক্ষকদের জীবনকথা আমরা শিক্ষায় কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। সেই সব হইতে ভবিষ্যতের পথের সন্ধান কি পাওয়া যাইবে তাহা দেখিতে চাই। আশা করি এ বিষয়ে আদর্শ শিক্ষকদের প্রাক্তন ছাত্রেরা তাঁহাদের শিক্ষকদের জীবনকথা লিখিয়া আমাদের সহযোগিতা করিবেন।

———

শিক্ষক ও সংস্কৃতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অস্ওয়াল্ড্ স্পেংলার (Oswald Spengler) জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে। তাঁর মৃত্যু তারিখ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে। জার্মানীর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত, ইতিহাস, আর্ট ইত্যাদি অধ্যয়নের পর তিনি হাইস্কুলের শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। যেবই লিখে তিনি বিশ্বব্যাপিনী খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন তার নাম Decline of the West. ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বই-খানির রচনার কাজ শুরু হয়; বই প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। Decline of the West বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতসমাজে সাড়া পড়ে গেল। এর পূর্বে তিনি ছিলেন একজন অখ্যাতনামা শিক্ষকমাত্র; তাঁর কোন পরিচয় ছিল না জনসাধারণের কাছে। বিদ্বৎসমাজও তাঁকে জানতো না। আর যে মতবাদ তিনি প্রচার করলেন তার নাম হতাশার মত। Decline of the West শুধু হতাশার সুরে ভরা নয়, তা বোঝাও কঠিন। শুধু দেখা গেল কয়েক বৎসরের মধ্যে লক্ষাধিক হাজারেরও বেশি বই বিক্রী হয়েছে, বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদও বেরিয়েছে, বইখানিকে কেন্দ্র করে আলোচনার অন্ত নেই। Sorokin তাঁর Social Philosophies of an Age of Crisis-এ এই উপাদেয় বইখানির সম্পর্কে লিখেছেন, It catapulted an unknown high-school teacher into the ranks of the century's most influential, social thinkers. যে ব্যক্তি উচ্চ বিদ্যালয়ের অখ্যাত শিক্ষক ছিলেন এই বই-খানি লেখার ফলে তিনি শতাব্দীর মনীষীদের অগ্রণীদের মধ্যে পরিচিত হলেন।

Decline of the West-এ স্পেংলার বলেছেন; প্রত্যেক সংস্কৃতিরই (culture) একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ তার আর্টে এবং বিজ্ঞানে, তার চিন্তাধারায় এবং কর্মধারায় স্বকীয়তায়, তার বিজ্ঞানে এবং এবং দর্শনে, তার সৃষ্টিতত্ত্বিদ্যার বাস্তবে। একটা বিশেষ বিরাট সংস্কৃতি তার প্রাণের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে। ইতিহাসে যে সব বড়ো বড়ো সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে স্পেংলারের মতে তাদের প্রত্যেকে অদ্বিতীয়, অনুপম, অননুকরণীয়। তাদের একের ভাষা অন্যের কাছে দুর্বোধ্য।

কাল্চার সম্পর্কে স্পেংলার আর একটা কথা বলেছেন। কোন কাল্চারই অমর নয়। তার জন্মমুহূর্ত আছে, তার বিকশিত যৌবন আছে, তার মৃত্যুও আছে। স্পেংলার বলছেন: Every culture passes through the age phases of the individual man. Each has its childhood, youth, manhood and old age. ব্যক্তির জীবনে যেমন শৈশব আসে, যৌবন আসে, বার্ধক্য আসে—সংস্কৃতির বেলাতেও তেমনি।

স্পেংলারের মতে কাল্চারের প্রকাশ ফুলের বিকাশের মতো। ফুল যেমন সাথে সঙ্গেই আপনাকে বিকশিত করে তুলে ধরে, কাল্চারের প্রকাশও তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। কাল্চারের মধ্যে একটা জাতির প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। স্পেংলার বলছেন: কাল্চার অন্তরে একটা জাতির আত্মার মনোজগতের স্বর্গ উষার। কাল্চারের মধ্যে একটা মহাজাতির প্রাণপুরুষের জ্যোতির্ময় অভিব্যক্তি। অন্তরের মধ্যে সে একটা রূপ নিয়ে

জেগে ওঠে আপনার স্বতন্ত্র মহিমায়। সীমার বন্ধনের মধ্যে অসীম আত্মা ধরা দেয়। সেই রূপের এবং অসীমের মূর্ত প্রকাশ কাল্‌চারে। বিকাশের মধ্যাহ্ন শেষ হয়, কাল্‌চারের সূর্য পশ্চিম আকাশে চলতে থাকে, জাতির প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে, পরিশেষে এমন দিন আসে যখন the fire in the culture's soul dies down, it enters its last phase —that of Civilisation. সেই দুর্দিনের অন্ধকারে নিষ্প্রাণ জাতির মর্মের মণি কোঠায় অনুদ্ভিন্ন সংস্কৃতির যে হোমানল তার শিখা। তখন সংস্কৃতির চিতাভস্মের উপরে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় সভ্যতা তার বাহিরের আড়ম্বরগুলির প্রগল্‌ভ ঐশ্বর্য নিয়ে। স্পেংলার বলছেন: Every Culture has its own Civilisation. The Civilisation is the inevitable destiny of the Culture. প্রতিটি সংস্কৃতির একটি নিজস্ব সভ্যতা আছে। সংস্কৃতির অনিবার্য পরিণতি সভ্যতায়।

স্পেংলারের মতে সংস্কৃতির আর সভ্যতার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সংস্কৃতির মধ্যে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় প্রকাশ, সভ্যতার মধ্যে সেই প্রাণের মৃত্যুর কঠিনতা। সংস্কৃতির মধ্যে জাতির অন্তরাত্মার সম্প্রসারণ, সভ্যতার মধ্যে সেই আত্মার সংকোচ। সভ্যতার মধ্যে আসে বুদ্ধির যাদুত্ব, মনস্তত্ত্বের স্পর্ধা। সভ্য মানুষ অস্বীকার করেছে মাটী-মায়ের স্নিগ্ধ কোল, অস্বীকার করেছে প্রাণের আহ্বান। প্রাণকে অতিক্রম করে তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে টাকা। অভিজাতের মাথায় প্রসূন হয়ে সে নির্মাণ করছে পাষাণে তৈরী বিরাট বিরাট শহর। গ্রামের পর গ্রামকে শোষণে রক্তহীন করে শহরগুলো বাড়িয়ে চলেছে তাদের মেদবহুল কলেবর। সভ্যতার যুগে যান্ত্রিক সংগ্রামের সঞ্চার করে সাম্রাজ্যবাদ চারিদিকে বিস্তীর্ণ করছে তারলৌহবাহু। কালচারের যুগেও যন্ত্রাক্ত সংগ্রামের অভাব নাই। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে উচ্চারিত হচ্ছে গীতার মৃত্যুহীন শ্লোক। সেই সংগ্রামের মধ্যে আছে আদর্শবাদ। এখনকার লড়াই শুধু দুনিয়ার বাজার দখলের জন্যে।

তাহলে আমরা দেখি—শিক্ষক সংস্কৃতির বাহন, সভ্যতার নয়। শিক্ষকের আহ্বান জাতির মর্মের রক্তধারার কাছে, ভোগবাদের কাছে নয়। শিক্ষকের সাধনাকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠে জাতির অন্তরাত্মা।

স্পেংলারের Decline of the West সত্যসত্যই একখানা পড়বার মতো বই। তাঁর মতের সঙ্গে মতের আমাদের মিল না হতে পারে। কিন্তু মানুষের ইতিহাসকে যে দৃষ্টি ভঙ্গিমা নিয়ে তিনি দেখেছেন তার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। বই পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়, বিদ্যাসাগর বলতে স্পেংলারের মতো পণ্ডিতকেই বোঝায়। কত বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন! বিজ্ঞান, গণিত, রাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, অর্থনীতি, ধর্ম —কোন কিছুই বাদ যায় নি। অথচ স্পেংলার ছিলেন বিদ্যালয়ের একটি শিক্ষকমাত্র।

একটি দিনের কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

কিছুকাল যাবৎ প্রত্যেকটি রবিবারই কলিকাতার বাহিরে কোথাও-না-কোথাও যাইতে হইতেছে। এইরূপ একটি রবিবারের কথা এখানে বলিব।

৩রা ফাল্গুনই, ১৯৫৪ সাল। কলিকাতার দশ-বার মাইলের মধ্যে দুইটি স্থানে গিয়াছিলাম। একটি শিয়ালদহ হইতে বনগাঁ লাইনে মধ্যগ্রাম ষ্টেশনের নিকটবর্তী নব ব্যারাকপুর কলোনী, ইহার পরে ঐ দিনই মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ কাটে গঙ্গাতীরে এড়িয়াদহ—ডাকনাম 'এড়েদা' গ্রামে।

নব ব্যারাকপুর কলোনী উদ্বাস্তুদের দ্বারা অধ্যুষিত একটি পল্লী। আজকাল কলোনী কথাটার খুব চল। আগেকার পরিভাষায় কলোনী খুব ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইত। ইংরেজ জাতির কলোনী বা উপনিবেশ প্রথমে ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, এখনও আছে কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়া। তখন ডোমিনিয়ন বা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস কথাটির উদ্ভব হয় নাই। কলোনী বা কলোনিয়াল গবর্নমেন্ট বলিতেই কতকটা স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার কথা বুঝা যাইত। এখন 'কলোনী' অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। কোন নূতন অঞ্চলে অল্প কিছু সংখ্যক লোক একত্রে বসবাস করিলেই তাহাকে এক একটি কলোনী বলা হয়। ভারত-বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান হইতে লোকজন আসিয়া এইরূপ বহু কলোনী স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছেন।

এই নব কলোনী হইতে নব ব্যারাকপুর কলোনীর অনেকটা বৈশিষ্ট্য আছে। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ বিশ্বাসের ঐকান্তিক চেষ্টায় সমবায়-প্রথায় প্রতিষ্ঠিত। গত তিন-চার বৎসরের মধ্যেই এই কলোনী বা পল্লীটি কি চমৎকার গড়িয়া উঠিয়াছে। চার বৎসর পূর্বেও এই পথে যাঁহারা যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন এখানকার বাঁশবেড়ে ও বনজঙ্গল। এসব অঞ্চল বারাসতের সন্নিকট; এক সময়ে খুবই স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল এবং লোকজনের বসবাস ছিল প্রচুর। গত শতাব্দীতে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী বন পরিষ্কারে ইহাকে একেবারে উজাড় করিয়া দিয়া যায়। তখন প্রায় জনমানবশূন্য হইয়া এ অঞ্চল জঙ্গলে পূর্ণ হয় এবং বন্য জীবজন্তুর আবাসস্থল হইয়া উঠে। আজ এই অঞ্চলে আর বনজঙ্গল নাই, লোকালয়ে পূর্ণ, জনসমাগমও বিস্তর। একটি সুন্দর শহর বা সুসজ্জিত পল্লী গড়িয়া উঠিতে আর বুঝি বিলম্ব নাই।

যাক্, আমি এখানে নব ব্যারাকপুর কলোনীর ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। যে উপলক্ষ্যে গিয়াছিলাম তাহাই এখন লিখিব। এই নূতন পল্লীতে দুইটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের জন্য। এই দুইটি বিদ্যালয়েরই প্রতিষ্ঠা-দিবস ছিল ঐ দিনটি। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক ও নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সমাবেশে সভা বেশ জম-জমাট হইয়া উঠে। সভার যারা বিশেষ কর্মকর্তা ছিলেন—যেমন দুই-জন শিক্ষককে বিদায়ী মানপত্র এবং উপহারাদি প্রদান—প্রথমে সম্পন্ন হইল। তাহার পর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষ্যে আমাকেও কিছু বলিতে হইয়াছিল। মাত্র কয়েক মিনিট আমি বলি। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস, কাজেই

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছিল।

বালক বালিকাদের প্রকৃত শিক্ষাদান যে জাতিগঠনের প্রথম ধাপ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সমবায়ীত যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রত্যেক দেশে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এই একই উদ্দেশ্যে। আমি আধুনিক, অর্থাৎ ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকের শিক্ষা-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক দিকটি লইয়া বহু বৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছি। গত দেড়-শত বৎসরের মধ্যে আমাদের শিক্ষাদান প্রণালীর বহুই না ছোট-বড় অদল-বদল হউক, যাঁহারা এইরূপ অদল-বদল করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই এরূপ করিয়াছেন। ইহাতে জাতির সামগ্রিক মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় নাই, সাময়িক ভাবে বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই এইরূপ করা হইয়াছিল। কাজেই ইহাতে জাতির মঙ্গল আদৌ আশানুরূপ হয় নাই। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি আজ সাত বৎসর, কিন্তু এখনও জাতি-গঠনের প্রথম ধাপ শিক্ষার সংস্কারের কোন চেষ্টা দেখি না। যে চেষ্টা হইতেছে তাহা পরীক্ষার পর্যায় হইতে বাস্তব জীবনের কাছাকাছিও এখন পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। আর এই সব পরীক্ষার পিছনে কি কম অর্থ, সময়, সামর্থ্য ব্যয় হইতেছে?

বড়ই ভাবি তাই একটি কথা বড় বেশি করিয়া মনে হয়। আমাদের স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু যে মানুষগুলি দাসত্ব স্বীকার করিয়া সেই মনোভাবেই পুষ্ট হইয়াছিল তাহারা তো আর চলিয়া যায় নাই। আবার এই দাসত্বের ধ্বজাবাহীরাই এখনও রাষ্ট্রের কর্ণধার-রূপে বিরাজ করিতেছেন। সোনার পাথরের বাটি যদি-বা কল্পনা করা যায়, তথাপি স্বাধীন ভারতে পরাধীনতার ধ্বজাবাহীরা রাষ্ট্রের নিয়ামক হইবে, এটি কল্পনার অতীত! কিন্তু আজ তাহাই হইয়াছে। একটি কথা বলি। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ও তাহার পরবর্তী দুই তিনটি দিন সাড়ম্বরে স্বাধীনতা-উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল অনেকেরই মনে আছে।

আমাদের আপিসের নিকটেই পুলিশ ডেপুটি কমিশনারের আপিস। পতাকা উত্তোলনের পর পুলিশ আপিসের সম্মুখে গিয়া দেখি, পুলিশের বুকে জাতীয় পতাকার চাকতি, জাতীয় পতাকার ব্যাজ! আনন্দ খুবই হইল, কিন্তু মনের কোণে একটু সন্দেহও উঁকি-ঝুঁকি যে না মারিয়াছিল তাহা নয়। অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আগষ্ট বিপ্লব—চোখের সামনে এই কয়টি স্বাধীনতা আন্দোলন চলিয়া গিয়াছে, পুলিশের অত্যাচার-অত্যাচার লাঠিচার্জ কতই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সামরিক বাহিনীর কেরামতিও কতই না দেখা গেল। কিন্তু রাতারাতি একি পরিবর্তন! তবে বাস্তবিকই কি মনের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল? মহাত্মা গান্ধী যাহাকে বলিতেন—'change of heart' বা 'হৃদয়ের পরিবর্তন'? আমি একটি বিভাগের কথা বলিলাম। এইরূপ সরকারী অন্যান্য বিভাগেরও কি সত্যকার মনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে? আমরা আদর্শ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িতে চাই। কিন্তু যাহাদের হাতে রাষ্ট্র গঠনের ভার, তাহাদের অনেকেরই মনে কি আদর্শের স্পষ্ট রূপ এবং স্বাধীন প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে? যদি সত্যই জাগিয়া উঠিত তাহা হইলে পরাধীনমনস্কতার এতটা প্রাবল্য দেখা যাইত না।

এখানে শিক্ষার কথাই আর একটু খোলসা করিয়া বলি। মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। বহু চিন্তার ফল এই বুনিয়াদী শিক্ষা। গত দেড় শত বৎসরের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমরা কেরানী ও 'বাবু' হইয়াছি, মানুষ হই নাই। স্বল্পায়াসে সকল পয়সার লোভে চাষী, জেলে, কামার, কুমোর, ধোপা-নাপিত, ছুতার-মিস্ত্রী, তাঁতী-মিস্ত্রী

ক্রমশ ইংরেজী শিখিয়া নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে, চাকরীর জন্য সংকোচী ও সওদাগরী আফিসের দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিতেছে। এখনও ইহার পরিবর্তন দেখিতেছি না। ইহার প্রধান কারণ—আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া মোটেই উহার সংস্কার সাধন হইতেছে না। বর্তমান যুগে শিক্ষার মূলকথা—সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা। ভাল কথা। মেধাবী ছাত্র, বুদ্ধু ছাত্র—সে সমাজের যে কোন স্তরেই হোক উচ্চতম সোপানে আরোহণ করুক, রাষ্ট্রের উচ্চতম পদও তাহার করায়ত্ত হউক, কিন্তু সাধারণের জন্য বৃত্তি অনুগ শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। এই বৃত্তি-অনুগ শিক্ষার চল বংশ-পরম্পরায় ছিল বলিয়া ভারতীয় সমাজ বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও টিকিয়া আছে। মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষার বুনিয়াদ ভারতের এই সমাজ-ব্যবস্থা। কিন্তু এখনও এই বুনিয়াদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-বিস্তার সুরু হইয়াছে কি? কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা এই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করিবেন তাঁহারা যে প্রায় সকলেই পুরানো আমলের পুরানো সরকারী ঘাঁচে গড়া মানুষ।

এখন সেদিনকার কথায় আসা যাক। সেদিন উপস্থিত ভদ্রমহোদয়ের নিকট শুধু এই কথাই নিবেদন করি যে, পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল অধিবাসীরা যখানে যেমন নূতন দেশ বা পল্লী গড়িতে লাগিয়াছেন তেমনি ওখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও যেন নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় শুধু যেখায়-সেখায়ই বৃদ্ধি পাইবে, অথবা আন্দোলন-কারীরাই বল পুষ্ট হইবে। কারিগর, মানসিক এবং নৈতিক শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যাহাতে আমাদের ছেলেরা জীবিকা অর্জনের জন্যও উপযোগী হইয়া উঠে। দুই-একটি দান দিয়া তাহারা শুধু চাকুরিরই উমেদার হইবে—এরূপ শিক্ষা হইতে আমরা যেন শত হস্ত দূরে থাকি। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের প্রবন্ধনাথ বসু মহাশয়ের *Illusions of New India* বা 'নয়া ভারতের আলেয়া'র দিকে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রাথমিক, উচ্চ, বা গিরি—কত রকম শিক্ষার জন্যই আমরা মাতিয়াছি। কিন্তু তাহার ফলে দেশের নাড়ীর যোগ স্থাপিত হইয়াছে কতটুকু? যে যে ধরনের শিক্ষায় দেশের আপামর সাধারণের জীবন ও জীবিকার সন্ধান মিলে, তাহা আমরা ত্যাগ করিয়া কতকগুলি চোখধাঁধানো পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছি। ইহাকেই চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রবন্ধনাথ 'আলেয়া' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। শিক্ষাবিদ্, রাষ্ট্রচালক এবং জনসাধারণ সকলেরই এই আলেয়া ছাড়িয়া বাস্তবকে স্বীকার করার এবং তদনুযায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব স্বাধীন ভারতে শতগুণ সহস্রগুণ বাড়িয়াছে। একথা কে অস্বীকার করিবে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা বহুদূরে হইয়া থাকিতে চাহিলেই পারিব না। কিন্তু তাহার সঙ্গে সমানে চলিতে হইলে প্রত্যেকটি অধিবাসীর যে শরীর মন ও নীতির দিক হইতে যোগ্যতা অর্জন করা দরকার।

২

এবিন মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ কাটাই কলিকাতা হইতে চার ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী এড়িয়াদহ বা এড়েদা গ্রামে। অনেক ভাষাবিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—'দহ' কথাটি দ্রহ হইতে আসিয়াছে। তবে 'ডিহি' শব্দ হিন্দী 'ডিহ্' হইতেই আসিয়াছে মনে হয়। যেমন—গিরিডি, জামিডি প্রভৃতি। বাংলারও 'ডিহি' শব্দ আছে, যেমন ডিহি, ডিহি-শ্রীরামপুর প্রভৃতি। 'এড়িয়াদহ' শব্দটির 'দহ'ও ডিহি হইতে আসা সম্ভব। এই সূত্রে খড়দহ, ভুমুরদহ, চক্রদহ (চাকদা) শব্দগুলিও উৎপন্ন। এড়িয়াদহ অতি প্রাচীন গ্রাম, গঙ্গাতীরে অবস্থিত। বিশ্রাম, জনযোগ, গঙ্গাস্নান, মধ্যাহ্ন ভোজন,

ব্যবস্থিতি দর্শন হইল। ঘোষাল-পরিবারের আতিথ্য ও আপ্যায়নে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রবেশকার্য কয়টি দিবস আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলিব।

আমাদের প্রথমেই বৈষ্ণবচূড়ামণি গদাধর দাসের মন্দির দেখিতে গেলাম। এই মন্দিরটি বেশি পুরানো নয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত। শুনিলাম, পূর্বমন্দির জরাজীর্ণ হওয়ায় তাহার স্থলে এই নূতন মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের সেবায়েত কলিকাতার বলাইচাঁদ মল্লিকের বংশধরগণ। নূতনের সম্মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একখানি সুপ্রাচীন চিত্র—অনুমান চারি শত বৎসরের—সেবায়েতের বৈঠকখানায় টাঙানো দেখিলাম। এই খানির একটি প্রতিলিপি করাইয়া দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' দিয়াছেন। মন্দিরের পশ্চাতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গদাধর দাসের সমাধি এখনও বিদ্যমান। প্রস্তরের সমাধি, জায়গায় জায়গায় ক্ষয় ধরিয়াছে। এটিও শুনিলাম, অন্তত চারি শত বৎসরের পুরাতন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য ছিলেন গদাধর দাস। তাঁহার আদেশে নীলাচল হইতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে গদাধরদাস ও রামদাস গৌড়ে প্রেমধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে আগমন করেন। গদাধর গঙ্গাতীরে এড়িয়াদহে স্থিত হন। এখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আসিয়া 'রাসলীলা' করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত উভয় গ্রন্থেই গদাধর দাসের সাক্ষোল্লেখ পাই। শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে এখানে কয়েক পঙ্‌ক্তি প্রদত্ত হইল :

"ভাগীরথীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্বত্র করেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥

• • • •

একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তান প্রীতি করিবার তরে॥

গৌরাঙ্গে গদাধর দাস মহাশয়।
হইলা আবেশে অতি পরমানন্দময়॥

• • •

দুকূলে শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
রাসখণ্ড নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে॥

• • • •

এই মত কতোদিন প্রেমানন্দ রসে।
গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বসে॥
যাহা আছি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি হরিবোল বোলায় সভারে॥"

(অন্ত্যখণ্ড, ৫ অধ্যায়)

"বৃহৎ বৈষ্ণবাভিধান"-প্রণেতা অনুসন্ধানের ফলে উক্ত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, "গদাধর দাস বড়ই তেজস্বী ভক্ত ছিলেন। একদিন বঙ্গাধিপের মুসলমান কাজীর নিকট গমন করত তাঁহাকে গ্রন্থ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করেন। এবং তাঁহারই কৃপাতেই উক্ত কাজী হরিনামপরায়ণ হন ...দাস গদাধরের সেবাপাট, রাসলীলা ক্ষেত্র, গদাধর ভজন ও গদাধরের সমাধি-বেদী এড়িয়াদহে বর্তমান আছে।" এটি বর্তমানে বৈষ্ণবদের একটি পরম তীর্থ। শুনিলাম, এখানে বৈষ্ণব উৎসবাদি যথারীতি পালিত হইতেছে।

এড়িয়াদহে উচ্চ বালক-বালিকা বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, মাতৃসদন প্রভৃতি রহিয়াছে। অপরাহ্নে শেষোক্ত দুইটি দেখিবার সুযোগ ঘটিল। প্রসূতিসদনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গদাধর ওপার হইতেও বহু প্রসূতি এখানে আসেন। চটকলের জন্য দুইটি 'বেড' সংরক্ষিত আছে। সর্বশেষে গ্রন্থাগারে যাই। তখন সূর্য প্রায় অস্তদিগন্তে, চারিদিকে একটা প্রশান্তি বিরাজ করিতেছিল। বন্ধুবর শৈলেনবাবু আগেই বলিয়াছিলেন, গ্রন্থাগারে একটি সভার অনুষ্ঠান হইবে। গ্রন্থাগারটি ছোট, কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন। অল্প সময়ের মধ্যে যতটা চোখে পড়িল, দেখিলাম বাংলা ও

ইংরেজী ভাল ভাল ক্লাসিক এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুস্তক এখানে রহিয়াছে। আজকাল চটকি নাটক-নভেলের যুগ। এত সব গুরুগম্ভীর বইয়ের পড়ুয়া এখানে নিশ্চয়ই রহিয়াছে, ভাবিয়া সুখী হইলাম। একটি আলমারির মাথায় কতকগুলি পুথি স্তূপীকৃত দেখিলাম। এগুলির মধ্যে মূল্যবান্ কি কি পুথি আছে, কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিকে লইয়া গিয়া যাচাই করানো প্রয়োজন। পুরাতন গ্রাম আড়িয়াদহ, এখানে শাক্ত-বৈষ্ণব বিরল পণ্ডিত-প্রধান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পুথির ভাণ্ডারও এখানে রহিয়াছে। কলিকাতার বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র যে কেন এদিকের খোঁজখবর লন নাই তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য হই।

বৈকালিক অনুষ্ঠানটির কথা এখন বলি। ছোট্ট গ্রন্থাগার, ছোট্ট সভা। কিন্তু এখানে আসিয়া একজন নিষ্ঠাবান কর্মীর পরিচয় পাইলাম। তিনি বর্ষীয়ান। তাঁহারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সভা। তাঁহার নাম জীবনধন মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠাবধি পঞ্চাশ বৎসর কাল তিনি গ্রন্থাগারিক রূপে ইহাকে আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপালিটিতে সামান্য চাকুরি করিতেন। অবসর সময় প্রায় সবটাই তিনি গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করিতেন। পূর্বকালে পল্লীতে পল্লীতে এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁহারা লোকসেবাকেই জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। এখন জীবন-সংগ্রাম বাড়িয়াছে, আমাদের চিন্তা-ধারারও রূপান্তর আসিয়াছে। আজকাল এরূপ লোক বিরল। কিন্তু ইঁহারাই সমাজকে বাঁচাইয়া রাখেন। দেহ মন ত্যাগী মহতের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"Ye are the salt of the earth"—আপনারাই পৃথিবীর লবণ। লবণ ব্যতিরেকে তরকারির স্বাদ হয় না, সেবাব্রত ত্যাগী লোক না থাকিলে সমাজ বা পৃথিবী মনুষ্যবাসের যোগ্য হয় না। জগতে এরূপ লোক আছেন বলিয়াই তো ইহা মনুষ্যবাসের উপযোগী। জীবন-ধনের জীবন-কথা শুনিয়া এই কথাই বারবার মনে হইয়াছে। এখনও এরূপ লোক আছেন, তাই সমাজ টিকিয়া আছে। হয়তো আধুনিক চোখ-ঝলসানো সভ্যতার অন্তরালেই তাঁহারা কাজ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা আছেন। তাঁহাদের কথা বই পুথিতে ছাপার হরফে হয়তো পাইব না। কিন্তু তাঁহারা মনুষ্যসাধারণের জীবনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাত্ম হইয়া রহিয়াছেন—অমর হইয়া আছেন। গ্রন্থাগার ও জীবনধনের পল্লীকে শত-সহস্র প্রণতি জানাই। সাহিত্যিকদের মধ্যে কত কথার কচকচি, বিরোধ, বিবাদ-বিসম্বাদ। কিন্তু গ্রন্থাগারে সকলই মিলিত। মিলন এখানকার ধর্ম। দেবদীপার কালিদাস পাশাপাশি বিরাজ করিতেছেন। মিলন-প্রীতি-সেবা—গ্রন্থাগার এ সমুদয়েরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকে। জীবনধন এই আহ্বান শুনিয়াছিলেন। আমরাও যেন এই আহ্বান শুনি। একই দিনে নূতন পুরাতনের সঙ্গ করিয়া সারাদিন গৃহে ফিরিলাম।

২৭-১-৫৩

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হাতের লেখা

শ্রীকণা সেনগুপ্ত

সাধারণত বিদ্যালয়ে হাতের লেখা বলতে যান্ত্রিকভাবে লেখা বোঝায়, যেমন বিশেষ একটি ঘণ্টান্তে আদর্শ লিপি দেখে অথবা ব্ল্যাকবোর্ডে মাষ্টারমশাইয়ের লেখা একটি লাইন দেখে নিজ নিজ খাতা বা শ্লেটে তার নকল করা। এভাবে লেখায় চেষ্টার দিয়ে শিশু নিজের মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ পায় না, অথবা হস্তলিপির সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এভাবে খুব সাহায্য করা সম্ভব হয় না। অবশ্য ভাবপ্রকাশের ক্ষমতালাভে সাহায্যের জন্য রচনা লিখবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু তাতেও বিষয়বস্তু নির্বাচন এমনভাবে করা হয় যাতে চেষ্টার দিয়ে ভাবপ্রকাশের বদলে তথ্যসংগ্রহের বেশি সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এজন্য দেখা যায়, শিশুরা যান্ত্রিকভাবে যতটা লিখতে শেখে, সহজ মনের ভাবকে স্বাভাবিক ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা তাদের ততটা হয় না। প্রথম থেকেই শিশুকে বাস্তব ও অর্থপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখতে দেওয়া উচিত। এজন্য দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম খেলাধূলা ইত্যাদি যার সাথে শিশু বিশেষ ভাবে জড়িত, এ রকম বিষয়বস্তুকেই লিখবার বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচন করা প্রয়োজন। শিশু যেন লেখাকে আত্মপ্রকাশের একটা স্বাভাবিক উপায় বলে বুঝতে শেখে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তাই হাতের লেখার জন্য নানারকম বিষয় নির্বাচনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

প্রথম শ্রেণীতে শিশুরা যখন প্রথম লিখতে শেখে সে সময় তাদের হাতের লেখার সৌন্দর্য বা বিশুদ্ধির প্রতি প্রখর দৃষ্টি দেওয়া ঠিক নয়। স্বাভাবিক ভাবে তারা যাতে নিজেদের প্রয়োজনীয় এবং আগ্রহের বিষয় সম্বন্ধে লিখতে শেখে এজন্য দৃষ্টি রাখতে হবে তাদের কাজ কর্মের উপর, এবং বিষয় নির্বাচন করতে হবে তার থেকেই।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর শিশুরা দিনের কাজের প্রথমে কি মাস, কি বার, কত তারিখ ইত্যাদি বলে তাদের কাজ আরম্ভ করে। দিনটা কেমন, রোদ উঠেছে, মেঘ করেছে, না বৃষ্টি পড়ছে, ইত্যাদি বিষয়ও তারা মুখে মুখে বলে থাকে। বিদ্যালয়ের কাজের জন্য তাদের নায়ক নির্বাচন হয়ে থাকে, যেমন আসন পাতবে কে, কাঁটা দেবে কে, জল আনবে কে ইত্যাদি। নায়কের নিত্য কাজও তারা করে থাকে, চরি জাঁকে, ছুরি, পাতা, পালক ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংগ্রহ পুস্তক তৈরী করে, শিশুর উপযোগী খবর আলোচনা হয়। তাদের এসব কাজকর্ম অবলম্বন করেই তাদের লেখার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হতে পারে, যেমন মাস ও বারের নাম লেখা, আবহাওয়ার বিবরণী, নায়কের তালিকা, শিল্পকাজের বিবরণী ইত্যাদি লেখা। সংগ্রহ-পুস্তকে কিসের ছবি, কি পাতা, কোন পাখীর পালক, ইত্যাদি লিখে রাখতে তারা প্রচুর আনন্দ লাভ করে। ক্রমশ এগুলো সম্বন্ধে দুচারটে কথা লেখাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এমন কি, প্রথম শ্রেণীতে শেষের দিকে তারা শ্রেণীতে লেখা ছড়া, গান ইত্যাদি লিখে নিজের নিজের বইও তৈরী করতে আনন্দ পায়। অবশ্য লেখা ছড়া বা গান লিখে রাখার চেয়ে লিখে মনের ভাবপ্রকাশ ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা হয় না, কিন্তু হস্তলিপির প্রয়োজনবোধকে জাগিয়ে তোলে। এ সময় শিশুদের চিন্তাকর্ষক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে দিলেও সুফল আশা করা যায়। খবরের কাগজে নিত্য নিত্য খবর লেখা ছোট শিশুর কাছেও আনন্দদায়ক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরাও এসব বিষয় নিয়েই লিখবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের হস্তলিপির মান এবং ভাবপ্রকাশের মান প্রথম শ্রেণীর চাইতে উচ্চমানের হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরা আবহাওয়া-পঞ্জী, খবরের কাগজ, নামুকের তালিকা, সংগ্রহ-পুস্তক, গানের খাতা, কবিতার খাতা ইত্যাদি তৈরী করতে পারে। কার্যবিবরণী, কাজের পরিকল্পনা, দিনলিপি ইত্যাদি তাদের লিখতে দেওয়া যায়। বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতার বিবরণী, যেমন বিদ্যালয়ে ঘনভোজন হয়েছে অথবা কোন উৎসব পালন করা হয়েছে তার বিবরণী, ইত্যাদি লিখতে দিলে শিশুদের কাছে তা বাস্তব হয়ে ওঠে। প্রয়োজন-বোধে নানারকম চিঠিও তাদের লিখতে দেওয়া যায়, যেমন তাদের শ্রেণীতে চিড়িয়াখানা তৈরী হয়েছে তা দেখতে আসবার নেমন্তন্ন চিঠি, অসুখের জন্য কোন বন্ধু অনুপস্থিত আছে সে কেমন আছে জানতে চেয়ে চিঠি ইত্যাদি লিখতে দেওয়া যায়। অবশ্য চিঠি হবে খুবই সংক্ষিপ্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুদের লেখার সৌন্দর্য ও শিশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, তাই লেখা যে মনের ভাবকে প্রকাশ করবার সহজ ও স্বাভাবিক পথ, এ সম্বন্ধে যেন শিশুরা সচেতন থাকে সেটাও দেখতে হবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শিশুদের প্রচুর লিখবার অবকাশ দেওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর শিশুরা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের বিবরণী, শিল্প কাজের বিবরণী, ভ্রমণের বিবরণী ইত্যাদি লিখতে পারে। এদের খবরের কাগজে শুধু বিদ্যালয়ের খবর ও বাড়ীর খবরই থাকবে না—তাতে থাকবে পাড়ার খবর, গ্রামের খবর। এমন কি দেশের ও বিদেশের কোন কোন খবরও এদের খবরের কাগজে পাওয়া যেতে পারে, যদি কৌতূহল জাগ্রত করা যায়। সুযোগ এবং উৎসাহ পেলে গল্প এবং কবিতা রচনা করাও এ সময় এদের পক্ষে সম্ভব হয়। তাদের শোনা গল্পকে, ইতিহাসের কাহিনীকে শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে লিখিতভাবে নাটকে রূপান্তরিত করা তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর পক্ষে সম্ভবপর। উৎসব অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে স্বাধীনভাবে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার সুযোগ দিলে এদের ভাবপ্রকাশের পথ সুগম হবে। দেশনেতাদের ছবি, মহাপুরুষদের ছবি, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নানারকম ছবি সংগ্রহ করে এরা সংগ্রহপুস্তক তৈরী করতে পারে। এদের সংগ্রহপুস্তকের লেখা দু একটি বাক্যে আবদ্ধ না থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হবে। চিঠি লেখা মনের ভাবপ্রকাশের সহজ ও সুন্দর পথ। কৃত্রিম চিঠি লেখার প্রচলন না করে চিঠি লেখার প্রয়োজনকে শিশুর কাছে বাস্তব করে তুলতে পারলে শিশুরা গুছিয়ে চিঠি লিখতে শেখে এবং এধরণের চিঠি লেখা মনের ভাবপ্রকাশ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করে থাকে। বিদ্যালয়ের উৎসব অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে আমন্ত্রণ লিপি, এক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য বিদ্যালয়ের যোগাযোগ সাধনের জন্য পত্রালাপ, বিজয়া, নববর্ষ, বড়দিন ইত্যাদিতে অন্যান্য শ্রেণীর শিশুদের, অথবা বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ইত্যাদিকে সম্ভাষণ-লিপি ইত্যাদি শিশুরা সময় বিশেষে লিখতে পারে।

ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জনের জন্য শিশুরা তাদের জানাশোনা যে কোন বিষয়ে রচনাও লিখতে পারে। অবশ্য রচনার বিষয়বস্তু যেন প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হয়ে ওঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ প্রচলিত বিদ্যালয়ে রচনা লেখা মানে অত্যন্ত কৃত্রিম ও নীরস লেখার ব্যবস্থা করা হয়, কারণ রচনার ভেতর দিয়ে তথ্যই চাওয়া হয় বেশি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথ্যমূলক রচনার চাইতে বর্ণনামূলক রচনা লিখতে দিলে, বিশেষতঃ সে বর্ণনা যদি অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আসে, তবে খুবই সুফল পাওয়া যায়। যেমন গ্রামে কোন মেলা

হয়েছে তার বিষয়ী, নিজ গ্রামের বর্ষাকালের অবস্থা, বিদ্যালয়ে প্রতিপালিত কোন উৎসব, বিদ্যালয়ের অথবা বাড়ীর দোষা পাখীর ইত্যাদি যে সব বিষয় অথবা ঘটনাগুলো তাদের কাছে বাস্তব, অথবা যেগুলো সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ আছে, এরকম বিষয়ে লিখতে দিলে শিশুরা প্রকৃতই মনের ভাবকে প্রকাশ করবার সুযোগ লাভ করে এবং তাদের লিখন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে লেখা বাস্তবিক সার্থক হয়ে প্রকৃতই মনের ভাবপ্রকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে।

কোন পথে ?

শ্রীশ্যামেন্দু বসু

আমরা আজকালকার অধিকাংশ ছাত্রদের মধ্যে দেখি, শিক্ষা মানে কতকগুলা কেতাব পড়িয়া কোন রকমে পাশ করিয়া একটি চাকরিতে ঢুকিতে পারিলেই নিজের সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইল—এই তাহারা বুঝিয়া রাখে। তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না, এই পৃথিবীতে শিক্ষার কোন শেষ নাই।

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ শরীর, মন ও আত্মার বিকাশ অর্থাৎ, এক কথায় বলিলে, সর্বাঙ্গীন বিকাশ যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা শিক্ষাই নয়, ইহা প্রত্যেক ছাত্রের এবং মানুষের বোঝা দরকার। আমরা যদি এই উদ্দেশ্য কায়-মনোবাক্যে গ্রহণ ও বিশ্বাস করিয়া লই, তাহা হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারিব, কোনও সন্দেহ নাই। আজ পর্যন্ত আমাদের সম্মুখে যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তাঁহারা আমাদের পূজ্য।

ভগবান আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে শক্তি-বুদ্ধি দিয়াছেন, আমরা প্রচেষ্টা করিলে কম-বেশি উন্নতি লাভ করিতে পারিব, ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। কিন্তু বর্তমানে যে প্রণালীতে আমাদের শিক্ষা চলিতেছে, ইহাতে আমাদের অনেক কিছু বাধা রহিয়াছে। ইহার মানে শিক্ষার মধ্যে কোন চেতনা-শক্তি নাই, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে সুন্দরতর করিয়া তুলিবার তেমন রাস্তা নাই, অর্থাৎ ইহাকে একথায় প্রাণহীন বলিলে অসংগত হইবে না। এর কারণ, দীর্ঘদিন ধরিয়া ইংরেজ আমলের শিক্ষায় আমাদের মন দুপুর করিয়া পাশ করিতে এবং কোনো রকমে কায় ভোগাড় করিয়া ঘরসংসার করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। আমরা তলাইয়া দেখি নাই এবং স্থিরচিত্তে চিন্তা করি নাই যে, ভগবান আমাদের এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে মনুষ্যরূপে কেন জন্ম দিয়াছেন ? এবং মানুষের লক্ষ্যস্থল কোন্ দিকে তাহা জানিতেও চাহি নাই, জানিবার প্রয়াসও করিতেছি না, যদি করিয়া থাকেন তো মুষ্টিমেয় কয়েকজনে মাত্র।

আমরা এত বড় বড় কথা নাই বা জানিলাম, এবং জানা দূরের কথা, সাধারণভাবে আমাদের বোঝা উচিত, চরিত্র বলিতে কি বুঝায় এবং ঐ চরিত্র বিনাশে মনুষ্যত্বের উন্নতি বা অবনতি। একটু ধীর স্থির হইয়া চিন্তা করিলে আপনা হইতেই বুঝিতে পারা সম্ভব। শিক্ষার প্রথম পর্যায় এবং মানুষের যার উপর শেষ পর্যন্ত না হইলে সফলকাম অর্থাৎ সমাজে মানুষ বলিয়া গণ্য হয় না, সেই সত্য অসত্য ইত্যাদির কথা আজ

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শিক্ষার প্রাথমিক গুণ বিনয় ও নম্রতা, বর্তমানে কতজন ছাত্রছাত্রী তাহা বুঝিয়া থাকেন বলা শক্ত। তাহার পরিণতি আজ আমাদের চোখের সামনে অহরহ ভাসিয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত কথা আজ বলা হইতেছে না, আমরা ইতিহাসে যুগে যুগে মহাপুরুষদের এই শিক্ষার মৌলিক উপদেশাবলী শুনিয়া আসিতেছি এবং আজও শুনিতেছি। আমাদের একবার ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখা কর্তব্য, কেন এত উপদেশ, এর মৌলিকত্ব বা কতটুকু, এবং আমরা পিছনে না সামনে চলিতেছি। আজ আমাদের সমাজের পরিস্থিতি যে পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, তাহা একমাত্র শিক্ষার ত্রুটীর জন্যই একথা বলিলে ভুল হইবে না। যদি আমরা আমাদের সেই গুরুগৃহাশ্রমের শিক্ষার কথা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে মাথা নত করিতে হয়। পূর্বে যেমন ছিল আমাদের আশা, তেমন ছিলাম স্বাবলম্বী এবং তেমন ছিল শিক্ষা ও চরিত্র উন্নত। কিন্তু আজকার দিনে এর বিপরীত। আমরা সকলেই অবগত যে, আমাদের ঠাকুরদাদারা কত দিন ধরিয়া সুখ ও স্বচ্ছন্দ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদেরই বংশধরেরা পড়িবার কোঠায় আজকাল নামিয়া কোথায় পড়িয়াছে এবং আমরা জানি যে, আমাদের দেশেই এক সময় দুধে-ভাতে দিন কাটিত—কিন্তু আজ শাকচাল্লও বহু লোকের জোটে না। এই সমস্ত পুরানো কথা একটু চিন্তা করিলে বর্তমানের অবস্থা কি, খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাই বলিয়া আমরা শুধু এ ধারণা করিব না যে, আমাদের জীবন পিছনের দিকেই নিয়া যাইব, আমাদের সব কিছু প্রাচীন কালের মতই হইবে, তাহা নয়। আমাদের শুধু পিছনের দিকে তাকাইলে চলিবে না, বর্তমান দুনিয়ার সাথে তাল মিলাইয়া পা ফেলিতে হইবে। আমাদের সব কিছুই হইবে মানুষের সৎ এবং আদর্শ জীবনের লক্ষ্য, তাহার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুই। আমাদের বর্তমান এই জরাজীর্ণ পরিবেশকে পরিবর্তনের জন্য যাদুকী প্রবর্তন করিলেন নঈ তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষা। যে শিক্ষা আমাদের জীবনকে আদর্শ করিয়া তুলিতে পারিবে তাহা এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন কাজ করিবার সাথে আমাদের জ্ঞানপিপাসাও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ করিতে পারিব। যেমনি আমরা পরিশ্রমী হইব তেমনি স্বাস্থ্যবান এবং স্বাবলম্বীও হইতে পারিব। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, শুধু বই পড়িলেই জীবনের প্রকৃত আদর্শ বা লক্ষ্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে না; সমাজে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে—সমাজকে জানিতে হইবে, সমাজের সঙ্গে একাত্মবোধ হইয়া থাকিতে হইবে।

এই সমাজকে জানিতে ও বুঝিতে হইলে যেমনি হাতে কলমে কাজ করিতে হইবে, তেমনি বইও বেশি করিয়া পড়িতে হইবে। আমাদের লক্ষ্য কি জানিবার জন্যই পড়া, শুধু পাশ করার জন্য যে বই পড়া তাহা কিছুই নয়।

আমাদের চাকরির মোহ, টাকার লালসা ত্যাগ করিয়া আসল মানুষ হইতে হইবে, আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। আজও যারা শিক্ষার এই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ও কাজ করিতে অবহেলা করিতেছে, তাহাদের বলি, এখনও যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না করি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের পরিণাম কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিবে, তাহা এখন আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা দরকার।

শিক্ষাব্যবস্থা—পুয়েরটো রিকো দ্বীপে

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

শ্রীচরণকমলেষু,

মাষ্টার মশাই, আজ পুয়েরটো রিকো দ্বীপের শিক্ষাব্যবস্থার কথা লিখিতেছি। পুয়েরটো রিকো ইউনিভারসিটি হাইস্কুলের Principal (আমেরিকায় স্কুলের Head master বা Head-mistress না বলিয়া Principal বলা হয়) মিউ ইয়র্ক সহরের International House এ থাকিয়া কলম্বিয়া ইউনিভারসিটির টীচার্স কলেজে সবেমাত্র বছর এম্. এ. পড়িতেছেন। তাঁহার নিকট শুনিয়া এই চিঠি লিখিতেছি। সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা জানিতে পারিলে এদেশেরও শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা আঁচ করা যায়। পার্থক্য অবশ্য অনেক আছে।

ছোট দ্বীপ, আয়তনে সাড়ে তিন হাজার বর্গ মাইলেরও কম; কিন্তু লোক সংখ্যা বাইশ লক্ষেরও বেশি, অর্থাৎ আমাদের খুলনা জেলার চাইতেও ঘন বসতি। বলাবাহুল্য ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নামে আলচাণ্ডর দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করেন। পর বৎসর, তিনি এই পুয়েরটো রিকো আবিষ্কার করেন। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন হইতে ইয়ানেজ পিনজান Yanez Pinzan এক পাল ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া এই দ্বীপে ছাড়িয়া দেন। তাহার আগে দ্বীপে এই সব জন্তু ছিল না। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে পন্স ডি লিয়ঁ Ponce de Leon প্রথম উপনিবেশ স্থাপনা করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমেরিকা যুক্তরাজ্য এই দ্বীপটি দখল করে। এখন তাহা "উপনিবেশ" কিন্তু অধিবাসীরা বেশ পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে। প্রায় সব লোকই ক্যাথলিক, মাতৃভাষা স্প্যানিশ, তবে ইংরাজি শেখা বাধ্যতামূলক। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষকেরাই স্কুলের শেষ পরীক্ষা লইয়া থাকেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক, এবং ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। বই এবং অন্যান্য উপকরণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। দুপুরের খোরাকটাও ছাত্রেরা বিনামূল্যেই পায়। সর্বত্র সহশিক্ষা প্রচলিত। শিক্ষার জন্য বার্ষিক চার কোটি ডলার—আজকালকার বাজারে প্রায় উনিশ কোটি টাকা—খরচ হয়। আর আমাদের বাংলা দেশে? ইহাদের তাহার আয় অবশ্য অনেক বেশি।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল অনেই আছে। স্কুলে শিক্ষা-ব্যবস্থা সাধারণত এলিমেন্টারি (৬টি শ্রেণী), জুনিয়র হাই স্কুল (তিনটি শ্রেণী), ও সিনিয়র হাই স্কুল (তিনটি শ্রেণী); এই তিন ভাগে বিভক্ত। ৫+ বয়সে ভর্তির নিয়ম। Elementary স্কুলে ইংরাজি, স্প্যানিশ, পাটিগণিত, Physical Education, শিল্প সঙ্গীত ও কমিউনিটি সমস্যা পড়ান হয়। কমিউনিটি সমস্যার মধ্য দিয়া প্রাথমিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান পড়ান হয়। Social Studies বলিতে ইতিহাস ভূগোল বোঝায়। সমাজে যে সব সমস্যা, যেমন ম্যালেরিয়া, তাহাকেই কমিউনিটি সমস্যা বলে। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, কৃতি, ঔষধ, ঔষধের আবিষ্কার, কোন কোন দেশে ঐ রোগ চালু আছে, কোথায় এখন আর নাই ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল শেখানো হয়। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক

যাই। শিক্ষক প্রথম তোগাড় করেন, নিজে পড়িয়া শুনিয়া প্রথম লিখিয়া ডুপ্লিকেটিং মেশিন দ্বারা পুস্তিকা ছাপাইয়া থাকেন। আর্ট বা ভাষার দ্বারা একদিন বিশেষ বক্তৃতা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ছাত্ররা যেই উপরের শ্রেণীতে যাবে যাবে উঠিতে থাকে তেই সব বিষয় কিছু বেশি করিয়া শিখে।

মুনিয়ার হাই স্কুলে স্যাবিন ইংরাজি, গণিত (পাটিগণিত ও প্রাথমিক বীজগণিত এবং নবম শ্রেণীতে প্রাথমিক বীজগণিত), Social Studies (সপ্তম শ্রেণীতে পুয়েরটো রিকোর ইতিহাস ও ভূগোল, অষ্টম শ্রেণীতে আমেরিকা যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম গোলার্ধের অন্যান্য দেশের বিবরণ, নবম শ্রেণীতে পৃথিবীর মোটামুটি বিবরণ), বিজ্ঞান (যেমন মেকানিক্স, পদার্থবিদ্যা, তড়িৎ বিজ্ঞান ভূবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি) অল্প অল্প শেখানো হয়। মেয়েদের গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং ছেলেদের বাণিজ্য, শিল্প, যেমন কাঠের কাজ, শিখিতে হয়।

সিনিয়র হাই স্কুল শেষ করিতে ১২ বছরের প্রয়োজন হয়। যে বিষয় এক বছর স্কুলে পড়ানো হয় তাহাতে ১ নম্বর পাওয়া যায়। স্যাবিন দুই বছর, ইংরাজি তিন বছর, গণিত (Algebra ও Plane Geometry) দুই বছর; ইতিহাস (পুয়েরটো রিকো, ইউ এস্ এ, পৃথিবী) দুই বছর; জীববিদ্যা এক বছর। স্বেচ্ছামূলক বিষয়ের মধ্য হইতে আরও দুই বছর লইতে হয়। স্বেচ্ছামূলক বিষয়কে Electives বলে। Advanced mathematics, অন্য দেশের ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বাণিজ্য শিল্প, ফিজিক্স, ফরাসি ভাষা ইত্যাদি Electives.

তিন শ্রেণীর শিক্ষক আছেন। হাইস্কুল শেষ করিয়া দুই বছর পড়িয়া Normal Diploma পাইয়া এলিমেন্টারি পড়ান যায়। বেতন বার্ষিক ১৫০০ ডলার হইতে ১৯০০ ডলার পর্যন্ত। যাঁহারা Bachelor Degree পান, তাঁহাদের বেতন ১৮০০ ডলার হইতে ২২০০ ডলারপর্যন্ত। যাঁহাদের Master's Degree আছে তাঁহাদের বেতন ২০৪০ ডলার হইতে ২৫২০ ডলার পর্যন্ত। অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি হয়। স্কুল ইন্‌স্পেক্টরদের নাম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট; তাঁহাদের বেতন বার্ষিক ২৭০০ ডলার হইতে ৩১০০ ডলার পর্যন্ত। গরমের ছুটি দুই মাস মাত্র; আমেরিকার কিন্তু তিন মাস। ইহা ছাড়া বড়দিনে দুই সপ্তাহ, ইস্টারে এক সপ্তাহ এবং অন্যান্য ছুটি বছরে দশ দিন মাত্র। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে যেমন সপ্তাহে পাঁচদিন, সেখানেও তেমনই সপ্তাহে পাঁচ দিন স্কুল হয়। পোর্টো রীকো শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ এবং শিক্ষক ২০ ভাগ মাত্র। ইউরোপ আমেরিকার সর্বত্রই স্কুলে শিক্ষকদের চেয়ে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা অনেকগুণ বেশি।

শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চে আছে শিক্ষাবিভাগ, এবং তাহার সর্বময় কর্তাকে Secretary of Education বলা হয়। একমাত্র শিক্ষাবিভাগই দ্বীপের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। দ্বীপটি পাঁচটি শিক্ষাপ্রদেশে বিভক্ত। প্রতি প্রদেশে একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আছেন। কোনও কোনও প্রদেশে হাজার জন পর্যন্ত শিক্ষক আছেন। পাঁচজন জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সকলই জন সহকারী আছেন। সিনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা মাত্র ৬৬। সকাল সাতে আটটা হইতে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত এবং দুপুর একটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত স্কুল বসে। এলিমেন্টারি স্কুলে একজন শিক্ষকই এক শ্রেণীতে সব বিষয় পড়াইয়া থাকেন। ঘণ্টার পর পনের মিনিটের জন্য ছুটি দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি সুবিধা অনুসারে প্রত্যেক বিষয় পড়াইবার সময় ভাগ করিয়া নেন। হাইস্কুলে কিন্তু ৫০ মিনিট করিয়া নির্দিষ্ট সময়।

চাকুরির জন্য পাশ করিয়া যাহারা এলিমেন্টারি এবং মুনিয়ার স্কুলে পড়াইবেন তাঁহারা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট, এবং সিনিয়র হাই স্কুলে যাঁহারা পড়াইবেন তাঁহারা শিক্ষাবিভাগে, দরখাস্ত করেন। সিনিয়র হাই স্কুলে পড়াইতে হইলে কোনও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিবার প্রয়োজন হয়। দরখাস্তের পর যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া নামের তালিকা তৈয়ারি করা হয় এবং চাকুরি খালি হইলেই নিয়োগ করা হয়। শিক্ষা-বিভাগ হইতে বই কিনিয়া স্কুলে তাহা বিনামূল্যে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়; তাহাদের আর কিনিতে হয় না।

আজ এই পর্যন্ত।

প্রণত
দিলীপ

শিক্ষকের সমস্যা

শ্রীবকুলমালা সেন

বিদ্যালয়ে সাহিত্য পাঠদানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লইয়া শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণী। কক্ষটির এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত একবার দৃষ্টি পরিচালনা করিয়া তাঁহার মনে হইল, শ্রেণীপাঠনা সম্বন্ধে পোষিত ধারণাগুলি কেমন যেন জট পাকাইয়া গেল। ছাত্রী সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে, বয়স আনুমানিক দশ হইতে পনের। মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে পাঠদান প্রচেষ্টা সফল হইবে বলিয়া মনে হইল না।

শিক্ষিকা লক্ষ্য করিলেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় ত্রুটি ছাত্রীরা নিজেরাই কতকটা সংশোধন করিয়া লইয়াছে। অল্পবয়স্কা এবং অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কারা স্পষ্টই দুটি গোষ্ঠি সৃষ্টি করিয়া শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের, চিন্তাধারার ও বুদ্ধির যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে—এমনি করিয়াই যেন তাহা চোখে আঙুল দিয়া তাহারা দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু এখন চিন্তা করিবার অবসর নাই, শিক্ষিকা পাঠালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

বাংলা সাহিত্য। পুস্তকের প্রথম রচনাটি ছাত্রদের প্রতি উপদেশমূলক। অল্পবয়স্কারা গভীর মনোযোগের সহিত শুনিল, সোৎসাহে আলোচনায় যোগ দিল। স্কুলের মত সহজ সুন্দর বালিকারা সাধারণের প্রতিমূর্তি। কেহ কেহ বলিল, "আমি মিথ্যে কথা বলি না দিদিমণি, শুধু খেলার সময় বলি।" কেহ বলিল, "আমি অন্য সময়ও মাঝে মাঝে বলি।" কিন্তু পরমুহূর্তে প্রায় সকলেই আনন্দদীপ্তমুখে দৃঢ় সংকল্প জানাইল, "এখন থেকে আর কখনও বলবো না।" কিন্তু অধিকবয়স্কাদের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ইহার কারণ বুঝিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইবার কথা নয়। দশ এগার বৎসরের বালিকাদের নিকট ভাবজগতের প্রাথমিক স্তরের নূতনত্ব এখনও কাটিয়া যায় নাই, তাই তাহা এখনও তাহাদের নিকট আনন্দগর্ভ। অতীতের কোন ভুল, কোন ত্রুটি যেমন তাহাদের মনে গভীর রেখাপাত করে না, ভবিষ্যতে ত্রুটিমুক্ত পূর্ণ করিয়া তুলিবার পথও এক পায়ের পর আর এক পদ অগ্রসর হওয়ার চেয়ে বেশি দুরূহ বলিয়া মনে

হয় না। তাই তাহাদের উৎসাহ অপরিসীম। যে কোন সংকল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যের অনুভবে সর্বাঙ্গে আনন্দ উপচাইয়া পড়ে। কিন্তু চৌদ্দ পনের বৎসরের বালিকারা ভাবলোকের প্রথম কোঠা পার হইয়া দ্বিতীয় কোঠার প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অসীম রহস্য অনিবার্য আকর্ষণের মৃদু ইশারায় তাহাদের আকাশ বাতাস ভরিয়া ফেলিয়াছে। তাই সহযোগ প্রভৃতি উপদেশাবলী তাহাদের শৈশবস্মৃতিকে একবার জাগাইয়া তোলে মাত্র, নূতন কোন প্রেরণার সঞ্চার করিতে পারে না।

দ্বিতীয় দিন শিক্ষিকা ভিন্নরুচীর পাঠ বাছিয়া লইলেন—আচার্য জগদীশের জীবনকথা। রচনাটি মূলতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের ঠাসবুনানিতে জমাট বাঁধা। অদ্ভুতকর্মা বৈজ্ঞানিকের জীবনব্যাপী কর্মসাধনার সন তারিখ কণ্টকিত সুদীর্ঘ তালিকা। নিরাবরণ তথ্য সংগ্রহের মধ্যেই তৃপ্তি লাভ করা বালকবালিকাদের মনোধর্ম বিরোধী। পাঠ পরিচালনা করিবার কালে সতর্ক প্রয়াসে শিক্ষিকা আচার্যের মানবীয় সত্তাকে আকারের গণ্ডীতে যতটুকু সীমায়িত করিতে পারিলেন, তাহা আনন্দসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। অল্পবয়স্কারা সন তারিখ এবং কীর্তি-তালিকা হইতে কিছু কিছু ছাঁটিয়া ফেলিয়া মোটের উপর জীবনকথায় কাঠামোটুকু গল্পের মত আয়ত্ত করিয়া লইল বটে কিন্তু তাহাদের চোখে উৎসাহের দীপ্তি বা আনন্দের প্রকাশ দেখা গেল না। অধিকবয়স্কাদের মনে ইহা আদৌই স্থান গ্রহণ করিতে পারিল না। তথ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা ইহাদের অল্পবয়স্কাদের চেয়ে কম নয় এবং সমধর্মী গল্প সাহিত্যের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচয় ঘটিয়াছে বলিয়া জীবনকথার এই অস্পষ্ট রেখা-চিত্র তাহাদের মনে কোনরূপ ভাবের উদ্রেকই করিতে পারিল না।

তৃতীয় দিন। শিক্ষিকা পরীক্ষামূলক মনোভাব লইয়া পুস্তকের শেষাংশ হইতে রবীন্দ্রনাথের রচনা 'বোলপুর বর্ণন' বাছিয়া লইলেন। সাহিত্যের আবেদন এই উভয় শ্রেণীর বালিকাদের সমভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে কি না, ইহা দেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কবির প্রথম বোলপুর বর্ণন। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় তাঁহার শৈশবস্মৃতি অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। সাহিত্যের দুয়ারদেশে আসিয়া এই রচনা আলোচনার সময় শিক্ষিকা এই প্রথম অধিকবয়স্কাদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আসিয়াছে লক্ষ্য করিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া কবির মনোভাবের ব্যঞ্জনা যেন তাহারা অন্তরে উপলব্ধি করিতেছে—এমনি একটা তৃপ্তির আভাস তাহাদের চোখে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু আলোচনার যোগদানের ভিতর দিয়া তাহা যতখানি প্রকাশ পাইবে বলিয়া শিক্ষিকা আশা করিয়াছিলেন, ততখানি প্রকাশ পাইল না। কবির বর্ণনা—"প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটি মাত্র নীল রেখার গণ্ডী আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অগাধ সকরুণের কোন ব্যাঘাত ঘটিত না"—তাহাদের চোখে যে স্বপ্নাঞ্জন লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহা চিনিয়া লইতে কিছুমাত্র ভুল হয় না। চৌদ্দ পনের বৎসরের বালিকাদের এই জাতীয় অনুভবের স্বাভাবিক প্রকাশ কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা উপরের শ্রেণীগুলিতে শিক্ষিকা দেখিয়াছেন। ভাষার অপূর্ণতা তাহাদের ভাবপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে সত্য, কিন্তু উপলব্ধির মধ্য দিয়া প্রবাহিত স্বরণা ধারার মতই তাহা উৎসারিত হইতে দ্বিধা করে না। এই শ্রেণীতে যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল—শিক্ষিকার মনে হইল, অল্পবয়স্কা সহপাঠিনীদের সহিত একত্র পড়িবার লজ্জাই হয় তো তাহার কারণ।

অল্পবয়স্কাদের অনুভূতি যেটি ঘুরে পরিষ্কার

যাইতে পারিল না। তাহারা "রেলগাড়ীর দুই ধারে দুই ছুরির" ধরণের বেশে ছোটো পথটুকুই বুঝিতে পারিল এবং সেরা মাথায় অমীর টুপী পরিতে করির অনিচ্ছায় প্রচুর কৌতুক বোধ করিল। মোটের উপর ইহার বিষয়বস্তু অল্পবয়স্কদেরও আনন্দ দিল যথেষ্ট এবং ইহার অল্পগুলির সহজবোধ্য পদের বিন্যাস তাহাদের আরাম ও শক্তি দিল অতিরিক্ত। তাহা গ্রহণ করিতে হইলে যদি প্রতি পংক্তির অধিকাংশ পদের অর্থের জন্য অভিধানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে রসগ্রহণে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাহার গভীরতা বহুই থাক, পদার্থ কখনও প্রাচীর তুলিয়া দাঁড়ায় না। তাই বালকবালিকাদের মন আপনাদের ইচ্ছামত, সাধ্যমত এবং রুচি অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিতে গিয়া বারবার হোঁচট খাইয়া কভু বিকল হয় না।

সাহিত্য-রসের আস্বাদন উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীদের অন্তরেই সাড়া জাগাইয়াছে দেখিয়া শিক্ষিকা আশান্বিত হইলেন। কিন্তু তাহা বেশি কণ স্থায়ী হইবার পথ ছিল না। পাঠ্যপুস্তকের পাতা উল্টাইয়া সাহিত্যরসসমৃদ্ধ গদ্য রচনা বেশি মিলিল না। তাহার মধ্যে কয়েকটি আবার দুরূহ শব্দজালে এতই দুরাকীর্ণ যে পরিবেশন কালে তাহার রস মাধুর্য বজায় রাখা যাইবে কি না, মনে সন্দেহ জাগে। "পৃথিবীর স্থলভাগেই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অধিকতর সুস্পষ্ট" সন্দেহ নাই, এবং "রৌদ্রকরোজ্জ্বল চিরতুষারাবৃত অপূর্ব শোভা" দেখিয়া "ভ্রমণকারীরা যে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকে", "নিম্নে নিষ্কিপ্ত অগ্ন্যুদ্গম যে ভয়াবহ উদ্দীপনা" করে, "তাহার সুস্থ অবস্থা সমূহ ঊর্ধ্বে যতদূর পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইলে" যে অপূর্ব শোভার বিস্তার হয়, তাহাও নিশ্চিত। কিন্তু সে শোভা উপলব্ধি করিতে হয় এগার বৎসরের বালকবালিকাদের মন বিমুখ হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। অল্পবয়স্কদের যোগ্য সরলতর রচনার সংখ্যাও পুস্তকটিতে নিতান্তই সামান্য। ইহা ছাড়া অন্যান্য রচনাবলী সাহিত্য পুস্তকের অযোগ্য না হইয়া ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান অথবা সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকের পৃষ্ঠায় স্থান পাইলেই মানাইত বেশি। কিন্তু রচনাগুলিকে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগের সকল দীর্ঘতাহা যুক্তাক্ষরের প্রবর্তনীতে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা এতই সুস্পষ্ট যে তাহাদের পাঠ্য যে কোন ভাষার পুস্তকে স্থান পাইবার যোগ্য বলিতে দ্বিধা জাগে।

শিক্ষিকা সুরু হইলেন, সাধনা পাইবার আশায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষিকা জানেন, বালকবালিকাদের মনে মনে ছন্দে গদ্যের ধরণটা ধরিতে খুব্বই দেরী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু পুস্তকটির কবিতা নির্বাচনে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি যে দেওয়া হইয়াছে, তাহা মনে হইল না। বিভিন্ন কবির বিভিন্ন প্রকার ছন্দের সমাবেশ ঘটানর দিকেই মন দেওয়া হইয়াছে বেশি। তাহা ছাড়া কাহিনী ও উপদেশ মূলক কবিতা সংগ্রহের তালিকে ঘনাবদ্ধ কবিতের ছোট্ট রচনাগুলি অপাংক্তেয় হইয়া গিয়াছে। গল্প বা কাহিনীতে বালক-বালিকাদের প্রীতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু গদ্যের আড়িকে ইতিহাস ভূগোল পরিবেশন করিয়া পদ্যের আড়িকে নিছক কাহিনী পরিবেশনের ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কবিতার কাহিনী যদি ছন্দকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা বাল-বালিকাদের গদ্যের ক্ষুধা মিটাইতে পারে বটে, কিন্তু কাব্য হইতে সত্যকার আনন্দ আহরণের যে প্রেরণা তাহাদের স্বভাবগত, তাহাকে প্রশ্রয় করিবার কোন সম্ভাবনাই ইহাতে থাকিতে পারে না। গদ্যগ্রন্থে বালক বালিকাদের কাহিনীমূলক কবিতাতেই আকর্ষণ থাকে বেশি। কিন্তু তাহা

কাব্যসৌন্দর্য-সমন্বিত হওয়া দরকার। কাব্যের প্রভাব, ছন্দের দোলা তাহাদের মনঃশক্তি বিকাশেরই যে শুধু সহায়ক, তাহা নয়। তাহাদের মন ইহাতে যে আনন্দ পাইয়া থাকে তাহা শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য করিয়া তোলে। পুস্তকটিতে যতটি কবিতা সংগৃহীত ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে বালকবালিকাদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কবিতা পাওয়া গেল মাত্র ছয়টি, তাহাদের মনে আনন্দলোক সৃষ্টি করিতে পারে যে ছন্দ তাহার সমাবেশ আরও কম।

শ্রেণী গঠনের বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনের ত্রুটি শিক্ষা দান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে বিপুল প্রতীপের মত দাঁড়াইয়া আছে, ইহারই মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে। সে পথের প্রান্তদেশে যত জোর পরীক্ষার পাশ পর্যন্তই মিলিতে পারে, তদতিরিক্তের আশা করা চলে না।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। সিঙ্গনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ বালবিদ্যোদয় প্রতিনিধি, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষাব্যবস্থা—অভিভাবকের দৃষ্টিতে

শ্রীশঙ্করনাথ ঘোষ

কোন একটা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য যে সাধনা বা চর্চা করা হয় সাধারণত আমরা তাকে শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষা কতকাংশে মানুষের রুচিবোধের তারতম্য নির্ণয় ক'রে থাকে, অর্থাৎ মানুষের যে রুচিবোধের বিভেদ ঘটে তা তাদের শিক্ষার ফলে, এবং বস্তুত এখান থেকেই শিক্ষার দুটি পথ আমরা পাই, একটি সু-শিক্ষা অন্যটি কু-শিক্ষা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানেই শিক্ষা কথাটার সংজ্ঞা শেষ হয় না, যেন আরো কিছু বলার বাকি থাকে। এর অর্থটাকে পরিষ্কার করতে, এ পর্যন্ত যতগুলি সংজ্ঞা করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মানুষকে সংস্কারমুক্ত হতে হলে যে সাধনার বা চর্চা করার প্রয়োজন, তাই-ই হলো শিক্ষা। তাই যেন হলো, কিন্তু কথাটার অর্থ এখন কিছুটা উপলব্ধি করা গেলেও ঐ যে মূলে একটা কথা রয়ে গেছে 'সংস্কার', এ কথাটার অর্থও পরিষ্কার হওয়া দরকার, নতুবা অর্থটা অর্থহীন হয়েই থাকবে।

'সংস্কার' কথাটার অর্থ সাধারণভাবে হচ্ছে এই যে, কোন একটা প্রথা বাধ্যবাধিক ভাবে আমাদের মধ্যে দিয়ে চলে আসছে, তাকে আমরা সংস্কার বলে থাকি। এখন এই প্রচলিত প্রথার বাধ্যবাধিকতার হাত থেকে মুক্ত হতে হলে যে চেষ্টা করা করা হয় তাকে যদি আমরা শিক্ষা বলি, তবে নিশ্চয়ই আমরা শিক্ষা কথাটার অর্থ করেছি, কেন না প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে ভাল এবং মন্দ দিক নিশ্চয়ই আছে, একথা অনেকেই বলেছেন সুতরাং পুনরায় প্রমাণ করার প্রয়োজন বোধ করি না। আমার কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের সেই প্রচলিত প্রথা, এর মধ্যেও ভাল এবং মন্দ দিকটাও আছে, সুতরাং সেই প্রথার 'সু' এবং কুদিকটাও বিচার করার জন্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এখন কথা হলো, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়, সুতরাং প্রত্যেক মানুষের এর ভালমন্দ দিকটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন তা মনে করা যায় না। সেইজন্য এদিক দিয়ে আমরা কথাটার অর্থ পরিষ্কার করিতে পারবো বলে মনে হয় না।

বর্তমান কালে আমরা শিক্ষার অর্থ করেছি এই যে, মানুষের মনের অজ্ঞতা দূরীভূত করার জন্য যে প্রচেষ্টা বা চর্চা করা হয় তাই হলো শিক্ষা, অর্থাৎ দিনা পৃথিবীর আঁধারকে দূর করতে গেলে যেমন চাই আলো, তেমনি মানুষের অজ্ঞতাকে দূর করতে হলে চাই জ্ঞানের আলো। এই জ্ঞানের আলো কোথায় পাওয়া যায়? তবে কি ওটা শুধু পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যায়? একথা অবশ্য কেউ স্বীকার করবেন না, কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলো ডিগ্রী পেলেই যে মানুষের অজ্ঞতা দূর হয় একথা স্বীকার করা যায় না, তবে বরং বলা যায় যে মানুষের 'অজ্ঞতা' সম্বন্ধে তার কিছুটা ধারণা জন্মায়, সুতরাং এই অজ্ঞতাকে দূর করতে গেলে আর একটা কিছুর আশ্রয় লাভ করতে হয়, সেটাকে আমরা সামাজিক শিক্ষা বলতে পারি। মানুষ সামাজিক জীব, তার অজ্ঞতা অনেক সময় প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সমাজের ওপর প্রতিভাত হয়ে সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করে তোলে। তাই এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে মানুষকে তার উপায় খুঁজতে হবে।

মানুষের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাটাই বেশি যাঁরা মনে করেন তাঁরা যে জিনিসটা বুঝেছেন সেটাই ঠিক, এবং অন্য সবই ভুল। প্রমাণ দিয়ে তাঁদের

বুঝাতে যাওয়া একটা মস্ত বড় ভুল। অনেকদিন আগে কোন একটি ভদ্রলোক কোন এক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিযুক্ত হন। ভদ্রলোকটির পক্ষে সওয়াল হবার পূর্বে প্রতিষ্ঠানের সওয়াল শুনেই হাকিম রেগে গিয়ে জানালেন যে তিনি ভদ্রলোকটিকে ছেড়ে দেবেন এবং এটা তাঁর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। ভদ্রলোকটির উকীল উঠে দাঁড়িয়ে অনেক বোঝাতে লাগলেন কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না দেখে বললেন, your Honour, if you had in your mind that the shape of the earth is apt to be a square, then I would have no opportunity to make you understand that the shape of the earth was not likely to be a square but round as an orange. এই কাহিনীর অবতারণা শুধু মাত্র এটুকু বুঝাতে যে, শুধু যে সাধারণ মানুষ এই প্রবৃত্তিটার দ্বারা চালিত তা নয়, শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এ প্রবৃত্তিটা লুকিয়ে থাকে। তাই একে যে অন্তঃ কিছুটা কমে, তা প্রায়ই ভুল হয়। সুতরাং যতক্ষণ না এই ভুলটার শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই পথে অগ্রসর হওয়ার থেকে বিরত থাকাই ভাল।

আজকাল অর্থনৈতিক সমস্যার দিনে, শুধু আজ কেন বহুদিন পূর্ব থেকেই যখন মানুষ তার পশুবৃত্তিকে বশীভূত করে সভ্য হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই মানুষ শিক্ষা কথাটার এই অর্থ করে এসেছে যে, কোন একটা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য যে চর্চা বা সাধনা করা হয় তাই হচ্ছে শিক্ষা এবং বস্তুত এটাই বোধ হয়, শিক্ষা কথাটার মূল অর্থ। তবে ঐ অর্থের সঙ্গে আরো কিছু অর্থ যোগ করে নেওয়া উচিত। এই যে জ্ঞানলাভের জন্য সাধনা, তার মধ্যে যেন সংযত জীবনের নির্দেশ থাকে, সুতরাং এই পর্যায়ে যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়াই থাকবে তা নয়।

আমাদের দেশে এখন শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী নানা প্রকারের করে নেওয়া হয়েছে এবং বয়স ও জাতিবিশেষকে নিয়েই আমরা শিক্ষা দিয়ে থাকি, যেমন 'বয়স্কশিক্ষা' 'বালশিক্ষা' 'নারীশিক্ষা' ইত্যাদি। কোন শিক্ষা প্রণালীর বিষয় বিশ্লেষণ করতে গেলে পৃথক্‌ভাবেই তার পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

বয়স্কশিক্ষার পক্ষে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে, যে সকল বয়স্কলোক এতদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিল তারা যদি হঠাৎ জ্ঞানের আলো দেখতে পায় তা তারা সহজে সহ্য করতে পারবে না। হয়তো তাদের মনের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও নানা ভুল ধারণা থাকতে পারে সুতরাং তাদের মনের মধ্যে থেকে এই সব নানা ভ্রান্তধারণা অপসারণ করতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে শিক্ষার প্রসার চালানো উচিত, নতুবা শিক্ষা দিতে গিয়ে বিপরীত চাইতে অহিতটাই বেশি হবে।

শিশুবয়সে কোন জিনিসকে যে কোন ছাঁচে ফেলে তাকে মনের মতন করে তৈরী করা যায়। সুতরাং শিশু যখন শিশু থাকে সে, তখন যে শিক্ষা পায় সেই শিক্ষাকে চিন্তি করে সে গড়ে ওঠে। তাই এই সময়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার দিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং এই দৃষ্টি রাখাটা একমাত্র অভিভাবকেরই কর্তব্য। কেউ কেউ মনে করেন, ছেলেমেয়েদের জন্য একজন 'মাষ্টার' রেখে দিলেই বোধ হয় সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই তাঁরা ঘণ্টা হুয়েকের জন্য একজন 'মাষ্টার' নিয়োজিত করেন, তাঁকে রাখা ছেলেমেয়েদের চরিত্রগঠনের জন্য। বক্তব্য শুধু এই, ২৪ ঘণ্টা ছেলেমেয়ের সঙ্গে রেখে যে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের সুবিধা করতে অভিভাবকেরা অপারগ দুই ঘণ্টার জন্য নিয়োজিত একজন লোকের কাছে কেমন করে আশা করা যেতে পারে, যে সে তাদের সুব্যবস্থা করতে পারবে? তাই প্রত্যেক অভিভাবকের নিজস্ব কর্তব্য এদিক দিয়ে রয়ে গেছে, কোনদিন তা অবহেলা করা যায় না।

সহশিক্ষা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন থাক। কেন না ও প্রশ্নের সমাধান করতে গেলে পাশ্চাত্য সহশিক্ষাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তবেই ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে মনে করি। আমাদের দেশীয় সহশিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হবে, হয় এই সহশিক্ষা বিদ্যালয়ের সঙ্গে জীবন থেকেই আসা উচিত নতুবা বন্ধ করে দেওয়া ভাল। এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করেন পাশ্চাত্য সহশিক্ষা সম্বন্ধে, তবে আমি শুধু তাঁকে পাশ্চাত্য সমাজের পরিস্থিতি ও বিষয় একবার ভেবে দেখতে বলবো।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্নও অবান্তর, কারণ যে কোন দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সেই দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা দরকার। যদি কেউ একথা বলেন যে আমাদের শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর, তার উত্তরে শুধু এই কথাই বলা চলে যে, আমাদের দেশে কি এমন লোক ছিলেন না বা নেই যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ধার ধারেন না, অথচ শিক্ষা বিষয়ে তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত কোন লোকেরই নিম্নে নন? একথা বহুস্থলে সত্য। এখন আমাদের দেশে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি অনেকাংশে প্রশংসার্হ, এবং দিনের পর দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজকাল যাঁরা উচ্চশিক্ষার্থে (খবরের কাগজে যে ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়) বিলাতে গমন করেন তাঁদের মধ্যে পঁচানব্বই জন নিজেকে অপরের কাছে 'বিলাত ফেরৎ' বলে বিজ্ঞাপিত করার জন্য যাত্রা করে থাকেন। পাঠক, এর সত্যতা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যদি কোন ফটো-যুক্ত সংবাদ দেখেন "উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা", একটু মনোনিবেশ সহকারে দেখলেই দেখতে পাবেন, সেই খবরের শেষে (Ⓐ) এইরূপ একটি চিহ্ন আছে। ঐ চিহ্ন শুধু যাঁরা পকেটের পয়সা খরচ করে নিজেদের বিজ্ঞাপন ছাপাতে চান, তাঁদের খবরের শেষে ঐটুকু লেখা থাকে। অবশ্য একথা একশ্রেণীর লোকের পক্ষেই সত্য।

আর একটা কথা বলেই প্রবন্ধটি শেষ করবো। সেটা হচ্ছে এই যে, কোন ছেলেমেয়েদের নৈতিক বা চারিত্রিক দোষ দেখা দিলে এই সব ছেলেমেয়েদের উপরে দোষারোপ করেই অভিভাবকের দায়িত্ব খানিকটা এড়িয়ে যেতে চাই। যখন বাড়ির লোকের শিক্ষার অভাব নেই, তখন কোন একটা ছেলে বা মেয়ের চরিত্র এমন হবে কেন? সেই 'কেন'টার উত্তর যদি খুঁজতে যাই তবে সেই সব ছেলেমেয়েরা যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছে তার পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, তাদের এই অধঃপতির জন্য সেই সব ছেলেমেয়েরাই একমাত্র দায়ী নয়। এদিক দিয়েও অভিভাবকের প্রখর দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য বলেই মনে হয়।

শিক্ষা যে মানুষকে উন্নত থেকে উন্নততর পথে টেনে নিয়ে যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মনে করে, এই শিক্ষা পেয়ে আমি একজন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা মন্ত্রী হবো তাহলে জানতে হবে নৈতিক দিকটা আমাদের নষ্ট হ'য়ে গেছে। মানুষ যখন প্রকৃত মানুষ হবার জন্য মানবত্বের শিক্ষায় প্রবৃত্ত হবে, তখনই জানা যাবে সে প্রকৃত শিক্ষা কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, তার আগে নয়।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান। শ্রীআশুতোষ সেন। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৸০ এক টাকা আট আনা। ১৩৫৩

স্বাস্থ্যসংকটের যুগে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যলাভ বিচার করিয়াছেন। তাঁহার সংকল্প, 'নিয়ন্ত্রিত জীবনে ক্ষয় ও জরা নিবারণ'। সংকল্প শুভ, সন্দেহ নাই; বাংলা ভাষায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রকাশ ও প্রচার এই প্রথম নহে, তথাপি এরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে, বিশেষ করিয়া যখন প্রচুর খাদ্য পাওয়া যাইতেছে না। এবং জীবন-যাপনের উপযোগিতা বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষজ্ঞের চিন্তার আশ্রয় লইতেই হইবে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, বিশেষ করিয়া যখন পুস্তকের শিরোনামায় 'নিয়ন্ত্রিত জীবনে ক্ষয় ও জরা নিবারণের' দিকে তাকাইয়া দেখি, ইহা বুঝি বৃদ্ধের জন্য লেখা; কিন্তু বাস্তবিক ইহার আলোচনা প্রণালী দেখিলে সাধারণের পাঠ্য বলিয়া, এমন কি বিদ্যালয়ে পাঠ্য বলিয়াও, গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। আদিম বর্ণে প্রতিফলন—শুধু শোভাই বর্ধন ইহাতে তথ্য এত বেশি আছে যে যত লোকের কল্যাণ করিবে না, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানপিপাসাও তৃপ্ত করিবে। অজ্ঞান দূর করিবে। আয়ুর্বেদ মতে খাদ্যের প্রবর্তন ৭১ পৃঃ দেওয়া হইয়াছে; ইহা অনেকের কাজে লাগিবে। প্রতি সম্বন্ধে যাহা পুস্তকের শেষে লেখা হইয়াছে, তাহাতেও বহু জ্ঞাতব্য বস্তু সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। সূচিপত্র ও বিষয়সূচী পাঠকের আলোচনার পক্ষে অনুকূল।

দুই একটি স্থানে অবশ্যই প্রশ্ন করিব। পেশী ও Tissue কি সমার্থক? (২৪ পৃঃ) ধমনী কি arteries (৪৪ পৃঃ)? Air-tight কি বায়ুরুদ্ধ (৪৬ পৃঃ)? পেশী কে muscle বলা হইয়াছে (৬২ পৃঃ)—এ বিষয়ে muscle ও arteries কি সমার্থক? সেইরূপ 'কষা' ও Constipation ও ঠিক একার্থক নহে (১২২ পৃঃ)।

পুস্তকের মলাট সমালোচনার দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি সাহিত্যে সুবিদিত। কিন্তু এই পুস্তকের উপরের মলাটে পঞ্চভাতীয় খাদ্য দ্রব্যের রঙীন ছবি ও নিম্নের মলাটে শরীরের আভ্যন্তরীণ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | ফাল্গুন ১৩৬০ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

মিথ্যাপ্রচার

বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে সহযোগীদের কোনও এক পত্রিকায় নিজেকে বাংলার শিক্ষাবিষয়ক একমাত্র মাসিকপত্র—The only monthly magazine on education in Bengali বলিয়া প্রচার করিতেছেন। গ্রাহক সংখ্যা যতই বেশি হউক, ভারতের বিধান যতই সুখ্যাতি করুন, শিক্ষাবিষয়ক প্রাধান্য প্রবন্ধ যতই সেখানে প্রকাশিত হউক, বাংলার শিক্ষাবিষয়ক একমাত্র মাসিকপত্র বলিয়া নিজেকে জাহির করা মোটেই সঙ্গত, সত্য, ও শোভন নয়। "শিক্ষা" আজ বারো বৎসর ধরিয়া শাশ্বতী শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার লেখক ও পাঠক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, অবশ্য তাহার বাণী সুদূরপ্রসারিণী নহে, কিন্তু তাহার ও অন্য পত্রিকার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার তো কোন সঙ্গত কারণ নাই। "শিক্ষক" ও monthly magazine on education in Bengali—একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। শিক্ষাবিষয়ক কোনও পত্রিকার বিষয়েই এরূপ প্রচারের কোনও সার্থকতা নাই।

নূতন সহযোগী

বর্তমান বেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণের মুখপত্র প্রাথমিক শিক্ষক পত্রিকার প্রথম-পাঁচ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। ইহার বার্ষিক মূল্য দুই টাকা এবং পত্রিকাটি পাক্ষিক। পত্রিকা প্রাথমিক শিক্ষক ও অভিভাবক সকলের হিতসাধন করুক, ইহা আমাদের কামনা। "প্রাথমিক শিক্ষকতে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠাবান, অধ্যয়ন ও কর্মরত ছাত্র হইতে হইবে। তাহার শিক্ষাস্পৃহাকে উগ্র করিয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বের অগ্রসর দেশগুলির প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় নানাবিধ শিক্ষণীয় পুস্তক ও পত্রিকা সরবরাহ আমাদের শিক্ষকদের দাবীর অন্তর্গত হউক। নব্যভারত গঠনে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষকগণ পূর্ণ সচেতন। তাই তাঁহাদের অবদান সমাজ ও রাষ্ট্রের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের আজীবন সেবার অধিকার প্রার্থনায় আজই প্রাথমিক শিক্ষক সংঘবদ্ধ হইতে চাহে। "প্রাথমিক শিক্ষক পত্রিকা" প্রাথমিক শিক্ষকদের

সেই আবেদনই জাতির দরবারে হাজির করিবার কঠোর ব্রত লইয়া যাত্রা সুরু করিয়াছে।"

উহার ভাবনা, এবং স্পষ্ট ঘোষণা—বিশ্ব "বাণি", "কঠোর ব্রত" এবং "বাহিত্ব"—এই শব্দগুলির মধ্যে একটা "যুদ্ধং দেহি" ভাব আছে, তাহা আমাদের ভাল লাগিতেছে না।

অধ্যাপকের সম্বর্ধনা

গত ১ মার্চ তারিখে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা মহাশয়ের ষষ্টিবর্ষ পূর্তি উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক সাহার জন্ম হয় ৬ অক্টোবর ১৮৯৩ তারিখে, সুতরাং উৎসব যথাকালেই অনুষ্ঠিত হইলে ভাল হইত। যাহা হউক সম্ভবত উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই এই দোষ হইল। অধ্যাপক সাহা ১৯১৩ সালে ফলিত গণিতে এম্ এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পদার্থ বিজ্ঞানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এবং এদেশে ও ইউরোপে গণিতের নানা বিষয়ে গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইয়া ১৯২৩ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানেই ৩৪ বৎসর বয়সে রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। পরের বৎসর এলাহাবাদে অধ্যাপনা করার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক হইয়া আসেন এবং এবার তিনি অবসর গ্রহণ করিতেছেন।

অধ্যাপনার কাজ ছাড়া বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিষয়ে অধ্যাপক সাহা সর্বদাই আগ্রহশীল ছিলেন। এবং ভারতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি ও দেশের প্রয়োজনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার নাম যুক্ত থাকিবে।

তাঁহার ছাত্র ও অনুরাগী সমাজ একই দিনে একই সময়ে ভারতবর্ষের ২৮টি কেন্দ্র হইতে এই সম্বর্ধনা উৎসব অনুষ্ঠিত করিয়াছে। আমেদাবাদ হইতে ওয়াল্‌টেয়ার, আসানসোল হইতে কোচিন অধ্যাপক সাহার জন্মদিনের শুভকামনা জ্ঞাপন করিয়াছে। ইহা পরম আনন্দের বিষয়, শিক্ষকের এই সম্বর্ধনায় "শিক্ষা"ও তাহার সুর মিলাইতেছে।

মাখালতা সোম

নীরব কর্মী শ্রীযুক্তা মাখালতা সোম বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি হার্টের অসুখে ভুগিতেছিলেন, অবশেষে ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে তিনি যখন ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ট্রেনিং বিভাগের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয়। কাজে নিষ্ঠা ও শিশুদের প্রতি অনুরাগ এই দুইটি গুণ তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ ছাড়িবার পর তিনি শিশুশিক্ষায় বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য বিলাতে যান। সেখান হইতে মন্তেসরি ট্রেনিং লাভ করিয়া দেশে ফেরেন। দেশে ফিরিয়া তিনি নিজের চেষ্টায় শিশুদের জন্য একটি মন্তেসরি বিদ্যালয় খোলেন। শিশুনিকেতন নামে পরিচিত এই মন্তেসরি বিদ্যালয়টি উত্তর কলিকাতায় বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ মনীষা ও কর্মনিষ্ঠার বলে ও স্বধর্ম খুঁজিয়া পাইলে মানুষ কেমন করিয়া কাজে সফলতা লাভ করিতে পারে, মাখালতা সোমের জীবনে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের শক্তি অনেক সময়েই ভ্রান্তপথে চালিত হয় বলিয়া ক্ষতির অঙ্ক বৃদ্ধি করে, ঠিক পথ পাইলে তবে না শক্তির বিকাশ সম্ভব। শ্রীযুক্তা সোম নীরবে কাজ করিয়াছেন, আত্মপ্রচার করেন নাই, স্বল্প পরিসরে শুদ্ধ নিষ্ঠায় কাজ করিতে করিতে আপনা আপনি প্রতিষ্ঠানটি বড় হইয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষার লেখক, গ্রাহক ও অনুরাগী পাঠক শ্রীযুক্তা সোমের মৃত্যুতে আমরা দুঃখ অনুভব করিতেছি।

তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও শিশুনিকেতনের কর্মী এবং শিশুদের সঙ্গে সমবেদনা জানাইতেছি। শ্রীযুক্তা

সৌম্যের অভাবে বিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইল, সহকর্মীরা যেন প্রত্যহ নির্মমরূপে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য চেষ্টা করিয়া শ্রীমতী সোমের প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখেন। মানুষ চলিয়া যায়, তাহার কাজই বাঁচিয়া থাকে।

দুর্মূল্য ভাতা ও শিক্ষকদের অভিযোগ

শিক্ষকদের দুর্মূল্যভাতা বৃদ্ধির আন্দোলনটি শেষ হইয়াছে। কি ভাবে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটিল ও কি কি দাবি তাঁহাদের মিটিল সেসব আজ এতই অল্পদিনের কথা যে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সকলেই তাহা পরিষ্কার ভাবে জানেন।

কিন্তু এই আন্দোলনের শেষাশেষি যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তাহার বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলা যায়। প্রথম কথা, সরকারের অদূরদর্শিতা। সেই তো, সকল দাবিই পূরণ করিতে হইল, তবু সময়ে তাহা না করায় শুধু যে রাজপথে শুভাশ্রির তাণ্ডব লীলা প্রকট হইতে দেখা গেল তাহা নয়, সরকারের দুর্বলতার একটি নিদর্শন হইয়া রহিল। বলা যাইবে যে, চাপ দিতে পারিলেই কাজ আদায় করা যায়। চাপের মাত্রা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার যে পরিচয় সরকার প্রত্যক্ষ করিলেন, আশা করি তাহাতে ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের চক্ষু খোলা থাকিবে।

তারপর, শিক্ষকদের পক্ষে বলিতে হয় যে, তাঁহারা যদি যখনই জানা মাত্র আন্দোলন বন্ধ হইল বলিয়া ঘোষণা করিতেন তবে তাঁহাদের যত গৌরব-মণ্ডিত হইত, মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাইত। বাহিরের যে চাপে আন্দোলনের শেষ দিকে ব্যাপারটি রাজনৈতিক দলবিশেষের হাতে গিয়া পড়িল, অবশেষে কলিকাতা নগরী গুণ্ডামির চরম প্রকাশে ধনক্ষয়, লোকক্ষয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলার লীলাভূমি হইয়া উঠিল, তাহাকে প্রতিরোধ করার শক্তি তো শিক্ষকদের হাতে ছিল না। কাজেই তাঁহারা সময়ে সচেতন হইলে তাঁহাদের আন্দোলনের বিশুদ্ধতা বজায় থাকিত।

যাহা হউক, এ কথা বলিতেই হইবে যে, উচ্চস্তরেই ব্যাপারটি গভীর পরিতাপের বিষয় হইয়াছে। এখন ইহার শিক্ষা যদি উভয় পক্ষ গ্রহণ করেন, তবু মঙ্গলের একটা ভাল হইবে। আমরা সর্বান্তঃকরণে শিক্ষকদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, তাঁহাদের আর্থিক মান উন্নত হউক, সমাজে তাঁহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হউক কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহাও আশা করি যে, তাঁহাদের একনিষ্ঠ সেবায় দেশের শিক্ষার উন্নতি হউক। তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সমগ্র শিক্ষাজগতে কল্যাণকর পরিবর্তন আনয়ন করুক।

নয়ী তালিমে জীবন-দর্শন

বিনোবা ভাবে

স্বরাজ লাভের দশ বৎসর আগে ১৯৩৭ সালে বাপুজী নয়ী তালিমের পরিকল্পনা দেশের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন। স্বরাজ অর্থে, বিদেশী শাসন হইতে চালিয়া যাইবে, বাপু এতটা মনে করিতেন না। তিনি মনে করিতেন, দেশে স্বরাজ আসিলে এমন এক সমাজ সৃষ্টি হইবে যাহার মধ্যে শোষণ থাকিবে না। কেন্দ্রিত শাসন বিকেন্দ্রিত করিয়া যাইবে, প্রত্যেকে আপন আপন শক্তির বিকাশের জন্য পূর্ণ সাহায্য ও সুযোগ পাইবে।

নয়ী তালিম মানে নূতন মূল্যের স্থাপনা। পুরাতন শিক্ষায় চুরিকে পাপ মনে করা হইত, নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে কেবল চুরি করা নয়, অধিক সংগ্রহকেও পাপ মনে করা হয়। পুরাতন শিক্ষা শারীরিক আর মানসিক পরিশ্রমকে পৃথক করিয়া দেখে। নয়ী তালিমে এই দুই শ্রমকে শুধু সমান মূল্যই দেয় না, এই দুইয়ের সমন্বয় করে, সমন্বয় সাধন করে। পুরানো শিক্ষায় 'ক্ষমতা'র জাতি খাড়িয় করে, নূতন শিক্ষা পদ্ধতি ক্ষমতাকে সমতার দাস মনে করে। পুরানো বিশ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী, শক্তিকে অলগ দেবতা রূপে পূজা করিত, নয়ী তালিম মানবতার পূজা করে আর এই তিনটিকে মানবের সেবার সাধনরূপেই অবলম্বন করিতে চায়।

আমাদের স্বরাজ্যের অর্থ শুধু রাজশক্তির বদল নয়। স্বরাজ অর্থে শাসন শব্দটি উঠাইয়া দিয়া সেবা শব্দকে তাহার স্থানে বসাইতে হইবে। বর্তমানে কেহ কেহ এই দুইটিকে মিলাইয়া দেখিবার এক কথা তুলিয়াছেন, সেবারা বলেন, জনসেবার জন্যই স্বাধীনতা। সেবাই আমাদের আদর্শ। অনুগামী জনসাধারণও ভাবে যে, সেবা হইতেছে, রাজনীতির জন্যই সেবা করিতে হইবে। জনগণ এই ভাবেই নেতাদের ভাষার অনুবাদ করে। ফলে হয় কি, আজ দেশের সব রাজনৈতিক দলগুলির মুখে কেবল রাষ্ট্রশাসনের কথা, আর সেবার কাজ সমর্পিত হইয়াছে "ভারত-সেবক সমাজের" উপর।

স্বরাজের প্রকৃত অর্থ যদি আমরা গ্রহণ করিতাম, তবে পুরানো রাজতন্ত্রের সঙ্গে পুরানো শিক্ষা-পদ্ধতিও দূর করা উচিত ছিল। কাজে কিন্তু নূতন রাজ্যেও পুরানো শিক্ষাপদ্ধতিই চলিতেছে। আর তাহারই পরিণামে বিদ্যার্থী হইয়াছে অনুশাসন-বিহীন। এখন তাই নেতাদের মন নয়ী তালিমের দিকে ঝুঁকিয়াছে। কিন্তু বেকার সমস্যা দূর করা বা বিদ্যার্থীদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলার ভাবনা আনয়ন করা এই গুলি তো বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান লাভ নয়; ইহার প্রধান মূল্য তো এই যে, জগতে নূতন মূল্য স্থাপন করাই ইহার লক্ষ্য। এই নূতন মূল্যের যখন জয় হইবে, তখনই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত গুণগ্রহণ হইবে।

আজ বুনিয়াদী শিক্ষার যতটা গুণ স্বীকার করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহা এতই আংশিক যে ঐ আধারে বুনিয়াদী শিক্ষার বিকৃতির মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া ইহা দেখিতেছি। আজ নয়ী তালিমের যে ব্যাপক প্রয়োগ চলিয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের আওতায়। ফলে সর্বত্রই ঠাসুর পদ্ধতিতে কাজ চলা হইতেছে। নয়ী তালিমের পিছনে জীবনের এক দার্শনিক আদর্শ আছে। ঐ আদর্শ গ্রহণ না করিলে ইহার যে আংশিক গ্রহণ ও বিকৃত অনুকরণ ঘটে, তাহার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার বদনাম ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়। আর, তাহাই হইতেছে। যে সব রাজ্যে এই শিক্ষার সরকারি

প্রয়োগ হইতেছে, তাহাদের মধ্যে বিহারের চেষ্টাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেখানেও আমি যে কথা লিখিয়াছি, তাহাতে ভয় হয় যে, বুঝি বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাধি রচনা হইতে চলিয়াছে।

তবে এই বিকৃতির জন্য দায়ী আমরাও, যাহারা এই শিক্ষাকে সরকারের আশ্রয়ে যাইতে দিয়াছি। উচিত ছিল, আমরা জায়গায় জায়গায় এই পদ্ধতির বিশুদ্ধ নমুনা খাড়া করিয়া তুলিব। কিন্তু তাহা হইল না, কারণ আমরা বিভিন্ন সংঘগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চালাইতে লাগিলাম। গান্ধীজি এই কথাটা চিন্তা করিয়াছিলেন, আর সব সংঘগুলিকে একত্রিত করার কল্পনাও তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার এই বিচারটি এখনও পুরাপুরি ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। আজ চরকা সংঘ সর্বসেবা সংঘের সঙ্গে মিলিয়া যাওয়ার সাহস দেখাইয়াছে, তাই ইহার পথ খুলিয়া গিয়াছে। নঈ তালিমের প্রকৃত শুদ্ধ ও তেজীয়ান রূপ দেখাইতে হইলে তালিমি সংঘ আর সর্ব-সেবা সংঘকে মিলিত হইতে হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন সর্ব সেবা সংঘ আর তালিমি সংঘ, দুই-ই নির্জীব থাকিবে। বড় আর মৃত আলাদা হইলে শরীরের যে দশা হয় ইহারও সেই অবস্থা।

স্বরাজ লাভের পর এই শিক্ষার অন্তত আংশিক প্রয়োগও কেন হয় নাই, আজ ছয় বৎসর পরে সেদিকে খেয়াল হইল। ইহাতে আমার যত আশ্চর্য না লাগে, তাহার চেয়েও বেশি আশ্চর্য কথা যে আমরা নিয়ন্ত্রণ সমপ্রভার চর্চা করিলেও সমপ্রভার অর্থ আমরা বুঝি না। সর্বোদয়ওয়ালা কংগ্রেসের সদস্যকারী হইতে পারেন, রাজ্যের মন্ত্রী হইতে পারেন, বিরোধী রাজনৈতিক দল পর্যন্ত গঠন করিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে একতা আনিতে পারেন না। এই অবস্থা আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা দরকার।

সরকারি কর্মকর্তাদের আওতায় আজ পর্যন্ত যতটুকু এই পদ্ধতির প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা দুই প্রকারের; এক প্রকার তো যাহারা জানিয়া বুঝিয়া বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করিতেছে, তাহাদের মতে ইহাতে ব্যবস্থাপনা, ইহাতে এমন কিছু শিক্ষালাভ হয় না; অভিভাবকগণ ইহাতে ক্ষুব্ধ, বিদ্যার্থীও অসন্তুষ্ট। ইহাকে বলা যায় একটি উৎকৃষ্ট মিশিনের অ-প্রামাণিক বিচার। এ বিচার আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। আরেক প্রকার আছে প্রামাণিক বিচার, কিন্তু তাহাতে একটা ভুল করা হয় কি, নূতন মূল্যকে স্বীকার না করিয়া পুরানো মূল্যের আধারেই নূতন পদ্ধতির কিছু কিছু গুণ স্বীকার করিয়া কাজ করা হইতেছে। সেইজন্য, প্রামাণিক হওয়া সত্ত্বেও নঈ তালিমের আসল রূপ সেখানে দেখা যায় না। তাই আজ, নূতন মূল্যের বুনিয়াদের উপর মতুয়ে সম্বন্ধে শুদ্ধ প্রয়োগের জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজন। তাহার জন্য এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে নঈ তালিম, সর্ব-সেবা আর স্বাধীন বস্তু এই তিনটির একাত্মতা সাধিত হইবে।

যখন দেশ পরাধীন ছিল তখন জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা ছিল। আর তাহার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠও খোলা হইয়াছিল। আর জনসাধারণ মনে করে, দেশ যখন স্বাধীন হইয়াছে, তখন সব সরকারি বিদ্যালয়ই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হইয়াছে বলিলেই তো হইয়া যায় না। উহাকে করিয়া তুলিতে হইবে। আমার আশা আছে যে একদিন উহা হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সরকার হইতে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োগ ও পরীক্ষার আবশ্যকতা থাকিয়া যাইবে। গ্রামে গ্রামে, পরিস্থিতি অনুযায়ী জনসাধারণের চেষ্টায় স্বতন্ত্র শিক্ষালয় থাকা আবশ্যক। নতুবা, দেশের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি সরকারি নীতিতে চালিত হয় তবে দেশের শিশুদের মনোভাব সরকারি এক বিশিষ্ট ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা থাকিবে। এই দিক দিয়া দেখিলেও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ ও প্রচলন সরকারনিরপেক্ষ হওয়া উচিত।

এই সব আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার।*

*'নঈতালিম পত্রিকার জানুয়ারী ১৯৫৯ সংখ্যা হইতে অনূদিত।

ডায়েরির এক পাতা

শ্রীসুধীর চন্দ্র রায়

শুক্রবার বেলা ১২।৩৫ মিনিট। (১৯ ১০৫১)

বছরের প্রথম দিক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে প্রবেশিকা বাংলা সঙ্কলন বের করা হয় তা বরাবর বাজারে ছাপানো না হওয়ায় বাজারে বই পাওয়া যাচ্ছে না। কথাটা এমনি রটেছে বটে, তবে ভেতরকার কথা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বই যে যেমন 'কমিশন' পেওয়া হয় না তাই দোকানে বেশি বই রাখা হয় না। যারাও রাখে, তারা আবার বেশি টাকার বই একযোগে না কিনলে সেগুলো বিক্রি করে না। বিশেষতঃ বোর্ডিনী পুস্তক ওর সঙ্গে কিনতেই হবে। আর্থিক দিক দিয়ে দেশের সাধারণ লোক প্রাক-উনিশশো-সাতচল্লিশ আর উত্তর-১৯৪৭ এ বিশেষ পার্থক্য টের পায়নি। যারা অর্থনীতি ক'ষে তারতম্য নির্ণয় করেছে, তারা বলে দেশের অর্থদুর্নীতি ছাড়া স্বাধীনতায় আর কিছু হয়নি; খুব শুভবাদী যারা তারা বলে, অর্থের এ দুর্নীতি থাকবেনা, কারণ সংসারে কিছুই যে চিরস্থায়ী নয় একথা ইংরেজরা চলে গিয়ে আর একবার প্রমাণ করে দিয়েছে। দেশের বাণিজ্যিক মহলে যারা নাম লেখায়নি তারা বলে, বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরা দোকান খুলে অতিচারকদের এই কষ্টকে অনায়াসে তো লাঘব করতে পারে। কিন্তু 'প্রেস্টিজ্' বলে একটা বস্তু আছে, তা তারা জানেনা অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারেরা তো দেখা না দেবে পারে না তাই তারা বলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে Advancement of Learning বলা হয়, তা Learning এর 'L'টি কালক্রমে অস্পষ্ট হয়েছে সত্যকথা, কিন্তু এখনও ওটা একেবারে তো মুছে যায়নি, এবং মুছে যে যায়নি তার প্রমাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় বিল্ডিং-এর নীচেকার কাপড়ের দোকানের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের বিভাগের তেতালের ব্যবধান এখনও পাকাই রয়ে গেছে।

অতএব কোন সমস্যার সমাধান হতে পারেনি, তাই ছেলেরা বাংলা বই কিনতে পারনি এবং তার ফলে আমাকে কয়েকদিন নবম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণই পড়াতে হবে। ত্রিকোণ প্রভাব পাথারে পদার্থের মধ্যেও পূর্ণভাবে যে বিস্তৃতে প্রকাশ পায় তা একেবারে জলের মতো বেন সহজ হয়ে গেল।

একঘেয়ে বাংলা ব্যাকরণ যখন পড়াতেই হবে, তখন তাকে interesting করতেই হবে। 'ডিউবি' সাহেবের Interest and Effort এর ব্যাখ্যাটা পক্ষে বিপাব, Kilpatrick এর তথ্যও বাদ দিলাম না। ইংরেজি ভাষার How to teach Grammar ও একবার দেখে নিই, এসব বিষয়ে বাংলা কোনো বই এখনও তৈরি হয়নি।

বাংলা বই না থাকুক, আমাকে বাংলাতেই পরিশ্রম করতে হবে।

আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট সাহেবের কথা যদি মানতেই হয়, তবে অনুকরণ প্রণালীতে (Correlation) ব্যাকরণও পড়ানো উচিত। তার মনে অনুকরণ করব দেখা আজও আমার স্পষ্ট হয়নি। স্পষ্ট করে নিতে ইচ্ছাও হচ্ছেনা আমার, এ দেশের নবম শ্রেণীর ছাত্র কেবল নবম শ্রেণীরই ছাত্র নয়। তারা ভবিষ্যতের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। আর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী মানেই পরীক্ষা-দেওয়া যন্ত্র বিশেষ, শিক্ষার্থী তারা নয়। তাদের নির্দিষ্ট পাঠ্য অংশ সম্পূর্ণ করতেই হবে। এই 'Course Complete'-এর জোগানে বাংলাদেশে শিক্ষকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় না এমন শিক্ষকের খবর জানিনা।

বাংলা ব্যাকরণ এখনও সাবেক পণ্ডিতমশায়েরাই পড়িয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, ব্যাকরণ ব্যাকরণই। অনেক ইংরেজও তাই বলেন। তবে ইংরেজের বলার সঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহারে পার্থক্য হচ্ছে, পণ্ডিতমশায়েরা এই ব্যাকরণের ক্লাসটায় লক্ষণের গণ্ডী এঁকে দেন, পাছে সাহিত্য-বস্তুটি ঢুকে পড়ে।

অতএব আমার সমস্যা ভীষণ সমস্যা। ক্লাসের লেটখাতার পাতা উলটালাম, এ বিষয়ে ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকেরা যদি কোন মন্তব্য করে থাকেন সেই আশায়। দেখলাম Lesson Plan সম্বন্ধে ব্যবস্থাপত্র তাঁরা মাখা ঘামাননি। পরিদর্শক-মহাশয় বিষয়টি আমাদের বিপজ্জনক হয়েই থাকুক, এই অভিসন্ধিই বোধ হয় তাঁদের ছিল।

আসলকথা, ট্রেনিং কলেজ মনোবিদ্যার তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বেশি তত্ত্ব কাজে-কর্মে প্রয়োগ করতে চায় না। অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকেরাই ছাত্রদের পরীক্ষা-পাশের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর বেশি নির্ভর করে থাকেন। কোনো কিছু হাতে-কলমে করানোকে তকলিফের ব্যাপার ব'লে সব শিক্ষকেরাই মনে করে থাকেন। Self activity সম্বন্ধে বক্তৃতা করা বড় আরামের, তাকে কাজে খাটানো ততটাই বিরক্তিকর। চারঘণ্টা বক্তৃতা করা পান করারই মতো, কিন্তু একঘণ্টা ঠাণ্ডা মাথায় ছেলেদের দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া যেন মাটি-কাটা পরিশ্রম করা।

তাই আমাদের পরিদর্শক রচনার দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়নি। তবে তাঁদের বিশ্বাস আছে, ওটি আপনা থেকেই আমরা করতে পারব। আর, আমাদেরও বিশ্বাস আছে ও বিষয়ে আমরা পরিদর্শকদের ফাঁকি দিতে পারব।

আমিও তাই হার্বার্ট অনুমোদিত আধুনিক তিনটি ধাপে বস্তু সমাস সাধিবে, অভিযোজনে অনুশীলনীর অন্তে রবীন্দ্রনাথ নজরুল প্রেমেন্দ্র কবি-ত্রয়ের কবিতাংশ উদ্ধৃত ক'রে দিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যে আগ্রহ সৃষ্টির অন্তেই ব্যাকরণ-কে পড়ানো। ব্যাকরণ যে জীবন্ত ভাষার সমতালে চলে, ব্যাকরণ যে মূলত ভাষা ও সাহিত্য-রস উপলব্ধির সহায়ক সেই দিকে দৃষ্টি দিয়েই পরিলেখ রচনা করলাম।

বন্ধু পরিলেখটি দেখে বললেন, সর্বনাশ! করেছেন কি?

—কেন?

—জানেন না? সেদিন অমুক স্কুলে মেয়েদের ক্লাস দেখতে গিয়ে একজন অমুকের মাতার একটা দুর্ঘটনামূলক ব্যাপার মন্তব্য করেছেন?

—কেন?

—ব্যাকরণ পড়াতে এইসব কবির উদ্ধৃতি-বচন জুড়ে দেওয়ায়।

—কেন, দোষ কি?

—তাঁর মতে, এতে ব্যাকরণের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

উদ্দেশ্যের আসল নকল আমার বোধে তেমন স্পষ্ট হল না। তবুও কান না দেওয়াই স্থির করলাম। ভাবলাম, তাঁর যেমন যুক্তি আছে আমারও তেমনি যুক্তি আছে। এ বিষয়ে তিনিও যেমন কোন ওস্তাদ পড়াইয়ের অভিজ্ঞতা কিছু দেখাতে পারবেন না, আমিও নয়।

অতএব সেই পরিদর্শক যদি এখানে আজ আসেন, তবে তাঁর সঙ্গে যে আমায় লড়াই করতেই হবে সেই বিবেচনায় প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। অবশ্য চাই না, যুক্তি আর অনুভূতি দুটিই চাই। শুধু যুক্তিতে চলবে না। চোরেরও যুক্তি থাকে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে উহার অনুভূতিও তাঁর কাছ থেকে দাবি করব। দাবি করব, তিনি ব্যবহারিত এই পদ্ধতির কোন্ কোন্ দোষ পেয়েছেন তার দু-একটা ঘটনা মেনে নিতে। পুঁথিপড়া যুক্তি শুনতে চাই না।

খুব গর্ব ও দম্ভ নিয়ে ক্লাসে ঢুকলাম। বোর্ডও মুছে নিলাম। হাতে খড়িও আকড়া ধারণ; মনটা

জানালা খুলে দেওয়া, ছেলেদের বার-তিনেক ওঠ-বস করানো প্রভৃতি খুল হাইজিনের সভ্য নিয়মগুলো পালন করলাম।

আয়োজনের প্রথমটা কাটিয়ে সবে মাত্র 'উপস্থাপন' সুরু করেছি, পরিদর্শক নীরবে টেবিলের উপরকার র‍্যাংকাডাটা নিয়ে পিছনে গিয়ে বসলেন। ইনি সেই দুর্ঘটনাকারী পরিদর্শক নন দেখে আশ্বস্ত হলাম। সহজও হলাম। আমি তখন বোর্ডের কাছে।

চশমাটা নেমে পড়েছিল, ঠিকমতো বসিয়ে নেবার অবসরে পরিদর্শকের পাঠ-নিরত ভাবটি দেখে কাজে মন দিলাম।

অঙ্কটার শক্ত নিশ্চিহ্নে যে ঘষে সমাধান তৈরি করা হয় সেখানটাতে এসে গেছি।

ক্লাসের ছেলেদের কাছে বেশ সাড়া পেলাম।

ক্লাস ফাইভের ছেলে যে-রসিকতায় হাসতে পারে, এরাও সেই অতি তুচ্ছ কথায় আনন্দে হেসে পড়ল, মনে হল, বুদ্ধিবৃত্তি আর আনন্দের দিক দিয়ে এরা কতই না মিল। দশবৎসর আর চৌদ্দ বৎসরে যেন কোন পার্থক্যই নেই।

যন্ত্রের মতো পড়িয়ে যাচ্ছি আর অন্তরঙ্গের মতো এই কথাই ভাবছি। কাজ আর চিন্তা বিদ্যুতের চলেছে। এইটেই কিন্তু বাইরের দিকে এক অভিনব অস্বিস্তার সৃষ্টি করেছিল আমার চোখে নেই। আমি কি করব। কলকাতার অনুযোগিত মুখে। সেই অস্বিস্তার জোরেই ছেলেদের আমি. শিক্ষানবিশ যে। যন্ত্রমুক্ত করে রাখতে পেরেছিলাম। গলার নীচের কাঁপুনিকে যেন গলার-ধারা ব'লে গান গাইবে ওস্তাদ কুল করল।

ছেলেরা সবচেয়ে উপভোগ করল, কবিতার মধ্যে থেকে ঘর সমান বের করবার রীতিটিকে। ভালো কবিতা এরা ভালোই বাসে। আর ভালো কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়েই জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাই বোধ হয় ব্যাকরণের পৃষ্ঠায় কবিতা উদ্ধৃতিতে আর তাদের এই মাস্টার মশায়ের কবিতা-আবৃত্তিতে বিশেষ পার্থক্য অনুভব করে। শব্দ অন্ধ-ই।

অষ্টম শ্রেণীতে ইংরেজি ক্লাস কিন্তু তেমন ভালো হল না। আজকে পঞ্চাশজন ছাত্রই উপস্থিত ছিল। ঘরটা ইস্কুলের একটা উপরীপ বিশেষ। তিন দিকে বড় বড় জানলা, বারান্দা; কাজেই 'বহুজন' যাওয়া আসা করে, বহু সমস্যা উঁকি ঝুঁকি মারে। ক্লাসটা হোতলায়। শিক্ষকদের 'মেলা-ঘর' বা হেডমাস্টার মশায়ের ঘর থেকে একেবারে নির্বাসিত। ছেলেদের বিশেষ তদারককে রাখা হয় না। সবচেয়ে মজার, গায়ে লাগান সামনের বাড়ী থেকে রেডিয়োর গান, রঙ-বেরঙের শাড়ী, ঝিয়ের চিৎকার, ছাত্রদের এবং তাদের এই নূতন মাস্টার মশাইকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছে। ছেলেরা শীতকালেও কেবলই জল খেতে চলেছে, বাইরে যাওয়ার অনুরোধের অন্ত নেই। আমি কি করব। কলকাতার অনুযোগিত মুখে। সেই অস্বিস্তার জোরেই ছেলেদের আমি. শিক্ষানবিশ যে।

বুনিয়াদী পদ্ধতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রথম শ্রেণী

ছাত্র-ছাত্রীর বয়স—৬-৭

জ্যোতিষের কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার আগে কতকগুলি বিষয়ে শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা গেল।

(১) আলো বর্তমান থাকিলে জিনিষের ছায়া বিপরীত দিকে পড়ে।

(২) আকাশে নানা বর্ণের ও ছোটবড় নানা রকমের তারা দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ তারার বিশেষ বিশেষ নাম।

(৩) তারাগুলি একদিক হইতে অন্যদিকে সরিয়া যায়।

(৪) আকাশে সময় সময় তারার ন্যায় অথবা গোলার ন্যায় পদার্থ দ্রুতগতিতে চলিয়া যায়।

(ক) তাহাদের গতিবেগের বিভিন্নতা।

(খ) তাহাদের বর্ণের বিভিন্নতা।

(গ) কিছুদূর যাওয়ার পর তাহারা অদৃশ্য হয়।

(ঘ) কখনও কখনও তাহারা কাটিয়া বিভক্ত হয়—কোন কোন ক্ষেত্রে কাটিবার সময় আওয়াজ হয়, যদিও এরূপ ঘটনা বিরল।

(ঙ) কখনও ধোঁয়ার মত একটি লেজের সৃষ্টি হয়, আবার শীঘ্রই তাহা অদৃশ্য হয়।

(৫) চাঁদের কলা পরিবর্তন ও কলা অনুযায়ী প্রতি সন্ধ্যায় আকাশের বিভিন্ন অংশে চাঁদের অবস্থিতি।

(৬) উদয় ও অস্তের সময় সূর্যের বর্ণ ও রূপের তাহার পরিবর্তন।

(৭) ঋতু অনুসারে সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান।

(৮) বহু দূর হইতে জাহাজ আসিলে প্রথমে তাহার মোঁয়া, পরে মাস্তুল এবং অন্যান্য জিনিষ দেখা যায়। অনেক দূরের কোন জিনিষের কেবল মাথার অংশ দেখা যায়।

(৯) চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় ছায়ার আকৃতি গোল হয়। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময়ও চাঁদকে দেখা যায়। চাঁদের তখনকার বর্ণ।

(১০) কাচে 'সুখো' মাখাইয়া অথবা ধূম্রবর্ণের ও কালো রংয়ের কাচ দ্বারা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করা।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের জ্যোতিষ শিক্ষা এই সকল পর্যবেক্ষণে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হইবে। সাধারণ শিশুর ৬।৭ বৎসর বয়সে ইহার অধিক বুঝিবার ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়। পরবর্তী শ্রেণী-সমূহে এই সকল পর্যবেক্ষণের ফল পাওয়া যাইবে।

শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া শিশুদের মনোরঞ্জক উপায়ে কি ভাবে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় তাহারই একটি নমুনা কথোপ-কথনের ছলে নীচে উল্লেখ করা গেল।

এক কৃষ্ণপক্ষের দশমী বা একাদশী তিথিতে ছাত্রছাত্রীরা মাষ্টার মহাশয়কে ঘিরিয়া বসিল, সকলে তো দিনের বেলায় নতুবা জ্যোৎস্না রাত্রিতে চড়ুইভাতি করে, তাহারা অন্ধকার রাত্রে চড়ুইভাতি করিবে।

প্রথম ছাত্রী বুবু—কই মাষ্টারমশাই, আমাদের অন্ধকার রাত্রির চড়ুইভাতি হবে না?

টুনী—এখনই তো অন্ধকার রাত্রি, তবে চড়ুইভাতি হবে মাষ্টারমশাই?

মাষ্টার মহাশয়—তোমরাই বল, কবে?

কাজু—কালই হোক, মাষ্টারমশাই।

মাঃ মঃ—আচ্ছা, তবে কালই হবে। কিন্তু

অন্ধকারে আর মাঠের ধারে গিয়ে কাজ নেই, ইস্কুলেই করা যাবে।

তাহু—খাবারটা?

মাঃ মঃ—খাওয়ার কথাটা তাহুর ভুল হবে না। আগের মত এবারও যার যার খাবার নিয়ে এসো।

[পরদিন বিকালে সকলে ইস্কুলে আসিল—সঙ্গে আনিয়াছে এক একটি খাবার পুঁটুলী।]

মাঃ মঃ—দেখ, অন্ধকার হবার আগে খাবার জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে নাও, তারপর হাতে জল ছিটিয়ে ধুলো মুছে দাও।

[সবাই তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ শেষ করিল।]

মাঃ মঃ—ঐ দেখ, আকাশে একটা তারা উঠেছে। একতারা বটি, বাটি ইত্যাদি।

রাণী—তারপর যেন কি? 'তারারা সাত ভাই'—।

মাঃ মঃ—তুমি বল না? জান, কোন্ তারারা সাত ভাই?

টুনি—আমি জানি, যে তারাটা সবার আগে উঠবে।

মাঃ মঃ—ঠিক, সেদিন তোমাদের কৃত্তিকার কথা বলেছিলাম মনে আছে? সেই কৃত্তিকাকে চলতি কথায় বলে, সাতভেয়ে।

টুনী—কৃত্তিকা? কৃত্তিকার কথা আবার কবে বললেন?

বুবু—যাবে, সেই যে কতকগুলি তারা জড়াজড়ি করে থাকে।

টুনি—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ—(মুখস্থ করিতে লাগিল) কৃত্তিকা, কৃত্তিকা।

মাঃ মঃ—এই তো বুবু ঠিক বলেছে। আর দেখ, এই ৭টা তারা অনেকটা সাতভেয়ের মত, তবে অত জড়াজড়ি করে এক জায়গায় বন হয়ে নেই। ফাঁকা, ফাঁকা, কিন্তু অনেকটা ঐ রকমই মনে হয় না? আকাশে ওরা যেন জিজ্ঞাসার চিহ্ন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসার চিহ্ন কাকে বলে তোমরা জান?

তাহু—না, মাষ্টার মশায়।

মাঃ মঃ—এই, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কৃত্তিকা কাকে বলে। এই কথাটা লিখতে গেলে শেষদিকে এরকম একটা চিহ্ন দিয়ে শেষ করতে হয়। (ঘাটিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকিয়া দেখাইতে হইবে)। তা না করে যদি দাঁড়ি দিই তবে তার অর্থ অন্যরকম হয়ে যাবে। বোঝা যাবে না যে তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছো। এখন বুঝলে তো সবাই? আর, জান, এই তারা সাত-টার মধ্যে নাম আছে—সপ্তর্ষি। অর্থাৎ সাত ঋষি। সাতজন ঋষির নামে সাতটি তারার নাম হয়েছে।

টুনি—(মুখস্থ করিতে লাগিল)—সপ্তর্ষি, সপ্তর্ষি।

বুবু—তা, তারাগুলো আলাদা আলাদা থেকে কি করে ওরকম চিহ্ন তৈরি করবে?

মাঃ মঃ—আরে, মনে মনে আকাশে লাইন কেটে তারাগুলোকে যোগ করে নিলেই হবে। আচ্ছা, তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি একটা মজা করে। তোমরা সাতজন এসো তো এদিকে। এখন দাঁড়াও দেখি, ঠিক ঐ সাতটি তারার মতো। বুবু, তুমি এখানে দাঁড়াও, না, না, তাহু, আরেকটু সরে এসো। প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা যদি এত দূরে হয়, তবে তৃতীয়টা এতটা দূরে হবে নাকি? হাঁ, হয়, ঠিক দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এবার সবদের দাঁড়ান ঠিক হয়েছে। এবার রাণী, তুমি সবদের পা-গুলো বরাবর খড়ি দিয়ে একটা লাইন কেটে যাও।

টুনী—এবার আমরা সরে যাই, মাষ্টার মশাই।

মাঃ মঃ—হাঁ, এখন দেখ, রাণী কাটা লাইন থেকে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হলো না?

সবু—ঠিক, ঠিক তো।

বুবু—এমনি করে মিলিয়ে নিলে, তারাগুলো নিয়ে কত কিছুই তো বানানো যায়।

মাঃ মঃ—হুঁ, তা যায়ই তো। এমনি করেই

লোকেরা আগে আগে নানা রংবেরঙের বানিয়ে তাদের নাম সেই সব রংবেরঙের নামে রাখত।

কাদু—মেঘও কিন্তু অনেক সময় অনেক রঙের মত দেখায়।

মাঃ মঃ—ঠিকই বলেছ, কিন্তু মেঘ যে বদলে যায়। তারা নিয়ে যে সব জিনিস বানানো যায় তা আর বদলায় না। এক বছর না, এক হাজার বছরেও কোন বদল দেখতে পাওয়া যায় না।

বুবু—কোন্ কোন্ তারা দিয়ে কি কি রংবেরঙের বানানো হয়েছে?

মাঃ মঃ—তোমরা নিজেরাই খানাও, আমি দেখি।

টুনি—(উত্তেজিত ভাবে) মাস্টার মশাই, মাস্টার মশাই, ঐ যাঃ—একটা তারা পড়েই গেল! আকাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কোন তারাটা পড়লো মাস্টার মশাই?

মাঃ মঃ—ওগুলো তারা নয়। এর পরে বলবো তোমাদের। (বুবুর দিকে সহাস্যে তাকাইয়া) তোমরা বড় হও একটু, তারপর। আচ্ছা, টুনি, ঐ তারার রং কিরকম ছিল, বল তো?

টুনি—রং—রং—তারার মত।

বুবু—ওটার রং ছিল নাদা মাস্টার মশাই, ঐ তারাটার মত।

কাদু—না, মাস্টার মশাই, অত নাদা নয়, ঐ দুধের তারাটার মত হবে।

রাণী—নাদা ছিল না ছাই—ওটা ছিল লাল। ঐ তারাটার মত।

মাঃ মঃ—বুবুর কথাই ঠিক। ওটা নাদাই ছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মাঝে মাঝেই এমনি তারা খসে পড়ে। এগুলো তারা নয়—এদের বলে উল্কা। আচ্ছা, এক কাজ করা যাবে। একটা সময় ঠিক করে নিই। মনে কর, সন্ধ্যে ৭টা থেকে, ৮টা। টুনি ঘুমিয়ে পড়বে না তো?

টুনি—না মাস্টার মশাই।

মাঃ মঃ—আচ্ছা, তবে ঐ সময়টা তোমরা বাইরে থাকিস বাইরে বসে, যা গুনবে, দেখবে আকাশ থেকে কটা উল্কা পড়ে, কে কয়টা দেখতে পাও। পরদিন ইস্কুলে এসে আমাকে বলবে।

রাণী—বেশ হবে। দেখবো কে সব চেয়ে বেশি দেখতে পায়।

মাঃ মঃ—জান, বিলাতে, আমেরিকায়, সব জায়গায় লোকেরা এমনি করে উল্কা দেখে তার হিসেব একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠায়। তাই থেকে অনেক কিছু হিসেব করে বার করে ওরা।

টুনি—তবে আমরাও পাঠাব মাস্টার মশাই। ঐ যে আর একটা পড়লো।

মাঃ মঃ—কোথায় যে কোথায়?

বুবু—বাবে, এতক্ষণে চলেই গেল। আপনি যে দেখতে দেরি করলেন।

মাঃ মঃ—কোন্ খান থেকে কোন খানে গেল?

বুবু—ঐ খান থেকে ঐ দিকে।

মাঃ মঃ—আচ্ছা, অমনি বললে, কেউ বুঝতে পারে? কোন্ তারার কাছ থেকে আরম্ভ করে, কোন্ তারার কাছে গিয়ে মিলে গেল, তাই বল।

বুবু—ঐ তারাটার কাছ থেকে তো আরম্ভ হলো, কিন্তু কার কাছে গিয়ে শেষ হলো, আর বলতে পারছি না।

মাঃ মঃ—আচ্ছা, আগেরটা জোরে গিয়েছিল, না, এটা?

বুবু—এটাই আগের থেকে জোরে।

কাদু—এটা ছিল নীল।

তাদু—শুধু তারাই দেখব মাস্টার মশাই, গাছপালা? বেজায় খিদে পেয়েছে।

মাঃ মঃ—আচ্ছা, চল এখানে। তোমরা এখন যা যা জানতে চাও? এখন গল্প করি, চল।

[গল্পের নামে সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।] মাস্টার মহাশয় এখন উপাখ্যান শুনাইলেন।

পরে বলিলেন যে ভগবান ধ্রুবকে থাকিবার জন্য এমন একটা জায়গা ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, যার কখনও নড়চড় হইবে না। বরাবর এক জায়গায় থাকিবে।

মাঃ মঃ—সেই জায়গাটা কোথায় জান?

টুনি—কোথায় মাস্টার মশাই?

মাঃ মঃ—আসলে সেটা একটা তারা, এই তারাটির নড়চড় হয় না। অন্য তারাগুলি তোমরা দেখেছ, এক জায়গায় থাকে না। কিন্তু এ তারাটি বদলায় না। সব সময় এক জায়গায় থাকে। নামও তার ধ্রুব।

কাছু—কোন্ তারাটা মাস্টার মশাই?

মাঃ মঃ—ধ্রুব তারা চিনবার খুব সহজ একটা উপায় আছে। সপ্তর্ষি চিনলে তো? সপ্তর্ষির মাথার দিকের প্রথম তারা দুটো যোগ করে সোজা সামনে চলে গেলে নীচে যে বড় তারাটার উপর দিয়ে যাবে, সেটাই ধ্রুবতারা।

বুবু—সেটা সব সময় এক জায়গায় থাকবে? একবারও জায়গা বদল হবে না?

মাঃ মঃ—না, কোন দিন বদলাবেনা। আচ্ছা, এখন দেখাও তো, কোন্‌টা ধ্রুবতারা?

টুনি—(সপ্তর্ষির শেষের তারা দুইটি যোগ করিয়া একটা বড় তারা দেখাইয়া বলিল) ঐটা মাস্টার মশাই, না? সপ্তর্ষির ঐ তারা দুটি যোগ করে টেনে নেলে তো ঐ তারাটার উপর দিয়ে যাচ্ছে।

মাঃ মঃ—উঁহু, ওটা নয়। ও দুটো তো শেষ তারা। সপ্তর্ষির মাথার দিকের তারা দুটোকে বলে প্রথম তারা।

বুবু—মাস্টার মশাই, ঐটা নাকি? কিন্তু ওটা তো খুব বড় নয়। সপ্তর্ষির তারা গুলোর চেয়ে ছোট।

মাঃ মঃ—হাঁ, ঐটিই ধ্রুবতারা। এখন রাত হলো, এবার চল যে যার বাড়ি যাই। এর পরে আবার আমরা আকাশের চাঁদ, তারা দেখবো, আর তাদের বিষয় জানবো।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা। সিঙ্গলের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, গোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

"জঙ্গলে মঙ্গল"

শ্রীঅর্ণপ্রভা সেন

দুর্গম পর্বতমালা, দুর্ভেদ্য অরণ্য। প্রকৃতির রূপরূপ এখানে সম্ভাবনার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী বা জলস্রোত যাহা আছে তাহাতে যাতায়াত চলে না। একবার এই ভয়াবহরমণ্ডিত শৈলরাজি-পরিবেষ্টিত স্থানটিতে ঢুকিলেই বুঝি বাহির বিশ্বের যবনিকায় অন্তরালে চলিয়া যাইতে হয়। এখানে প্রবেশ দুঃসাধ্য, নির্গমন বুঝি দুষ্কোধিক। কেন্টাকি পর্বতের পূর্বভাগে অবস্থিত এই স্থানটির নাম কেনী Caney।

গভীর দুর্ভেদ্যতার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া একবার প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, প্রকৃতির এই ভীষণ ও রম্য কোণটিতে এক সুপরিকল্পিত সুগঠিত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানে আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, শিশুদের আনন্দ নিকেতন, ছাত্রছাত্রীর আবাসগৃহ, লাইব্রেরি, বিজ্ঞান পরিষদ, যত কিছু সমাজের হিতকর প্রতিষ্ঠান। পাহাড় দিয়াছে এইসব গৃহের জন্য প্রস্তর, অরণ্য বৃক্ষ দিয়াছে কাষ্ঠ, আর পর্বত ও অরণ্যবাসী দিয়াছে তাহাদের শ্রম। আর সকলের সমবেত চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে আজ অপূর্ব এক মানব সমাজ, যে সমাজের ভিত্তি ত্যাগে, বিশ্বাসে আর সামাজিক চেতনার মধ্যে।

কিন্তু এই জনপদ একদিনে গড়িয়া ওঠে নাই। চল্লিশ বৎসর আগে এখানে ঘর বাড়ি ছিল না। ছোট ছোট কাঠের খুপরির মধ্যে লোকে বসবাস করিত। তাহাদের আনাজের বালাই ছিল না, আলো বাতাসের জন্য কারও মাথা ব্যথা ছিল না। একটি মাত্র দরজা, তাহাও অতি নীচু। অধিবাসীদের গড়ে আয় ছিল বার্ষিক একশ টাকা বা তার সামান্য বেশি। শতকরা দুইজন লোক লিখিতে পড়িতে পারিত। প্রাথমিক শিক্ষারই এই অবস্থা, উচ্চতর শিক্ষার কথা তো স্বপ্নেরও অগোচর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরও অনেক প্রায়-নিরক্ষর সত্য সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নাম সই করিত।

কি করিয়া এই বন্ধুর পথে, সহরের মানুষের দৃষ্টিসীমার বাহিরে এত বড় এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, তাহার ইতিহাস বিচিত্র। উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। বোটন সহরের এক মধ্যবিত্ত ঘরের আধাবয়সী, শৈশবের এক ব্যাধিতে অর্ধ বিকলাঙ্গ, কীলমাত্মা, এক মহিলা দুরন্ত শীত সহ্য হইবে না বলিয়া চিকিৎসকের পরামর্শে এই অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পার্বত্য গ্রামটিতে আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে তাঁহার বর্ষীয়সী মা। ত্রিনিদপত্রের মধ্যে একখানি তাঁহা পুরানো টমটম গাড়ি। পিতৃগৃহের চিহ্নাবশেষ ঘোড়া সেই গাড়ি টানিয়া লইয়া আসিয়াছিল। গাড়ীর পশ্চাতে ছিল একটি ট্রাঙ্কে তাঁহাদের দুইজনের পোষাক পরিচ্ছদ আর সম্বল একটি টাইপরাইটার। জীবিকা অর্জনের উপায়।

প্রথম দৃষ্টিতে বিভীষিকা ছাড়া কি মনে আসিতে পারে? এক চটির কাছে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। তাহারও বয়স চল্লিশ; জীর্ণ বস্ত্র, খালি পা, ১১টি সন্তানের জননী। বিদেশিনীদের দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া মেয়েটি প্রশ্ন করিল, এখানে তোমরা কেন? বিদেশিনী উত্তর দিলেন, ব্যথার ব্যথী পাইব বলিয়া। মেয়েটি বলিল, তবে থাকো এখানে, বন্ধুর অভাব হইবে না।

বন্ধুর অভাব হইবে না, এই বড় আশ্বাসের কথাটি দৈববাণীর মত Alice Lloydকে এই স্থানে টানিয়া রাখিয়াছে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর। দেশ বলিতে তাঁহার আর অন্য জায়গার কথা মনে উদয় হয় না। বহু সম্পত্তির প্রায় সবই উড়িয়া গিয়াছে, আজ থাকা থাকা ছাড়া উপার্জন বলিতে তাঁহার কিছু নাই। পুরোনো টাইপরাইটারটিতে কিন্তু কম টাকা রোজগার হয় নাই। ইহার দ্বারা তিনি আমেরিকার বন্ধুবান্ধবদের কাছে যে অজস্র প্রেরণ করেন, তাহাতে লক্ষাধিক টাকা উঠিয়াছে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কত যে তাঁহার নামে আসিয়াছে তাহার হিসাব নাই। অবশ্য সে সবই পরের জন্য। তাঁহার বিশ্বাস এই পার্বত্য গোত্রির অন্তরে লুকায়িত রহিয়াছে। তাহারা জানে কাজের জন্য যাহা চাই তাহা অবশ্যই পাওয়া যাইবে। আরেকটি কথা তাহারা জানে, তাহাদের শ্রমের দ্বারা যে কাজ সম্ভব, তাহা তাহাদের অবশ্যই করিতে হইবে।

আজ পর্যন্ত ২০০ ছেলেমেয়ে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছে। তাহাদের সম্পূর্ণ খরচ এই Caney প্রতিষ্ঠান বহন করিয়াছে। হালরোর বেশি শিক্ষিত, অর্থাৎ, শিক্ষালয়ের এখনকার অর্থে শিক্ষিত হইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ৪০ বৎসর আগে যেখানে একটিও ছিল না, আজ সেখানে ১০টি অধিকৃ উৎকৃষ্ট মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়। একটি কলেজও আছে। আর এই সব নির্মাণ করিয়াছে কাহারা? ছাত্ররা এখানে আপন আপন কাজ আপনারাই করে, রান্না করে, মাঠঘাট, ঘরবাড়ি তৈয়ারি করে। এই নির্মাণ কাজের অর্ধেক করিয়াছে তাহারা, বাকি অর্ধেক তাহাদের বাপেরা। এই Caney কলেজে এখন আমেরিকার ভাল ভাল ইস্কুল কলেজের পাশ করা অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করিতেছেন। হোস্টেলে শতাধিক ছাত্র, আরও নানাভাবে ভর্তি হইতে পারে না। Caney কলেজে ভর্তি হওয়া এক বিশেষ সম্মান ও গৌরবের কথা। সকলকে তো নেওয়া হয় না, যাহার মধ্যে সম্ভাবনা, তাহাকেই নিয়া দেশের কাজের জন্য, নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

Caney কমিউনিটিতে অলিখিত একটি নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে. এখানকার ছেলে মেয়ে যে যেখানে থাকুক, কাজের ডাকে সাড়া দিবে। আগে এই কেন্দ্রী কমিউনিটির কাজ, তবে অন্য কথা! তাহার কাছে নিজের ব্যক্তিগত উন্নতি, বা সুখ ও দুঃখ তুচ্ছ। মিসেস লাভের একটি মেয়েকে প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন, তাহাকে বাহিরে বহু সন্ধানে পাঠাইয়া শিক্ষা দিলেন, কোন বিধি নিষেধ নাই। মেয়েটি ভাল কাজ পাইল, নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইল, এবার বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে। উপযুক্ত বহু প্রণয়প্রার্থী হইয়া আসিল। কিন্তু ঠিক মোক্ষম সময়টিতে আসিল কেন্দ্রী কমিউনিটির আহ্বান। একটা কেন্দ্রে কিছু বিশৃঙ্খলা, মিসেস লাভের মতে এই মেয়েটি তাহার জন্য যোগ্যতম কর্মী। এই আহ্বানের কাছে অন্যের কোমল বৃত্তিগুলি চাপা পড়িয়া গেল। আজ কেন্দ্রীর সেই কেন্দ্রে কত লোক ঐ মেয়েটির নেতৃত্বে শিক্ষা দীক্ষা পাইতেছে। জীবনে সেবার এই পরম সত্যটি সে অবহেলা করিল না, ব্যক্তিগত জীবনে শুকনো আবার আসিবে কি না কে জানে।

কিন্তু এই যে নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আত্মদান, কর্তব্যের জন্য আত্মস্বীকার, ইহা কি একদিনে, সহজে হইয়াছে, না হয়? প্রেম দিলে তবে প্রাণ প্রেমে পূর্ণ হয়। দলের মাঝে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া, নিজেকে সেই দলেরই একজন করিয়া তবে না এই রমণী সার্থকতার পথে চলিয়াছেন। বাধা কি আসে নাই? গ্রামের দুইটি মেয়ে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেল, তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টায় বিফল হইল। মন উঠিল তাঁহার অন্যই এই মৃত্যু। স্পষ্ট অভিযোগ নয়, কিন্তু চাপা সন্দেহ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁহাকে

আর্থানির গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করা হয়। স্পষ্ট অভিযোগের প্রতিবাদ চলে, কিন্তু সন্দেহের বাষ্পের বিরুদ্ধে তো লড়াই চলে না। তিনি নীরব। পাড়াতীরা কথায় কথায় আদালতে যায় না, নিজেদের হাতেই বিচার করে। বিচার বৈঠকে কিন্তু মিসেস লয়েড নির্দোষী প্রমাণিত হন। নিঃস্বার্থ সেবার পুরস্কার।

অরণ্যবাসী বলিষ্ঠ এই অধিবাসীরা কাজ বোঝে। ইস্কুল কমিটির এক সভা বসিল, দুই শত অভিভাবক একত্র হইয়াছে, ইস্কুল ঘরে স্থানাভাব। মিসেস লয়েড বলিলেন, আমাদের একটি বৃহত্তর বিদ্যালয়গৃহের প্রয়োজন। কোথা হইতে টাকা আসিবে, মোড়লদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল। উত্তর হইল, টাকা আমি জোগাড় করিব, কিন্তু তোমাদের কাছে চাই শরীরশ্রম আর শুভ কামনা। যখন তাহারা বুঝিল, ইনি তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে হাত দিতেছেন না, তাহাদের রাজনীতি নিয়া তাঁহার মাথা ব্যথা নাই, তখন ঠিক হইল, শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা হইবে। এক পক্ষ ঐ দুই বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, অন্য পক্ষ প্রাণ দিয়া শক্তিসামর্থ্য দিয়া তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, কেন্টাকির এই স্থানটিকে সর্বপ্রকারে উন্নতির পথে নিয়া চলিয়াছে।

মিশনারির মত ধর্মপ্রচার এখানে করা হয় নাই, কিন্তু প্রতি কাজে অধিবাসীদের নীতিজ্ঞান ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। রবি বারে, রবি বারে ধর্মসঙ্গীত তাহারা গান করে, নীতি ও সৎ কথা আলোচনা করে। অবিচল নিষ্ঠায় বিশ্বাস করে যে, চাহিতে আনিলে পাওয়া যাইবে।

ছোট পুরানো সেই টাইপরাইটারে আবার আবেদনপত্র দিকে দিকে প্রেরিত হইল, টাকা আসিল, জিনিস আসিল। কল্যাণকৃৎ কখনও বিফল মনোরথ হয় না, পীতায় এই আশ্বাস হাতে হাতে ফলিতে দেখা গেল। কি পরিশ্রম স্থানীয় লোকেরা করিল তাহার তুলনা হয় না। বড় বড় বাড়ী তৈয়ারি হইয়াছে, মালমসলা অবশ্যই কিনিতে হয়, কিন্তু শ্রমিক তাহারা নিজেরাই। কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর, কেন এত কষ্ট স্বীকার করিতেছে, সে বলিবে, বা রে, কেনী যে আমার সন্তানের শিক্ষার ভার নিয়েছে। ইহা যেন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

টাকা ছাড়াও বিস্তর জিনিস আসিল। ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য বুদ্ধিমতী রমণী তখনি দোকান খুলিয়া দিলেন। এই দোকানে টাকার বিনিময়ে কিছু নাই, যে যাহার উদ্বৃত্ত দ্রব্য আনিয়া বিনিময়ে তাহার অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পাইবে। আজও সেই দোকানে বিনিময়ে আনীত খাদ্যদ্রব্য যাহা আসে তাহাতে কেনী আবাসিক বিদ্যালয়ের দুই শত ছাত্রের খাওয়া চলিয়া যায়। কমিউনিটির অধিবাসী মাত্রই জানে এই দোকানে সব কিছু পাওয়া যাইবে আর বিনিময়ে যথামত ভাল জিনিস ও খাদ্যদ্রব্য দিতে হইবে।

সমস্ত প্রাণের আন্তরিকতা ঢালিয়া দিয়া, নিজে ইহাদেরই একজন হইয়া এই যে কর্মব্রত গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন, ইহার কথা ভাবিয়া দেখিবার মত। বাহিরের লোক হিসাবে থাকিলে, বাহিরের অর্থে, বাহিরের লোকের সেবায় এমন সমাজ গড়িয়া ওঠে না। শিক্ষার আলো একদিনে জ্বলে না। ধীরে ধীরে অন্ধকার আবরণ মুক্ত করিয়া শিক্ষার পথে, স্বাবলম্বনের পথে, আত্মপ্রত্যয়ের পথে, জনকল্যাণের পথে মানুষকে চালনা করা সহজ কাজ নয়, কিন্তু তাহাই যে একমাত্র পন্থা।

শিক্ষাবিস্তারের, অবনমিতের উন্নতি সাধনের স্পৃহার কথা আজ অনেকেরই মুখে শোনা যায়। কমিউনিটি প্রোজেক্টের পরিকল্পনা দেশে চলিতেছে, এই সময়ে Readers Digest পত্রিকায় মর্মিত কেন্টাকীতে অবস্থিত এই কমিউনিটির গোড়া-পত্তনের ইতিহাস, কর্মপদ্ধতি, সাধনের মূলমন্ত্র ও উজ্জ্বল বিশ্বাসের চিত্রটি আমাদের প্রাণে আশার

আনিয়া দিতে পারে। বৃহত্তম কোণেও জ্ঞানের আলো জ্বালিবার এই যে অদম্য উৎসাহ, ইহার অভাব প্রধান আমাদের শিক্ষাকর্মীদের মনে প্রেরণার সঞ্চার করিতে পারে। দুর্গম অরণ্য পর্বতও অতিক্রম করিয়া যদি সমুদ্রে স্থাপনে জলযান অসম্ভব, সত্যতার সংস্কৃতিতে তাহার মানবসমাজ গঠন করিয়া তোলা সম্ভব হয়, তবে আমাদের এই বাংলা দেশের সহস্রাধিক সহস্র গ্রামগুলিতে শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, আনন্দময় উদ্দেশ্য-পূর্ণ জীবনের বার্তা প্রচার কেন অসম্ভব হইবে? গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনা সভায় যাহা "অমলে মঙ্গল" বলিয়া আমাদের জাতির সম্মুখে স্থাপনা করিয়াছিলেন, ইহা তো তাহারই একটা সুনির্দিষ্ট রূপ।

অক্সফোর্ডের চিঠি

শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত

[এই শিরোনামে প্রবাস থেকে আমার বন্ধুবান্ধবকে চিঠি লিখতেন। চিঠিগুলি একজনকে লেখা নয়, একজনের উদ্দেশেও লেখা হয় নাই। বিভিন্ন পত্র থেকে সংকলন আমাদের। অক্সফোর্ড এবং ইংলণ্ডে এখনকার দিনে শিক্ষার ধারা ও পরিবেশ কেমন, কয়েকটি থেকে তার একটা মুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

—সম্পাদিকা।]

৬ই সেপ্টেম্বর '৫৩

আমরা এখন আছি সাগরে, ৮ই তারিখে এডেন পৌঁছব। জাহাজে প্রথম দিন আমার ভালই কেটে গিয়েছিল—অর্থাৎ ৬ঠা সেপ্টেম্বর। সে দিন প্রত্যেকবার সেটঅরে খেয়েছিলাম, বিকালে ৪ সেট টেনিস খেললাম, অনেকক্ষণ 'ডার্ট থ্রোইং' করলাম। পরের দিন সকালে উঠে দেখি ভীষণ দোলানি সুরু হয়েছে—এক একটা ঢেউ আমাদের ঘরের সমান উঁচু। এ অবস্থায় হাঁটতে গেলে পড়ে যাই, খাবার ঘরে বা কেবিনে গেলে সেট খোলায়, কেবল মাত্র আরামে থাকি ডেক চেয়ারে শুয়ে বা লাউঞ্জে আরাম চেয়ারে। কাল দুবার sick হয়েছিলাম, আজ সকাল থেকে সাবধান হয়েছি। আমাদের কেবিনে প্রত্যেকের একটা টেলিফোন আছে; তাছাড়া জাহাজে কয়েকটা জায়গায় অন্য automatic telephone-এর ব্যবস্থা আছে। একটা ছোটখাট শহরই বলা চলে, ৭টা ডেকার যাত্রীদের কেবিন আর লাউঞ্জ ইত্যাদি, তার নীচে খালাসিদের ঘর।

১০ই

আমরা সুয়েজ পৌঁছচ্ছি কাল ১১ই বেলা দুটোর সময়ে। এডেনে নেমেছিলাম কেবল সোয়ালার সঙ্গে, বড় গরম জায়গাটা, তবে খুব চমৎকার দেখতে। নানা জাতের মানুষ—আরব, ইথিওপীয়, ইহুদী, ভারতীয়। কত বনবিহীন পাহাড়, আর শাদা সমুদ্র।

২৪ শে

এতদিনে আমার কেমব্রিজ আর লণ্ডন থেকে লেখা প্রথম চিঠিটা পেয়েছি নিশ্চয়। আমাদের হস্টেলটি এ বছর নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে। ঘরগুলোর ভালো ব্যবস্থা, প্রাতরাশে পাই—দুধ, কর্ণফ্লেক্স, দু স্লাইস কাঁচা রুটি মাখন, মার্মালেড, টোস্ট আর ডিম অথবা মাছের কোন রকমারি ভাজা, সঙ্গে প্রচুর শাদা চা। যারা ভারতীয় কায়দায়, নিজেদের পরিবেশন করে নিতে

হয়। তিনারে যোগ হুমন করে ছাত্র পরিবেশন করেন, আর এক একটা পদ হয়ে গেলে প্রতি টেবিল থেকে একজন করে পরিষ্কার করে দিই। তিনারে থাকে সুপ, চাপাটি অথবা ভাত, দুরকম তরকারি, মাংসের অথবা মাছের কারি আর মিষ্টি কিছু, আর চা। দুপুরের খাওয়া বা চা আমরা ইচ্ছামত বাইরে খাই। গতকাল মহুদিরা আমাকে খেতে ডেকেছিলেন Lyons Corner বলে একটা রেস্তোঁরাতে। এরা খুব বেশি দাম হাঁকে না। সেখান থেকে আমার ফুলো দেখে ফিরলাম।

লণ্ডনে আর যে কদিন আছি ঘুরে ঘুরে দেখে নেব। এতদিন যেখানেই গেছি একাই রাস্তা চিনে গেছি। প্রথমদিন direction নিয়ে নিতাম আসে, তার পরের দিন থেকে একটা ম্যাপ আর একটা ছড় টিউব ম্যাপ যোগাড় করার পর কোন অসুবিধা হয় নাই। হেঁটে, বাসে ও টিউবে ঘুরেছি। টিউবটা খুব সুবিধার, যদি বেশি দূরের পথ যেতে আর কোন লক্ষ্য নিয়ে ঘুরতে হয়। গতকাল টটেনহাম কোর্ট রোড থেকে Charing Cross-এ গিয়ে হেঁটে Foyles-এর বইয়ের দোকান দেখে আসি। পরশুকাল সকালে Aldwych গিয়েছিলাম ইণ্ডিয়া হাউসে, আর সেখান থেকে পিকাডিলিতে মহুদিদের ফ্ল্যাটে। সবই চেনা চেনা মনে হয়, এত পড়েছি এ সম্বন্ধে। নতুন জিনিস যা দেখলাম তা হল escalator, Television আর একটা জটিল automatic telephone system। প্রথম ও শেষটা ব্যবহার করতে হয়েছে। দ্বিতীয়টা হস্টেলে আছে, পরশুকাল দেখলাম সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু যেখানে যা অনুভূতি হয়, সেরকমই, কেবল এটা সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে। টিউব ব্যাপারটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আরেকটা নতুন gadget আমাদের হস্টেলে self-operated automatic lift। এখানে ভারতবর্ষের কয়েকটা কাগজ পাই, তাতে বড় বড় খবরগুলো জানা যায়, যেমন Estate Duty Bill পাশ হয়েছে, রাজেন্দ্র সিংহী কাশ্মীরে গেছেন, বার্মপুর কর্মবিরতি শেষ হয়েছে, বর্ধমানে ফুধা মিছিল হয়েছে, কোলকাতায় শিল্প প্রদর্শনী এসেছে বা এসেছিল ইত্যাদি; কিন্তু কলেজের বা পরিচিত বর্গের খবরাখবর তো সেখানে পাওয়া যায় না।

১লা অক্টোবর

নতুন জায়গায় আসায়, নানা দেশ ঘোরার প্রথম উত্তেজনার ধাক্কাটা কেটে গেছে, এখন লণ্ডন পুরাণো হয়ে গেছে। দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে হয়তো কিছু এখনও দেখা বাকি রয়েছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে প্রথম দিকে যে অভিনবত্ব অনুভব করেছিলাম এখন তা আর ততটা অনুভব করি না।

সৌভাগ্যবশত আমরা এখানে এসে অবধি যে দিনের মধ্যে কমপক্ষে আট দিনের জন্য রৌদ্রের আলো পেয়েছি। যে দুদিন ম্লান মুখে আকাশ অশ্রুবর্ষণ করছিল, সে দুদিনের সকরুণ মূর্তি দেখে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছি যে আমাদের ইংলণ্ডে পদার্পণের সময় আকাশ ছিল আলোয় ভরা, এখনও দিনগুলি রৌদ্রস্নাত। এখানে বাদল দিনে একা মন টেঁকে না, বর্ষার বিষণ্ণ সুরগুলোই মনে পড়ে, তাই এই শরতের রোদ্দুর আমাদের কাছে যত বড় আশীর্বাদ। এর সহাস্যতলে লণ্ডনের মতো মহানগরীও আনন্দে শিশুর মতো সরল খুশিতে ভরে ওঠে; রাস্তা ঘাট, পার্ক আর লেক লোকে ভরে ওঠে; অফিসের বিরতির সময়ে অনেকেই খেতে ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে পার্কে বেড়ায়। 'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে'—তার চেয়ে যোগ্য বর্ণনা বোধ হয় দেওয়া যায় না রৌদ্রস্নাবিত সেন্ট জেমস পার্ক বা হাইড পার্কের, কিংস্টোন গার্ডেন, গ্রীন পার্কের, রিজেন্টস্ পার্ক বা রেস্ট্রিজন স্কোয়ারের। যেদিন থেকে ঘুরে এসেছি, সেটা মনে পড়ে, সেটা অনুভব করি, কিন্তু তিন হাঁটার মাইল ঘুরে পরশুদিন এসে

পড়েছি, সেটা লণ্ডনে অন্তত অনুভব করতে পারিনা। এখানকার রাস্তাঘাট চালচলন, শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা এত পড়েছি যে প্রায় ৮০%ই আমাদের জানা; তাছাড়া ইণ্ডিয়া হাউসে অর্থসাপ্তাহিক আনন্দবাজার, Overseas স্টেটসম্যান, ইত্যাদির মারফৎ কোলকাতার খবরাখবরও ২।৩ দিনের মধ্যে পাই। জগৎটা এত ছোট হয়ে গেছে যে কোলকাতা-বাসীর প্রথমে বম্বে বা মাদ্রাজ, দিল্লী বা এলাহাবাদে গিয়ে যেরকম লাগে, তার চেয়ে গভীরতর কোন অনুভূতি এখানে হয় না।

ইংলণ্ডে এখন প্রচুর ভারতবাসী আছে, বিশেষ করে লণ্ডনে। তুমি বলেছিলে এদেশে এসে এদেশের লোকদের সম্বন্ধে কিছু বলতে, এরা formalই বা কেন তাও জিজ্ঞাসা করেছিলে। এদেশের লোকদের জীবন—ব্যক্তিগত বা সামাজিক-সম্বন্ধে মন্তব্য করার মত অভিজ্ঞতা আমার এখনও হয় নাই। দু একটি দারোয়ার কথাই বলতে পারি। তবে একটা কথা, formality প্রায় উঠে গেছে বলেই হয়, অন্তত সাধারণ লোকের জীবন থেকে, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবি, শ্রমিক ইত্যাদি-দের মধ্য থেকে। বিরাট বনিক সংস্থাগুলোর মধ্যে, হোয়াইট হলের সরকারি মহলে এখনো তা রয়েছে। বোধ হয় বাহ্য চাকচিক্য আর বিশিষ্ট রীতিনীতি না থাকলে কোন শাসক সম্প্রদায়ই টিকতে পারে না। কিন্তু যদি ব্রিটেনের লোকদের দিকে তাকাও—বিদেশ-তের জনসাধারণ—তবে দেখবে যে বিশেষ করে সদ্য যুদ্ধের পরে বেশভূষা থেকে আহারাদি, কথাবার্তার ধরণ-ধারণ সব কিছুর মধ্যেই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অনুশাসনের অভাব। Three piece suit পরে কম লোকে, স্পোর্টস কোট আর ফ্ল্যানেল ট্রাউজার দিয়ে চালিয়ে দেয় অনেকে, টুপী মাথায় দেয় কেবল ৫০%, খাওয়া দাওয়ার সময়ে যে যেমন ইচ্ছা খায়; ছেলে মেয়ে সবাই অফিস করে, তাই লাঞ্চটা বাইরে খাবে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাবার নিয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে লাইন হয়ে যায় সবা। এখানে রেজিগ সীটও নাই, জায়গা ছেড়েও তেমনি কেউ দেয় না, মেয়েই হন বা পুরুষই হন। অবশ্য করে বৃদ্ধ, শিশু বা পঙ্গুদের ক্ষেত্রে। গত যুদ্ধের বিফলাঙ্গ এখানে অনেক দেখবে। বোমাবিরতি কয়েকটা অঙ্গ এখনও সারানো হয় নাই। পথঘাটে লোকরা খুব ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু কেউ বাজে বক্ বক্ করে না। সবাই যেন সর্বদা কাজের তাড়ায় দৌড়াচ্ছে, সকালে দৌড়াচ্ছে অফিসের দেরি হয়ে যাবে বলে, বিকালে দৌড়াচ্ছে সাড়ে আঠারোর মেয়ি হয়ে যাবে বলে।

এখানে ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম দেখলাম, অনেক চমৎকার আর বিখ্যাত শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। ভাস্কর্যে (ব্রোঞ্জ বা মার্বল), আসবাব নির্মাণে, সূচীশিল্পে মানুষের সৌন্দর্যবোধের নানা নিদর্শন সাজানো রয়েছে বিভিন্ন বিভাগে। রাফায়েলের ট্যাপেস্ট্রি, ডাভিঞ্চি বা মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তি, ইতালীয় রেনেসাঁসের আরও অসংখ্য নিদর্শন। অন্যান্য দেশের অন্যান্য যুগের চারুকলার সমাবেশও আছে। ন্যাশনাল গ্যালারীতে অনেক 'ওল্ড মাস্টার'দের চিত্রশালা, বিশেষ করে ডাচ আর ফ্লেমিস্ স্কুলের; রবেন, ভ্যানডাইক আর রেমব্রাণ্টের অনেক ছবি সেদিন শুধু হয়ে দেখলাম। যুদ্ধগুলো দেখে, আগে যার প্রতিলিপি দেখেছি, তাকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করি। রোঁদার বিখ্যাত ভাস্কর্য The Kiss-টা আরেকটি ঘরে ছিল, শ্বেত পাথরের এই মূর্তিটি অপূর্ব, অতুলনীয়, অদ্ভুত! এটা না দেখলে, নানা দিক থেকে লক্ষ্য না করলে, এর রস বুঝতে পারবে না।...আমি সোমবার অক্সফোর্ড চলে যাচ্ছি, সেই ঠিকানায় চিঠি দিও।

এই নভেম্বর

তোমার চিঠি লেখার পর টেমসের অনেক জল

সাদরে ঘরে গিয়ে পড়েছে, রবিপ্রদক্ষিণ পথে সূর্যও কিছুটা এগিয়েছে, আমিও প্রভুর শরৎকালের মাতিসীতোফ সুশোভন সূর্যাস্ত দর্শনের পরিবেশ ছেড়ে এসেছি। এখন অক্সফোর্ডে।

কিছুদিন আগে রবিবার দুপুরে অক্সফোর্ডের বাইরে একটি বাসার দাকের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে অতি প্রাচীন রোমক যুগের ব্রিটনদের বসতির একটি ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাই। এখানে রোমক যুগের স্থাতীয় চিহ্ন পাবেনা, কিন্তু যা দেখতে পেলাম তার অনাড়ম্বর বিরাট ভাব, সহজ বোধগম্যতা আর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে মনে দাগ কাটে। একটি বিরাট টিলার উপর তাদের ঘর বাড়ী ছিল, সেগুলোর আর চিহ্ন নেই, কিন্তু টিলা আর তার চার পাশের পরিখাটি এখনও অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে। যে জন্য বিশেষ করে এই ধ্বংসাবশেষটা লক্ষণীয়, সেটি টিলার সবুজ ঢালু জমির উপর দুহাজার বছর আগেকার সাক্ষ্য বহন করছে—সেটি একটি সাদা ঘোড়ার ছবি, শুধু কতগুলি সাদা ঘাসের টানে; প্রাচীন ব্রিটন কবিরা হয়তো কোন পূজার্চনার উদ্দেশ্যে ছবিটা এঁকেছিল। কিন্তু আজও নিছক এস্থেটিক দিক থেকে দেখলে তার সজীব গতিশীলতা সর্ব প্রথম চোখে পড়ে। দূর থেকে পাহাড়ের দিকে আসার পথে এটি আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে পাহাড়ের গায়ে।

• • • •

অক্সফোর্ডের লোকে প্রধানত দক্ষিণপন্থী। যারা পাবলিক স্কুলগুলো থেকে এসেছে তারা বেশির ভাগ 'টোরি'। সেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় সেটা হল যে ব্রিটেনের ঐতিহ্য যা করে, তার সবই খুব ভালো এবং তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না—এজাতীয় একটা মনোবৃত্তি। এরা তাই জিজ্ঞাসু মনের তীব্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করে না। এবার প্রগতিশীল ছাত্রদের কথা বলা যাক। প্রথমে লেবার ক্লাবের কথা। লেবার ক্লাবের ছেলেরা লেবার পার্টির সঙ্গে সহানুভূতিশীল, এদের বাকল কমিউনিস্ট ভীতি, তবে সাম্রাজ্যবাদী নয়। তারপর আছে সত্যিকারের বামপন্থী ছেলেরা সোসালিস্ট ক্লাবে। সোসালিস্ট ক্লাবের বৈশিষ্ট্য হলো বামপন্থী সকল ধরনের মতাবলম্বীর এটা একটা ফ্রন্ট, তার ফলে এর মধ্যে কমিউনিস্ট, বিভানপন্থী, ইত্যাদি অনেকে রয়েছে। তাছাড়া আছে কমিউনিষ্ট ক্লাব—তার সদস্যরা কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার, তবে পার্টি ওয়ার্কার নয়, অথচ সভায় যোগ দিতে চায়, এরকম ছেলেদের জন্য ওরা অর্ধপেনী মূল্যের কার্ডের ব্যবস্থা করে।

এবার আমাদের কলেজের কথায় আসা যাক্। এখনও গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ ছুটি শেষ হয়নি, কাল শেষ হবে। সাধারণত যেদিন কলেজ খোলে সেদিনই সবাইকে এসে থাকতে দেয়। কিন্তু আমি এবং আর কয়জন বিদেশ থেকে এসেছি, বাসস্থানের স্থিরতা নেই, সেজন্য আমাদের ছুটির মধ্যেই আসতে দিয়েছে, তিনদিন আগে ৫ তারিখে; কলেজ তাই অনেকটা খালি, কেবল জন ত্রিশেক ছেলে যারা বছরের মধ্যে কলেজে থাকার অনুমতি পেয়েছিল, তারা আছে; তিনদিন আগে এসে সুবিধা হয়েছে যে পারিপার্শ্বিকটা চিনে নিচ্ছি। থাকা খাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে যা ধারণার সম্পষ্ট করছি, ফলে কাল যখন টার্ম সুরু হবে, দলে দলে ইংরেজ ও অন্যদেশীয় Freshmen এসে পৌঁছবে, তখন আমি অনেকটা মানিয়ে নিতে পারব। কেননা এখানে আমাদের নানা সমস্যা। প্রথমত একটা heavy course নিয়ে পড়াশোনা, তার সঙ্গে নিজের সংসার (জিনিসপত্র টাকা পয়সা ইত্যাদি) দেখাশোনা, ছুটির সময়ে (Christmas, Easter, আর Summer) বাসস্থান খোঁজা, আর রোজ কলেজে নিজের চা এবং খাবারের ব্যবস্থা করা; সব কলেজে প্রাতরাশ, লাঞ্চ, আর ডিনার দেয়, এবং বৈকালিক চা আর

যাওয়া (যদি তুমি চাও) নিজেদের ব্যবস্থা করতে হয়; এবং এ নিয়ম এতদিন ধরে চলে আসছে যে brewing one's own tea in one's room is supposed to be part of the Undergraduate's training। তাই প্রত্যেককে কেটলি, সসপ্যান আর চায়ের বাসনের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

এখানে এখন প্রায় গুছিয়ে বসেছি; কলেজটা চিনে নিয়েছি, কলেজ লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে ভাব করেছি কয়েকটা ভাল ভাল ভারতীয় ভাকটিকিট উপহার দিয়ে। কলেজ কমনরুম, অডিন, Bursary, Chapel Hall, সব দেখে শুনে নিয়েছি। পরিবেশও মোটামুটি পরিচয় হয়ে গেছে। কাল শুনলাম আর আমি দোকানে গিয়ে খাতাপত্র কেনাকাটা করলাম, আজকে আবার যেতে হবে। গতকাল লাইব্রেরিয়ান আমায় জিজ্ঞাসা করলো তোমার তো টিউটরের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি, লেকচার লিস্ট পাওনি, কি বই দেখতে এসেছ? আমি বললুম এমনি browse করতে, ইতিহাসের বইয়ের মধ্যে। খুশি হয়ে কোনখানে ইতিহাসের তাক তা দেখিয়ে দিল। এখানে ছোট বড় সকল রকম লাইব্রেরিই ব্রিটিশকাউন্সিলের মতো খোলা-রাখা নিয়মে সাজা। যারা তাদের বই আছে, দেখছি, প্রেফটা সাজগুছ করে নিয়েই হবে কেননা ওটা পরীক্ষার কোর্সে, তাছাড়া দ্বিতীয় বর্ষের শেষে বা তৃতীয় বর্ষের গোড়ায় অন্য কোন ভাষার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান দরকার হবে। শুনলাম তাই বলেন। শুনলাম আর আমি বিকেলে বেড়াই রোজ, লাইব্রেরিগুলো ৫টা অবধি খোলা থাকে, তারপরে ঠিক করেছি ওটা দুয়েক ঘুরব বা বেলায় মাঠে যাব। সারাদিন ছেলেরা ছুটোর সময় পড়া ছেড়ে পালায়, তাই তখন, ছুটো থেকে পাঁচটা নিরিবিলি পাওয়া যায়। কাল সমস্ত টিউটার যখন শুনব করবেন তখন বিস্তারিত ব্যাপারটা জেনে নিয়ে সময় ভাগ করে ফেলতে হবে। এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেই সবকিছু ব্যবস্থা করতে হয়, এমনকি অবকাশ সময় কাটাবার উপায়ও।

১২ই অক্টোবর থেকে আমাদের পুরো ক্লাস সুরু হয়েছে, সামনে মার্চে প্রাথমিক পরীক্ষা। তাতে চারটে পেপার। এখানে টিউটোরিয়াল, লেকচার আর লাইব্রেরি ভিজিটের মাধ্যমে পড়ান হয়। প্রত্যেক ছাত্রের একজন টিউটরের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়, যে যে বিষয় পড়ছে সেই বিষয়ের। তিনি ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করে অবশ্য বিষয় ভাগ করে দেন, কি কি লেকচার দরকার বলে দেন, কিভাবে পড়তে হয়, কোন কোন বই পরীক্ষার জন্য পাঠ্য, কোন কোন উপায়ে রেফারেন্স বার করা যায়, এ সমস্ত আলোচনা করেন, এবং যে টার্মে যে যে অংশ শেষ হবার কথা, সেই সেই অংশের উপর টার্মে প্রতি সপ্তাহে একটা করে রচনা লেখান। আমরা যারা আধুনিক ইতিহাস পড়ছি তারা Prestwich-এর কাছে আছি। চারটে পেপারের মধ্যে এই টার্মে Locke আর Historical Geography শেষ হবে, দামনের টার্মে থেকে De-Tocqueville-এর ফরাসী বিপ্লবের উপর বইটা আর ল্যাটিন, আমার ক্ষেত্রে Shakespeare এর দুটো নাটক শেষ হবে। Prestwich আমাদের সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে Locke-এর টিউটোরিয়াল নেবেন, তাঁর বিশেষ বিভাগের আওতায় না পড়লে বাইরের কলেজের টিউটার কোন কোন বিষয়ের ক্লাস নেবেন; যথা Historical Geographyতে আমরা যারা Expansion of Europe নিয়েছি তারা Mr Reingerএর কাছে যাবো St Antony's Collegeএ। সারা সপ্তাহে এই রচনা লেখার পিছনে খাটতে হয়, তাছাড়া বক্তৃতা শুনোর সঙ্গে তাল রাখতে হয়। লেকচার শুনো সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক, বিভিন্ন জায়গায় হয়। বিভিন্ন কলেজে বা সোসাইটিতে এবং লেকচারে যাও বা না যাও, কেউ

খোঁজ নেবে না। অবশ্য আমি প্রত্যেকটাতেই যাই। গতকালই সব সুরু হল, তার আগে কলেজে শুধু আসার অনুমতি পাওয়া গেছল, আর টিউটরের সঙ্গে সেমেস্টারের মত প্রাথমিক আলোচনা হচ্ছিল। আমাদের দিনে একটা লেকচার, কেবল বুধবার ছুটি।

তাছাড়া, এবং এখানে যেটা সবচেয়ে জরুরি, টিউটোরিয়াল ছাড়া, লাইব্রেরিতে বসে নিজের কাজ করে যাওয়া, নানা বই ঘাঁটা, নোটগুলো সমালোচনা, প্রবন্ধের জন্য মালমসলা তৈরী ইত্যাদি। This is Oxford education in a nutshell.

এর অর্থ দিনে আট ঘণ্টা রোজ যদি খুব মন দিয়ে পড়, আর অবসর বিনোদনের সময়টা ভাগ করে ব্যবস্থা করে নাও, তা হলে ভাববার কিছু নেই। কিন্তু সেই ব্যবস্থা আর মনোযোগ একান্ত দরকারি।

অক্সফোর্ডে কলেজ-জীবন বলে জিনিসটার একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। কলেজে Junior Common room-কে কেন্দ্র করে আর খেলাধুলোর ক্লাবগুলো শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে এ জিনিসটা প্রকাশ পায়। University Level-এ সমস্ত কলেজে একরকমভাবে অসংখ্য ক্লাব আছে। অন্তত ডজন ক্লাব, প্রায় গোটা ৫০ হবে। প্রত্যেক বছরই এই সব ক্লাবের আর নিয়মকানুনের ঢেউয়ে হাবুডুবু খাই, তার থেকে বেছে নিতে হয় দু-একটা। আমি Union Society (যেটার সভ্য সবাইকে হতে হয়) এবং আরেকটা ক্লাবের সভ্য হয়েছি; আর হইনি।

এখানে আমার ভীষণ পড়ার চাপ, গত এক সপ্তাহ কলেজ করে যা বুঝেছি, আজকে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্যপরিক্রমা ঢেলে সাজাব। তপনদাকে বলেছিলাম আপনাকে খাটতে হয় রাশি রাশি পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে কিনিসের জন্য, আমাকে খাটতে হয় রাশি রাশি ছাপা বই ঘেঁটে essayর জন্য, কিন্তু খাটুনি আর একাগ্রতা আর বুদ্ধি খাটানো সমানই। উনি একবাক্যে স্বীকার করলেন, বললেন অক্সফোর্ডের ঐটেই বিশেষ সুবিধা, ছাত্রদের ছোটখাট রিসার্চ ওয়ার্কার বানায়। ভাল করতে হলে গবেষণার টেকনিক—selection of facts and their representation and interpretation শিখতে হয়, এই individual training এর জন্যই অক্সফোর্ডের শিক্ষার মূল্য। হয়তো লেকচারার, বা টিউটরিয়ের অধ্যাপকের এমন কিছু নেই। ভালো লেকচারার বা টিউটার সুযোগসন্ধানের চেয়ে ভালো নয়, আবার অত্যন্ত খারাপ লেকচারারও আছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার টিউটার দুজনেই খুব ভালো, বিশেষ করে Mr. Rainger, Historical Geography (Expansion of Europe 1415—1713) পড়ান যিনি।

বিষয়গুলো চিত্তাকর্ষক—that is their only redeeming feature; চাপ প্রকাণ্ড, তার উপর আমার ভালো করে ফ্রেঞ্চ শিখতে হচ্ছে আর শব্দভাণ্ডার বাড়াতে হচ্ছে। বিস্তারিত বললাম না। গত সপ্তাহে যাঁড় করেছি, এ সপ্তাহ থেকে তাই রীতিমতো খাটতে হবে, আগে যা ভাবিনি। এক একটা essay এক এক সপ্তাহে শেষ করলেও অসংখ্য loose ends পড়ে থাকে, যেগুলো you are supposed to clear up by your general readings। আর অজস্র বই ঘাঁটতে হয়। তার ফলে এখানে কলকাতার মতো খাতায় নোট করা, পরে কপি করার যখন বহলে কেলতে হয়েছে (তাতে শুধু সময় নষ্ট), খালি আলগা পাতা ব্যবহার করতে হয়। সব শুনে বুঝতেই পারছ যে এখানে আমার সময় একেবারে রেশন করা।

বয়স্কশিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন

শ্রীজীবেন্দ্র সে

এ যুগের চিন্তাশীল শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্, কর্মী, সমাজসেবক এবং দেশহিতব্রতিগণ সমাজের যে সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন তাহা বয়স্ক-শিক্ষা। দেশের এই নব জাগরণের মুখে বয়স্ক-শিক্ষা সমস্যা এক নূতন অর্থ ও সম্ভাবনা লইয়া আমাদের সামনে উপস্থিত। পূর্বে যে সমস্যা কেবল একটি সমস্যারূপেই নিরক্ষর সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ ছিল এখন তাহা বিরাটতর ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের বহুতর সমস্যার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত। সমাজের এমন কোন সমস্যা নাই যাহা প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষার উপর শেষ পর্যন্ত নির্ভরশীল নহে। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজনীতি সকল কিছুরই বাহক ও বাহক শেষ পর্যন্ত জন-সাধারণ। একথা সত্য, মানব সমাজে যাঁহারা নূতন নূতন চিন্তা জ্ঞান ও কর্মের পথপ্রদর্শক, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশি নহে, কিন্তু নূতন চিন্তা নূতন আদর্শ এবং নূতন কর্মপ্রবাহকে যুগ যুগ ধরিয়া জাতির জীবনে স্পন্দমান রাখিতে হইলে বিপুল জনসাধারণের মধ্যে সেই আবিষ্কৃত সত্যের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। গণচেতনায় যে সত্য আপ্তবাক্যরূপে অধিষ্ঠিত নহে তাহার স্থায়িত্বও কম। সুতরাং লক্ষ লক্ষ দেশবাসী যদি দেশের চিন্তাপ্রবাহ ও কর্মপ্রবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকে তবে সে অজ্ঞতা কালক্রমে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকলবিধ অগ্রগতিকে পদে পদে ব্যাহত করিবে।

দেশের এই নবজাগরণের মুখে তাই লক্ষ লক্ষ যৌন যুক্ত অক্ষরজ্ঞান নরনারীকে শিক্ষিত করার বিরাট দায়িত্ব আজ সকল দেশ-প্রেমিকের। দেশ তো মাটি নয়, দেশ মানুষ। মানুষের প্রকাশের মধ্যেই দেশের প্রকাশ। বাহিরের বস্তুসম্ভারের বিপুল আয়োজন, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টা কোন দেশ ও সমাজের স্থায়ী উন্নতির কারণ হইতে পারে না। অগণ্য লোকের প্রতিদিনের চিন্তায় ও কাজে, আনন্দে ও উৎসবে, চেতন মনে, এমন কি অবচেতন মনে যে সত্যের আসন, তাহাই কালের প্রহরীকে অতিক্রম করিতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশেও আজ বয়স্কশিক্ষার প্রশ্ন নূতন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। একথা সত্য, নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে ইউরোপ আজ মুক্ত বলিলেই চলে, কিন্তু তবুও সেখানে বয়স্কশিক্ষার সমস্যা নূতন ভাবে দেখা দিয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞানের সহিত শিল্প-সভ্যতার যোগাযোগ ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলিকে প্রচুর সম্পদ দিয়াছে, একথা অনস্বীকার্য। সম্পদে ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক তাক-ধারার প্রসার সে দেশের মানুষকে আজ দেশের ভাগ্যবিধানের নূতন শক্তির সন্ধান দিয়াছে, এ কথাও সত্য। কিন্তু তবু পাশ্চাত্যে সাধারণ মানুষ আজ সুখী নহে। তাহার সম্মুখে আজ দুইটি পথ। হয় তাহাকে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া বিপুল জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণ মিশিয়া যাইতে হইবে, নতুবা নিজেকে সমষ্টি হইতে পৃথক রাখিয়া নিজের ব্যক্তিচেতনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া একক জীবন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু উভয় পথই মানব-প্রকৃতির বিরোধী। মানুষ যেমন দলের মধ্যে এক হইতে চায়, তেমনি নিজের একক বিশেষত্বকে সম্পূর্ণরূপে দলের যজ্ঞবেদীমূলে বলি দিতেও পারে না। কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় এই দুইয়ের সমন্বয় দিনের পর দিন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাই ইউরোপের কবির মনে আজ প্রশ্ন :—

I, a stranger, and afraid,
In a world I never made.

এ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন জগৎ। ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ণবেগে চলিতেছে। কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ প্রকৃতির উপর মানুষের বিজয়-অভিযান ব্যক্ত করিতেছে। জনসাধারণের প্রতিনিধিদ্বারা পরিচালিত গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক নূতন নূতন ব্যবস্থার দ্বারা মানুষের সুখসুবিধার পথ বলিয়া দিতেছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতিমূলক সমিতি, আলোচনা-সভা মানুষের চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। যাতায়াত পথঘাটের সুন্দর ব্যবস্থা, গগনস্পর্শী সৌধ, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় প্রচুর আরামের উপকরণ প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করিতেছে মানুষের জয়যাত্রার কাহিনী। কিন্তু তবুও পশ্চিমের সাধারণ মানুষ এই বিচিত্র পরিবেশে নিজেকে আগন্তুক মনে করিতেছে কেন। এই বিপুল প্রবাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে একাধারে বিহ্বল ও ভীত। শুধু কবি নয়, পশ্চিমের একাধিক ভাবুকের চিন্তায় সাধারণ মানুষের এই সুতীব্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। ১৯৪৯ সালে ডেনমার্কের এলসিনর সহরে যে প্রথম আন্তর্জাতিক বয়স্কশিক্ষা-সম্মেলন হইয়াছিল, তথায় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক পরিষদের (UNESCO) অধিকর্তা মিঃ টোবেস স্কেঁড়ে যে চিন্তাপূর্ণ কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহাতেও পশ্চিমী সভ্যতার এই দৈন্য অত্যন্ত নিপুণতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন :

Bent over the soil for hours everyday, subjected from morning to night to the mechanical rhythm of mass production, the average adult of our time rarely seems to be in any position to appreciate the life going on around him and to grasp the truth about his fellows.

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মরত একজন সাধারণ চাষী অথবা সাধারণ শ্রমিক বাহিরের বৈচিত্র্যময় জীবন প্রবাহের সহিত কোন যোগাযোগ রাখিতে পারিতেছে না। তাহার বুদ্ধি অথবা কল্পনায় তাহার চারিপাশের মানুষের জীবনের কোন সত্য সে খুঁজিয়া পায় না। তাহার নিজের সম্বন্ধেও এই একই অবস্থা। অথচ একথা সত্য, এই সাধারণ মানুষের মতামতের উপরেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ।

সমস্যা নিঃসন্দেহ গুরুতর। পরিবেশের সহিত মন বুদ্ধি ও হৃদয়ের অর্থপূর্ণ সম্পর্কের ফলেই জগৎ ও জীবনের প্রকৃত সমন্বয়। এই যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের অভাব ঘটিলেই শিক্ষা সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার গায়ে ভাটা আসে। ব্যক্তিজীবনকে সমন্বিত প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে এই ভাটা রোধ করিবার দ্বিতীয় পথ নাই। মানুষের অন্তরে যে দৈন্য, আসলে তাহা অন্নবস্ত্রের দৈন্য নয়, তাহা হৃদয়ের দৈন্য, প্রাণের দৈন্য। প্রাণের সহিত যোগ না থাকিলে বিদ্যা হয় কেবল অর্থহীন গ্রন্থের ভার, বুদ্ধি নিজের মনোভাব গোপন করিবার বা প্রকাশ করিবার একটি যন্ত্র। সেইজন্য এ যুগে বয়স্কশিক্ষার প্রথম কথা First enliven, then enlighten, —আগে আনন্দ, পরে বিদ্যা। বিশ্বপ্রাণের বিপুল বৈচিত্র্যময় পরিবেশে সূর্যের প্রথম আলো যেমন ধরিত্রীর সমুদ্ধ রূপ আনন্দে জাগায়, তেমনি অন্তর রাজ্যেও আনন্দময় প্রাণের স্পন্দন না থাকিলে জ্ঞানের দীপ স্থায়ী ভাবে জ্বলে না। পশ্চিমের শিক্ষাবিদ্ বয়স্কশিক্ষার মারফৎ সাধারণ মানুষের অন্তরে এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার যত্ন।

বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বয়স্কশিক্ষা-কর্মীর গণমানসের সহিত কিছুটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যে ধরণে বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন চলিতেছে তাহার অন্ধ অনুকরণ আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মমূলে আঘাত করিতে পারে। ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত সত্য, ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিজীবনকে পূর্ণতার

উপলব্ধির যে পথ দেখাইয়াছে তাহা বিস্মৃত হইয়া ইউরোপীয় চিন্তাধারা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাবনা, আমাদের দেশের কর্মীবৃন্দের চিন্তা ও কল্পনায় যেন প্রধান স্থান অধিকার না করে।

একথা যেমন সত্য যে, ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক নিরক্ষর (যাহাকে আমরা "লিখন-পঠন-ক্ষম" বলি সেই পর্যায়ে যাহাদের আনা যায় না), তবু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সভ্যসমাজে বাস করিতে হইলে যে প্রাথমিক মূলনীতি সম্বন্ধে জানা দরকার এবং জীবনে পালন করা প্রয়োজন, নিরক্ষর ভারতবাসী তাহা বহুলাংশে জানে এবং পালন করে। একথা আজও সত্য যে ভারতীয় সমাজে অত্যাচার, অপরাধ ও দুর্নীতি-পরায়ণ লোকের সংখ্যা অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় (যে সব দেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যায় ভারতকে অনেক পিছনে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে) অনেক কম। একথা এখন প্রমাণিত সত্য বলিলেই চলে যে, অক্ষর-জ্ঞানের সহিত শিক্ষার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। গ্রামের নিরক্ষর চাষী এমন সরল ও মধুর ব্যবহার করে যে সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত 'সভ্য' নাগরিক তাহা হয়ত ভাবিতেও পারে না। দেখা দরকার, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর হইয়াও প্রকৃত শিক্ষার অন্তর্নিহিত মূল সত্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইউরোপ নিরক্ষরতা মুছিয়া ফেলিয়াছে বলিলেই চলে। কিন্তু ইউরোপে লোক-ব্যবহার বা সমাজ-ব্যবহার কি ভারত হইতে উন্নত? ভারতবাসীর ব্যবহার, কথাবার্তা, আচরণ, ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ-বোধ প্রভৃতি মুহূর্তেই প্রমাণ করে যে যাহাকে আমরা অশিক্ষা বলি, তাহা ভারতের মাটিতে নাই। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তির আচরণ বলিতে আমরা যাহা বুঝি এবং সমাজ ব্যবহারের (social conduct) যে পর্যায়ে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, একজন সাধারণ গ্রামবাসীও ব্যবহারের দিক দিয়া নিজেকে সেই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। ভারতীয় সমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে। প্রাচীন কাল হইতে যাযাবর চিন্তায়, সাধনায় ও চেষ্টায় ভারতের সমাজ ক্রমে ক্রমে রূপ লইয়াছে, ঔদার্য ও জীবনের উপলব্ধ শ্রেষ্ঠ সত্যগুলি ব্যক্তি-জীবনের সমাজে-সমাজের চলতি-জীবনে এমন সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া গিয়াছেন যে সমগ্র সমাজ-জীবন একাধারে একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-পদ্ধতির রূপ লইয়াছে।

বাস্তবিক, ভারতবর্ষের সমাজ-বন্ধনের মূলে এই আশ্চর্য সত্যদৃষ্টি সমাজ-বিজ্ঞানের একটি অপূর্ব কথা। ঋষি, দার্শনিক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, সমাজের জ্ঞানী ও গুণী, যখনই যে সত্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে অগণিত সাধারণ লোকের কাজকর্মে, তাঁহাদেরই চেষ্টায় সেই সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতে কোন সত্য পুঁথির পাতায় সমাধিলাভ করে নাই। পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান বৃহৎ জীবনে উপলব্ধ সত্যের আলোয় আলোকিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম প্রজা প্রতিদিনের কাজে একই পথ অনুসরণ করিয়াছে—সত্যকে ভাল বাসিয়াছে, মঙ্গলকে গ্রহণ করিয়াছে, অন্যায়কে অস্বীকার করিয়াছে। ভারতীয় সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত স্তর গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় একটি বৃহৎ সত্যের বন্ধনে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র যুক্ত।

আমাদের বয়স্ক-শিক্ষা আন্দোলনে সকল কর্মীর এই সত্য সকল সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতে প্রকৃত শিক্ষার বীজ যুগ-যুগান্তের জীবনধারায় সঞ্চিত হইয়া আছে। অন্যান্য অনুকূল অবস্থায় এই বীজ নবাঙ্কুরে রূপায়িত হইবে। কাব্য, মহাকাব্য, লোক সাহিত্য, যাত্রা, কথকতা, কবিগান, নৃত্যগীত, বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে এই প্রাণধর্ম এখনও অক্ষুণ্ণ। নিরক্ষরকে অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন করিয়া, ইউরোপীয় সমাজবাদ বা জীবন-দর্শনের কয়েকটি বুলি কপচাইয়া আমরা নূতন ভারত গড়িতে পারিব না। আসলে চাই সেই দৃষ্টিভঙ্গী যাহা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ঘটিলে লোকে মনে করিবে—এরা আমাদের নয়। এই অবস্থায় বাহিরের শত উপকরণ, রাষ্ট্রের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কাজ হইবে না, কারণ ভিতরে ভিতরে জনসাধারণের সহিত কর্মীর ব্যবধান রহিয়া যাইবে। অন্তরের এই ব্যবধান যাহাতে না থাকে সে বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া দরকার।*

* নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্‌দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | চৈত্র ১৩৬০ | ৫ম সংখ্যা

আলোচনা

পরীক্ষা বিভ্রাট

এই বৎসরের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াই থামিয়া গেল। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ পরীক্ষা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। আগামী ১৯শে এপ্রিল হইতে ইংরেজি ভিন্ন অন্য বিষয় গুলির নূতন করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। ইংরেজির পরীক্ষা যাহা হইয়া গিয়াছিল, তাহাই বাহাল থাকিবে। ইংরেজির খাতা সহজ ভাবে দেখিবার জন্য পরীক্ষক-গণকে ইতিপূর্বে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

গোল বাধিয়াছিল কিন্তু এই ইংরেজির প্রশ্নপত্র লইয়াই। অবশ্য ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রশমিত হয় তাহার পরে, ইতিহাসের প্রশ্ন দেখিবার পর। শুধু স্কুল ফাইন্যালেই নয়, পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ, বি.এস্‌সি, পরীক্ষারও বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

উভয়ত্রই ছাত্রদের অভিযোগ দুইটি, প্রশ্নপত্র কঠিন হইয়াছে এবং সিলেবাসের বাহিরে গিয়াছে। প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই, তাহা বিদ্যালয়ের ও অধ্যাপক এবং শিক্ষকবর্গের বিবেচ্য। কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগটি সত্য হইলে একান্ত পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়। প্রশ্নকর্তা যিনি বা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অবহেলায় বা ঔদাসীন্যে পরীক্ষার্থীদের এই যে ক্ষতি হইল, তাহার পূরণ কে করিবে? প্রশ্নকর্তার পরে মডারেটারেরা আছেন, তাঁহারাই বা কি জবাব দিবেন, ভাবিয়া পাই না। পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এক মহা সমস্যা, শান্ত ও অনুকূল পরিবেশ ব্যতীত পরীক্ষার হলে মাথা ঠিক রাখিয়া যথাযথ উত্তর লিখিয়া আসা সহজ নয় এবং আজ যাঁহারা কর্তৃপক্ষ, তাঁহাদেরও একদিন এই পরীক্ষাব্যূহ ভেদ করিতে হইয়াছে। পরীক্ষার্থীর মনোভাব ও শক্তি তাঁহাদের অজানা নয়, তবু এই ধরণের ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়া মর্মান্তিক দুঃখের বিষয়।

অবশ্য, এই অজুহাতে কেন্দ্রবিশেষে ছাত্রেরা যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজের সম্বন্ধে উদ্বেগ ও নৈরাশ্যে মন পীড়িত হইতেছে। 'ছাত্রশক্তি' মানতে হবে, এই হুমকির রাজত্ব চলিতে থাকিলে পরিণামে দেশ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে?

অবশ্য দেখিয়া আমাদের মনে হয়, এখন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে একদল বলিষ্ঠচিত্ত, স্থিরবুদ্ধি ছেলেমেয়ে সংঘবদ্ধ হইয়া এই স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির দমন করিবার ব্যবস্থার কথা চিন্তা না করিলে এই অসংখ্য দাবির অন্তরঙ্গ বোধ করা ক্রমে অসম্ভব হইবে। কেবল অভিভাবক বা

শিক্ষকদের হাতে থাকিলে চলিবে না, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আজ নব চেতনার উন্মেষনের একান্ত প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি

মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন ও ডুয়ার্স ভাতা সম্বন্ধে যাহা হউক কিছুটা সীমাংসা হইয়াছে। এই হারে বেতন নিয়মিত পাইলে তাঁহারা খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে পারিবেন, আশা করা যায়। শিক্ষক নিজেও অতিভাবক, সন্তানের জনক, সমাজের মঙ্গল তাঁহারও কাম্য. কাজেই তাঁহার কাছে সমাজ যে সেবা দাবি করে, সমাজের জন্য তাহা তিনি অবশ্যই করিবেন।

বেতন দিয়া মর্যাদার পরিমাপ হয় না, তবু মর্যাদার এই স্বীকৃতি সমাজে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং সকল স্তরেই ইহার মূল্য আছে। মানুষের শিক্ষার গোড়াপত্তন যে প্রাথমিক শিক্ষকের কাছে, তাঁহাকেও অন্যের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ অথবা কলেজের শিক্ষকদের অর্থাৎ সমগ্র ভাবে শিক্ষকদের বেতনের হার প্রভৃতি একসঙ্গে বিবেচনা করিয়া একসঙ্গে উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ভাল হইত। এক অংশে আগে, অন্য অংশে অন্তরায়, এ ব্যবস্থা ভাল নয়।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষকগণ মিলিত ভাবে যে দাবি করিয়াছেন, তাহা বেশ যুক্তিসঙ্গত বলে হয়। আমরা আশা করি পশ্চিমবঙ্গের সরকার শীঘ্রই তাঁহাদের দাবি পূরণ করিবেন। তাহাতে অর্থ নাই, এই যুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে আর কতদিন সব উন্নতির অন্তরায় হইয়া থাকিবে?

নীচে আমরা প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবির সারাংশ উল্লেখ করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে দাবি করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের মাসিক বেতন কম পক্ষে ৬০৲ টাকা আর ডুয়ার্স ভাতা ৩৫৲ টাকা ও বাড়িভাড়া বাবদ ৫৲ টাকা মিলা মোট ১০০৲ টাকা হইবে। প্রধান শিক্ষক অতিরিক্ত ১৫৲ টাকা বেশি পাইবেন। তাঁহারা বলেন, দিল্লী, আসাম, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, আজমীর, দুর্গ প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় ইহা এমন বেশি নয়। এমন কি, তাকির হোসেন কমিটি ১৯৫২ সালে যে ২৫৲ টাকা বেতন ধার্য করিয়াছিলেন, বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে ১০০৲ টাকা তাহার চেয়ে বেশি নয়।

বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে যে ১·২৮ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা প্রায় ৫ কোটি টাকা ইহাতে বেশি লাগিবে। তাঁহাদের মতে শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ টাকার শতকরা ৪০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার খাতে ব্যয় করা উচিত। বাকিটা টাকা শিক্ষাকর আদায় করিয়া পূরণ করা যায়। যাঁহাদের বার্ষিক আয় ১,৫০০৲ হেডহাজারের উপর তাঁহাদের কাছে এই কর আদায় করা উচিত। তাহা ব্যতীত, বিদেশী বণিকসংস্থাগুলি, পাট, চা, কাপড়, মাদক দ্রব্য, সিনেমা প্রভৃতি শিল্পব্যবসায়ীগণ এই কর দিবেন, এইরূপ আইন করা অসঙ্গত হইবে না।

শিক্ষার গোড়াপত্তন যাহাদের হাতে, সেই প্রাথমিক শিক্ষকদিগের ন্যায়সঙ্গত দাবি আমরা সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য

বিশ্বভারতীর সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে সুপরিচিত, বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এখন ভারতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুমোদনের অপেক্ষা। আমরা ডাঃ বাগচির এই নির্বাচনে আনন্দ অনুভব করিতেছি ও তাঁহাকে সাধুবাদ জানাইতেছি। তাঁহার সুযোগ্য হস্তে

বিশ্বভারতীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হউক, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকুক, ইহাই আমাদের কামনা।

অর্থ সাহায্য কমিশন কর্তৃক অর্থ মঞ্জুর

বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-সাহায্য-কমিশন ১৯৫৩-৫৪ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে মোট ৭২ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ৭২ লক্ষের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার প্রসারের উদ্দেশ্যে ৪২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশি টাকা পাইয়াছে বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়, তাহাদের সাহায্যের পরিমাণ নয় লক্ষ টাকা। বোম্বাইয়ের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য প্রায় ৩২ হাজার টাকা পাইবে।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ভারতীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আই, এ, এস) এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগদান করিতে চায় তাহাদের শিক্ষায় সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া ভাইস চ্যান্সেলার ঘোষণা করিয়াছেন।

তিনি এবিষয়ে ছাত্রদের অসুবিধা অভিযোগ প্রভৃতি জানিতে উৎসুক এবং প্রতিবিধান করিতেও বদ্ধপরিকর। বেশ কিছু দিন হইতেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাঙালী ছেলের নাম বিরল হইয়া আসিতেছিল, বর্তমান বৎসরে তো মোটে একটি বাঙালী মেয়ের নাম আই, এ, এস্ পরীক্ষার তালিকায় দেখা গেল, তাহাও বাঙলার বাহিরের মেয়ের। কারণ অনুসন্ধান করিলে অনেক কিছুই চোখে পড়িবে এবং তাহার প্রতিকারও সহজে হইবে না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ তাহার জন্য অনেক খানি দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই দিকে দৃষ্টি দেন তবে এবিষয়ে প্রতিকার অসম্ভব হইবার কারণ নাই। বাঙালী ছেলের মনীষা তো ক্ষীণ হইয়া যায় নাই, যাহা নষ্ট হইয়াছে তাহা হইল শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা। ছাত্রদের মধ্যে নিরুৎসাহিতা ও এই শ্রদ্ধার ভাবটি কাটাইয়া তোলার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ না করে তবে আর কে করিবে?

শিক্ষা কি? সৎসঙ্গ।

আচার্য বিনোবা ভাবে

শ্রম, সম্পত্তি, বুদ্ধি, ভূমি আর মন—এই পাঁচটি এমন সম্পত্তি যাহা মানুষের পঞ্চ-প্রাণের সমান। কোনটি বাহ্য সম্পদ, কোনটি আন্তরিক। ভূমি বাহ্যিক সম্পদ, লোকে যাহাকে ধন দৌলত বলে তাহাও বাহ্যিক। শ্রম কিছুটা বাহিরের কিছু অন্তরের। শরীর দ্বারা আমরা শ্রম করি। তবে প্রাণ-শক্তির না হইলে, মানসিক আশ্রয় না পাইলে শরীর কাজ করিতে পারে না। কিন্তু শরীর পঞ্চকুলে নিহিত। আর বুদ্ধি ও প্রেম এই দুই শক্তি দুইটি অন্তরের নিহিত। সম্পত্তি ও ভূমি বাহ্য সম্পদ, আর শরীরশ্রম আছে শক্তি। অন্তরের সম্পদ সকলের সমান হয় না, ব্যক্তি বিশেষে কম বেশি হয়। এমন মানুষ খুবই কম পাওয়া যাইবে যাহাদের বুদ্ধির একান্তই অভাব। তাহাদের তো পাগলের মধ্যে ধরা হইবে। কিন্তু বাকি সকলের কম বেশি বুদ্ধি প্রমাণসাপেক্ষ।

বুদ্ধির বিকাশের জন্য চাই সজ্ঞান-সঙ্গ, যাহাকে বলে শিক্ষা, কিন্তু বর্তমানের শিক্ষা নয়। আমার বিচারে শিক্ষার অর্থ কেবল ইস্কুলে গিয়া বই পড়া নয়। শিক্ষার প্রধান অর্থ—সজ্ঞান সঙ্গ। যে সমাজে প্রত্যেকটি লোকের জন্য সৎ সঙ্গতির ব্যবস্থামূলক প্রতিষ্ঠান থাকিবে, সেই সমাজের উন্নতি হইবে। এই জন্য আজ বিশেষ ভাবে একথা বলা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক শিশু, প্রত্যেক বৃদ্ধ, আর প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের যেন সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য শুনিবার ও জ্ঞান চর্চা করিবার সুযোগ থাকে। ইহাকেই আমি শিক্ষা বলি।

এইরূপ পরীক্ষা গ্রামে গ্রামে হওয়া চাই। অন্যথা দেশের উন্নতি অসম্ভব। এইরূপ এক ব্যবস্থা আমাদের দেশে ছিল। কিছুদিন ধরিয়া তাহা চলিয়াছিল। যতদিন তাহা চলিয়াছিল ততদিন দেশ যৌবনের শিখরদেশে ছিল। কিন্তু আজ উহার পতন হইয়াছে। আজ শিক্ষা ইস্কুল কলেজে সীমাবদ্ধ। শিক্ষা গ্রামে গ্রামে পৌঁছায় না আর যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহাও হয় না। কারণ আজ শিক্ষা পয়সার জন্য আর পয়সার আধারেই তাহা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার আগে পাছে, সম্মুখে, পয়সারই কথা সর্বত্র। এই শিক্ষায় সৎ-সঙ্গের প্রয়োজন হয় না। মানিয়া লইলাম যে, এই শিক্ষারও কিছু ভাল অবশ্যই আছে, কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে ইহা অচল। আর নিকট ভবিষ্যতে ইহারা যে সর্বত্র স্কুল কলেজ খুলিবে, এমন ভরসাও পাই না।

প্রাচীন ব্যবস্থায় তো ছিল, যিনি জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, সমাজে কিছু শক্তি রাখেন, যাঁহার ইন্দ্রিয়াদি সিদ্ধি নয় তাঁহাকেই প্রব্রজ্যায় বাহির হইতে হইবে। আজকাল আমি প্রব্রজ্যায় বাহির হইয়াছি, আর দেখিতেছি লোকে আমাকে এজন্য আদর করে, কেননা এই যুগেই ইহা হইতেছে। অতীতে তো আমি যাঁহাদের চরণের ধূলিরও সমান নই, এমন সব ঋষিরা দেশ পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। তুলসিদাস বলিয়াছেন, মা গঙ্গা তুমি আমাকে এমন মতি দাও যেন তোমার তীরে তীরে আমি ভগবানকে স্মরণ করিয়া বিচরণ করি।

পরিব্রাজকগণ গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিতেন। তাঁহারা লোককে জ্ঞান দান করিতেন। আর পুথি পড়িয়া যাহা পাওয়া যায় না এমন সকল বিষয়ে জ্ঞান ইঁহাদের কাছে লাভ করা সম্ভব ছিল। সেই জন্য শ্রবণ শক্তির উপর আমাদের দেশে জোর দেওয়া হইত, আর গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে এই পরিব্রাজকদের কাছে শুনিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিত। তখন ইঁহাদের জন্যই গ্রামে গ্রামে, কোণে কোণে জ্ঞানের প্রচার হইত। আজ কি দেখি, আজ সামান্য বিদ্যা লাভ করিয়া লোকে সহরে চলিয়া আসে। আর জ্ঞানের দিক দিয়া গ্রামগুলির শোষণ চলিতে থাকে। গাভী যেমন ঘাস খায় কিন্তু ছোট বাছুরকে ঘাস খাওয়ায় না, তাহাকে দুধই পান করায়, সেইরূপ পরিব্রাজকগণ আপনাদের অর্জিত বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয় লোক-সুলভ ভাষায়, গুণগ্রাহী ভাষায়, যেমন করিয়া গাভীমাতা বৎসকে দুগ্ধ পান করায় তেমন করিয়া গ্রামবাসীকে শিখাইয়া দিতেন। লৌকিক ভাষায় শিক্ষা দিতেন যেন সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় যাহা পারিত না, এই সব পরিব্রাজক তাহা করিতে পারিতেন। ইঁহারা এক এক গ্রামে দুই তিন মাস থাকিতেন, গাছ-গাছড়ার কিছু ওষুধ দিয়া বিনা পয়সায় লোকের রোগ সারাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কথা বলিতেন। শিক্ষা প্রচারের কি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ফলে এমন দাঁড়াইল যে, পরিব্রাজক থাকা চাই, ইহা ধর্মের অঙ্গীভূত হইল। আর আর যাহা লোকে জানে না এমন জ্ঞানও সেকালের লোকে লাভ করিত। এইজন্য বেদান্ত টিকিয়াছে, এইজন্য নীতিধর্ম বিস্তার লাভ

করিয়াছে আর এইজন্য এই দেশ টিকিয়া আছে —ইহাই আমার বিশ্বাস।

মূলত উহাদ লইয়া আমাদিগকে এই পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে গাঁয়ে গাঁয়ে জ্ঞান পৌঁছিবে। বেতিও প্রভৃতি দিয়া একাজ হইবার নয়। যদিও আমি ইহারও মূল্য দিই, তাহা দিলেও অতিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানের কথায় সোজা আওয়াজ যাহার কানে পৌঁছায় সেই ব্যক্তি বড়। যাহারা বেতিও শুনিয়া শিখিতে চায় তাহাদের কান এই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ জ্ঞানচর্চায় যে বিধি দিয়াছিলেন, আমাদের আবার তাহাই পালন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে প্রবণের অনেক লাভ। লোকের উপর চাপ পড়িবে না অথচ উপকার যথেষ্ট হইবে। আজ যদি সাক্ষরতা প্রচারের কথা ওঠে অমনি কোটি কোটি টাকার কথা ওঠে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সমাজের উৎসাহী লোক, জীবনে যাঁহার মানসিকতা অনুভূতি হইয়াছে, যিনি চরিত্রবান, যাঁহার পুস্তকতা সংসারের ভার বহন করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, এমন লোক যদি আপন আত্মার বিকাশের জন্য হরিদাস গাহিতে গাহিতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শিক্ষা প্রচারের কাজে ঘুরিয়া বেড়ান তবে দেশে প্রকৃত জ্ঞানের বিস্তার হইবে আর এইভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিতে দেশ টিকিয়া যাইবে।

আর্নল্ড জে. টয়েনবি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আর্নল্ড্ জে. টয়েন্‌বি এ যুগের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন শেষ করে টয়েন্‌বি এথেন্সে যান, ব্রিটিশ আর্কিওলজিক্যাল স্কুলে কিছুকাল পড়েন এবং পদব্রজে সারা গ্রীস ঘুরে বেড়ান। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ডে ফিরে আসেন এবং তিন বৎসরকাল অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী থাকেন। এরপর সরকারী কাজ নিয়ে টয়েন্‌বি বৈদেশিক রাজনীতির ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের সুযোগ গ্রহণ করেন। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে যাঁরা যোগ দান করেন তাঁদের মধ্যে টয়েন্‌বি ছিলেন অন্যতম। ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় অভিবাহিত করে টয়েন্‌বি ১৯২৪-এ গ্রীসে যান, যুদ্ধের ব্যাপারে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সংবাদদাতার কাজ নিয়ে। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত টয়েন্‌বি পররাষ্ট্রদপ্তরে গবেষণা বিভাগের পরিদর্শক হিসাবে কাজ করেন। তার পর ১৯৪৭-এ তিনি আমেরিকায় যান এবং নানাস্থানে বক্তৃতা করেন।

টয়েন্‌বি যে-গ্রন্থ লিখে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন তার নাম A Study of History। এর ৬ খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে। আরও ৩ খণ্ড প্রকাশের আয়োজন চলেছে। A Study of History-র ছয় খণ্ডের চুম্বক একখণ্ডে প্রকাশ করেছেন D. C. Somervell. ডি. সি. সমারভেল্ তাঁর গ্রন্থে টয়েন্‌বির ভাষা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। যাঁদের সময় কম অথচ মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রবল আগ্রহ আছে তাঁদের অনুরোধ করি সমারভেলের বইখানি পড়বার জন্যে। টয়েন্‌বির মতে সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর করে সমাজের চলার শক্তির উপরে।

বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হ'য়ে যে-সমাজ চলা বন্ধ করে দিলো দুঃখের ভয়ে, তার পক্ষে অনিবার্য। মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে টয়েন্‌বি বলছেন: সমাজের প্রগতির পথে প্রবলতম বিঘ্ন আরামপ্রিয়তা। বাধা নানা আকারে আসবেই। সেই বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা যে সমাজ হারালো সে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

কোন্ সমাজ এই বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে সামনের দিকে আগিয়ে চলে; আবার কোন সমাজ বাধাবিঘ্নের সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করে থেমে যায়। কোন্ শক্তির জোরে এক সমাজ আগিয়ে চলে এবং কোন্ শক্তির অভাবে আর এক সমাজ পিছিয়ে যায়? সমাজের উন্নতির অথবা অবনতির কারণ কি? টয়েন্‌বি বলছেন: সমাজ বাধাবিঘ্নকে জয় করবার শক্তি আহরণ করে তার Creative minorityর কাছ থেকে। যেসব সৃষ্টি-ক্ষমতা নেই যে সমাজের, সে-সমাজকে অধোগতির দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবে কে? ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়েছে, সমাজকে গ্রাস করবার জন্যে বাইরে থেকে এসেছে আক্রমণের পর আক্রমণ; সেই আক্রমণকে ঠেকিয়ে সমাজকে শক্তি যোগাবার জন্যে আবির্ভূত হয়েছে পুরুষসিংহের দল। তাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং কর্মধারা সমাজের অবসন্ন শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করেছে নূতন প্রাণপ্রবাহ। আবার এসেছে আক্রমণ। আবার সেই আক্রমণকে ঠেকাবার জন্যে রণে দাঁড়িয়েছে সৃষ্টিধর্মী মনীষীর দল, যাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে মানবেতিহাসের জয়গান, লেখনীর মুখে জ্বলেছে স্বর্গের বহ্নিশিখা, কর্মে ফুটে উঠেছে মহাবীরের পরিত্রাণের পরিচয়। এই অগ্রগতির পথে কোথাও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। যে-সমাজ এগুনি করে তার প্রতিভাবান মনীষীদের পশ্চাতে চলতে পেরেছে অবিরামগতিতে বাধার পর, বাধাকে জয় করে—সেই সমাজ আপনাকে উজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়েছে সভ্যতার অকপালোকের মধ্যে। টয়েন্‌বি বলছেন: সভ্যতার বিকাশ নির্ভর করে না যন্ত্রের উন্নতির অথবা প্রাকৃতিক আবেষ্টনীকে বশীভূত করবার শক্তির উপরে। প্রগতিশীল সভ্যতার প্রাণ হচ্ছে তার ঐক্য। সভ্যতার প্রগতিশীল অবস্থায় সমাজে সৃষ্টির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত সৃষ্টিধর্মী নর-নারীর প্রভুত্ব থাকে অক্ষুণ্ণ। তখন সমাজের জনসাধারণ দেশের মনীষীদের আদর্শকে মানদণ্ড করে অনুসরণ। তাঁদের জীবন থেকে তারা আনিয়ে নেয় নিজেদের জীবনের দীপশিখা। এই রকমের প্রাণবন্ত অখণ্ড সমাজ আত্মকলহের অভিশাপ থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে সমাজ যখন অধোগতির পথে নামতে সুরু করে তখন তার মধ্যে দেখা যায় তিনটি লক্ষণ: *a failure of creative power in the minority, an answering withdrawal of respect on the part of the majority, and a consequent loss of Social unity in the Society as a whole*; যে-সমাজ ভাঙনের মুখে, তার নেতাদের মধ্যে দেখা দেয় সৃজনীশক্তির শোচনীয় দীনতা। সেই সমাজের জনসাধারণ স্বতঃই হারিয়ে ফেলে নেতাদের উপরে শ্রদ্ধা, অস্বীকার করে তাদের অনুকরণ করতে। ফলে সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ঐক্য হয় ব্যাহত, তার ভিতরে থাকেনা পূর্বের সংহতি, খণ্ড খণ্ড হয়ে সমাজ ভাঙতে আরম্ভ করে। যে অল্প কয়েকজন সৃষ্টিধর্মী চরিত্রের এবং জ্ঞানের আভিজাত্য দিয়ে জনসাধারণকে বশে রেখেছিল তারাই তখন সমাজে প্রবল হয়। বলের দ্বারা এই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তখন সমাজে প্রভুত্ব করবার চেষ্টা করে, এই প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ হতে থাকে ঘনীভূত; শেষে গণবিপ্লবের দাবানল জ্বলে ওঠে লেলিহান শিখায়। অন্তর্বিরোধে সভ্যতা যায় রসাতলে। অন্তর্বিরোধের ফলে সমাজ ভাঙতে

আরম্ভ করে টুকরো টুকরো হবে। অন্য কথায় এই প্রবন্ধের মাধ্যমে টয়েন্‌বির চিন্তাধারার একটা অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। প্রবন্ধ পড়ে তাঁর A Study of History পড়বার ইচ্ছা কারও মনে জাগলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ধন্য হবে।

আজকের দিনে টয়েন্‌বির রচনার আলোয় শিক্ষাব্রতীরা নিজেদের বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলে সমাজে নবজীবনের প্লাবন আসবে। টয়েন্‌বির Creative Minority-র পর্যায়ে শিক্ষকেরা নিশ্চয়ই পড়েন। শিক্ষকের কাছে চরিত্রের এবং জ্ঞানের আভিজাত্যে সমুজ্জ্বল নেতৃত্বের দ্বারা সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

টয়েন্‌বি মনীষীদের নেতৃত্বে জনসাধারণের শ্রদ্ধার উপরে জোর দিয়েছেন। এই শ্রদ্ধার দৈন্য ছাত্রসমাজের মধ্যে যে ভাবে প্রসার লাভ করেছে তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। দেশের মনীষীদের সম্পর্কে এই শ্রদ্ধা-হীনতা জাতির ঐক্যকে ব্যাহত করবে, সমাজের অঙ্গে কাটল ধরিয়ে দেবে, ভারতবর্ষকে সত্যসত্যই সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে। আজকের দিনে জাতির চিত্ত যখন নানা আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষোভিল হয়ে উঠেছে, বড়ো বড়ো আদর্শে যুব-সমাজের শ্রদ্ধা যখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে তখন টয়েন্‌বির ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের পরিচয় সমাজের পক্ষে নিশ্চয়ই শুভ হবে।

শিক্ষক—গিরীশচন্দ্র দে

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথের "আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ-খেলা' কবিতার মর্মটি আমাদের ইস্কুলজীবনের এক অধ্যায়ের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়ে ছিল যে, আজ সেই কথাই বারবার করে মনে হচ্ছে।

পুরানো এক ইস্কুলে পড়তাম। হঠাৎ সেই ইস্কুলের প্রধান-শিক্ষকের মান-মর্যাদার সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের জীবন জড়িয়ে গেল। আমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। ইস্কুল পরিচালক সমিতির অন্যায় আর অবধানতা প্রধান-শিক্ষক যেন সইতে পারলেন না, আমরাও তেমনি। তখনও জাতীয়-আন্দোলন মিইয়ে আসে নি। প্রথম দিকের সেই অসহযোগের উত্তেজনা শান্ত হয়ে এলেও মনের মধ্যে একটা সুর এমনভাবে বেজে গেল যে ছাত্রদের সমগ্র দেহ-মনে যেন সারা রাত্রের বড়-বৃষ্টির শেষে প্রভাতের কাঁচা রোদ্দুরের আলোর মতো একটা অদ্ভুত আনন্দ এনে দিয়েছিল। একটা কিছু করা চাই, হৃদয়ের অনুভূতির সেই চঞ্চলতা আমাদের ব্যগ্র করে তোলে। সুযোগ ছুটে গেল।

প্রধান শিক্ষকের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা নতুন বিদ্রোহ নিয়ে সজীবিত হয়ে উঠলো। তিনি নতুন ইস্কুল খুললেন সহরে। তাঁর প্রথম কর্তব্য হল, বাংলাদেশের যশস্বী শিক্ষকদের সাহায্য গ্রহণ করা। তাঁরা এই ইস্কুলে যোগদান করলেন। দ্বিতীয় কর্তব্য হল, পাড়ায় পাড়ায় ঐ শিক্ষকদের পরিচালনায় বিনাবেতনে ছেলেদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা। সহরের যে অঞ্চল থেকে ঐ শিক্ষকেরা আসতেন সেই অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং অভিভাবক ছিলেন ঐ শিক্ষকেরা। ছেলেদের চরিত্র আর বিদ্যার্জনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকত তাঁদের। সহরের আর তিনটি

ইস্কুল এই অভিনব পদ্ধতিতে বিশ্বিত হয়ে ওঠে। কেবল বিস্ময় নয়, অধিকাংশ ছাত্র সেই সব ইস্কুল থেকে এখানে এসে যোগ দিল। যে-প্রধান শিক্ষককে ইস্কুল পরিচালক সমিতি মনে করেছিলেন, অর্থাৎ আর ঢোঁড়া সাপ—তাঁরই অপূর্ব সংগঠনশক্তি দেখে তাঁরা হতবাক হয়ে যান। একটা অভিশাপের মতো তাঁদের ইস্কুলগুলোতে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা পদ্ধতি এসে পড়ল। এই প্রধান শিক্ষক ছিলেন—পার্থবাবু সেন। তাঁর কথা 'শিক্ষায়' পূর্বে লিখেছি।

তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন গিরীশচন্দ্র যে—সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে। গিরীশচন্দ্রও ছিলেন পূর্ববঙ্গের বনশ্রী প্রধান শিক্ষক। তখন তিনি বার্ধক্যের কোঠায়। কিন্তু জরা-ব্যাধি তাঁকে আক্রমণ করতে পারে নি। অটুট স্বাস্থ্য-সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

প্রথম দিন তাঁকে দেখবার জন্যে আমরা ভীড় জমিয়েছি। তখন বেশ গরম পড়েছে। সাহেবি-চলনে যাঁরা মানুষ তাঁদের কাছে এই গরমের দেশের লোকে অসভ্য বলে পরিগণিত, বোধ হয় পোষাকের জন্যে। তিনি একটি পুকুরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। গায়ে কতুয়া, সংকুচিত পাঞ্জাবীটি কাঁধের উপর রাখা, হাতে একখানি গীতা আর পকেট সংস্করণের অক্সফোর্ড ডিক্সনারী। হাতের ঐ বইটির কথা তখনও জানিনি। মুখে একটু হাসি, পরিষ্কার গলা, সবল আর জাঁদ-যুক্ত। খাটো কাপড়, পায়ে স্যাণ্ডেল।

আমরা তখন 'গান্ধীজী কি আর করে এমন অভ্যস্ত যে তাঁকে দেখে স্বভাবতই সেই গান্ধীজীর কথাই মনে হল। চেহারায় আর আচরণে সেই দিকটাই ফুটে উঠেছিল, তখনও জানতে পারিনি আদর্শের দিক দিয়েও তাই বটে।

আজ ভাবি, সৌন্দর্য-সম্বন্ধে যাদের এতটুকু জ্ঞান ছিল না—সেই ছেলেদের কাছে তিনি এমন অপরূপ হয়ে উঠলেন কি করে? ব্যাখ্যা করতে গেলে মনে হয় সেই সৌন্দর্য-দর্শনের কথা। অন্তর (তত্ত্ব) আর বাহির (রূপ) এই দুই বস্তুর সমন্বয়ে হয় সৌন্দর্য। কিন্তু অন্তর যদি বাহিরকে ছাড়িয়ে যায় তবে সেই সৌন্দর্য হয় অপরূপ, আর বাহির যদি অন্তরকে ছাড়িয়ে যায় তবে তা হয় সৌন্দর্যের উপহাসের দিক। গিরীশচন্দ্রের অন্তর বাহিরকে অতিক্রম করেছিল বলেই তিনি ছিলেন অপরূপ। কিন্তু আমাদের তো তখনও সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের এই কথাটি জানা ছিল না। মনে হয়, মনোবিশ্লেষণকারীরা ভাষা ও মনের যে ব্যাখ্যা করছেন—গিরীশচন্দ্রের সম্বন্ধে তাই খেটে গেছে। চিন্তার সেই সহজ লক্ষ্যবিহীনতা বা মুক্ত উৎসারণের দিকে গিরীশচন্দ্রের অন্তরকে আমাদের মন প্রতীকের মতো ভেবে নিয়েছিল। ঐ প্রতীককে ভিত্তি করে আমাদের তখনকার মন জাতীয়-আন্দোলনের সর্বমান্য নেতার খোঁজই তাঁকে দিয়েছিল। গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধে ভাবতে বসে আজও তাই আমার মনে হয়, শিক্ষককে এমনি করে প্রতীক-ই হতে হয়। দেশের ঐতিহ্য আর জনসাধারণের মনকে অবলম্বন করে শিক্ষকের নিজের মধ্যে সেই প্রতীককে সৃষ্টি করতে হয়। কোনো কৃত্রিমতা থাকলে চলে না, স্বাভাবিক হয়ে উঠতে হবে। এই-ই তো প্রগতি। পুরাতনের মধ্য দিয়ে নতুনকে আহ্বান করে ভবিষ্যতের দিকে চলবার যে ইঙ্গিত তাকেই আমি প্রগতি বলে মানি। কবি, সাহিত্যিক এমনি করেই প্রিয় হ'য়ে ওঠেন। শিক্ষকও এমনি করেই দেশের সামনে প্রত্যক্ষ মূর্তি তুলে ধরেন। গিরীশচন্দ্র আমাদের মতো দশটি মানুষের কাছে সেই নির্দেশ এনেছিলেন।

এই সহজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা নানা দিক দিয়ে প্রকাশ পেত। আমাদের কয়েকজনের উপর নির্দেশ ছিল, ভোরবেলা অর্থাৎ ৪টের সময় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে নিজের নিজের পড়া তৈরী করতে। বার্ষিক পরীক্ষার আগে, ঐ অঞ্চলে মৈমনসিং থেকে যে শীতের হাওয়া আসে, তার অত্যাচার

অনেকটা বংশনের মতো। সেই এক মাইল দূর থেকে লণ্ঠন জালিয়ে নিয়ে পথ বেয়ে চলেছি। মাড়োয়ারী পট্টি দিয়ে যেতে হয়। কত কথা মনে আসত। ঐ ভোরে মাড়োয়ারীরা উঠে কি-সব তোড়জোড় করত। তাদের বড় বড় বাড়ীর দাতা থেকে নানা রকম ফুলের গন্ধ রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের অনেকেরই জীবনের সুখ সম্বন্ধে কোন বোধ ছিল না, কিন্তু কেন যেন মনে হত ঐ ধনী মাড়োয়ারীরা লেখাপড়া জানে না, বিলিতি কাপড় বিক্রী করে, পাটের কারবারে বহু টাকা খাটায়, তবু তারা পৃথিবীর সুখের বাস্তব দিকটা এমন আয়ত্তে আনল কি করে? বলতে যারা নেই, লেখাপড়া যারা করে তারা যে খুব দরিদ্র এ কথা বুঝে গিয়েছিলাম, আর বুঝেছিলাম এ দারিদ্র তারা ইচ্ছে করে বরণ করে না, তারা অসহায় বলেই বরণ করে।

গিরীশচন্দ্রের বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে লণ্ঠনের আলো অনাবশ্যক হয়ে উঠত। ভাড়াটে বাড়ী। একতলাতে ঢুকলাম, সামনেই দরজা।

সর্বনাশ! ভাগ্যিস দেখতে পেয়েছিলাম। গিরীশচন্দ্র তখন একটা পাটিতে শুয়ে হাত-পা নানা ভাবে ছোড়াচ্ছেন। এমনি ভাবে ব্যায়াম করতেন। ঐ টিতেও খালি পা। আর একটু হলেই তাঁকে মাড়িয়ে দিতাম। ঈশ্বরের অসীম করুণা, পরবর্তী জীবনে এই 'আর একটুর' হাত থেকে বেশ কয়েকবার বেঁচে গেছি।

ঐ অবস্থাতেই বললেন, "পাশের আলনাটা খুলে দাও, আলো এসে পড়েছে।"

আমরা তাঁর ব্যায়াম করা দেখছি। কিন্তু ব্যায়াম দেখলে তো চলবে না, বিদ্যে অর্জন করতে এসেছি। বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ করতে বললাম। অনুবাদ সংশোধন করতে বসে—মাছের মধ্য থেকে আমরা যেমন কাঁটা বাছি, তেমনি করে ভুলগুলো বের করলেন। একটা করে ভুল বের করেন আর বলেন, 'এইবার কথাটা কেমন সুন্দর হল, তাই না?'

আমরা সায় দিলাম, ইংরেজির সৌন্দর্য নয়, তাঁর 'সুন্দর' কথাটা ঐ ভোর বেলা কেমন যেন আবেশ নিয়ে আসে। এই 'সুন্দর' কথাটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। হঠাৎ এক সময় আমাদের অতি সাধের, অতি কষ্টে সঞ্চয় করা তিন সিলেবলের এক ইংরেজি শব্দ কেটে দিয়ে বললেন,

—দোকানদার হয়েছিস?

কোথায় ভুল হল বুঝলাম না, আমাদেরই ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার-করা অনেক শব্দের মধ্যে একটি, তবু লজ্জার সঙ্গে জিজ্ঞাসু হলাম।

—দোকানদারেরা বড় বড় শব্দ ব্যবহার করে। মিথ্যেকে সত্যি করে তুলবার জন্যে শব্দের ফুয়াসা।

—কিন্তু!

—তোরাও এমনি মিথ্যেবাদী। বলতে পারিস, এই এত বড় শব্দটা তোরা বুঝেছিস্? কখনোও না, আমাকে ভড়কে দিতে চাস—তোরা খুব ইংরেজি জানিস বলে। ভুল, বুজরুকি সব ভুল।

আমরা তখন 'না তব না তব' করে ইংরেজি শব্দটি যে খুব জানি এবং প্রমাণ করবার জন্য সেটির পদ-পরিচয় আর ইংরেজি প্রতিশব্দ নিয়ে তৈরী হতে চলেছি এমন সময় গম্ভীর হয়ে বললেন,

—বড় ইংরেজি শব্দ দেখলেই আমি কেটে দেব। ভদ্রলোকের ইংরেজি ব্যবহার করবি—Simple English, বেমানান কিছু থাকবে না কথার মধ্যে। কথার মধ্যে একটা সুর আছে।

তিনি একটা সহজ শব্দ বসিয়ে দিলেন। তাজ্জব! এমন সাধারণ ইংরেজি যা আমরা ৬ষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীতে প্রায়শ ব্যবহার করেছি—তাই যে এখানে ব্যবহার করা যায় বুঝতে পারিনি। কিন্তু এ কথা বুঝলাম, ঐ বাক্যের আর পাঁচটা শব্দের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেল।

তাঁর সেই 'সুন্দর আর সহজ' কথাটা বোধ হয় পরিষ্কার হয়ে গেল। আজও শিক্ষকতা করি, কিন্তু গিরীশচন্দ্রের সেই 'সহজ আর সুন্দর' সত্যি খুব

থাকিয়ে উঠতে পারিনে। ওটি তাঁর একান্ত নিজেরই ছিল যেন। অনুকরণ করা যায় না; কিংবা হে বয়স শিক্ষাসাপেক্ষ।

আর একবার এই 'সহজ-সুন্দর' কথাটা তাঁর শুনেছিলাম। ইংরেজ-আমলে বিচারের সময়, একজন মুসলমান জমিদার বক্তৃতা করছিলেন। টানে টানে-টানার টান দেখে মনে মনে আমরা ছি ছি করছি, কিন্তু সামনের বিচার প্রোতৃবর্গ খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। গিরীশচন্দ্র ঐ দার থেকে এই দিকে ঘুরে এলেন। মুখে তাঁর আনন্দের হাসি। আমরা কিন্তু বিরূপ কথা বলবার আগেই বললেন,

—কেমন সহজ করে বললেন দেখছিস! সুন্দর!

সেই মুহূর্তে মনে হল সত্যিই সহজ। এতক্ষণ যা মনে করেছিলাম, অন্য লোকের পক্ষে সহজ—এখন মনে হল সত্যিই সহজ। আমরা সকলেই তো বুঝেছি। ঠিক ঐ জ্ঞান নিয়েই বিদ্যাসাগর-পরাবলী পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলাম—সহজ আর সরল। গিরীশচন্দ্রের প্রত্যক্ষতা আমাদের মধ্যে এমনি করে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন কিছুর বাধা মানতেন না, মনের উপর জোর করে পাশ কেটে দিতেন—'সহজ আর সুন্দর' বলে।

যেখে-শুনে মনে হত তাঁর মত ছিল, ছেলেরা কত অধিক শব্দ শিখতে পারে, সেদিকে নজর দেওয়া নয়, বিদেশী ভাষা শিক্ষায় তাঁর বক্তব্য—তাঁর কথাতেই বলি—

—দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী শতকরা নব্বই শব্দ শেখ, আর তা নিখুঁত করে ব্যবহার করতে শেখ।

বিদেশী শব্দের নিখুঁত ব্যবহার করতে শেখানোই তিনি থাকতে বলেছিলেন। তখনও তত্ত্বের কথা জানি না, তবু তর্ক তুলেছিলাম।

—অনুবাদ অংশে এমন কঠিন-কঠিন বাংলা থাকে যার অনুবাদ করতে ইংরেজির বড় শব্দ—তর্কটা বোধহয় জানা ছিল, তাই বাধা দিয়ে বললেন—

পরীক্ষকদের তুলই তো ঐগুলো। বাংলায় কোন্ অংশ তোরা অনুবাদ করতে পারিস, সে হিসেব তাঁরা রাখে না। যে রচনা কলেজে পড়ানো হয়, তাই-ই তোদের বাংলা পুস্তকে ঢুকিয়ে প্রদান করা হয়, তোদের উপযুক্ত। আর তাই থেকে অনুবাদ অংশ তোরা। আরে তাই না কি হয়? তোদের তা খুন করবে, তার আমি কি করব? কিন্তু আমি ভুল করব না। ঐ সহজ শব্দগুলোকেই উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে শিখবি।—

এই নিখুঁত আর উপযুক্ত ব্যবহার সেই সময় আর একবার লক্ষ্য করলাম। ফুটবল মাঠে 'রেফারী' যিনি থাকেন তাঁর ক্রিয়াটিকে আমরা বন্ধুদের কাছ থেকে (উকিল মোক্তার মুনসেফ) শিখেছিলাম 'Refer' করা। গিরিশচন্দ্র আমাদের ভুল ধরিয়ে দিলেন। Referee মাঠে refer করেন না, referee-ই করেন।

শুধু শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার নয়, ভাবেরও উপযুক্ত ব্যবহার করতে তিনি শেখাতেন। তখনও আমাদের কোন ইস্কুলের কোন্ শিক্ষক সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন না, ইস্কুলের বাইরে কোন কাজের মধ্যেই তাঁরা আসতেন না। মানুষের সঙ্গে মিশতে তাঁরা চাইতেন না, পারতেন না। সদরে গিরীশচন্দ্রই প্রথম শিক্ষক যিনি পাড়ার সভাসমিতির সমস্ত দায়িত্ব এসে বসতেন। আর কিছুদিনের মধ্যে কেমন হয়ে গেল, সভাপতির পদটি অবধারিত ভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এমনি এক সভাপতিত্বের তাগদের কথা মনে পড়ে।

সভাপতি হিসাবে বলতে উঠে তিনি উপস্থিত বন্ধুদের কাছ থেকে ছুটো ছড়ি নিলেন। বড়টি মাটির সঙ্গে সমান্তরাল রেখে ছোটটি তার উপর দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্‌টা বড় দেখা যাচ্ছে?—যে ছড়িটি দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক। যে দাঁড়িয়ে থাকে সেই-ই বড়। যে জাতি দাঁড়িয়ে নেই পৃথিবীর বিচারে সে অত্যন্ত

ছোট। ছোট হয়েও যে দাঁড়িয়ে থাকে সে পরান বড় থেকে অনেক বড়। এমনি করে ঐ দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর বক্তৃতা চলল শুশ্রূষকের বোঝাকে হোগ্রাতে। কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম আর একটি সূত্র। নিতান্ত সহজ জিনিসকে কেমন ক'রে সুন্দর ব্যাখ্যায় রূপায়িত করা যায়। বাংলায় দৃশ্যরূপে দেখানোর ছলে এই দুটিটি খাটাতে থাকি। চোখের দৃষ্টি থাকলে সংসারের অনেক সোজা জিনিসও যে বাঁকা তা বোঝা যায়। কথাসাহিত্যিকের ব্যবহৃত 'বাঁকা' কথাটা বদলে আমরা যেন 'সরস' বসিয়ে নিলাম।

আর একবার তিনি পাকাটিতে আগুন ধরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, এখন আগুন একটি বৃত্তের মতো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সত্যি তো তা নয়। এমনি করে বোঝা যায়, চোখ কাকে বেশি বিশ্বাস করা আমাদের ভালো নয়। সামান্য জিনিসের মধ্য থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তিনি বের করতেন। গিরীশচন্দ্র ইস্কুলটাকে যেন সমাজের মানুষের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। বিদ্যা আর শিক্ষা তাঁর সর্বত্র চলত। সমাজের প্রতিটি মুহূর্তের রূপ তিনি ধরতে পারতেন, তাদের কথা যেন তিনি শুনতে পেতেন। শিক্ষক হিসাবে গিরীশচন্দ্রের মধ্যে এই নূতন রূপটি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম।

ইংরেজি-ই পড়াতেন তিনি। কিন্তু সবসময় ঐ পকেট অক্সফোর্ড ডিক্সনারিটি আমাদের কৌতূহল জাগাত। অর্থ-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন এলেই তিনি ছাত্রদের সামনেই অভিধান দেখতে বসতেন। এতটুকু লজ্জা করতেন না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমে মনে করেছিল, ইংরেজি খুব ভালো জানেন না বুঝি। কিন্তু পরে ভুল ভেঙে গিয়েছিল। শিক্ষক নিজে কম জানেন, এই কথাটি জানাতে খাঁটিক শিক্ষক পছন্দ করেন না। তার ফলে অনেক ভুল শেখানো হয়। কোন সন্দেহ হলে নিঃসঙ্কোচে 'জানিনা' বলতে পারা সত্যিকারের গুণ। গিরীশচন্দ্রের এই গুণ ছিল না, কারণ ঠিক পড়ানোর দিকে ছিল তাঁর সত্যকার নজর। এ ছাড়া আমরা তখন অভিধানে আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করলাম। আমরাও বাড়ীতে পকেট অক্সফোর্ড ডিক্সনারি কিনে ইংরেজি পড়াশুনা করতাম। উৎসাহ সকার এমনি করে গিরীশচন্দ্র করতেন।

ইস্কুলের পড়া হয়ে গেলে একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি প্রায়ই বলতেন সুন্দর আর সহজ করে গদ্য ব্যবহার করতে। সহজ ব্যবহার বুঝি, কিন্তু সুন্দর করে ব্যবহার কেমন করে দেখা যায়?

প্রশ্ন যখন করেছিলাম, মনে আশা ছিল, সামান্য ইস্কুল মাস্টার এর উত্তর দিতে পারবেন না, কিংবা অন্যান্য শিক্ষকদের মতো মুচকি হেসে প্রশ্ন বন্ধ করে থাকবেন, অথবা চোখ মটকে বলবেন "আছে আছে।"

কিন্তু গিরীশচন্দ্র একটা আশ্চর্য কথা বললেন—

সুন্দর শব্দের ব্যবহার শিখতে হলে কবিতা পড়তে হয়। এটা সব ভাষাতেই সত্য। ইংরেজিতে, বাংলাতেও। কবিতার মধ্যে কবি সুন্দর চোখ আর মন নিয়ে শব্দের ব্যবহার করেন। কবিতা পড়, বুঝবে।

আর ব্যাখ্যার দরকার হয় নি। কথাটা কতখানি সত্য তখনও জানিনি। কিন্তু এমনি করে ইস্কুলের বাইরের কথা ইস্কুল মাস্টার ব্যবহার করেন, এ আশা করিনি। তাঁর মনে কোথায় যেন গতির ভাব ছিল। কোন কিছুতে বদ্ধ হয়ে থাকত না। ইস্কুল মাস্টার কবিতা পড়ে আনন্দ পান, এ তো আজব কথাই অধিকন্তু কবিতার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে এমন করে ভেবে দেখেছেন। এ ব্যাপার অচিন্তনীয়।

কিন্তু তাঁর চিন্তাশক্তির এই স্বচ্ছতায় এত বেশি ছিল যে, আমরা বাহির থেকে মনে করতাম তত-

প্রশান্ত। এই প্রশান্তির দিকটি তাঁর মৃত্যুকালে দেখেছিলাম।

প্রাতর্ভ্রমণে বের হতেন অন্ধকার থাকতে। সেদিনও অমনি বেরিয়েছেন। পেছন থেকে এক সাইকেল আরোহী তাঁকে এমন ধাক্কা মারল যে গিরীশচন্দ্র ধাঁধা রাস্তায় ইটের খোয়ার উপর পড়ে গেলেন। আশেপাশের বাড়ীর ছেলেরা হৈ-হৈ করে সেখানে এসে সাইকেল-ওয়ালাকে এই মারে তো সেই মারে। গিরীশচন্দ্র আহত অবস্থায় উঠে বললেন,

না, না, উনি তো দেখতে পান নি, তাছাড়া আমার লাগেও নি। ওঁকে ছেড়ে দাও। কিন্তু ঐ আঘাত তিনি সামলাতে পারেন নি। কয়েকদিন পর নিউমোনিয়ার মতো হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যু যে এত কাছে, আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারিনি।

চরিত্রের এই প্রশান্তি তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? যদি করতেন তো অপরিণত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। পড়াতেন তো তিনি তাঁর নিজেরই বয়সীদের পড়া বন্ধ।

কিন্তু সব ছাড়িয়ে ছিল তাঁর চরিত্রের সামাজিক দিকটি। সমাজের মানুষের, দেশের চিন্তাধারার প্রত্যেকটি মুহূর্তের সঙ্গে তিনি চলতেন পরিচয় করে। শিক্ষকের পক্ষে এ পাপ নয়, অন্যায় নয়, অবশ্য নয়; এইটিই তাঁর প্রাণশক্তি, এই মনোধর্মই তাঁকে অমর করে তুলেছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও তাহার উন্নতি

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

[লেখক দিলীপ কুমার বিশ্বাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সি প্রাক্তন গ্রাজুয়েট। ইনি Fulbright বৃত্তি লইয়া আমেরিকার Southern Illinois বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম, এ পড়েন। তিন বছরের পর ১৯৫৩ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Educational Administration-এ কয়েকটি কোর্স করেন। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের কোনও একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।]

মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই অসন্তুষ্ট ও অমনোযোগী। শিক্ষক বলেন অনুক্ত, ছাত্র বলেন পড়ান মনঃপূত নয়, প্রাইভেট টিউটর না রাখিলে পাশ করা অসম্ভব। একথা সত্য, দশ জনের সকল শিক্ষক দুই বেলা না হউক, এক বেলা ছাত্র না পড়াইলে সংসারের ব্যয় বহন করিতে পারেন না। অধিকাংশই দুই বেলা পড়াইয়া থাকেন। পক্ষে পাঁচটি করিয়া পোষ্য ধরিলে শুধু খাওয়া খরচ সওয়া শ টাকার কমে চলে না। ইহার পর কাপড়, জামা, জুতা, বাড়ীভাড়া, ঔষধ, পথ্য, সৌকিকতা ইত্যাদির খরচ অতিরিক্ত। দুই শ টাকায় কবে আজকালকার দিনে চলা অসম্ভব। অথচ বি, এ. (অনার্স), বি. টি. শিক্ষক ৩৫৲ জি. এ. পাইলেও ১৬০৲ টাকার বেশি পাইতে পারেন না। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা দুইজনও বি. এ. (অনার্স), বি. টি. বা এম. এ. বি. টি. বিনা সন্দেহ। তবু ৪০৲ টাকা কম পড়ে।

ছাত্রদের পড়াশুনা ভাল না হইবার জন্য শিক্ষকদের অযোগ্যতা ও অমনোযোগিতা সামান্য অংশে দায়ী, একথা সত্য। অধিকাংশ শিক্ষকেরই ট্রেনিং নাই এবং দুই বেলা অতিরিক্ত খাটুনির জন্য স্কুলের কাজে মন দিতে পারেন না। কিন্তু এজন্য ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবকের দায়িত্ব কম নয়; মূলত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব সব চাইতে বেশি। জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস প্রোমোশানে এবং বই কিনিতেই কাটিয়া যায়। অনেক সময় মার্চ মাসে বই কেনা হয়। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে পরীক্ষা আরম্ভ হয়। সুতরাং বছরে এই সাড়ে তিন মাস ও ছুটির জন্য প্রায় সাড়ে তিন মাস কাটিয়া যায়। বাকি পাঁচ মাসে আর কতটুকুই বা পড়া হয়? এই পাঁচ মাসে ছাত্রের অসুখ আছে, বিসুখ আছে, লৌকিকতা রক্ষা আছে, এবং গরীব ছাত্রের গৃহকর্মও আছে। শিক্ষকেরও অনুরূপ কাজ আছে সুতরাং আরও দিন চলিয়া যায়। তারপর ফেল-করা ছাত্রের অভিভাবকের আবেদন, নিবেদন এবং প্রাইভেট টিউটরের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া হেডমাস্টার মহাশয় অনুপযুক্ত ছাত্রকেও অনেক সময় প্রোমোশান দিয়া থাকেন। বেসরকারি, সাহায্যহীন স্কুলগুলি তো আদ্যোপান্ত ছাত্রবেতনের উপর নির্ভরশীল। যে ছেলে আট শ্রেণীর উপযুক্ত নয়, বহু ক্ষেত্রে সে দশম শ্রেণীতে উঠিয়া থাকে—তবির তদারককে সবই সম্ভব, "মূকং করোতি বাচালম্‌তে, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌ সদ্ধয়তে।"

দেখা যায়, অন্যত্র যাঁহারা সুবিধা করিতে পারিলেন না, তাঁহারাই স্কুলের কাজে ঢোকেন। তখন তাঁহাদের কিছু পোষ্যও থাকে। সব সময় অল্প-বয়সী শিক্ষক নিযুক্ত করা ভাল; পোষ্য কম থাকে, উদ্যম থাকে, স্বাস্থ্যও থাকে। তাহাদের অবশ্যই অন্তত আই. এ. পাশ হওয়া চাই; বি. এ.

পাশ হইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করাই প্রধান সমস্যা। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার কথা কিছু লিখিতে চাই। বলিয়া রাখা ভাল, আমেরিকার ছাত্র আমাদের দেশের ছাত্রের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান নয়। বরং সামাজিক আবেষ্টন এক হইলে আমাদের ছাত্র বেশি বুদ্ধিমান।

সে দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার প্রধানত রাজ্য সরকারের উপর। আমাদের ভারতবর্ষের মতই, এক রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে অন্য রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ মিল নাই। সে দেশে দুই বৎসর থাকিলেও আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দুইটি রাজ্য লইয়া। তবুও বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া দেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা কাঠামো খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছি। বিভিন্ন রাজ্যে কলেজের শিক্ষা প্রায় একই প্রকার। কোথাও টার্ম প্রথা (তিন সপ্তাহ), কোথাও বা Semester (আঠার সপ্তাহ) প্রথা। আমাদের দেশে স্কুলে দশ বছর ও কলেজে দুই বছর পড়িতে হয়, এবং তাহার আগে কার্যকরী কোন পরীক্ষা দেওয়া যায় না। সেখানে স্কুলে প্রায়ই semester প্রথা, বার্ষিক পাঠ্য বিষয় দুই ভাগে ভাগ করিয়া তাহা সেমিস্টার প্রথায় পড়ানো হয়। প্রতি সেমিস্টারের শেষে পরীক্ষা হয়। ফেল খুব কমই হয়। যদিও বা প্রথম পরীক্ষায় কেহ কোন বিষয়ে ফেল করে, পরের পরীক্ষার শেষে তাহাকে সেই ফেল-করা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। দ্বিতীয় বারও কেহ ফেল করে এমন কথা শুনি নাই। অনেক ঐচ্ছিক বিষয় থাকে। ছাত্রেরা পূর্বজ্ঞান এবং বিষয়বিশেষের প্রতি অনুরক্তিবশত দ্বিতীয় বারে পাশ করিয়া যায়। স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সহশিক্ষা প্রায় সর্বত্র চলিত, মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ও কিছু আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কখা ভাষায় স্কুল বলে, যদিও আমরা কলেজ বলি। পি. এইচ. ডি পড়িতে থিসিস লেখা ছাড়া কিছু কিছু বিষয়ও পড়িতে হয়। এম্. এ. পড়িতেও থিসিস্ লিখিতে হয়। এম্. এ, ও পি, এইচ, ডি পড়াকে Graduate Study বলে। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা যেখানে হয় সেখানকার নাম গ্র্যাজুয়েট স্কুল, কোথাও কোথাও বা থিসিস লিখিয়া বি, ফিল ডিগ্রী পাওয়া যায়। যে কোনও কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনও ডিগ্রী পড়িবার সুবিধা সর্বত্র।

স্কুল কলেজে সময়ের বন্ধ সাধারণত তিন মাস। কোনও স্কুল সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে থাকে না, প্রায় সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত। শিক্ষার জন্য প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি স্কুল ডিষ্ট্রিক্টে ভাগ করা থাকে। এই জেলার নাম কাউন্টি; এই কাউন্টিতে যে নির্বাচিত কাউন্সিল থাকে তাহা পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। পরিদর্শন প্রায়ই "নামকা ওয়াস্তে" ও informal হয়। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকের ট্রেনিং আছে, এজন্য পরিদর্শক পড়ানো দেখেন না; কিন্তু আমাদের দেশে তাঁহার পক্ষে Demonstration lesson দেওয়া ও পড়ানো দেখা একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি কোন চাপরাশ লইয়া আসেন না। তাঁহার কোন চাপরাশি, আরদালি নাই। বরং তিনি স্কুলে আসিয়া Janitor-এর সাথে (আমাদের দেশের দারোয়ান) বন্ধুর ন্যায় আলাপ করেন। স্কুল বোর্ড (আমাদের দেশের ম্যানেজিং কমিটি) স্থানীয় করের সাহায্যে স্কুল চালায়। কোন কোন রাজ্যে অধিকাংশ খরচ এই কর হইতে চলে, কোথাও বা অল্পাংশে চলে, বাকি রাজ্যসরকার দেয়। শিক্ষকদের বেতন সমান নয়, তবে একেবারে নূতন শিক্ষকদের বেতন সাধারণত বার্ষিক ২৪০০ ডলারের নীচে নয়—অবশ্য যাহাদের শুধু Bachelor

ডিগ্রী থাকে। Master ডিগ্রী থাকিলে সাধারণত বার্ষিক ৩০০০ ডলারের কম হয় না। দুই বছরের অভিজ্ঞতা হইলে এককত ডলার হিসাবে বেতন বৃদ্ধি হয়। কোনও কোনও রাজ্যে বেতনের হার বেশি। আমাদের দেশের মত প্রাইভেট টিউশান নাই। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী দুইজনেই স্কুলে কাজ করেন। অধিকতর আয় করিবার জন্য গরমের বন্ধে কারখানায় ফুলিশিরি বা অফিসে কেরানিগিরি করিতে হয়, যদিও ফুলিশিরিতে আয় বেশি। কেরানিগিরি সাধারণত স্ত্রীলোকের কাজ। স্কুলে বারটা শ্রেণী। উপরের চার শ্রেণীকে হাই স্কুল এবং নীচের আট শ্রেণীকে এলিমেন্টারি স্কুল বলে। স্কুল কোথাও কোথাও বিনিময় হাই ও জুনিয়র হাই, এই দুই ভাগে বিভক্ত। কোথাও কিণ্ডারগার্টেন আছে, কোথাও বা নাই। স্কুলের শিক্ষা সর্বত্র অবৈতনিক এবং ষোল বৎসর পর্যন্ত পড়া বাধ্যতামূলক। এলিমেন্টারি স্তরে শিক্ষিকার সংখ্যা বেশি, উচ্চ স্তরে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্তর পর্যন্ত যে শিক্ষক যে বিষয় পড়াইবেন তিনি সেই বিষয়ের শেষ পরীক্ষা দিয়া থাকেন। Superintendent of Printing, Washington, D.C., U.S.A. ঠিকানায় চিঠি লিখিলে প্রয়োজনীয় সংবাদের ও বইয়ের তালিকা সকলেই পাইতে পারেন।

যাহারা হাই স্কুল পাশ করিয়া কলেজে পড়িবেন তাঁহাদিগকে ভর্তি হইবার পূর্বে কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। প্রায়ই প্রশ্নগুলি objective test; উত্তর দিতে দুই তিন ঘণ্টা লাগে। এই পরীক্ষায় সাধারণত নম্বর দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য কোনও পরীক্ষায় নম্বর নাই। Grade (A, B, C, D) প্রথা প্রচলিত। কলেজে প্রত্যেক ডিগ্রীর জন্য প্রতি কোর্স পাশ করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট point যোগাড় করিতে হয়। ডিগ্রী পাইতে সাধারণত চার বছর লাগে, কিন্তু পড়ার ঝামেলা না থাকিলে এবং সর্বদা নিয়মিত পড়িলে তিন বছরেও ডিগ্রী পাওয়া যায়। এক বছরের কমে মাস্টার ডিগ্রী পাওয়া যায় না। ষোল বছরের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী শহরে থাকিয়া পড়িবার আনুষঙ্গিক খরচ সংগ্রহ করে, বাপ-মা সবটাই দেন না। স্কুল কলেজে পাঠ্যপুস্তক কি হইবে তাহা স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষই ঠিক করেন; কোনও ডি. পি. আই-এর অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। স্কুলে নীচের দিকে সাধারণত কুড়িজনের বেশি ও উপরের দিকে তিরিশ জনের বেশি ছাত্র দেওয়া হয় না। কলেজগুলিতে সকালে, বিকালে, রাত্রে ও শনি রবিবারে পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। অনেকে শুধু জ্ঞানলাভের জন্য পড়েন, ডিগ্রীর জন্য নয়। বহু পরকেশ গবিতবয় এবিষয়ে আমাদের দেশের যুবক যুবতীর আদর্শস্থল। তিনি দিনের বেলায় কাজকর্ম করেন, তিনি সকালে রাত্রে সুযোগমত সময়ে বই লইয়া পড়িয়া থাকেন। গরমের বন্ধে সব কলেজেই ছয় সপ্তাহ হইতে বারো সপ্তাহ পড়ান হয়। নিয়মিত অনিয়মিত সকল ছাত্রই পড়িতে পারেন। প্রত্যেক কলেজের (বা বিশ্ববিদ্যালয়ের) নিজস্ব ডিগ্রী থাকে এবং তাহা সর্বত্র স্বীকৃত হয়। আমাদের দেশের মত ডিগ্রি ভিন্ন ভিন্ন কলেজগুলি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রত্যেক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত কলেজগুলিতে বেতন খুব কম—মাত্র সেই রাজ্যের বাসিন্দার জন্য। কলেজের বেতন প্রথম বছর হইতে শেষ বছর পর্যন্ত একই হারে দিতে হয়। ছাত্রবেতন হইতে এই সব কলেজের অতি সামান্য খরচই চলে; বাকিটা রাজ্য সরকার দেয়। বেসরকারী কলেজগুলিতে ফী অনেক বেশি। নিয়মিত শিক্ষার্থীর বার্ষিক হাজার হইতে হাজার ডলার

কী দিতে হয়। বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িবার জন্ত স্থানীয় ছাত্র বেশি কী দিয়াও সেখানে পড়ে। বলিতে গেলে প্রত্যেকেরই মোটর গাড়ি আছে। তাহাদের কাছে বিশ ডিরিশ মাইল দূর দূরই নয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বলিতে প্রথম হইতে শেষ বছর পর্যন্ত শিক্ষাই বুঝায়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কলেজ থাকে, যেমন—Michigan State College, তথাপি সেখানে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী দিবার ব্যবস্থা আছে এবং তথাপি ছাত্র সংখ্যা দশ পনের হাজার হইবে। আমাদের দেশের মত স্কুল কলেজে এত ছুটি নাই। ঝড়, বৃষ্টি বা বিশেষ কারণে স্কুল বন্ধ থাকিলে নির্দিষ্ট ছুটির তালিকা হইতে কাটিয়া সেই কয়দিন অতিরিক্ত পড়াইতে হইবে। ক্লাস যে দিন আরম্ভ হইবে সেইদিন হইতে নিয়মিত পড়াশুনা চলিবে। স্কুল কলেজে প্রায় সর্বত্র অন্তত আটত্রিশ বা চল্লিশ সপ্তাহ ক্লাস করিতে হইবে। কোন বিশেষ হর্ষ বা শোকের খবর আসিলে মাত্র এক ঘণ্টা ক্লাস বন্ধ থাকে, এবং সেই সময় হল ঘরে আনন্দ বা শোক প্রকাশ করা হয়। স্কুল কলেজে নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে পাঁচদিন ক্লাস হয়, তথাপি কলেজে সকাল বিকাল সন্ধ্যায়, শনি রবিবারেও ক্লাস চলে।

ছপুরে কেন্দ্রীয় (Federal) সরকারের সাহায্যে লইয়া অতি অল্প খরচে ছাত্রদের ভাল খাবার দিবার ব্যবস্থা আছে। যে খাদ্যের দাম বাহিরে এক তলার (একশত সেন্ট-এ এক ডলার, এক সেন্ট আধকাল তিন পয়সার সমান) স্কুলে তাহার দাম মাত্র পঁচিশ সেন্ট। যে ছাত্র একান্ত গরীব, তাহাকে কিছুই দিতে হয় না, তথাপি একান্ত গরীব বলিতে গেলে কেহ নাই। মৈথিক ছয় ঘণ্টা স্কুল বসে, টিফিনের জন্ত পৃথক আধ ঘণ্টা ছুটি।

আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের তুলনাই হয় না। তবুও আমাদের বর্তমান শিক্ষা-সমস্যার প্রতিকার করিবার জন্ত শিক্ষা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার না করিয়াও, তাহাদের কোর্স (আমাদের পেপার) ও extension lecture ব্যবস্থা চালু করিতে পারা যায়। প্রথমত প্রত্যেক শিক্ষককেই ট্রেনিং লইতে হইবে, দ্বিতীয়ত প্রত্যেককেই বি. এ বা বি. এস-সি পাশ করিবার জন্ত সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হইবে। বর্তমানে যাঁহারা প্রবেশিকা বা আই, এ পাশ আছেন তাঁহাদিগের জন্ত নর্মাল বা উহার সমান কোন ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করিতে হইবে। বরং নর্মালের চাইতে কিছু বেশি ট্রেনিং দেওয়া ভাল। মহকুমায় কেন্দ্র করিয়া শনি রবিবার অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্ত শিক্ষার্থী শিক্ষকগণ শনিবারে ছুটি পাইবেন। প্রতি বছর মাত্র একটি বা দুইটি বিষয় পড়ান হইবে এবং বছরের শেষে নির্দিষ্ট সংখ্যক লেকচার শুনিয়া পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। অন্যান্য কলেজে যেভাবে পড়ান হয়, এই সব কেন্দ্রে ঠিক সেইভাবে পড়ান হইবে, কিছুমাত্র কম হইবে না। দায়সারা ভাব নিয়া কাজ করিলে সকলেই ফাঁকিতে পড়িবেন; এত পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও আন্দোলন বৃথাই যাইবে। সমাজের সকল স্তরে যখন প্রতি বছর ছেলে, পরতে পরতে ফাঁকি প্রবেশ করিয়াছে তখন আমাদের বেশ সতর্ক হইতে হইবে। এই পরীক্ষার ফল বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা থাকিবে। এই ভাবে সব পেপার পরীক্ষা দিয়া পাশ করিলে তখন ডিগ্রোমা মিলিবে। সংক্ষিপ্ত কোর্সের প্রবর্তনের আমি পক্ষপাতী নই। তাহা দ্বারা শিক্ষাদানের উন্নতি হইবে না।

প্রতি মহকুমায় জন্ত কেন্দ্র স্থাপন করা প্রথম প্রথম সম্ভব না হইতে পারে। যে স্কুল হইতে অন্তত দুই তিন জন শিক্ষার্থী এই প্রকার ট্রেনিং লইতে ইচ্ছুক, সেই সকল স্কুলে অন্তত ছুটি কমাইয়া এবং শনিবার পুরাদিন স্কুল করিয়া গরমের ও পূজার চার মাস ছুটি দেওয়া যাইতে পারে। বার্ষিক

পরীক্ষা পনেরই ডিসেম্বর আরম্ভ করিলেই চলিবে। প্রয়োজন বোধে এই সব শিক্ষা-কেন্দ্রের জন্য অস্থায়ী অতিরিক্ত অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে। কোন কোন কেন্দ্রে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী পাইলে বারমাস সকাল সন্ধ্যায় ক্লাস চালু রাখা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই প্রকার ট্রেনিং অবৈতনিক হইবে, অন্তত প্রথম দিকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ট্রেনিং এর সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে বহু লোকই ট্রেনিং লইবেন।

স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতনের একটা উপযুক্ত হার বাঁধিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তবে, একটির বেশি ইনক্রিমেন্ট চিরস্থায়ী আইন করিয়া নিষিদ্ধ করা উচিত।

স্কুলে শিক্ষাদান বিষয়ের জন্যও দুই চার কথা লিখিতে চাই। যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্ পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিবেন ততদিন তাঁহারা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন বিষয়ে একটু উদার হইতে পারেন। প্রথমত, পাঁচ বৎসরের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বদল করা হইবে না। দ্বিতীয়ত, যে স্কুলে ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক বিষয়ে ট্রেনিং-প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক এবং একজন ট্রেনিং-প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক থাকিবেন। সেখানে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ভার সম্পূর্ণভাবে স্কুলের উপর দেওয়া দরকার। তৃতীয়ত, স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ক্লাসের বই সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদিগকে প্রত্যেক বছর বইয়ের মোট মূল্যের চার ভাগের এক ভাগ লইয়া ভাড়া দিবেন। পাঁচ বছরের মধ্যে কোন বইয়ের পরিবর্তন হইবে না। যে এক ভাগ ভাড়া লাভ হইল তাহা বই হারাইয়া যাওয়া, বা মেরামতের জন্য জমা থাকিবে। ইহাতে বছরের প্রথম হইতে নিয়মিত পড়াশুনা হইবে। অনেকটা এই প্রথার ব্যবস্থা আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক স্কুল কলেজে আছে। প্রত্যেক শিক্ষক বছরে কত-দিন পড়াইবেন তাহার একটা আনুমানিক হিসাব করিয়া ততদিনের অতি সংক্ষিপ্ত পাঠ-টীকা তৈরি করিবেন। চতুর্থ কথা, ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক-গণকে ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করিতে দেওয়া উচিত। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ব্যতীত প্রায় সকল সভ্যদেশেই স্কুলকলেজে যে শিক্ষক যে বিষয় পড়াইবেন তিনি সেই বিষয়ে শেষ পরীক্ষক। ইংরেজির মান একটু কমাইয়া ব্যাকরণত্যাগ ও রচনা শিখাইবার দিকে বেশি জোর দিতে হইবে। শেষে বলিতে চাই, অবশ্য-পাঠ্য পেপারের সংখ্যা কমাইয়া ঐচ্ছিক পেপারের সংখ্যা বেশি করিলে ক্ষতি কি? হাই স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়াও অনেকে দেখে John See, Boma eat—পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা কমাইয়া নিখুঁত রচনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে।

বর্তমান প্রথা অনুসারে শিক্ষক শুধু বই পড়ান, বিষয় পড়ান না। প্রতি শনিবার স্কুলের শেষে এবং সোমবার স্কুল বসিবার এক ঘণ্টা আগে প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকগণকে লইয়া এক আলোচনা বৈঠক চালাইবেন। সহকারী শিক্ষকগণ আগামী সপ্তাহে কি পড়াইবেন তাহা শনিবারে আলোচনা করিবেন। সপ্তাহের শেষে ক্লাসের ফলাফল কি হইল তাহা সোমবারে আলোচনা করিবেন। এ বিষয়ে কিছু অদল বদল করা যাইতে পারে। যাঁহারা আট দশ বৎসর ট্রেনিং কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের জন্য Refresher Course প্রবর্তন করা প্রয়োজন। স্থানীয় স্কুলের জন্য অন্ত অঞ্চলের শিক্ষক রাখাই ভাল। নতুবা গ্রাহ্য রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িবার খুবই সম্ভাবনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বিখ্যাত অধ্যাপক আমাদের ক্লাসে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

স্কুল ইন্‌স্পেক্টর স্কুলে একদিন যাইবেন, একটা শনিবারে Demonstration lesson বা আদর্শপাঠ দিবেন। স্কুলের শিক্ষকগণও মাঝে মাঝে দিবেন। পরীক্ষার খাতায় নম্বর না দিয়া গ্রেড দিবার প্রথা

ভাল। প্রতি মাসে এক দিন বা দুই দিন objective test লওয়া যাইতে পারে। এজন্য প্রতি স্কুলে একটা লণ্ড্রার মিশো মেশিন থাকা প্রয়োজন। আমেরিকায় দুই ঘণ্টা স্কুল হয়। আমাদের দেশে সাত ঘণ্টা হওয়া উচিত। কারণ আমাদের দেশে যাতায়াতটা শ্রেষ্ঠী নাই, মাত্র দশটা শ্রেণী, শিক্ষকগণের ট্রেনিংও ভাল নয়, এবং ছাত্রদের বাড়ীতে নানা অসুবিধা। উপরন্তু, ইংরেজি একটা বিদেশী ভাষা, যাহার আবশ্যকতা ইউরোপ আমেরিকায় কোথাও নাই, তাহা আমাদের অবশ্যপাঠ্য। সেখানে এই বস্তুই এত সময়েরও প্রয়োজন হয় না। ইংরেজি বই পড়া ও অনুবাদ শেখার জন্য অতিরিক্ত সময়ের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক হওয়া উচিত। তবু অর্থ পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের ছাত্ররা নমুনমন্দে বড়ই পণ্ডিত। শিক্ষক ও পরীক্ষক ইহার পরিচয় পান। তবে দুপুরে স্কুল হইতে টিফিনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অভুক্ত অবস্থায় সাত ঘণ্টা পড়া যায় না, পড়া শোনাও যায় না; এক কান দিয়া ঢুকিয়া অন্য কান দিয়া বাহির হইবে। এ জন্য সম্পূর্ণ খরচের চার ভাগের তিন ভাগ রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার দিবেন, এক ভাগ ছাত্র দিবে। টিফিনের জন্য রুচির পরিবর্তনের দরকার। সিদ্ধ আলু, ও কাঁচা সব্জি ইউরোপ আমেরিকার প্রিয় খাদ্য। বিদেশ হইতে এত জিনিস আমরা আমদানি করি, ওঁড়া দুধও আমদানি করিতে পারি। ওঁড়া দুধ, সিদ্ধ আলু, পনির, টমেটো, পনা, মুড়ি, মুড়কি, ভিজা ছোলা ও আলো চাল, বাদাম এবং চিড়ার মোয়া দিয়া আমরা কাজ চালাইবার মত টিফিন দিতে পারি। স্কুলের ছাত্রবেতন বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কারণ শিক্ষকবেতন বাবদ যত পড়িবে তাহা রাষ্ট্র সরকার দিবেন।

আমাদের প্রায় প্রত্যেক স্কুলে সমস্যার অভাব। এই সমস্যার অভাবে অনেক যোগ্য শিক্ষক শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করেন। কারণ, শিক্ষা ছাত্র ও শিক্ষকের পক্ষে একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হয়। বৈচিত্র্যময় শিক্ষাদানে ক্লান্তি অপনোদনে সাহায্য করে। বৈচিত্র্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও চিত্ত আকর্ষণ করে না। প্রতি ক্লাসে পঁচিশ জনের বেশি ছাত্র রাখা সঙ্গত নয়, কারণ শিক্ষক প্রত্যেকের দিকে নজর দিতে পারেন না। শুধু এই জন্যই যদি ছাত্রবেতন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করিতে হয় তাহাও সমর্থনীয়। কারণ, সেক্ষেত্রে অভিভাবকের প্রাইভেট টিউটর রাখার খরচ বাঁচাইতে হইবে না। তবুও যদি ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের হাতে ছাত্র কেন করে তখন শিক্ষকের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ দাবী করা যাইতে পারে। দৈনিক ৭ ঘণ্টা স্কুল বসিবে বটে, কিন্তু এক ঘণ্টা প্রত্যেক শিক্ষককে শিহনে-পড়া ছাত্রদের কোচিং ক্লাস লইতে হইবে। ছাত্ররা পড়া বুঝিয়া লইবে, যদিও ক্লাসে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক মহাশয় একবার বুঝাইয়াছেন। এত করিলেও যদি ছাত্র পিছনেই থাকে তখন কমফারেন্সের সময় তাহা আলোচনা করা যাইবে এবং প্রতিকারের জন্য স্কুল ইন্‌স্পেক্টর এবং ট্রেনিং কলেজের নিকট পরামর্শ চাওয়া হইবে। শিক্ষকের অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইলে নিম্ন ধাপে refresher course পড়িয়া আসিতে বলা হইবে। নিয়মিত হাজিরার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে এবং এজন্য প্রয়োজনমত কঠোর হইতে হইবে। শিক্ষক ছাত্রদের হোম টাস্ক বাড়ীতে বা অফিসের সময়ে দেখিয়া দিবেন। প্রতি তিন মাস অন্তর অভিভাবকগণের একটা কনফারেন্স ডাকিতে হইবে। তখন ছাত্রদিগের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। প্রতি ক্লাসের শিক্ষক পৃথক এক বেঞ্চ থাকিবে, অভিভাবক নিঃশব্দে আসিয়া বেঞ্চে বসিয়া পড়া দেখিবেন।

স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া খোঁজ করিবেন যে নূতন পদ্ধতি এবং নিয়মগুলি অনুসরণ করা হইতেছে কি না। প্রয়োজন হইলে তবু এইরূপ একশ্রেণীর স্নাতকবৃন্দ যুবক স্কুল পরিদর্শক নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহারা বেতন ও নির্দিষ্ট পথ খরচা পাইবেন। শিক্ষক-শিক্ষণই এখন প্রধান সমস্যা। প্রতি কলেজে ট্রেনিং এর অন্তত একটা theoretical paper পড়াইবার ব্যবস্থা করা উচিত। যে সব স্কুল নিয়ম বহির্ভূত কাজ করিবে তাহারা সরকারি সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে। স্কুলের পক্ষ হইতে ইন্‌স্পেক্টর বাবুদের অনযোগের ব্যবস্থা আইনদ্বারা নিষিদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। আইন সভা ও বিধান সভার সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার স্কুলের অবৈতনিক পরিদর্শক হইবেন।

ফেল-করা ছাত্রের বিষয়ে কিছু লিখিতে চাই। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের মতই অনেক দেশে গরমের ছুটির পর স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে সেই নিয়ম চালু করিতে বাধা নাই। খাস ইংলণ্ডেও জানুয়ারি মাস হইতে স্কুল আরম্ভ হয় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গরমের ছুটি দিয়া আষাঢ় হইতে আমাদের দেশে স্কুলের কাজ আরম্ভ হইতে পারে। চৈত্র মাসে বার্ষিক পরীক্ষা লইয়া ফেল-করা ছাত্রদের গরমের ছুটিতে বেশি করিয়া পড়িয়া ছুটির পর আবার পরীক্ষা দিয়া পাশ করিবার সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। যাহারা পাশ করিবে তাহারা ক্লাসে উঠিতে পারিবে, যাহারা ফেল করিবে, তাহারা থাকিয়া যাইবে। আমাদের দেশের অনুপযোগী প্রথা আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে গ্রহণ করিব, আর উপযোগী পদ্ধতি প্রথা গ্রহণ করিব না, ইহা কোন কাজের কথা নয়।

শিক্ষা সংস্কারে অভিভাবক, শিক্ষক, জনসাধারণ ও সরকার সকল পক্ষেরই সাহায্য এবং সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজনীয়। একথা অনস্বীকার্য যে এই সব নিয়ম চালু করিতে গেলে অনেক খরচ হইবে। পৃথিবীতে সব দেশেই এখন একথা স্বীকৃত যে শিক্ষার জন্য খরচ খরচই নয়। যে টাকাটা আজ অতিরিক্ত খরচ হইল, ভবিষ্যতের নাগরিক জীবন লাভ করিয়া সে টাকাটা ফেরৎ দিবে। প্রয়োজন হইলে সরকারি স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়া ঐ টাকা নূতন ব্যয়ের জন্য খরচ করা হইবে। ট্রেনিং না পাইলে শিক্ষক অনেক কিছুই শিখাইতে পারেন না, তাঁহাকে অধিকতর খাটিতে হয় এবং তিনি অধিকতর বেতনের দাবীও করিতে পারেন না। তবে, আমাদের দেশের মত শিক্ষকের নিম্নতম বেতন কোনও দেশে নাই। Extension lecture-এর ব্যবস্থা না করিলে মফঃস্বলের শিক্ষক কোনও দিন ট্রেনিং লইতে পারিবেন না। এই বাজারে নয় মাস পরিবার ফেলিয়া কেহ ট্রেনিং লইবার জন্য ঘর ছাড়িয়া আসিতে পারেন না। কারণ স্কুলের বেতনে সংসার খরচের একাংশ মাত্র নির্বাহ হয়; সম্পূর্ণ খরচের জন্য, অন্যভাবে অতিরিক্ত আয় করিতে হয়। আমেরিকার মত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে চালু করা কোনও দিন সম্ভব হইবে কিনা জানিনা; কিন্তু যতটা সম্ভব আমরা অনুসরণ করিতে পারি। কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়া শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করিলে ফল বিষময় হইবে।

'আশা' ও 'আত্মবিলাপ'

শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়

আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পাঠদানে প্রায়ই তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করতে হয়। সমধর্মী রচনাগুলির মধ্যে যে যে স্থলে সাদৃশ্য বা সাজাত্য চোখে পড়ে, সেগুলি বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করা বা তার সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করা কঠিনতম ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য যদি কল্পনার প্রসার, চিন্তাশক্তির উদ্বোধন বা মৌলিক গবেষণা পদ্ধতির উন্মেষণ হয়, তাহলে এই জাতীয় তুলনামূলক আলোচনার সার্থকতা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা চলে না। বর্তমান স্কুল কাইনাল বাংলা সিলেবাসে এমনি সমধর্মী প্রবন্ধ বা কবিতা যথেষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' ও নবীনচন্দ্রের 'আশা' কবিতা দুইটির উপর এবারে তুলনামূলক আলোচনা দেওয়া হয়েছিল। অনেক সময়েই পরীক্ষার ঘরে মনে অপ্রস্তুত অবস্থায় এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর করা অসুবিধার কারণ হয়। আমার আজকের আলোচনায় এ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের অংশবিশেষ 'আশা', এবং মধুসূদনের জীবনবেদের কাব্যরূপ 'আত্মবিলাপ' কবিতা। কবিতা দুইটির কাব্যসৌন্দর্য, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাবগত ঐক্যিক্যের পটভূমিকায় উহাদের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গেলে উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুইই উল্লেখ করিতে হয়।

কবিতা দুইটির রচনাকালীন পটভূমিকা আলোচনা করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে উভয় কবির মানস ধর্মের বৈসাদৃশ্য। একজন আপনার অন্তরঙ্গে সিক্ত করিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মণিমাল্য তুলিয়া ধরিলেন বিশ্বের দরবারে। অপর জন দেশপ্রেমের নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় অপূর্ব করিয়া তুলিলেন নিজ কাব্যকীর্তিকে। স্বভাবকবি মাইকেলের অনুভূতিপ্রবণ অন্তর জীবন-চর্যার অপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের পাতা মেলিয়া ধরিলেন 'আত্ম-বিলাপে'। একটি বিরাট সম্ভাবনাময় মহাজীবনের মর্মান্তিক অসফলের বেদনা এখানে গুমরিয়া উঠিল। দুঃখদ্রাবী অনুভূতি রসের বন্যায় ধরা দিল বং ও রেখার বন্ধনে। বিশেষ কালের বিশেষ একটি মানুষের ব্যর্থতা ও বেদনার ইতিহাস অনাদিকালের মর্মবীণায় করুণ সুরের মূর্ছনা তুলিল। বিশেষ ছাড়িয়া নির্বিশেষ ঐতিহ্য লাভ করিল, সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—কবির দিক হইতে ইহাই মস্ত লাভ। অপর দিকে বস্তুনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম নবীনচন্দ্রের অগভীর অনুভূতির ছোঁয়া পাইয়া একটি কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'আশা'তে। দেশকালাতীত কোন আবেদন ইহার মধ্যে স্তব্ধ গভীর হইয়া বাজিল কই? এখানে কবির প্রাণ, কবির সংস্কার, কবির মানস ধর্ম একান্তভাবে কাব্যের মধ্যে নিজেকে বিলাইতে পারে নাই। মাইকেলের মানস-ধর্মে বিপ্লবের আগুন ছিল—ব্যর্থতা ও বেদনার রসে সে আগুন কেমন করিয়া নিভিয়া গেল, সমস্ত আশা লুপ্ত হইল, তাহা তাবে ভাষায় অপূর্ব হইয়া উঠিল 'আত্মবিলাপে'। আর বাহিরের জগতে 'আশা'র প্রভাব কেমন করিয়া কবিকে আশান্বিত করিয়াছিল, তাহাই সাধারণ ভাবে কবিতার রূপ পাইয়াছে 'আশা'তে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য না থাকায় ভাবের গভীরতা 'আশা'তে সার্থকভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই; এখানেই কবিতা হিসাবে 'আত্মবিলাপে'র শ্রেষ্ঠত্ব।

ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীর দিক হইতে দেখা যায় যে,

একটি পূর্ণাঙ্গ গীতিকবিতার মধ্য দিয়া সুখ ও মনের বৈচিত্র্যে মাইকেল নিজ আন্তিক অপচয়ের একটি সরস ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছেন 'আত্ম-বিলাপে'। জীবনের যে সমাধিশয্যার উপর দাঁড়াইয়া তিনি আত্ম-দর্শন করিতেছেন, তাহা সুহাসিনী আশার সৃষ্টি, আশা তাঁহাকে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে উন্মাদ করিয়া বৃহত্তর জীবনের কল্যাণকর ক্ষেত্র হইতে অধঃপতন ও ব্যর্থতার মহাপঙ্কে ডুবাইয়াছে, দেহ ও মনের মর্মান্তিক অপচয় ঘটাইয়াছে। সত্যে ঘটনাসূত্রে এই জীবনদর্শন যেন একটি স্বপ্নাতুর রোমান্স বা উপন্যাসের মত। আর 'আশা'র অনন্তিম কবি সুগভীর বিশ্বাস ও বিপুল আশ্বাস লইয়া ভবিষ্যতের স্বপ্নমধুর সম্ভাবনার দিকে হাত বাড়াইয়াছেন। আলেয়ার হাতছানি তাঁহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, অবাস্তব ভাব-বিলাসের মোহ 'আশা'র একটি আপাত মধুর মূর্তি আঁকিয়াছে মাত্র; কোন শাশ্বত বাণী বা আবেগ ফুটাইতে পারে নাই। অপর দিকে পরিপূর্ণ বাস্তবধর্মী জীবন-আলেখ্য 'আত্মবিলাপ' আপন ভাব ও রসবাহুল্যের স্বতন্ত্রতায় পাঠকহৃদয়ে আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ও শিক্ষক

শ্রীকণা সেনগুপ্ত

শিক্ষা কথাটির অর্থ শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যার্জনেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি সকল দিকের বিকাশ। পুথিগত মুখস্থ বিদ্যা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করতে পারে না—এটি উপলব্ধি করবার ফলে বর্তমানে শিক্ষাজগতে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। ধীরে ধীরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলিত হতে চলেছে আমাদের দেশে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে। কারণ অনেকদিক থেকে বিচার করে দেখা গেছে যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

প্রথমত শিশু স্বভাবত চঞ্চল। চুপটি করে বসে থেকে পাঠে মনঃসংযোগ করা ও পাঠগ্রহণ করা শিশুর স্বভাববিরুদ্ধ। কাজের ভেতর দিয়ে শিশু তার শরীর ও মন দুইই চালনার সুযোগ পায়। চঞ্চল শিশুর মনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ে কর্মপ্রবর্তন নিতান্তই দরকার কারণ শিশুর মনের চাহিদা না মিটলে শুষ্ক জ্ঞানের বোঝা শিশুমনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত শিশুর মধ্যে কৌতূহল প্রবৃত্তি একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শিক্ষকের বক্তৃতা শোনার চাইতে হাতেকলমে কাজের ভিতর দিয়ে শিশুরা কৌতূহল প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার সুযোগ পায় এবং তখন তাদের জানবার আগ্রহ বাড়ে। কাজের ভেতর দিয়ে শিশুমনকে কৌতূহলী করে তুলতে পারলে এবং তাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে কৌতূহলী এবং আগ্রহী মন শিশুকে আপনা থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে।

কাজের ভেতর দিয়ে শিক্ষা শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব মূল্যে সাহায্য করে। ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের পাথেয়ই হল আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব।

কর্মের অনুশীলন শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি বিচারশক্তি ইত্যাদির বিকাশে সাহায্য করে থাকে। কাজের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিশু যে জ্ঞান লাভ করে তা তার কাছে প্রত্যক্ষ ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। কর্মের অনুশীলন শিশুকে বহু সদ্‌গুণ অর্জনে সাহায্য করে থাকে, যেমন কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে কর্মের প্রবর্তন একদিকে যেমন বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি শিশুকে প্রকৃত মানুষ হবার পথে পরিচালিত করে।

এসব দিক বিচার করে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান ও কর্তব্য নির্ণয় করতে গেলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকটিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণত শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু ও শিক্ষক এ দুয়ের ভেতর মুখ্যস্থান গ্রহণ করেন শিক্ষক। শিশুর গ্রহণ করবার ক্ষমতার বিচার না করেই কতকগুলো বিষয়ের বোঝা শিশুর মস্তিষ্কে চাপিয়ে দেওয়া হয় বক্তৃতার সাহায্যে। এভাবে সক্রিয় অংশ থাকে শিক্ষকের এবং শিশু হয়ে পড়ে গৌণ ও নিষ্ক্রিয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থাটাই চিন্তা করতে হবে। তবে শিক্ষক শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক রূপেই বিরাজ করবেন না। মুখ্যত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে শিশু এবং শিক্ষক হবেন পর্যবেক্ষক

এবং সহায়ক। প্রয়োজন হওয়া মাত্র সহায়তা-দানের জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে কিন্তু অযথা হস্তক্ষেপ তিনি করবেন না। সতর্ক অথচ সংযত পথপ্রদর্শক হতে হবে শিক্ষককে। অধ্যাপনার রূপ যন্ত্রালেও শিক্ষকের গুরুত্ব কমবে না একবিন্দুও। বরং তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি এবং শিক্ষাদান কৌশলের অধিকতর প্রয়োগ প্রয়োজন হবে। তাঁকে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং রক্ষা করতে হবে যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর প্রেরণা জাগ্রত হবে। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় না দিয়ে অথচ স্বাধীনতাকে অব্যাহত রেখে শিশুকে পরিচালিত করাই হবে শিক্ষকের কর্তব্য। শিশুর আগ্রহ এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে কাজের পরিকল্পনা করতে হবে শিক্ষককে। শিশুরা কাজ সুরু করবার পরেও কর্মসূচীর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয়োজন কি না সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজনমত পরামর্শ দেওয়া, সাহায্য করা, শিশুর কৌতূহলী মনের প্রশ্নের সমাধান করা, প্রত্যেক শিশুর উন্নতি অবনতির বিষয়ে সজাগ রাখা এসবই হবে শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য।

সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে প্রত্যক্ষভাবে শিশুরা কাজ করতে থাকলেও পরোক্ষভাবে শিক্ষকের প্রভাব থাকবে শিশুর ওপর, যাতে তারা ভুল পথে না যায়। শিশু মুখ্য ও শক্তির স্থান অধিকার করলেও শিক্ষকের দায়িত্ব কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিচালনাতে যথেষ্ট বেশী। স্থান তাঁর গৌণ বটে কিন্তু দায়িত্ব ও কর্তব্য মুখ্য, একথাটিই মনে রাখতে হবে শিক্ষককে।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা। সিঙ্গলের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ যাদবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

French for Indians, by Rajkumar Mukherji, M.A., Dip. Lib. Kamala Book Depot, 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.

১৭২পৃঃ। মূল্য ৬ ছয় টাকা। ১৯৫৩

ভারতবর্ষে ফরাসী ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। ইংরাজী ভাষা যে পাশ্চাত্যের সহিত যোগসাধনের একমাত্র পথ নহে, তাহা দিন দিন পরিষ্কার হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পশ্চিমের চিন্তাধারা কোন পথ বাহিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহা জানিতে হইলে ফরাসী ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য।

রাজকুমার বাবু চন্দননগরের লোক এবং ফরাসী ভাষার ব্যুৎপন্ন। তিনি সঠিক ফরাসী উচ্চারণের দিকে শিক্ষার্থীকে বিশেষ ভাবে মন দিতে বলিয়াছেন এবং কিছু কিছু উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন। বাংলা বা হিন্দীর সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাহাদের কথা মনে করিয়া রাজকুমার বাবু বইখানি লিখিয়াছেন, উদ্দেশ্য ফরাসী ভাষা বিষয়ে কিছু আগ্রহ জন্মানো এবং শিক্ষার্থীর মনে সাহস সঞ্চারিত করা। আশা করি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

Srimad-Bhagavad-Gita, with text, Hindi & English translations. By Swami Sambuddhananda. প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৩ ফেব্রুয়ারি। বোম্বাই, ৩৮০

অষ্টাদশ অধ্যায়ে সাত শত শ্লোকে সম্পূর্ণ গীতার ইংরাজি ও হিন্দী অনুবাদসহ সংস্করণ অনেকেরই কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করি। নিত্যপাঠে ইহা ভারতের অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ের বস্তু। যতদূর দেখিলাম, ইংরাজি ও হিন্দী অনুবাদ সহজ ও মূলানুগামী হইয়াছে। বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে ইহার স্থান হওয়া উচিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম ধি কল্যাণকৃৎ কল্পিত্ ছুর্গন্তিং তাত গচ্ছন্তি

১২শ বর্ষ | বৈশাখ ১৩৬১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

নববর্ষ

শুভ নববর্ষে আমরা শিক্ষার পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ, সকলকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই। আমাদের নববর্ষ আরামের নববর্ষ হইবে এমন কল্পনা আমরা করি না। আমরা যেন সংগ্রাম করিয়া মনুষ্যত্বের অধিকারে সুমহান অভ্যুদয়ের পথে যাত্রা করি, এই আমাদের কামনা। মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ ফুলচন্দনাকীর্ণ নয়, এ পথ বিঘ্ন-বাধা-সমাকুল। শিক্ষার আলোকে এই পথ স্বচ্ছ হয়, নববর্ষে সেই সুবিমল স্বচ্ছতাকে আমরা আহ্বান করি যাহাতে সকল ক্ষুদ্রতাকে সহজে অতিক্রম করা চলে।

২৫শে বৈশাখ

পৃথিবীর সাধারণ নিয়মে আমরা দেখি কেহ জ্ঞানে বড়ো কেহ গুণে বড়ো, কেহ বিদ্যায় কেহ মনীষায়, কেহ হৃদয়বত্তায় আবার কেহ কর্মশক্তিতে বড়ো হন। কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে কখনও কখনও মহাপুরুষ একাধারে বহুবিধ গুণে মণ্ডিত হইয়া জগতের বরেণ্য হন। দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া ইঁহারা নিজেরা ধন্য হইয়াছেন, জগৎবাসীকে ধন্য করিয়াছেন।

এই রকম একজন কণজন্মা পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। ২৫শে বৈশাখ এক শুভ লগ্নে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙলা দেশ ও বাঙালীকে ধন্য করিয়াছেন, বৈশাখ সংখ্যায় আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি, আরাধনা করি, তাঁহাকে আমাদের সকল কল্যাণকর প্রচেষ্টার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা সাহিত্য দর্শন, সামাজিকতা, রাষ্ট্রনীতি—কোন্ দিক ছাড়িয়া কোন্ দিকের কথা বলিব। এমন দিক এমন বিষয় খুঁজিয়া পাই না যেদিকে কবিগুরু তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া ধরেন নাই, যেদিকে চলিবার জন্য তিনি পথ-নির্দেশ করেন নাই।

আমাদের দেশের শিক্ষা সম্বন্ধেই তিনি যে ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন, মানুষের মহান আত্মোপলব্ধির কথা, প্রকৃত শিক্ষার রূপ ও আদর্শ, তাহার বিধি-ব্যবস্থার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া তিনি যাহা আমাদের জন্য লিখিয়া রাখিয়া

দিয়াছেন তাহা যদি আমরা আলোচনা করিতাম, অনুধাবন করিতাম তবে বোধ হয় আজ আমাদের এমন বিভ্রান্ত হইতে হইত না। আমরা অগত্য রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মতামতগুলি অর্পণ করিতেছি।

পরীক্ষা বিভ্রাট

মাস খানেকের বিরতির পর মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা আবার আরম্ভ হইয়াছে। গত মার্চ মাসের পরীক্ষার সময়ে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি না হওয়ায় আমরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। তবু কি সোয়াস্তি আছে? ইংরাজীর পরীক্ষার আগের দিন শোনা গেল ছাত্ররা কিছু কিছু প্রশ্ন আগেই জানিতে পারিয়াছে। পরীক্ষা সুরু হইয়া দেখা গেল, সত্যই তাহাদের কথা হইতে কিছু প্রশ্ন আসিয়াছে। পরের দিন ইতিহাসের প্রশ্নপত্রের নকল তো কাগজে কাগজে ফোটোতে ফোটোতে প্রচারিত হইয়া গেল। পরীক্ষার হলে ছাত্রেরা পরম পুলকে জানা প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বসিয়া গেল। সংকৃত প্রশ্নপত্রের বেলায়ও তথৈব ঘটনা হইল, যদিও ছাত্রদের দুর্ভাগ্যক্রমে এবার আর কোনও দিন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

বুদ্ধিমান ছাত্র ও শিক্ষক আমাদের অনেকটা ধারণা করিতে পারেন, এবং বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন সকলেই সহজে অনুমান করিতে পারে, কিন্তু এবার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। দোষ কাহার, কাহার দুর্বলতা, কাহার অযোগ্যতা, ইহা কোথায় এসব আজ ভাবিয়া দেখার বিষয়। এই গুরু দায়িত্ব যাহাদের উপরে ন্যস্ত তাঁহারা নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই তাহা ঠিক, কিন্তু জনসাধারণও আজ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না।

আমরা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, শিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষা গ্রহণ করা সমীচিত মনে করেন নাই, এবং মিলিয়ে পরীক্ষাগুলি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পদ্ধতিগুলির বিবেচনায় আমরা অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কি যথাকর্তব্য করিয়াছেন?

বোম্বাই রাজসরকারের নির্দেশ ও হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত

যে বিদ্যালয়ে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে যাহাদের মাতৃভাষা ইংরেজি তাহারাই শুধু পড়িতে পারিবে, অন্য কাহাকেও সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করা চলিবে না, বোম্বাই রাজ্য সরকারের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যে মামলা রুজু হইয়াছিল তাহাতে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। এই আইন ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী, ইহাতে অভিভাবকগণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, ছেলেমেয়ে কোন স্কুলে পড়িবে তাহা নির্ধারণের অধিকার বাপ মা এবং অভিভাবকের থাকিবে না। হাইকোর্ট এই সব যুক্তির বলে বিদ্যালয়কর্তৃপক্ষের পক্ষে রায় দিয়াছেন। শুনিতেছি রাজ্যসরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবেন।

সংবিধানের মর্যাদা অবশ্যই রাখা কর্তব্য কিন্তু বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার প্রতিকারও সম্ভবত এইরূপ কঠোর হাতে না করিলে সহজে হইবার নয়। সেদিক দিয়া দেখিলে আমরা বোম্বাই সরকারের এই নির্দেশকে দোষের মনে করিতে পারি না।

অবশ্য ইহার ফলে যদি অনেকগুলি ভাল বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তবে তাহাও পরিতাপের বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন পরিকল্পনা

আই এ এস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে ভাল করিতে পারে, প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বাঙালী ছেলে যেন পিছনে

না পড়ে তাহার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি ক্লাস খুলিয়াছেন। অনেকে এই সব প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার উপর তেমন গুরুত্ব দেন না, আবার অনেকে বলেন এই সব চাকুরিতে ভর্তই বা যোগাযোগ হয় যে ইহার জন্ত এত পরিশ্রম ও প্রয়াস করিতে হইবে? সম্প্রতি শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররাই তো দেশের শাসন যন্ত্রের হাল ধরিয়া বসেন, মন্ত্রীরা পরামর্শ দেন কিন্তু দৈনন্দিন কর্মপরিচালনা তো এই সব সেক্রেটারিদের উপরেই ন্যস্ত, কাজেই দেশের শাসন যন্ত্রের পরিচালকরূপেই যা বাঙালী ছেলেরা থাকিবে না কেন? আমরা পূর্বেও বলিয়াছি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, সমগ্র উন্নতির ক্ষেত্রে বাঙালী ছেলের স্থান শীর্ষদেশে হউক, ইহাই তো সকলের কাম্য।

বিশ্বভারতীর নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

বিশ্বভারতীর নূতন উপাচার্য পদে ডাঃ প্রবোধ-চন্দ্র বাগচির নিয়োগসম্ভাবনার কথা আমরা আগের সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। পরিদর্শক ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুমোদনক্রমে এই নিয়োগ কার্যে পরিণত হইয়াছে জানিয়া আমরা গভীর আনন্দ অনুভব করিতেছি। ডাঃ বাগচিকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। আর আশা করি, তাঁহার কাছে দেশবাসীর যে প্রত্যাশা তাহা পূর্ণ হইবে।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডাঃ বাগচির সভাপতিত্বে বিশ্বভারতী কর্মসমিতি সংসদের নিকট আচার্য পদে পণ্ডিত নেহরুর পুনর্নিয়োগের জন্ত অনুমোদন করিয়াছেন। আগামী ২২শে যে সংসদের অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হউক ইহাই সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ ঘোষের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের কলিকাতা শাখার এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা পান্না দেবী শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার ইতিহাস বিবৃত করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ঘোষ বলেন, শান্তিনিকেতন আশ্রমটি বিশ্বের ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ অবদান। চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁহার চিত্ত পীড়িত, ক্ষুব্ধ হইতেছিল তাই তিনি প্রকৃতির পরিবেশে শিশুর দেহমনের স্বাভাবিক বিকাশ সাধনের জন্ত এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আদর্শ ছিল শিশুর চিত্তকে স্বাভাবিক বিকাশের পথে চালিত করিবেন। কেতাবী শিক্ষার চাপে তাহার বৃত্তিগুলিকে অথবা ভারাক্রান্ত করিয়া শিক্ষক তাহার স্বাধীন বিকাশের পথে বাধার বেড়াজাল সৃষ্টি করিবেন না। আজ দেশে যখন নবচেতনার উন্মেষ দেখা যাইতেছে তখন শিক্ষার এই দিকটিতে যদি আমাদের দৃষ্টি সজাগ থাকে তবেই কবিগুরুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন সার্থক হইবে।

পাঞ্জাবে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী রাজাগোপাল আচারিয়ার রাজ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী এক পরিকল্পনা পাঞ্জাবেও গৃহীত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে শিল্প ব্যবস্থার প্রথম স্থানে দেওয়া তাহাদের সর্বপ্রধান সঙ্কল্প। এই ব্যবস্থায় স্কুলগুলি দুইভাগে কাজ করিবে, যাহাতে প্রতি ভাগের ছাত্রই কিছু সময় বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় ব্যয় করিবে, বাকি সময় গৃহে পিতামাতার কাজে সাহায্য করিবে। ইহাতে অভিভাবকদের তরফে ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পাঠানোর এক প্রধান আপত্তিই খণ্ডন করা হইবে। আমার অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পিতামাতা বিনা বিধায় ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাঠাইবে যখন দেখিবে ছেলে মেয়েকে পড়াইতে যত হইতে খরচ তো হইলই না,

বহু উন্নততর উপায়ে শৈক্ষিক কাজে তাহার কাছে সাহায্য পাওয়া সম্ভব হইল। এই ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীকে কোন একটি কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া দেওয়া হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাও শেষ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দেওয়া হইবে।

শিক্ষা-বিস্তারের কাজে গ্রন্থাগারের স্থান

বিগত ১লা মে তারিখে জাতীয় লাইব্রেরি-ভবনে একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ-শিবির খোলা হইয়াছে। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু। প্রথমে এই শিক্ষণ-শিবিরের পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীকেশবন বলেন যে, গ্রন্থাগারিক পরিষদটি এত অবহেলিত হইয়াছে যে, দুই খেপে ক্লাস করা হইতেছে। সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য দিনের বেলায়, বর্তমানে কাজে নিযুক্ত লাইব্রেরিয়ানদের জন্য সন্ধ্যার পর। এই পরিষদের কাছে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যটি বড় নয়। ইহারা চাহেন যে লোকে এই বিভাগের তথ্য ও আদিকের সঙ্গে পরিচিত হউক।

উদ্বোধনপ্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিকিরণ না হইলে গণতন্ত্রের সার্থকতা নাই। বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে জ্ঞানের বার্তা পৌঁছানর কাজে সময় লাগিবে, এ বিষয়ে গ্রন্থাগারগুলির কাছে জন-সাধারণ অনেক প্রত্যাশা রাখে। বিদ্যালয়ে সাধারণ লোকে যায় অর্থকরী বিদ্যার জন্য, কিন্তু গ্রন্থাগারের কাছে যাইবে এমন বিদ্যার জন্য যাহাতে আছে মনের তৃপ্তি, আর আত্মোপলব্ধির আনন্দ। গ্রন্থাগারের কর্মীরা তাহাদের পুস্তক নির্বাচন করিয়া, নির্বাচিত পুস্তক লোকের পক্ষে সহজলভ্য করিয়া সাধারণ লোকের জ্ঞান অর্জনের পথে সাহায্য করিবেন, এইজন্যই এইরূপ শিক্ষাশিবিরের সার্থকতা।

আমাদের দেশে লাইব্রেরির সংখ্যাই কম, ভাল লাইব্রেরির সংখ্যা তো নগণ্য, এবিষয়ে যত আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। আমরা বর্তমান সংখ্যায় সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত দ্বাদশ গ্রন্থাগারসম্মেলনের সভাপতির বহু তথ্যসম্বলিত, সুচিন্তিত ভাষণ লিখিত অভিভাষণটি উদ্ধৃত করিলাম।

সমাজ, গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা*

শ্রীঅনাথনাথ বসু

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার কোন যোগ্যতাই আমার নাই। তবুও আপনারা আমাকে এই সম্মান দিয়াছেন। বিনম্রচিত্তে সুষ্টিচিত্তে আপনাদের এই দান আমি নতমস্তকে গ্রহণ করিলাম। যদি অযোগ্যতার জন্য এই গুরুভার দায়িত্ব বহনে আমার কোন ত্রুটি ঘটে তাহার জন্য আপনারা আমাকে মার্জনা করিবেন, কারণ তাহার কিছুটা দায়িত্ব আপনাদেরই।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলিতে গিয়াই প্রথমে একটি পুরাতন স্মৃতি মনে আসিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। বন্ধুর সহিত পুরী গিয়াছি। মধুসূদন তীর্থ তখন সেখানে গোবর্ধন মঠে শঙ্করাচার্য। এককালে মহামহোপাধ্যায় বলিয়া তাঁহার ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল, ও জ্ঞানতপস্যার ক্ষেত্র হিসাবে গোবর্ধন মঠের যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তখন বহু বিদ্যার্থী জ্ঞানান্বেষণে গোবর্ধন মঠে আসিয়া মধুসূদন তীর্থের পাদতলে শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পর বহু দিন চলিয়া গিয়াছে। মধুসূদন তীর্থ এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, গোবর্ধন মঠের পুরাতন গৌরব নাই, সেখানে এখন আর বিদ্যার্থী ও সাধকদের ভিড় হয় না।

এই মঠের সরস্বতীভবন অর্থাৎ গ্রন্থাগার একদিন বিখ্যাত ছিল। বহু জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞানার্জনে তাহা সহায় হইয়াছিল। আমাদের আগ্রহ হইল সেই সরস্বতী-ভবন একবার দেখি। কিন্তু শুনিলাম বহুদিন হইতে সেই সরস্বতীভবনের দ্বার বন্ধ, সেখানে তালা দেওয়া, সেখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। বহু চেষ্টা করিলাম, বহু লোককে বলিলাম, এমন কি মধুসূদন তীর্থের নিকটও আবেদন করিলাম। তিনি এমন জরাজীর্ণ স্থবির, কোন কথাই শোনেন না। অবশেষে প্রস্তাব করিলাম আমরা গ্রন্থগুলির সূচী করিয়া দিব। তাহাতে কাজ হইল। বহুদিনের রুদ্ধ কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। কিন্তু কি দৃশ্য দেখিলাম। প্রকাণ্ড একটি কক্ষ পুথিতে ঠাসা, বহুদিনের অব্যবহারে অপব্যবহারে পুথিগুলি ইতস্তত অবস্থাবিপর্যস্ত, উই আর ইঁদুরের অত্যাচারে বহু পুথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। চোখে জল আসিল। যে হতভাগ্য দেশ এই মহামূল্য রত্ন এইভাবে অযত্নে নষ্ট হইতে দিয়াছে ও দিতেছে তাহার কি হইবে?

কল্পনানেত্রে দেখিতেছি নালন্দা মহাবিহারের গ্রন্থাগারগুলি—রত্ননিধি, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। গ্রন্থাগারের কী সুন্দর, কী সার্থক নামকরণ। যুগের পর যুগ শত শত বিদ্যার্থী রত্নের সন্ধানে আসিয়াছে, তপস্যা করিয়া সে রত্ন লাভ করিয়াছে, জীবন ধন্য করিয়াছে, গ্রন্থাগারকে ধন্য করিয়াছে। গ্রন্থাগারের এই তো চরম সার্থকতা।

গ্রন্থাগার জ্ঞানতপস্যার সাধন, যেখানেই এই সাধনা আছে সেখানেই গ্রন্থাগার আছে। বিদ্যার ক্ষেত্রের সহিত গ্রন্থাগারের এই অবিচ্ছেদ্য নিত্য যোগ গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব।

যখন প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন যেখানে যেখানে অধ্যাপকের বাস ছিল সেখানে সেখানে পুথিসংগ্রহ বা গ্রন্থাগার ছিল। আমাদের জীবনে সে ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। শ্রীশ

---

*বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, ২ বৈশাখ, ১৩৬১।

বৎসর আগেও এই বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরিতে গিয়া পনের দিনের মধ্যে শত শত পুথির সন্ধান পাইয়াছি—শত শত পুথি দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদেরও সেই গোবর্ধন মঠের সরস্বতীভবনের পুথিগুলির অবস্থা। একদিনে তাহাদের কত সন্ধান, কত যত্ন ছিল, কত লোক সেগুলির সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করিত, অধ্যয়ন করিত। আজ সেদিন আর নাই। আজ পুথিগুলির মর্যাদা বুঝিবে এমন লোকেরও অভাব ঘটিয়াছে। কোথাও কোথাও দেখিয়াছি তাহাদের পূজা হয়। কিন্তু সে তো পাটার পূজা, দেবতার প্রাণহীন কাঠামোর পূজা, পুথির যথার্থ ও একমাত্র পূজা তো তাহার প্রকৃত ব্যবহার—সে ব্যবহার শেষপ্রায় হইয়া গিয়াছে, সে পূজা করিবে এমন পূজারী আর নাই।

কিন্তু দুঃখ করিব না। পূজারীদের পরিবর্তে যে নূতন ব্যবস্থা আসিয়াছে সেখানেও গ্রন্থাগারের এই ধারা অব্যাহত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সে ধারা চলিয়াছে, শুধু চলে নাই, অতীতের তুলনায় পুষ্টিলাভও করিয়াছে।

মনে পড়িতেছে আমাদেরই যুগের এক শ্রদ্ধেয়তম ব্যক্তি যিনি এইভাবে সারা জীবন গ্রন্থাগারের মধ্যে জ্ঞান সাধনা করিয়া দিন কাটাইয়াছেন এবং এখনও কাটাইতেছেন। তিনি আপনাদের এই মালদা জেলারই লোক। আমি আমার পরমপূজনীয় আচার্য শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বলিতে গিয়া হঠাৎ শান্তিনিকেতনের একটি ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। তখনও শান্তিনিকেতনে বিদ্যুৎ আসে নাই, পাকা বাড়িও বেশি হয় নাই। শান্তি-নিকেতনের উপরিতলে ছাত্রাবাসে আমরা কয়েকজন বাস করি। কতদিন দেখিয়াছি সারাদিন গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়া করিবার পর বৈকালিক ভ্রমণ ও সান্ধ্য কৃত্যাদি সারিয়া শান্তীমশায় একটি লণ্ঠন হাতে লইয়া নির্জন গ্রন্থাগারে আবার তাঁহার আসনটিতে আসিয়া বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। ক্রমে রজনীর প্রথম যাম অতীত হইল, আশ্রমে বেশির ভাগ লোকই শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন, অথবা শয়নের আয়োজন করিতেছেন। তিনি তখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, লণ্ঠনের বাতিটি কমাইয়া দিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার কুটিরে ফিরিয়া গেলেন। গ্রন্থাগারের মর্যাদা ইঁহারাই জানেন।

আবার এমনও দেখিয়াছি বিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দ্বার নানাবাধাসঙ্কুলিত কণ্টকাকীর্ণ, অথবা সেখানে গ্রন্থের আদর নাই। গ্রন্থাগারের দ্বার বাধাকীর্ণ করিয়া রাখার একটিমাত্র অর্থ হইতে পারে। সেখানে সে ব্যবস্থা সেখানে গ্রন্থের ব্যবহারের চেয়ে গ্রন্থ রক্ষা করার উপর নজর বেশি। ইহা কৃপণের মনোভাব; ইহার দ্বারা গ্রন্থাগারের সার্থকতা ব্যাহত হয়, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে না। সেখানে গ্রন্থের আদর নাই সেটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দোষে। আমাদের এই পাঠ্যপুস্তক-সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা এমনই বিচিত্র যে এখানে পরীক্ষাফলসূত্র ছাত্রবল গ্রন্থ না পড়িয়া গ্রন্থের সমালোচনা পড়ে, গ্রন্থের পরিবর্তে গ্রন্থের কঙ্কালের আদর করে। সুতরাং তাহারা যদি গ্রন্থাগারের মর্যাদা না বোঝে, পাঠ্যাতিরিক্ত অন্য কোন গ্রন্থের মূল্য না দেয়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া একদা রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বক্তাকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"বিদ্যালয়ে চিরকাল থেকে আমরা যাঁরা পোষাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মনের শক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোন কালে সবল হয় না। তোমরা পরনার কাজ ছেড়ে দিয়ে রাখালের কাজ কোরো"।

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি যে কতখানি সত্য তাহা আমরা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। তাই আজ চারিদিকে শিক্ষাসঙ্কোচের দাবি উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত

মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য নানা সংস্কারের সঙ্গে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উপর বিশেষ করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে। আশা করিতেছি যখন কমিশন-পরিকল্পিত শিক্ষাসংস্কার দেশের সর্বত্র প্রযুক্ত ও কার্যকর হইবে তখন আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সার্থক হইবে, তখন সত্য সত্যই এদেশে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থের আদর, মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে।

এতক্ষণ আমি বিদ্যাকেন্দ্রসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির কথাই বলিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে আর এক শ্রেণীর গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। এগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার নামে সর্বত্র সুপরিচিত।

এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সৃষ্টির সহিত রাজনীতির জগতে লোকতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। এককালে শক্তি ও সংস্কৃতি দেশের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। লোকতন্ত্রের অভ্যুদয়ে সে শক্তি দেশের সর্বসাধারণের আয়ত্ত হইল, ধীরে ধীরে দেশের জনসাধারণ সংস্কৃতির অধিকার লাভ করিল। যে জ্ঞান, যে বিদ্যা, যে সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল তাহাদের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইল। সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্ম তখনই হইল।

সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্মকাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পিছনে একটি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটি কথা অনভিব্যক্ত অথচ সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। সে ভাব, সেই কথাটি এই যে, সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিও লোকশিক্ষার বাহন, সেগুলিও অপর যে শ্রেণীর গ্রন্থাগারের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহাদেরই সমগোত্র, সমজাতি, তাহাদেরই মত বিদ্যার কেন্দ্র। জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই তাহাদের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই বড় কাজ, যাহাতে এইভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা জাতীয় সংস্কৃতিকে তাহাদের অবদানের দ্বারা সমৃদ্ধতর ও সার্থকতর করিয়া তুলিতে পারে।

বিদ্যা অর্জন করিতে হইলে বিদ্যার্থী হইয়া গুরুকুলে আচার্যের নিকট যাইতে হইবে, ইহাই ছিল আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথা; যুগধর্মে কিছুটা রূপান্তরিত হইলেও এই প্রথা আজও চলিতেছে। শুধু প্রাচীনকালে বিদ্যার জন্য শুল্ক দিতে হইত না, আজ সেটুকু দিতে হইতেছে। কিন্তু পূর্বতন যে লোক জীবিকার্জনের জন্য নানা কর্মে ব্যস্ত তাহার বিদ্যার্জনের নিরবচ্ছিন্ন সেই অবসরও নাই, আর বিদ্যার জন্য যে শুল্ক আজ দিতে হয় সে শুল্ক দিবার সামর্থ্যও হয়তো তাহার নাই। সাধারণ গ্রন্থাগার তাহারই বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র, জ্ঞানার্জনের সাধন ও সহায়। সেখানে নিজের চেষ্টায় তাহার নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে, নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে। সেখানে যে সুযোগ সে পায় সে সুযোগ হয়তো জীবনের আরম্ভে নানা কারণে সে পায় নাই। এই ভাবে যে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন হয় তাহার মূল্য কি বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত বিদ্যার চেয়ে কম? বরং একদিকে বিদ্যা দেখিলে বলিব এক হিসাবে এই বিদ্যা সার্থকতর, কারণ ইহা সম্পূর্ণ ই স্বপ্রণোদিত ও স্বোপার্জিত। ইহার সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের এই যে রূপ বর্ণনা করিলাম এই কি আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির রূপ? যদি বলি 'হাঁ' তবে অপলাপ ও অতিভাষণ দোষ ঘটিবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারই এখনও পর্যন্ত লোক-শিক্ষার বাহন হইয়া ওঠে নাই। ইহার যে ব্যতিক্রম নাই একথা বলিব না, কিন্তু বেশির ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধেই একথা বলা চলে যে

তাহারা লোকশিক্ষার বাহকরূপে তাহাদের যে দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে সচেতন নহে ও সে দায়িত্ব পালন করিবার উপযুক্ত কোন সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি তাহাদের নাই। তাহাদের অধিকাংশই কল্পিত চিত্তবিনোদনের খোরাক জোগাইয়াই সন্তুষ্ট।

চিত্ত বিনোদন বটে কিন্তু সবটাই বিনোদন নহে।

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যদি শুধু পাঠকবর্গের রুচি অনুযায়ী শুধু সাহিত্য জোগাইয়া তাহাদের কাজ সম্পন্ন করিতেছে বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে ভুল করা হইবে, বিশেষ করিয়া আজিকার দিনে। আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, আজ আমরা দেশে লোকতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের সমস্ত কল্যাণশক্তি এই চেষ্টায় নিয়োগ করিতেছি। আজ আমরা বুঝিয়াছি যে নূতন ভারতবর্ষে যে নূতন লোকতন্ত্রাত্মক সমাজ আমরা গড়িতে চাই, তাহা শক্তিশালী ও প্রাণবান করিতে হইলে তাহাকে ব্যাপক লোকশিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

কিন্তু সে লোকশিক্ষা দিবে কে? সে ভার কে লইবে? সে লোকশিক্ষা শিক্ষার যে সাধারণ বাহন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলির সাহায্যে সম্ভব নয়। দেশের জন-সাধারণের কতটুকু অংশ সেভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে? বস্তুত লোকশিক্ষার পথ অন্য। একদিনে যাত্রা কথকতা পাঁচালীগান প্রভৃতি এই লোকশিক্ষার বাহন ছিল; তখন মুখের কথাই শিক্ষা দিবার প্রধানতম উপায় ছিল, বেশির ভাগ মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া হইত। সে ব্যবস্থা আজ মৃতপ্রায়। তাহা ছাড়া নূতন যুগে লিখিত কথার প্রাধান্য হইয়াছে; লিখিত কথার সহায়তায় আজ লোকসমাজকে শিক্ষা দিতে হইতেছে, বহুজনকে সে শিক্ষার আওতায় আনিতে হইতেছে। লোক-তন্ত্রের ইহাই রীতি, ইহাই বিশেষত্ব।

লিখিত কথার সাহায্যে শিক্ষা অর্থাৎ গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষা। সে গ্রন্থের জন্য হয় বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে, না হয় গ্রন্থাগারে যাইতে হইবে। ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। বস্তুত আজিকার দিনে আমাদের দেশে এই বয়সের লোকশিক্ষা শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিই দিতে পারে। এই শিক্ষা দিবার ভার তাহাদেরই লইতে হইবে।

একাজ করিতে হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মের ধারা কিছুটা পরিবর্তিত করিতে হইবে, তাহাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিবার আগে প্রথমে তাহাদের এই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। এই চেতনা জাগিলে তখন প্রয়োজন হইবে একটি সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতির। সেই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মের ধারা গঠিত ও চালিত হইবে।

বহুলোকে কিছু বই কেনা, সেগুলিকে রক্ষা করা ও সেগুলির লেনদেন করা—ইহাই হইল আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সাধারণ কর্মের ধারা। বই কেনা হয় সাধারণত পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের রুচি অনুযায়ী। সে রুচি গঠিত ও শিক্ষিত করিবার ভার গ্রন্থাগারের নহে। প্রচলিত রুচির খোরাক জোগাইলেই তাহার কাজ শেষ হয়—বস্তুতঃ এই ভাব এই কর্মধারার পিছনে রহিয়াছে।

কিন্তু এভাবে কাজ চালাইলে তো চলিবে না। এখানে সবটাই চিত্তবিনোদনের জন্য, শিক্ষার আয়োজন এখানে কোথায়? অবশ্য একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল, পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় যাবো আনা পাঠক শুধু সাহিত্য পাঠের জন্যই পাঠাগারে যান। যতদিন উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যরচনার প্রধানতম মাধ্যম থাকিবে, ততদিন শুধুই যদি শুরুই বলি, বেশির ভাগ পাঠকই সেই শ্রেণীর রচনাই পাঠ করিবেন। মিটারের উপর

লোক নাই, যিনি যে কেলিয়া পুস্তির জন্ত অন্ত আহার্য চায় এমন লোক যেমন তার। এমন অবস্থায় যিনিয়াকেও পুষ্টিকর করিয়া তুলিতে হইবে, এবং তাহার পাশে অন্ত পৌষ্টিক আহার্য সাজাইয়া রাখিতে হইবে—তাহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

সুতরাং আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে সহজে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থগুলির সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য নানা শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ রাখিতে হইবে। কিন্তু শুধু ভাল ভাল গ্রন্থ রাখিলেই কি কিনিলেই চলিবে না। সেগুলির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহাদের দিয়া পড়াইতে হইবে এবং এই ভাবেই তাহাদের অনভিলক্ষ্যে অনভিগোচরে পাঠকগণের রুচি মার্জিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলির লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইহার জন্ত মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারে আলোচনা সভা, পাঠসভা প্রভৃতির আয়োজন করিতে হইবে, সেখানে ভাল গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, আরও অনেক কিছু করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সময় এখন নহে। হয়তো আপনাদের অনেকেই এবিষয়ে অবগত ও অবহিত আছেন। আমার উদ্দেশ্য শুধু আজিকার পরিস্থিতিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের এই গুরুভার দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশের লোককে কিছু পরিমাণ সচেতন করিয়া দেওয়া। প্রকৃত লোকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে স্বকল্পিত সেই কর্তব্য পালন করিতে গিয়া যদি কোন ধৃষ্টতা করিয়া থাকি আপনারা মার্জনা করিবেন।

আমি কল্পনা করি আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটিই এইভাবে নূতন রূপ গ্রহণ করিবে ও লোকশিক্ষার সক্রিয় ও সার্থক কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। সেখানে শুধু পুস্তকের লেনদেনই হইবে না, সেগুলির সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হইবে, সেখানে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার প্রাচীন সাধনগুলিরও আয়োজন থাকিবে। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরে বৎসরে সাংস্কৃতিক মেলার কল্পনা করা কি একান্তই অলীক স্বপ্ন? আমার তো মনে হয় না।

সাধারণ গ্রন্থাগারের এই যে রূপান্তরের পরিকল্পনা আমি এখানে দিলাম তাহা আপনাদের অনুমোদন লাভ করিবে কিনা জানি না। আমার নিবেদন এই যে এদেশে লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ আমরা গ্রহণ করিয়াছি একমাত্র লোকশিক্ষার ভিত্তিতেই তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আর লোকশিক্ষার প্রকৃষ্টতম সাধন হইল এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি। সুতরাং তাহাদের রূপান্তর ও কর্ম-ধারার পরিবর্তন আজ বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হইয়াছে। সেগুলি যেদিন সত্য সত্যই লোকশিক্ষার সক্রিয় ও সার্থক সাধন হইয়া উঠিবে সেদিনই আমাদের দেশে নূতন সমাজের ভিত্তি পত্তন হইবে, প্রকৃত লোকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে।

অপরাধপ্রবণতা

শ্রীশান্তা দেবী

আজকাল একটা কথা অনেকেই ভাবেন—দশ পনের বৎসর আগে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা যে রকম ছিল এখন কি তা তার চেয়ে বেশি হয়েছে? আমাদের দেশে এ বিষয়ে কোনো হিসাব বা statistics রাখা হয় কি না জানি না। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখে মনে হয় অপরাধপ্রবণতা খুবই বেড়েছে। বলবস্তভাবে হজুগে যেতে লুট-পাট, অগ্নিকাণ্ড, মারামারিতে অল্পবয়স্করা করছেই দেখতে পাই এবং দশ পনের বৎসর পূর্বে দেশের এ অবস্থা যে ছিল না তাও জানি। ইংরেজের বিরুদ্ধে অহিংস বা ছোটখাট হিংস যুদ্ধ যাই আমাদের দেশের লোকে করেছে কোনোটাতেই এত মানুষ এ রকম করে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় নি। পরাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য অনুষ্ঠিত অসহযোগে অনেক মানুষ অন্যায় বলেই না, তবুও সেই হিংস্র আচরণ সে সময়ে এখনকার চেয়ে কম ছিল। সেটা কি ইংরেজের ধাপটে না মানুষই তখন আর একটু শান্ত ও সংযত প্রকৃতির ছিল এটা ভাববার বিষয়।

আজকালকার ছেলে মেয়েদের চিত্তস্থৈর্যতা অনেক কমে গিয়েছে স্পষ্টই বোঝা যায়। অল্পবয়সে দেশে বোমা জুলুম চালাবার চেষ্টা তারা করত না। তারা বুঝতে পারে না যে আজ যারা জুলুম করছে কাল তারাই অপরের জুলুমের পাত্র হবে, যদি না নিরপরাধবর্তিতা মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া যায়। দেশে অরাজকতা চললে তাতে তারাই কিছু লাভবান হবে কি? না তাদের দুটি টেপবার জন্য উদ্যুক্ত দৈহিক শক্তিশালী চোর ডাকাতরাই বেশি লাভবান হবে?

ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের যেমন বুদ্ধিমত্তার (intelligence test) পরীক্ষা হয়, সেই রকম যদি প্রতি স্কুলের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সততা, শুদ্ধভক্তি, মানবপ্রীতি প্রভৃতির পরীক্ষা করে রেকর্ড রাখা যেত, তা হলে কোন বয়সের ছেলেমেয়ের অপরাধের দিকে ঝোঁক যায়ে খানিকটা বোঝা সম্ভব হত।

অবশ্য এই জাতীয় পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের খানিকে করে কোন লাভ নেই। পরীক্ষা দিচ্ছি আসলে তাদের ব্যবহারে সংযম আপনা হতেই আসবে। এই পরীক্ষা বৎসরব্যাপী সমস্ত কাজ দেখে করা যেতে পারে। সে কাজ কেবলমাত্র পড়ায় পাশ করার কাজ নয়। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের জিনিসপত্রের ভার দিয়ে দেখতে হবে কে কি রকম যত্ন নেয় জিনিষের। বড় ছেলেমেয়েদের ছোট ছেলেমেয়ে আগলানো, খাওয়ানোর কাজ দিয়ে দেখতে হবে এদের মমতা ও কর্তব্যবোধ কি রকম। স্কুলের উৎসবাদিতে জিনিসপত্র কেনবার এবং বাজার ও পরিবেশনের ভার দিয়ে দেখা যায় তারা সততার সঙ্গে সব কাজ করছে কিনা। এ রকম পরীক্ষায় পরীক্ষকদের ভুলচুক হবার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য তাঁদের দৃষ্টি খুব সজাগ থাকা দরকার। এর উপর পিতামাতার সহযোগিতাও প্রয়োজন। মাঝে মাঝে পিতা মাতাদের সঙ্গে শিক্ষকদের মিলিত সভায় আলোচনা যদি করা যায় তবে কোন ছেলেমেয়ে বাড়ীতে কি রকম ভাবে চলে তা বোঝা আর একটু সহজ হয়। এই ধরণের সভা আমেরিকায় খুব হয় দেখেছি। ছেলে মেয়ের বিশেষ কোন দোষের কথা বাড়ী থেকে জানা গেলে শিক্ষকরা সজাগ হতে পারেন।

পাশ্চাত্য ছেলেমেয়েদের পাশদোষ একটা বড় দোষ, আমাদের দেশে সম্ভবত সেটা তত নেই। তবু আজকাল বাড়ছে বোঝা যায়। এই দোষ যত অপরাধের মূল সুতরাং উপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের এবং কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এটা আছে কিনা এবং কি পরিমাণ আছে তাও দেখা দরকার। যারা মদ্যাদি পানীয় কেনে তাদের বয়স এবং পেশা যদি বিক্রেতারা লিখে রাখেন তবে এটা সহজে বোঝা যায়।

আমাদের দেশ গরীব দেশ এবং মদ্যাদি পানীয়ের দাম যথেষ্ট। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা সব সময় তা কিনতে পারে না। অল্প বয়সের ছেলেরা সিগারেট ধরে কোন্ বয়সে সেটা জানা এ তুলনায় সহজ, কারণ এর দাম কম বলে প্রচার বহুল।

সিনেমার সাহায্যে অল্পবয়স্কদের মন অনেক সময় মন্দ বিষয়ে উত্তেজিত ও আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। কোন বয়সের ছেলেমেয়েরা কি জাতীয় সিনেমা দেখে এবং মাসে কতবার যায় তার হিসাব রাখলে এদের মনের গতি কোন দিকে তা বোঝা যায়। আমাদের দেশের মানুষ যে ভাবে চলে যেতে তাতে ছোট বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের প্রেমের ছবি দেখিয়ে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হয়। এ দেশে শতকরা ৯৯ জন ছেলে মেয়েই বরাত এখনও পিতামাতার নির্বাচিত পাত্রী বা পাত্রকে বিবাহ করে। এবং সে বিবাহেও পাত্রীপক্ষকে টাকা দিয়ে আর গায়ের রঙের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। পাত্র পক্ষের বর্ণবিদ্বেষ ঘোচাবার উপায় অর্থ এবং ঘোসামোদ। এ রকম ক্ষেত্রে ছোট ছেলেমেয়েরা যদি ছেলেবেলা থেকে আনন্দ সম্ভোগ করবার জন্য প্রেমের ছবি দেখতে যায় তবে বোঝাই যায় তাদের মনে এই প্রেমের বীজ বোনার ফল কি হবে। তারা ঘরে একরকম দেখে, সিনেমায় তার উল্টো দেখে। ফলে বিবাহটা বাড়ীর মিয়নেই করে, কিন্তু লুকিয়ে প্রেম করার ইচ্ছা এবং প্রেরণা অনেকের হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কিছু দিন লুকিয়ে প্রেম করে, তারপর বাপ্য সন্তানের মত টাকা ও গায়ের রঙের দর কষে তারা অপর কাহাকেও বিবাহ করে। বহু লোক আছে যাদের প্রেমের জীবন বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই মৃতপ্রায় হয়ে যায় না। অন্তরালে অন্য একটা জীবন এদের চলে।

স্ত্রীজাতির গায়ের রঙ এবং বাপের টাকাকে তার গুণের মাপকাঠি না করার শিক্ষা অন্তত আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের খুবই দরকার। আফ্রিকার colour bar আছে কি না, না দেখে নিজেদের ঘরের কথা আগে তারা উচিত। কিন্তু আধুনিক সিনেমার প্রেমের ছবির সাহায্যে সে শিক্ষা দেওয়া যায় না। স্ত্রীলোকের মর্যাদা শিক্ষা দিতে হলে শিশুকাল থেকে অন্যভাবে তা দিতে হয়। ঘরের আবহাওয়াই এমন হওয়া উচিত যে শিশুরা কালো ধলোর প্রভেদই বুঝতে না পারে। বাস্তবিক ঠিক তার উল্টোই বাঙালীর সংসারে দেখা যায়। শিশুরা মানুষের গুণের কথা শেখবার আগেই অনেক বাড়ীতে কে দাদা আর কে কালো তা শেখে। অনেকে অভ্যাগতদের মুখের উপর বলে 'তুমি কালো'। অনেক ছেলে-মেয়ের মুখে আমি একথা শুনেছি।

ছোট ছেলেদের শিশুকালে বন্দুক ও তীরধনুক নিয়ে খেলা শেখানো আমার ভাল মনে হয় না। এতে মানুষের মনের হিংসাভাবটাই জাগিয়ে তোলা হয়। শারীরিক শক্তির চর্চা অন্য নানা খেলার সাহায্যেই করা যায়। বড় বয়সে অবশ্য একদলকে বন্দুক ধরতে শিখতেই হয় পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় কিন্তু শৈশবে এই জাতীয় টিকা না দেওয়াই ভাল।

ডুবি জাকাতির ছবি এবং গল্পও এই কারণেই অনিষ্টকর। অথচ শিশুপাঠ্য পুস্তকে ও সিনেমায় এগুলির বেশ চলন আছে।

আজকাল শিশুদের শিক্ষালয়ের খুব চলন হয়েছে। এর ফল ভাল এবং মন্দ দুইই হয়। যে সব ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে কোন যত্ন পায় না এবং যাদের বাড়ীর আবহাওয়া ভাল নয়, তারা শিশুকাল থেকে শিক্ষালয়ে এলে তাদের অনেক উন্নতি হতে পারে। কিন্তু যে সব ছেলেমেয়ে পিতামাতার যত্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় এবং যাদের ঘরের আবেষ্টন ও আবহাওয়া সৎ ও বুদ্ধিমান শিশু গড়ে তোলবার অনুকূল তাদের শৈশব স্বগৃহে কাটালেই বোধ হয় শিশুদের সত্যতার ভিত্তি পাকা হয়। ফুলে নানা স্বভাবের ছেলেমেয়ের কাছে অবাঞ্ছিত জিনিসও যে শিশুদের শেখার সম্ভাবনা আছে এটা ভাবা দরকার।

শিক্ষক ও সমাজ

বকুলমালা সেন

সমাজে শিক্ষকের স্থান কোথায়, শিক্ষকের কর্তব্য কি, এই অতি পুরাতন প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া লোকের মনে আলোড়ন জাগাইয়াছে।

কিন্তু শিক্ষক কে, তাহা নির্ধারিত রূপে বুঝিয়া না লইলে তাহার স্থান ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নহে। সুতরাং সর্বাগ্রে এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজিতে হইবে।

নানা শাস্ত্রলিখিত বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে মিলাইয়া শিক্ষক খুঁজিতে গেলে সরল জিনিষটি অযথেষ্ট জটিল হইয়া উঠিবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া, নিরবয়ব ভাবপুঞ্জের আবির্ভাব ঘটাইয়া ধোঁয়ার সৃষ্টি না করিয়া তাদের ধারক ও বাহক প্রকৃত শিক্ষক কোথাও খুঁজিয়া পাই কি না, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। বিষয়টি বাস্তবরূপে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনিতে হইলে এই পন্থাই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

অতীতের ছবি অতীত বলিয়াই বড় স্পষ্টরূপে চোখে পড়ে। অতীত একেবারে বাহুল্যবর্জিত। কালের কষ্টি পাথরে ঘষিত হইয়া যাহা টিকিয়া থাকিবার যোগ্য তাহাই থাকে; আবর্জনার স্তূপ কালের করাল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। অতীতের অবিমিশ্র ফুলে ভিড়িবার বহুপূর্বে। তাই উপমা খুঁজিতে, দৃষ্টান্ত খুঁজিতে, আদর্শ খুঁজিতে, প্রেরণা পাইতে আমরা বারবার ছুটিয়া যাই অতীতের সুবর্ণ দীপে। সেখানকার শাশ্বত আলোর প্রদীপ্ত রশ্মিরাজি হইতে বিচ্ছুরিত হয় যে স্নিগ্ধ জ্যোতি, তাহাতে অবগাহন করিয়া ভবিষ্যতের পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লই। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, বর্তমানে সেরূপ মনের অভাব আছে। কিন্তু বর্তমান যন্ত্র কাড়াকাড়ি এবং আবর্জনার ঠাসাঠাসি। তাহার ফাঁকে ফাঁকে হয় তো কত অমূল্য নিধি হীরকের দ্যুতি লইয়া অবহেলিত অন্ধকারে পড়িয়া আছে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। তাই দুনিয়াদারী লোক সকল দেশে সর্বকালে অতীতের এত ভক্ত।

আমরাও শিক্ষক খুঁজিতে এই চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করিয়া অতীতের আলো-আঁধারি লোকে আসিয়া পৌঁছিলাম।

দেখিতেছি ছবির পর ছবি। আদর্শ শিক্ষকের অপ্রতুলতা দেখিতেছি না বটে কিন্তু আমরা হইতেছে আলোচনার কালে ব্যক্তিপ্রতিভার চাপে শিক্ষকোচিত গুণ ও শিক্ষণীয় বিষয়ের পার্থক্য

অনুভব করিতে না পারিয়া, উভয়কে অসাধিরূপে জড়িত বলিয়া ভুল না করি। শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যই শিক্ষকোচিত গুণকে বিকাশের চরমতম দীর্ঘদেশে আরূঢ় করাইয়াছিল, এরূপ ভুল যুক্তিযার প্রচুর সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমি পূর্বাহ্নেই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিতেছি।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষকের মনে কোন কোন বৃত্তি স্ফুরিত হইয়া শিক্ষাদানকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাহা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। শিক্ষণীয় বিষয় ভুল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, অথবা ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন বিষয়—যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অধ্যাত্মতত্ত্ব অথবা আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক যে কোন বিষয়ের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করা যাইতে পারে, কিংবা হাতে কলমে সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতির লোকে পৌঁছানো যাইতে পারে কিন্তু তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

অতীতে শিক্ষককে খুঁজিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়ে অস্পৃষ্ট, নগ্নদেহে ধূলিমলিন সত্যকাম কুণ্ঠিত নতনেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল ঋষি গৌতমের কাছে। সে শিক্ষার্থী। জ্ঞানপিপাসা তাহার প্রতি রোমকূপকে তৃষিত করিয়া তুলিয়াছে, দৃষ্টিতে আকুল আকুতি ও জিজ্ঞাসা। অভিজ্ঞ গুরু শিক্ষার্থী চিনিয়া লইতে ভুল করিলেন না। সমাজ, সংস্কার লোকাচার কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। অপর শিক্ষার্থীদের পরিহাসস্তরনের অন্তরালে সত্যকামকে শিষ্যত্বে গ্রহণের সম্ভাবিত ফল রূপে যে অস্বস্তি ও অশান্তি প্রায় অনিবার্য ছিল, ধূলিচাপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই তাহা অবহেলায় ধূলাবিত হইতে থাকিল। ঋষির সস্নেহ বাহু অনার্যের অপবিত্র দেহ বক্ষে তুলিয়া লইল। তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, শিক্ষার দীক্ষা দিয়া গুরু কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম।

দেখা যাইতেছে শিক্ষক এখানে তাঁহার আজীবন অর্জিত প্রতিষ্ঠা বিনষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিচলিত হন নাই, আত্মার আত্মীয়কেই সকল জ্ঞানালোকের পুরোভাগে স্থান দিয়াছেন। সেকালে অর্থ বস্তুর অভাব না থাকায় যশ এবং প্রতিষ্ঠাই পণ্ডিতমণ্ডলীর কামনার শীর্ষ-বিন্দুতে অবস্থান করিত, এরূপ অনুমান করিলে আশা করি ভুল হইবে না। কিন্তু গুরু গৌতমের শিক্ষকোচিত ভাবের প্রাবল্যে তাহা নিতান্তই অবহেলায় ভাসিয়া গিয়াছে।

বৈত্যগুরু শুক্রাচার্যও এই শিক্ষকোচিত প্রেরণান্তেই শত্রুপক্ষের সন্তান কচের শিষ্যত্ব স্বীকার না করিয়া পারেন নাই, কারণ সে শিক্ষার্থী। বিদ্যার্থ শিষ্যের তৃপ্তি বিধানের মধ্যে যে আনন্দ, তাহাই তো শিক্ষকের চরম পাওনা। তাহার ফলে ব্যবহারিক জীবনে যত ক্ষতিই আসুক না কেন, এমন কি পারিবারিক জীবন যদি বিপর্যস্ত হইয়া উঠে, তাহাও তুচ্ছ। স্নেহের পুত্তলী কন্যার জীবনের আনন্দ যদি মিটিয়া যায়, যদি সে তাহার সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ "নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী সন্ন্যাসীনীর" জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় অথবা শত্রুপুত্রকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিলে যদি রাজরোষে পতিত হইতে হয়, তাহাও তুচ্ছ। সেই পরম ক্ষতি শিক্ষাদানের আনন্দে যে অমৃতধারা নিঃসৃত হইবে, তাহাতে অভিষিক্ত হইয়া—হইয়া উঠিবে অমৃতময়, এ বিশ্বাস গুরু শুক্রাচার্যের মনে যদি দৃঢ় নিশ্চয়তার স্থান না পাইত, তাহা হইলে এত বড় ক্ষতি স্বীকার করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে হয় তো সম্ভব হইত না।

পুরাতন ভারতে এমন দৃষ্টান্ত যে আরও আছে, তাহা সকলেই জানেন। শুধু সুদূর অতীতেই নহে, আর একটু কাছাকাছি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেও নিরাশ হইতে হইবে না।

গৌতম বুদ্ধ। ইনি জাতির শিক্ষক, সমাজের

শিক্ষক এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তিনি শুধু

অন্তোস্তি মং অবধি মং অস্তিমি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয়ন্তি বেয়ংতে সুপদমন্তি॥

বলিয়াই যদি কর্তব্য শেষ করিতেন, তাহা হইলে আজি তাঁহার শিক্ষক নামের জন্য এমন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিত কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁহাকে শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে গুণ তাহা শুধু বুদ্ধি নয়।

ক্ষুদিরামের অন্ন যান যেবা
তোমরা লইবে বল কেবা?

এ পদ প্রাপ্তির চাবিকাঠি রহিয়াছে তাঁহার এই হৃদয়বত্তায়। ক্ষুদিরামের নিতান্ত দুঃখে অভাবে তাহার মর্মান্তিক কষ্ট অন্যান্যকুমার ন্যায়ই তাঁহার মনে যে সুগভীর রেখাপাত করিতে পারিয়াছে, সে শুধু সেই ক্ষুদিরামের সঙ্গে আত্মিকতায় এক হইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া। জনগণের সঙ্গে এই আত্মিক সংযোগই তাঁহাকে জনশিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা দিয়াছিল। এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। যে বেদান্তের রত্নের মূল্য আজ আবহমান কাল হইতে নানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। স্বামী বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া তাহা যে জনসাধারণের মধ্যে এত বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহারও মূলে এই সহমর্মিতাই যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহা আজ আর কাহারও অজানা নয়। কবি গিরীশচন্দ্রের মুখে সাধারণ বাঙালী সংসারের দুঃখ দৈন্যের কাহিনী শুনিয়া যে স্বামীজী চোখের জল মুছাইবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার সহিত ভাবধারী স্বামীজীর মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজ সাধারণ মহাভারতের মতই পল্লীর কুটিরে কুটিরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

শিবগুরু গোবিন্দের মধ্যে শিক্ষকতার যে বিশেষ দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। পাঠান শিশু অপরিণীত মেহে শিক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া যুবক পাঠানে পরিণত হইয়াছে। গুরুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অপরিমিত। গুরু লক্ষ্য করিলেন, এই ভালবাসাই তাহার স্বাভাবিক মনোবৃত্তির স্ফুরণে বাধা দিতেছে। সে অন্যায়কারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিতেছে না। নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও শিক্ষার সম্পূর্ণতা আনার জন্য তাঁহার মন যে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার অন্তরস্থিত শিক্ষক-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই ইহার কারণ। তাই গুরুর চোখের উত্তেজিত পাঠান যখন তাঁহার বুকে ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল, তখন তিনি পরম তৃপ্তিভরে হাসিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

শেষ শিক্ষা দিয়া গেনু আজি শেষ বার,
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার।

কিন্তু নিতান্তই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, যাঁহার দেহ কুজ পৃষ্ঠ, সর্বদেহের কোন স্থানে যাঁহার প্রাণবত্তার লেশমাত্র চিহ্ন নাই, ভদ্র সমাজে বিশিষ্টার মত পরিচ্ছদ বলাদি পর্যন্ত যাঁহার জোটেনা, যাঁহাদের বিবর্ণ পাদুকার তালির পর তালি দীর্ঘ যাহির করিয়া চেঁচাইতে থাকে, বিদ্বজ্জন-সমাজে বৈধাৎ প্রবেশ ঘটিয়া গেলে নিতান্ত অনুকম্পা ছাড়া যাহাদের ভাগ্যে আর কিছু লাভ ঘটে না, যাহারা অভিভাবকগণের তাচ্ছিল্যের, ছাত্রগণের অবহেলার এবং বিদ্যালয়-ব্যবস্থাপকগণের করুণার পাত্র, যাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে ঠক ও অকর্মণ্য বলিয়া নিন্দিত এবং গৃহশিক্ষকরূপে মাহিনা-সরবরাহ ভৃত্যের মধ্যে পরিগণিত, তাহাদের আদর্শ খুঁজিতে গিয়া যদি ঋষি গৌতম হইতে শুরু গোবিন্দ পর্যন্ত সর্বজনমান্য মহান ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করা যায়, অবতারকল্প শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করার মত ধৃষ্টতাও

প্রকাশ করা হয়, তবে আমরা হই—পাঠকবর্গ হয় তো মস্তিষ্কবিকৃতির ছাপ মারিয়া প্রবন্ধ রচয়িত্রীকে কোন চিহ্নিত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিবেন।

আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি। আদর্শ-বিচ্যুতিই আমাদের সকল অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান কোন আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া রাখিতেই যে আমরা অপারগ হইয়াছি, তাহা নয়। এরূপ আদর্শ স্থাপন করা প্রায় দুষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। অনধিকার তার শিক্ষকের উপর অর্পিত, শিক্ষকই জাতি গঠন করে, এই সারহীন কথাগুলি আমরা মাঝে মাঝে উচ্চারণ করি বটে, কিন্তু সে শুধু পাশ্চাত্যের প্রতিধ্বনি। সভা জাঁকাইয়া বক্তৃতার উপাদান হিসাবে এবং শিক্ষাব্রতীরূপে পরিচিত হইবার মোহে তোতা পাখীর বুলি আওড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়। অন্তরের সঙ্গে সংযুক্ত নহে বলিয়াই অনর্গলের কয়তালি-ধ্বনি মিলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মহাশূন্যে আশ্রয় খুঁজিতে যায়। শিক্ষার বিষয় যাহাই হউক না কেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয়ের আদান প্রদানের পন্থায় যে মূলগত কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না, এই সহজ সরল কথাটি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বস্তুত যে যুগে পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র রচনায় যতটুকু সময় ও মনোযোগ দিলে পরীক্ষার্থীদের প্রতি দরদের ও সুবিচারের পরিচায়ক হইতে পারে তাহারও অভাব দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীগণের গভীরতর জ্ঞানের পরিচয় লওয়া নয়, আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়াই যে কালে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র রচনার প্রকট হইয়া উঠে, যে যুগে শিক্ষকগণ অষ্টরাত্রি কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় পথের ধুলায় নামিয়া যাইতে দ্বিধাবোধ করেন না, যে যুগে শিক্ষক ভাতা পান না বেতন পান, সে যুগে তাহাদের সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ তুলিয়া ধরা অথবা সমাজসেবার দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? যে যুগে শিক্ষককে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রাতঃসূর্যকে নমস্কার জানাইবার পূর্ব হইতেই একটার পর একটা গৃহ শিক্ষকতার লাগ মিলিয়ে সময়ের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, এবং রাত্রির অর্ধাংশ কাটিয়া যাইবার পর যখন দেহের প্রতিটি অণুকণা বিশ্রামের জন্য আকুতি জানাইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে, মনের সকল প্রাণবন্তা যখন নিঃশেষ হইবার পথে ভবিষ্যতের পাত্র হইতে ধার করিয়া আনিয়া কোন মতে বর্তমানকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে—প্রতিদিনকার সেই চরম মুহূর্তে আগামী দিনের জন্য অবধারিত বাষিক পুনরাবৃত্তিকে চক্ষুমনে স্মরণ করিতে করিতে যাহাদের বিশ্রামের সময় মেলে, কি অর্থ, কি মর্যাদা সকল দিক দিয়াই যাহাদের স্থান শিক্ষিত সমাজের সর্বনিম্নস্তরে, তাহাদের সন্তাকার করণীয়, সত্যকার দায়িত্ব, সত্যকার আদর্শ যদি এমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রূপ লইয়া আবির্ভূত হইতে চায়, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই যে বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন, তাহাতে অবাক হইবার কী বা থাকিতে পারে? শিক্ষক সম্প্রদায়কে বুঝিবার সময় অনেকের মনেই হয় তো উঁকি ঝুঁকি মারিবে অপুর পাঠশালার মুখী শিক্ষককে, সন্তোষের মুখের অরুচি শিবনাথ পণ্ডিতকে অথবা কাহারও হয় তো মনে পড়িবে যে শিক্ষক দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বসিয়া ঝিমানো রোধ করিতে পারেন না, সময়ের অভাবে শিক্ষাদানের বিষয়ের সঙ্গে উপযুক্ত সংযোগ রাখিতে পারেন না কিম্বা যিনি গৃহশিক্ষক রূপে নিতান্ত কৃপাপ্রার্থীর ন্যায় নিত্য নিঃসঙ্গে যাতায়াত করেন অথবা কচিৎ কেহ যখন বিদ্রোহের আগুন মনে জ্বালিয়া সমাজ বিশৃঙ্খলাকারীর দলে ভিড়িয়া পড়েন—তাঁহাদের

চিত্রাবলী। সুতরাং শিক্ষকসম্প্রদায়ের আদর্শরূপে দর্শকমাত্রের উপস্থিত করা তাঁহাদের কাছে অমার্জনীয় বলিয়া মনে হওয়াই কথা। কিন্তু আমি বলিব, এ সবই আদর্শবিকৃতির ফল। এ আদর্শ-বিকৃতির জন্য দায়ী মূলত শিক্ষকগণ কি না, তাহা বিচার করা সহজ নয়। তবে ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক-গণের মধ্যে অর্থাৎ জনগণের মধ্যে, আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয়, শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে আদর্শে শ্রদ্ধা না জন্মিলে এ বিকৃতি দূর হইবে না। তাহি বা সমাজের আদর্শে শ্রদ্ধা ও অবহেলাই প্রতিফলিত হইয়াছে শিক্ষকে এবং ছাত্রে। শুধু তাহা নয়, শিক্ষা-ব্যবস্থাপক এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপকদের মধ্যেও ইহার প্রভাব দেখা যায়। ইহার সামগ্রিক রূপই মূর্তি লইয়া প্রকাশিত হয় শিক্ষা-ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, শিক্ষিত বলিয়া গণ্য, উচ্চপদস্থের আচারে, যাহা প্রকাশে শিক্ষকতাকে হয়রানির ও চাপরাশীর কাজ হইতেও কম মূল্যবান ও হেয় মর্যাদা পাইবার যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু ইহা বিকৃতিই। বিকৃতি যখন ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়, তখন সত্যরূপকেই অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। তাহা সত্ত্বেও সত্য কখনও সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় না, সত্যের সত্যতার পরীক্ষা এখানেই। তাই আমরা এখনও এই নৈরাশ্যময় যুগেও সত্য শিক্ষক এবং সহযোগীর হাতের সন্ধান মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। এখনও ছাত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সাফল্যে শিক্ষক আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠেন, যদিও তাহার ফলে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কাঠিন্য কিছুমাত্র কমে না বা প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র বাড়ে না। এখনও অতি বৃদ্ধ গৃহশিক্ষক তাঁহার যৌবনের শিষ্যছাত্রের পরবর্তীকালে শিক্ষাব্রী জীবনের সাফল্যে অজানা ঠিকানা খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাদের দরিবারে উপস্থিত হন শুধু একবার চোখের দেখা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিবার জন্য। আবার দেখি শিক্ষকের উৎসাহবাক্যে উদ্বোধিত হইয়া ছাত্র বাধাবিপত্তির পাহাড় উল্লঙ্ঘন করিবার প্রেরণা ও শক্তি লাভ করে।

ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই সত্য। এই সত্যকেই আবার ব্যাপক প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে হইবে। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অর্থাৎ সত্য শিক্ষকের আবির্ভাবে ব্যাপকতা আনিতে হইলে সর্বপ্রথম চাই হৃদয়বত্তা। শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে ভাল কথা, কিন্তু তাহা হইতেও বড় কথা—শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করা চাই। বেতনের বিনিময়ে কর্ম হিসাবে নয়, শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তোলার মধ্যে যে নূতন করিয়া সৃজনের আনন্দ আছে তাহার মাধুর্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হওয়া। কিন্তু এ সংসারে সব কিছুই আপেক্ষিকতার নিয়ম মানিয়া চলে। সুতরাং এরূপ শিক্ষকের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব করিয়া তোলে যে পরিবেশ, তাহার সংশোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যোগ্য পথে বিকশিত হইবার পথ না পাইয়া শিক্ষকোচিত গুণাবলী চরম ব্যর্থতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া জাতির ভবিষ্যৎ, ব্যক্তির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। সমাজে শিক্ষকের স্থান এবং কর্তব্যসম্পাদন যেমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টিও সেইরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। যাঁহাদের মানসিক গঠন শিক্ষাকে প্রাণবন্ত ও আনন্দগর্ভ করিতে সক্ষম নয় তাঁহাদের যেমন এ পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ানো কর্তব্য, তেমনি শিক্ষকতাই যাঁহাদের মনঃপূত বিকাশের যোগ্যতর ক্ষেত্র, তাঁহারা যাহাতে ব্যর্থকাম না হন, তাহার ব্যবস্থা করাও সমাজের বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া আবশ্যক। মানসিক প্রবণতাকে অবিসংবাদি পথ-নির্দেশকরূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদানই সার্থক শিক্ষাদান। এরূপ শিক্ষাদানের পথ বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এই পথের আবিষ্কার ব্যাপের মত;

ব্যক্তিত্বে তাহা মূর্ত করিয়া তোলা প্রতি মুহূর্তের সাধনার ফল। এই অসামান্য দায়িত্বই শিক্ষকের উপর ন্যস্ত।

সার্থক শিক্ষকতার আদর্শস্বরূপ প্রবন্ধের প্রারম্ভে যাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি, বলা বাহুল্য তাঁহারা আদর্শ শিক্ষক বটেন, কিন্তু শিক্ষকতাই তাঁহাদের একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁহাদের অন্যান্য গুণাবলী এতই সমুজ্জ্বল যে শিক্ষকতার আদর্শ হিসাবে তাঁহাদের কথায় অবতারণার বিষয় আসে। কিন্তু আদর্শ মানব যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যেই তো বিভিন্ন গুণের চরম বিকাশ ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত মহামানবগণের সহিত জনসাধারণের সংযোগ ঘটিয়াছে যে গুণকে আশ্রয় করিয়া, তাহা যে শিক্ষকতা, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সুতরাং শিক্ষকের আদর্শ খুঁজিতে হইলেও তাঁহাদের শিক্ষক-সত্তার চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইবে। তাঁহাদের সমগ্র সত্তা লইয়া আলোচনা করিবার স্থান ইহা নয় এবং শিক্ষকের কর্তব্য, পথের নির্দেশ ও আদর্শের জন্য তাহা অত্যাবশ্যকও নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও জাতির শিক্ষক, সমাজের শিক্ষক। যাঁহারা বিশেষ জনগণকে শিক্ষা দিয়া সার্থকতা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদতলে বসিয়াই তাহাদের শিক্ষাদান নীতির পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমান সমাজ তাহাদের জন্য পথের ধূলায় আসন পাতিয়া রাখিলেও তাহাই তাহাদের যোগ্য স্থান নহে। কারণ সত্য শিক্ষকের সত্যকার শিক্ষাদানের কাঠটিকেও অসাধারণের পর্যায়ে ফেলা চলে।

পরীক্ষায় দুর্নীতি ও তাহার প্রতিকার

ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পরীক্ষাকেন্দ্রে দুর্নীতির অভিযোগ নূতন নয়। পরস্পরের মধ্যে অথবা পুস্তক হইতে নকল করা, পরিদর্শক গার্ডকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা, প্রশ্নপত্র হইতে চুরি করিবার চেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের পরীক্ষায় বহুবার দেখা গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ প্রশ্নপত্রের ব্যাপক চুরির অভিযোগে সমগ্র পরীক্ষাই কয়েকবার বাতিল হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে (ইউ-পি) ১৯০৮ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক ও ইণ্টারমিডিয়েট উভয় পরীক্ষাই বাতিল হয়। ব্রহ্মদেশে ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দুইবার গ্রহণ করিতে হয়। ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দুই বার ম্যাট্রিক পরীক্ষাকে বাতিল করিতে হয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রশ্নপত্র চুরির অভিযোগ ছিল। কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ প্রশ্নপত্র চুরির অভিযোগ তো প্রায়ই আসে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য হইলেও সাধারণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাপারটা গোপন করা হয়। গার্ডকে ভীতি প্রদর্শন তো নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৮ সালে কলিকাতার একজন গার্ড ও ১৯৪১ সালে আলীপুরের পরীক্ষা কেন্দ্রের একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাত্রদিগকে নকল করিতে বাধা দিবার ফলে নিহত হন। প্রশ্নপত্র কঠিন হইয়াছে এই অজুহাতে ২।৩ বৎসর পূর্বে এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণ দল ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এবং এবৎসর ঐ কারণে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী

একমাত্র ছাত্র শুধু ফেল ছাড়িয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু অন্য অন্য ক্ষেত্রে উৎপাত সৃষ্টি করিয়া সমগ্র পরীক্ষাই বাতিল করিল।

এইরূপ কিছুসংখ্যক ছাত্রের আন্দোলন যখন সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, ও যখন আমরা দেখিতেছি যে পরীক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে তখন সমগ্র পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থাটিই আলোচনা হওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অন্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে পরীক্ষা কেবল শিক্ষাদান পদ্ধতির সহায়ক মাত্র নহে, বরং ইহা সমগ্র শিক্ষাদানের নিয়ামক হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ ছাত্রবৃন্দের জ্ঞানের পরীক্ষাগ্রহণ পরিমাপ করিয়া কোন ছাত্রের কোন বিষয়ের কোন অংশে বিশেষ সাহায্যের আবশ্যক তাহা নির্ধারণ করা। তাহার স্থলে পরীক্ষা আজ ছাত্রদের যোগ্যতার পরিমাপ করিতেছে। পাঠ্য-বিষয় ও পাঠ্যতালিকার নিয়ন্ত্রণও পরীক্ষার দ্বারাই হইতেছে। পরীক্ষার প্রণালী সম্বন্ধেও আমরা অন্যান্য দেশ হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা এখনও সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগেই আছি যখন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতিই শিক্ষার আদর্শ বলা হইত, এবং তথ্য সংগ্রহই শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র পদ্ধতি ছিল। এই মুখস্থ-পদ্ধতির পরীক্ষা লওয়াই তখন ছাত্র কতটা শিক্ষা প্রাপ্ত হইল তাহার পরিমাপ ছিল ও আমাদের পরীক্ষাগ্রহণ প্রণালী আজও ঐ নীতিতে পরিচালিত হইতেছে।

এইরূপ শিক্ষাদান বা পরীক্ষাগ্রহণের প্রণালীতে ছাত্রদের স্বাভাবিক রুচি কখনই আসিতে পারে না। যে শিক্ষা তাহাদের বর্তমান সমস্যার মুকাবিলা করিতে পারেনা তাহা গ্রহণ করিতে আগ্রহ আসিবে কি করিয়া? আর যে পরীক্ষাপ্রণালী এই শিক্ষাপদ্ধতির একমাত্র নিয়ামক, সেখানে প্রকারেণ তাহার পাশ হইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। প্রথম প্রচেষ্টা হইল কোনরূপে পাঠ্য বিষয় মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় বেড়া পার হওয়া। স্বাভাবিক রুচি না থাকিলে মুখস্থ কঠিন হইয়া পড়ে, বিশেষ বর্তমানে যুগ রেডিও সিনেমা, ফুটবল প্রভৃতি নানা আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে, মুখস্থ করিবার ও তাহার ফলে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিবার সময়ই বা কোথায়। এই অবস্থায় স্বাভাবিক পরিণতি অন্যায় সুযোগের সন্ধানে।

বিশেষ করিয়া আজকাল এই অন্যায় সুযোগ লাভের চেষ্টা কেন বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই :—

(১) যুদ্ধোত্তর যুগে সর্বত্রই নৈতিক মানদণ্ড শিথিল হইয়াছে। আমাদের দেশে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব পরিস্ফুট। বিদ্যায়তন সমাজের প্রতিবিম্ব মাত্র। সমাজের নৈতিক মান শিথিল হইলে বিদ্যায়তনও তাহার কুপ্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না।

(২) আমাদের দেশে বিদ্যায়তনগুলির ব্যয়ের সামান্য অংশমাত্র সরকারী সাহায্য হইতে নির্বাহ হয়। প্রায় তিন চতুর্থাংশ ব্যয় ছাত্রদের ফী হইতে আসে। বর্তমান যুগে নানা কারণে বিদ্যায়তনগুলির ব্যয়-ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে ও তাহার পূরণের জন্য ছাত্র সংখ্যা বাড়াইয়া ঘাটতি পূরণের চেষ্টা স্বাভাবিক। পরীক্ষার ফল ভাল হইলেই অধিক সংখ্যক ছাত্র পড়িতে আসিবে। পাশের হার বাড়াইবার আগ্রহে অনেক স্থলে দুর্নীতিগুলি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দেখিয়াও দেখিবেন না ইহা মনে করাই স্বাভাবিক ও অনেক স্থলে তাহা যে হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রতি দোষারোপ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, শিক্ষায়তনগুলিকে কম সাহায্য দিয়া পূর্বযুগের রুটিশ সরকার ও বর্তমান জাতীয় সরকার এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন ও ইহার একমাত্র প্রতিকার বিদ্যালয়গুলির সাহায্য

বৃদ্ধি করিয়া ছাত্রবেতনের প্রভাব হইতে মুক্তকরা। কেবল এই একমাত্র উপায়েই বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতার উন্নতি হইবে। যখন আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক, রাশিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষকরা তিন অংশ মাত্র ও ইংলণ্ডে ব্যয় ভারের শতকরা যার অংশ কী হইতে আসে তখন ভারতের শতকরা সত্তর বা পঁচাত্তর ভাগ কী হইতে নির্বাহ করিবার ব্যবস্থা যে কোন জাতীয় সরকারের পক্ষে গভীর কলঙ্কের কথা।

(৩) বিদ্যালয়ে আজকাল ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার ফলে বহু বিদ্যালয়ের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টি প্রদান অসম্ভব। উপেক্ষিত ছাত্রদিগের শিক্ষা ঠিকমত হইতেছে না, অথচ পরীক্ষায় সুফলের প্রতি জোর দেওয়া হইতেছে। কাজেই সাধু উপায়ে সুফলের আশা না থাকিলে ছাত্রেরা যে অসাধু উপায় অবলম্বন করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

৪। পরীক্ষাকেন্দ্রে অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্রের সমাবেশ সন্তোষজনকভাবে পরিদর্শনের অন্তরায় হইতেছে ও ছাত্রদের অসাধু উপায় অবলম্বনে উৎসাহিত করিতেছে।

৫। শিক্ষার ব্যয়ভার অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্কুলে বেতনের অতিরিক্ত আরও অনেক খরচা আছে। পাঠ্যপুস্তকের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান আর্থিক সংকটের যুগে প্রতি-শ্রেণীতে এক এক বার এই ব্যয়ভার বহন করাই অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কেন হইলে দুইবার ব্যয় নির্বাহ আরও কঠিন। যদি সাধু উপায়ে ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তবে অধিক সময়ের জন্যও বর্তমান নৈতিক অবনতির যুগে অনেক অভিভাবক অসাধু উপায় অবলম্বন করা দোষের মনে করেন না। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পরীক্ষকরূপে লেখকের নিকট বহুবার দূর দূরান্তর হইতে এইরূপ অভিভাবক আসিয়াছেন যাঁহাদের উদ্দেশ্যই ছিল নম্বর বাড়াইবার সুপারিশ করা।

৬। উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশই সন্তোষ চাকুরীর সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। পরীক্ষা পাশ চাকুরীপ্রাপ্তির প্রধান মানদণ্ড হওয়ায়, ছাত্র ও অভিভাবকের মধ্যে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে যত শীঘ্র পাশ করিয়া চাকুরীর উমেদারী করা যায় ততই ভাল। যত বিলম্ব হইবে ততই উমেদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই তাড়াতাড়ি পাশ করিবার চেষ্টাও অনেক ছাত্রের দুর্নীতি অবলম্বনের পরিপোষক।

আমাদের শুধু দুর্নীতির কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। যত শীঘ্র সম্ভব সংশোধনের চেষ্টাও করিতে হইবে। অসাধুতা ও দুর্নীতির জন্য যে এষণা ছাত্রদের মধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা অসাধু নাগরিক হইয়া দেশের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে। দেশের নৈতিক সংশোধন বিদ্যালয় হইতেই সুরু করিতে হইবে ও তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে পাঠ্যপ্রণালী, শ্রেণীবিন্যাস ও পরীক্ষাগ্রহণের নীতির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক।

এই সংশোধনকল্পে কয়েকটী অভিভাষ (Suggestion) নিম্নে প্রদত্ত হইল, দেশের শিক্ষা প্রণালীর কর্ণধারবৃন্দ ঐগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিবেন আশা করা যায়:—

(ক) বৎসরান্তে কেবল একটি পরীক্ষার ফলের উপর ছাত্রের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর না করিয়া যদি দৈনিক কাজের উপর অধিক জোর দেওয়া যায় তবে তাহার ফলে একদিকে যেমন ছাত্রেরা প্রাত্যহিক কাজে মনোযোগী হইবে অপরদিকে বিদ্যালয়ের অনুশাসনও ভাল হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনও ইহার উপর জোর দিয়াছেন। সম্ভব হইলে ইহার উপরই সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত হইবে

কিন্তু হঠাৎ এতটা পরিবর্তন হয়ত যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ যেসব ছাত্রসংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কোন কোন বিদ্যালয় নিজেদের মান শিথিল করিতে চাহিবেন।

(খ) বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ব্যয় সরকারী সাহায্য দ্বারা নির্বাহ হইলে (প্রয়োজন হইতে অতিরিক্ত শিক্ষকের বদলাইয়া এই খাতের বন্দোবস্ত করিলে) অনুশাসনের অনেক উন্নতি হইবে। ছাত্রেরা অনেক সময়ে এই কারণে বেপরোয়া হয়। তাহারা জানে তাহাদের অনুগ্রহের উপরই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। শিক্ষকও কঠোর নীতি অবলম্বনে দ্বিধা বোধ করেন। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে ঐ সকল দোষ হইতে আমরা মুক্তি পাইব।

(গ) পাঠ্যতালিকার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে বিভিন্ন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদান করা হয়। এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় না। পক্ষান্তরে বুনিয়াদী অথবা প্রজেক্ট প্রণালীর শিক্ষাদানের একটা মূল বিষয়ের সহিত অন্যান্য বিষয় এমন ভাবে সংযুক্ত যে তাহাদের কোন পৃথক সত্তা থাকে না। মূল সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় ভূগোল, ইতিহাস বা গণিত আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে ও ঐ বিষয়গুলিতে জ্ঞান লাভের সার্থকতা ছাত্রেরা স্বতঃই বুঝিতে পারে। এইরূপ মূল পাঠ্যতালিকার (Core Curriculum) ব্যাপক প্রচলন আবশ্যক।

(ঘ) পরীক্ষা প্রণালীরও পরিবর্তন আবশ্যক। যতদিন স্মৃতিশক্তির উন্নতি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিবে, ততদিনই নকল করা অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। যাহারা নকল করিয়া সফলকাম হইবে তাহারা দুর্নীতিরই সম্মান পাইবে। পরন্তু আমরা যদি স্মৃতিশক্তির উপর অধিক জোর না দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তিকে অধিক প্রাধান্য দিই তবে একদিকে যেমন নকল করিবার প্রশ্ন উঠিবে না, অপরদিকে নকল করিয়া পাশ করিবার আশাও থাকিবে না। বর্তমানে যাহা দুর্নীতির পোষক তাহাই তখন নিরর্থক হইবে। যে স্কুলে রেশন আছে সেখানে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ অপরাধ এবং সে অপরাধ যে করে ও তাহার দ্বারা লাভবান হয় সে-ই দুর্নীতির গুণগান করিয়া বেড়ায়। যেখানে রেশন নাই সেখানে খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহ অপরাধই নহে ও তাহার দ্বারা কোন নীতির অনুশাসন ভঙ্গ হয় না, দুর্নীতির গুণগানও শোভিত হয় না।

ইহার পূর্বে অবশ্য আমাদের দেখিতে হইবে যে বাস্তব ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির উপর এতদিন যে জোর দিয়াছি তাহা ঠিক অথবা ভুল। ভাবিয়া দেখিলে যে কালে হস্তলিখিত পুথির উপর নির্ভর করিতে হইত সেই যুগে গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতেই স্মরণশক্তির উপর এত জোর দিতে হইত। বর্তমান ছাপাখানার যুগে সে আবশ্যকতা দূর হইয়াছে। সকল কথার অর্থ সকলকে সর্বসময়ে আর মনে রাখিতে হয় না, অর্থপুস্তক কাছে থাকিলে ও তাহা ব্যবহার করিবার প্রণালী আয়ত্ত হইলেই আজ আমাদের কাজ চলিতে পারে। আমাদের জীবনে যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তাহাতে কতটা আমরা মনে রাখিতে পারি তাহার মূল্য অধিক নহে, বরং যেটুকু মনে থাকে তাহার মধ্যে কতটা কাজে লাগাইতে পারি, বিচার বা বিশ্লেষণ দ্বারা কতটা সমস্যার সমাধান করিতে পারি তাহাই বড় কথা।

এই নূতন নীতি অনুসরণ করিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করিলে ছাত্রদের পুস্তক হাতে দিয়া ও তাহার সহায়তা লইতে নির্দেশ দিয়াও আমরা বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তির উৎকর্ষের সঠিক পরিমাণ করিতে পারি।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। এখনও যদি আমরা মেকলের (Macauley) যুগের বা তাহারও পূর্বের স্বপ্ন দেখি তবে উন্নতির আশা কোথায়?

চয়ন

(রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে)

আমাদের দেশে যে অশিক্ষা তাকে আমরা বলব না, তাকে বলব বৈদ্যিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না, তার অন্তঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্ত-চলাচল হয় সর্বদেহে।

এখানে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ সহরে। তার সিঁড়িতে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে।

এই শিক্ষাপ্রণালীতে ফলের অংশ বেশি। যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয় সে ভাষায় প্রকাশ করিতে আমাদের অনেকদিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি-পেটা এবং ফুলুপ খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক, ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থ বিদ্যার শিলাবৃষ্টি বর্ষণ হইতে থাকে, তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কি করিয়া? প্রায় বত্রিশবছর বয়স পর্যন্ত মাথাখারির পর ইংরেজি ভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু ততদিন আমাদের মন কী খোরাকে বাঁচিয়াছে? আমরা কি ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কী রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টি-কার্যচর্চার জন্য কী উপকরণ লাভ করিয়াছে?

• • •

যাহা গ্রহণ করি, তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত, প্রকাশ করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চা না থাকাতে যাহা শিখি তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। Key মুখস্থ করিয়া লেখা এবং লেখা চালাইয়া দিতে হয়। যে বয়সে মন অনেকটা পরিমাণে পাকিয়া যায়, সে বয়সের দাঁত পুরা লাভ করে। সে কাঁচা বয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে, তখনি সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে মাঠ শস্যপূর্ণ অনুর্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে, তাহার হিসাব কে রাখে।

• • •

চাকরীর অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার দায়িত্ব যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব, ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না। তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না। এই যে নিবিড় মোহাবৃত নিষ্ক্রিয়তা ও চরিত্রবিকার, বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষাবাহীত কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহাকে নিবারণের কোনো উপায় নাই।

• • •

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে। কোনো কাজেই লাগিবে না। আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে। যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুথির শিক্ষালয় এবং স্বপ্নভবনকে গড়িয়া তোলা দুই ভাগই বিদ্যালয় গ্রহণ করে।

• • • আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পূরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে-কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে। কিন্তু যাহাকে শিখাইবার তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।

• • আমের বুঁড়ির মধ্যে আঁকুড় আঁটিয়া পড়িবার পূর্বে, পিটিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, খোলা আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা যেমন এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পণ্ডিতের চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

• • যাদবদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনি তাহাদিগকে স্নেহ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে এই সুধার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় আঙুলের দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় ঋতুর নানা রসবিচিত্র মিউজিক্যাল ড্রামা তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে থাক।

• • মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশাল ভাবে বিচিত্র ভাবে সুন্দর ভাবে বিরাজমান। কোনো মতে সাড়ে নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি আর সিলিয়া বিদ্যালিকার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না।

• • • আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরভাবশত কোনো শিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি তবু চেষ্টা করিয়া ইচ্ছা করিয়া নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যালয়কে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই? শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদারমধুর অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিদ্যালয়ের অভিপ্রায় ছিল, সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো, মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সহসা কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না, তাহাদিগকে ছাড়া করো।

• • তাই আমি বলিতেছি শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। এই বন আমাদের সজীব মাতৃভাষা এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক।

• • • আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশে ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

• • এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙা গ্রাম ও সাঁওতাল পাড়াগুলির সম্যক পরিচয় যাতে ছেলেরা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে দেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক। নিকটবর্তী পাড়ায় ব্রতী সম্প্রদায় স্থাপন করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চারিদিকের পাড়ার কাজ আমাদের ভালো করে চালাতে হবে। এই ব্রতীকৃত্য শিক্ষা আমাদের অন্য কোনো শিক্ষার চেয়ে কম গুরুতর নয়।

• • আর একটি গুরুতর শিক্ষার বিষয় আছে, সেটি হচ্ছে লোকব্যবহার। মানুষ সামাজিক জীব এইজন্যে যেমন তার সামাজিক নীতি আছে তেমনি সামাজিক রীতিও আছে। সেই রীতি পালনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সুন্দর ও সহজ হয়।

• • মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বীকারের প্রথম ও সাধারণ উপায় হচ্ছে অভিবাদন ও নমস্কার। এ সম্বন্ধে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে তত্ত্ব অভ্যাস পাকা করিয়ে দেওয়া চাই। ছাত্রেরা আপন পরিবারের বাহিরে গুরুজনের পাদগ্রহণ করবে এটা আমি পালনীয় মনে করিনে। কিন্তু নত হয়ে নমস্কার করা তাদের কর্তব্য। আর তাঁরা সম্মুখে এলে উঠে দাঁড়ানো চাই। যেখানে অনেকে সমবেত, সেখানে সকলে মিলে একসঙ্গে নমস্কার শোভন।

• • সকল কাজে সময় পালন করাও এই রীতিপালনেরই অঙ্গ। ক্লাসে, সভায়, উপদেশগৃহে বা ভোজনশালায় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া অন্যদের প্রতি অসম্মান একথা মনে রাখা কর্তব্য। মজলিসে ক্লাসে বা সভায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াও অশোভন।

বাস সম্বন্ধেও শুচিতার রীতি আছে। ঘর ও ঘরের আসবাব ও নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী নোংরা ও কদর্য হতে দেওয়া অনুচিত। এ সম্বন্ধে আমাদের আশ্রমে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ যেন থাকে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

• • দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে মন্দবুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে। প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ কোনো না কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার আসল উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে।

• • যার দেহ শিক্ষিত হয় নি সে বড় বড় পণ্ডিতই হোক্ সংসার-ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন যাপন করতে হয়, সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

'আমাদের লেখা' প্রকাশক শ্রীকিতীশ রায় শান্তিনিকেতন, মূল্য এক টাকা।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা জগতে এক নূতন পরীক্ষা। এই বই প্রকাশ করিয়া শান্তিনিকেতন পুস্তক প্রকাশন সমিতি শিক্ষার মহৎ করিয়াছেন, এজন্য অভিনন্দন জানাই।

এই বইয়ের ছোট ছোট গল্প কবিতা, ছবি ইত্যাদির মধ্য দিয়া শিশুকল্পনা পুষ্ট হইবার অবসর পাইবে। ইহাতে এমন অনেক সুন্দর বিষয় আছে যাহাতে প্রবীণ শিক্ষকদেরও আকর্ষণ হইতে হয়। এই বইএর লেখক লেখিকা অনেকের সঙ্গে আমাদের পাঠকগণের পূর্বেই পরিচয় হইয়াছে। পূর্বাপর রচনার ধারা দেখিয়া তাঁহাদের লেখার অগ্রগতিও লক্ষণীয়।

অধিকাংশ শিশু-শিক্ষালয়ই অনুরূপ পুস্তক প্রকাশের সুযোগ সুবিধা পান না, তাঁহারাও ইহা হইতে উপকৃত হইতে পারিবেন।

বিক্রয়লব্ধ অর্থ শান্তিনিকেতন পুস্তকপ্রকাশ তহবিলে গৃহীত হইবে ও শিশুপাঠ্য পুস্তক-প্রকাশে ব্যয়িত হইবে।

বঙ্গের প্রাচীন কবি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রকাশক শ্রীঅমলকুমার দত্ত, ৯৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯। মূল্য সাধারণ ১৲ একটাকা, বোর্ড বাঁধাই ১৷৷০ দেড়টাকা। ১৯৫৩

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই বইখানিতে বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে লেখক প্রাচীন কবিদের জীবনের সহিত তাঁহাদের লেখার উদ্ধৃতিও দিয়াছেন। আমরা আধাকবি পাঠক এই সকল উদ্ধৃতি পাঠ করিতে উৎসাহিত হইবেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, বিজয়গুপ্ত, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের জীবনী ও তাঁহার রচনার নিদর্শন আছে। লেখক ভারতচন্দ্র রায়, ঈশ্বরগুপ্ত, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতিকে প্রাচীন কবিদের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। ভারতচন্দ্র যুগসন্ধির কবি। আমরা ইহাদিগকে আধুনিক পর্যায়ের কবি বলিয়া গণ্য করি। লেখক ভারতচন্দ্রেরও অনেক পরে কেন আলাওলের নাম ও পরিচয় দিলেন তাহা বুঝিলাম না। মনে হইতেছে কবিতার তালিকা কালানুক্রমিক নহে, অথচ তাহাই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ

বিগত ১১ই মে এক সরকারি ইস্তাহারে জানা গেল যে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ হালদারকে পর্ষদের কর্মপরিচালকের (Administrator) পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা-পর্ষদের কার্যকলাপ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। উপর্যুপরি যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল তাহার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ব্যাপারে। সরকার বিশেষ যত্নসহকারে বিভিন্ন তথ্য বিবেচনার পর এই পর্ষদের পুনর্গঠনই উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই পর্ষদের পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উহাকে বাতিল করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার সাময়িকভাবে সরকারই গ্রহণ করিলেন। যে সমস্ত অনিয়ম ও অব্যবস্থার জন্য এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাদের কয়েকটি হইল :— (১) পরিদর্শকদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া বা কোন রকম পরিদর্শন না করিয়াই বিদ্যালয় সমূহকে অনুমোদন করা ; (২) সাহায্যদানের আইন-কানুন না মানিয়া বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দেওয়া ; (৩) প্রথা সত্ত্বেও সাহায্য না দেওয়ার ফলে বহু বিদ্যালয়ের দুর্ভোগ ; (৪) যোগ্যতার বিচার না করিয়া পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদন ; (৫) স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের যথাযোগ্য বিচার বিশ্লেষণের অভাব ও (৬) প্রশ্নপত্রের গোপনতা রক্ষার ব্যাপারে অসামর্থ্য। সংস্কারের বিবেচনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ও ছাত্রদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা আর চলিতে দেওয়া অনুচিত। সেজন্য একটি অভিজ্ঞতার বলে নিযুক্ত কর্মপরিচালক যথাসম্ভব শীঘ্র এই সব অসুবিধা ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। গভর্নমেণ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের অনুমোদনের ভিত্তিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ভাঙিয়া সাজাইতে

চাহেন। ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পরিষদ ঐ অনুমোদন গ্রহণ করিয়াছেন।

চার বৎসর আগে সরকারি অনুমোদনক্রমে এই মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ গঠিত হয়। ইহার পরিচালনায় কয়েকবার স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষা গৃহীতও হইয়াছে এবং উহার মারফৎ মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজ অনেক ক্ষেত্রে ভাল ভাবেই চলিয়াছে। তবু গলদ দেখা দিল। পর্ষদটি বাতিল হওয়ার অনতিকাল পরেই চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত চন্দের এক উক্তিতে দেখিতেছি, তিনি নিজেও স্বীকার করিতেছেন, এই পর্ষদের মধ্যে নানা ঘাত থাকিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে পরস্পরবিরোধী নানা দলের নানা মতের সঙ্গে করিয়াম সংঘাত অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমাদের দেশে বর্তমানে জাতীয় জীবনের সর্বত্র একটা বিশৃঙ্খলা, কাজে শৈথিল্য, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঈর্ষার ভাব দেখা যাইতেছে। ফলে জাতির কল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলি পদে পদে ব্যাহত প্রাপ্ত হইতেছে। সরকারি আওতায় নূতন পরিচালকের হাতে পর্ষদের কাজ কি ভাবে অগ্রসর হয় তাহার দিকে আমরা চাহিয়া থাকিব। কিন্তু আপনার মান রাখিতে আপনি কৃপাণ না বসিলে বাহির হইতে কেহ কি মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে? জনসাধারণের কল্যাণে উদ্বোধিতচিত্ত শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন, কর্মকুশলী পর্ষদ গঠিত না হইলে এক হাত হইতে অন্য হাতে যাইবে, কিন্তু শিক্ষার ব্যাপার যে আঁধারে সেই আঁধারেই থাকিয়া যাইবে।

শিক্ষকগণের বেতন ও ভাতা

শিক্ষক-ধর্মঘটের পর শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার কি কি পরিবর্তন সাধিত হইল, তাহা জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে দেখিতেছি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও বুনিয়াদী ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকগণের আর্থিক বেতন ও ভাতা সম্বন্ধে দুই রকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৫৪-র এপ্রিল হইতে এবং ১৯৫৫-র জানুয়ারি হইতে দুই দফায় বর্ধিত হারে বেতন দেওয়ার ব্যাপারটি শেষ করা হইবে। পূর্বের ঘোষণায় বর্ধিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শুধু নহে, সঙ্গে সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও কলেজের শিক্ষকগণেরও বর্ধিত হারে বেতন ও ভাতা দেওয়ার কথা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন।

আমরা তখন শুনিয়াছিলাম একটি তদন্ত কমিশন বসিবে, উহা শিক্ষকদের বেতন, শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষার পদ্ধতি ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিবে, এবং গভর্নমেন্ট ঐ কমিশনের সুপারিশগুলি যথাযথভাবে গ্রহণ করিবেন। সেই কমিশন কবে বসিবে, এখনও বসিল না কেন তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ বাতিল হওয়ার যে সমস্যার সৃষ্টি হইল, তাহাতে কর্তৃপক্ষ অভিপ্রেত নূতন বিধিব্যবস্থা সম্প্রতি জানাইয়াছেন। কমিশনের সদস্যেরা বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, তাঁহাদের নির্ধারণ সহানুভূতিপূর্ণ ও বিচারসহ হইবে, আমরা নিশ্চিতভাবে সেই আশা পোষণ করি।

স্কুল ফাইন্যালে ইতিহাসের পরীক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের অবলুপ্তির পর পরিচালক শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় কার্যভার গ্রহণ করিবার অনতিকালের মধ্যে ইতিহাসের পরীক্ষা পুনর্বার লওয়া হইবে ঘোষণা করায় পরীক্ষার্থী, তাহাদের অভিভাবক, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সকলের মধ্যেই এক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। পরিচালক মহাশয়ের পরবর্তী ঘোষণায় উহা বন্ধ করার নির্দেশে সকলেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এইবারকার পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারে যে বিভ্রাট ঘটিয়া গেল তাহার উপর আবার যে নূতন করিয়া এক অশান্তির সৃষ্টি হইল না, ইহাতে আমরা আশ্বস্ত বোধ করিতেছি।

প্রশ্নপত্র কাহার দোষে ছেলেরা পূর্বাহ্নেই জানিতে পারিল, সে বিবেচনা আমরা করিব না। তবে আমাদের মনে হয়, আর কাহার দোষ থাকুক, ছাত্ররা তো এজন্য দায়ী নয়। তাহাদের উপর কেন অতিরিক্ত একটা চাপ দেওয়া? আর যে ছেলে পাশ করার অনুপযুক্ত, সে জানা-প্রশ্ন পাইলেই যে খুব সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না। ভাল ছাত্ররা যেটুকু সুবিধা পাইবে তাহা তো সকলেই সমভাবে পাইবে, কাজেই ক্ষতি তেমন বেশি আর কি হইবে? তাহার জন্য সকলের উপর আবার পরীক্ষার চাপ দেওয়া কখনই সঙ্গত হইত না।

কালিম্পঙে আদিবাসী ও তাহাদের শিক্ষা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরীক্ষা হিসাবে দেশের শিক্ষা বিস্তারের দিকে কিছু উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার নীতি সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য প্রথমে দার্জিলিং জেলাকে মনোনীত করা হইয়াছে। এই জেলা সাধারণ ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারত সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জিলিং জেলার কালিম্পঙে অবস্থিত বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া পার্বত্য অঞ্চল সমূহে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য একটি কার্যক্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কার্যক্রমের ফলে বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়টির উন্নতি হইবে, একটি জুনিয়র কলেজ, ও একটি গ্রন্থাগার খোলা হইবে। পল্লী অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কতকগুলি পাঠকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার স্থাপিত হইবে। কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। বালকবালিকাদের ও বয়স্কদের উভয়ের শিক্ষার উন্নতিমূলক এই পরিকল্পনার জন্য প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, এই ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন, বাকি অংশ রাজ্যসরকার।

অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে শিক্ষা দ্বারা উন্নতির পথে আনিতে পারিলে তবেই তো সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি ঐক্যভাব সঞ্চারিত হইবে। এই ঐক্যবোধ আজ একান্তভাবে প্রয়োজন।

বি. টি পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. টি. পরীক্ষার শিক্ষার ইতিহাসের পরীক্ষায় ঠিক এক বিভ্রাট ঘটিয়া গেল। প্রশ্নপত্র অন্যান্য বারের তুলনায় শক্ত ও কিছু নতুন ধরণের হইয়াছে এই অজুহাতে একদল ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে অসম্মত হয়। অসম্মতি জানাইয়াই শুধু করে না, পরীক্ষা বয়কট করিয়া বসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, যে সব ছাত্রছাত্রী ঐ দিনে পরীক্ষা দেয় নাই তাহাদের এই বৎসর আর বি, টি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। যে ৫৭ জন ছাত্রছাত্রী বাধা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিয়াছে কেবল মাত্র তাহাদের এবং বহরমপুরের ছাত্র ছাত্রীদের এ বৎসরের বি,টি পরীক্ষা গ্রাহ্য হইবে।

ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টি নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আলোচনা করিতেছে, ইহার পরিসমাপ্তি কোথায় গিয়া হইবে জানি না। এখন অবস্থায় বিশেষ কিছু বলাও সঙ্গত নয়। কিন্তু গভীর পরিতাপের সঙ্গে বলিতেই হয়, অন্য পরীক্ষার্থীরা যাহা করে শিক্ষক পরীক্ষার্থীরাও যদি তাহারই অনুকরণ করেন, তবে আর আমাদের আশা করিবার কি থাকে? যাহাদের উপরে ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ভার তাহারাই যদি নিয়ম শৃঙ্খলা না মানিয়া অসংযমের পরিচয় দেন, তবে তাঁহাদের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া চলে কি? আজ তাঁহারা যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে তাহার ফল কি নিজেদেরই টানিতে হইবে না?

পরীক্ষার প্রশ্ন শক্ত হইতে পারে, নিরেবাস বহির্ভূতও হইতে পারে কিন্তু তাহার প্রতিকারের উপায় হিসাবে যে পথ তাঁহারা ধরিয়াছিলেন তাহাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। বিশেষত অতি অশোভন ভাবে অপরের কাজে ব্যাঘাত ঘটাইবার এই যে মনোবৃত্তি ইহা শিক্ষকের পদবীর পক্ষে নিতান্তই অমর্যাদাকর।

গত শিক্ষক ধর্মঘটের প্রসঙ্গে আমরা শিক্ষকের মর্যাদার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। ক্রমশই এই মর্যাদাবোধের অভাব দেখিয়া মনে বেশ অশান্তির ভাব আসিতেছে।

চাকদহ প্রাথমিক শিক্ষাসম্মেলন

নদীয়া জেলায় চাকদহ অতি পুরাতন জায়গা। এখানকার থানার অন্তর্গত প্রাথমিক শিক্ষকদের এক সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতি ছিলেন মহকুমা বিভাগের শিক্ষা অধিকারী শ্রীঅজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী ছিল, এবং প্রদর্শনীতে সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়া শিক্ষকদের কাজেরও কিছু নমুনা ছিল। বিশেষ করিয়া একটি মেয়ের কাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মেয়েটির দুই হাত নাই, কিন্তু তাহার উৎসাহ ও শিল্পীপ্রাণ প্রতিকূল অবস্থায়ও চাপা পড়ে নাই। পা দিয়া সে বেশ ভাল সুতা কাটিয়াছিল।

চাকদহের মত অন্যান্য থানাতেও প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মিলন হইলে শিক্ষার সঙ্গে গ্রামের যোগ ক্রমে দৃঢ় হইবে। অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে তাহাই তো হওয়া চাই। এ বিষয়ে নদীয়া জেলাবাসীর এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

ইস্কুলের অবসর সময়

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

ইস্কুল পরিচালনায় একটা বড় সমস্যা শিক্ষকদের অবসর সময় নিয়ে। শিক্ষকদের অবসর সময় কেন দেওয়া হয় তার কারণ নির্ণয়ে মতভেদ আছে। দুটো মত স্পষ্ট। প্রথম মতটি হচ্ছে ইস্কুলের অবসর ঘণ্টায় শিক্ষকেরা ছেলেদের লেখা খাতাপত্তর দেখবেন। দ্বিতীয় মত শিক্ষকদের ক্লান্তি দূর করবার জন্য অবসরের ব্যবস্থা। গান্ধীজীর ব্যাখ্যায় অবসর বিনোদন তাকেই বলা যায় যখন এক রকমের কাজ থেকে পৃথক, অন্য ধরণের কাজে আমরা লিপ্ত হই। এই হিসাবে খাতাপত্তর দেখার মধ্য দিয়েও শিক্ষকেরা অবসর যাপন করতে পারেন; প্রথম মতটি সমর্থিত হয়।

কিন্তু আমাদের দেশের ইস্কুলের অবস্থাগুলো এমন যে, কোন রকম কাজ ঐ সময়ে না করতে পারলেই যেন ভালো লাগে। অর্থনীতির ব্যাখ্যাটিকে যদি টেনে নিই, তা হলে বলতে পারি, দৈনন্দিন কোন কাজ যখন বৃত্তি-প্রাপ্ত কাজের অঙ্গ হয়, তখন তার প্রত্যেকটি ক্ষণই আমাদের ক্লান্তিকর কাজের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। আপন ইচ্ছা মতো কাজ, যতই কষ্টকর হোক সত্যিই অবসর-যাপনের সুখ আনে। এই হিসেবে খাতাপত্তর দেখার কাজও ক্লান্তিকর। তর্ক বা উপদেশ দিয়ে মানুষের মনের সুখ ফিরিয়ে আনা যায় না। কাজেই খাতাপত্তর দেখার কাজ যে অবসর যাপনের একটা উপায় একথা বললেই সমস্যার সমাধা হবে না। শিক্ষকদের মনের দিকটাও দেখতে হবে।

কিন্তু এ সমস্যার চেয়েও আর একটি কঠিন

সমস্যা হয়ে গেছে। প্রতিদিনই দেখা যায় কোনো শিক্ষককে ঐ অবসরঘণ্টা কেটে নেওয়া হয়। একেই বলে, extra routine. কোনো শিক্ষক ছুটি নিলে এই দুর্ঘটনা ইস্কুলে বেড়ে যায়। কোনো শিক্ষক যদি এক মাসের ছুটি নেন, তবে ওঁর বেতন হয়ত অনেক সময় কাটা যায়, কিন্তু তার বদলে কোন বাড়তি শিক্ষক না নিয়ে উপস্থিত অন্য শিক্ষক-সংখ্যা নিয়েই ওঁর কাজ চালান হয়। এর জন্যে ইস্কুলের পরিচালকসমিতি ওঁদের বাড়তি টাকা দেন না। নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থা অন্যায়। কিন্তু যখন ছুটি-নেওয়া শিক্ষকের বেতন কাটা হয় না তখন শিক্ষকেরা বাড়তি বেতন দাবি করতে পারেন না। কারণ ঐ দোনোয় ভিম দেওয়া মুরগীর কথাটা জড়িয়ে আছে সেখানে। নীতিবাক্য যাই-ই থাকুক, বাড়তি কাজে শিক্ষকের মন মেজাজ যে খারাপ হয়ে পড়ে একথা না মেনে উপায় নেই।

কলকাতার একটা ইস্কুলে দেখেছিলাম এই মন-খারাপের আবহাওয়া। ইস্কুলের বাড়ীটা চার তলা। সিঁড়ি সঙ্কীর্ণ আর ছেলেদের পক্ষে বিপজ্জনক। টিফিন ঘণ্টায় বেরিয়ে তারা যেখানে যা-তা খেয়ে কিংবা মারামারি করে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যায়। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থা করেছেন, বাড়তি কাজ দিয়ে ঐ টিফিন ঘণ্টায় সমস্ত তলাতে ছজন করে শিক্ষককে পাহারায় হাজির করিয়ে রেখে। টিফিন ঘণ্টা কাটা পড়ায়, বলতে বাধা নেই, শিক্ষকদের মানমর্যাদা আর বিবেক কাটা পড়ে গেল। পঞ্চয়-পঞ্চয়, ক্যাচ-ক্যাচ, তারপরই বিরুদ্ধ আন্দোলন।

সত্যি কথা বলতে কি, বাড়তি কাজ করতে হবে মনে করলেই শিক্ষকেরা কেমন যেন নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েন। ফলে, বেগার খাটা কাজে পড়ানো চলে না। ছেলেরা অথবা বকুনি খায়, পাঠ্যবিষয় ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। বাড়তি ক্লাস দিয়ে যদি পড়ানোই না হল তবে বাড়তি ফটিন করে লাভ কি? লাভ আছে, ছেলেরা স্কুলে আর যাই হোক গোলমাল করতে পারে না, শান্ত থাকে। অর্থাৎ, সমস্ত অশান্তি কেন্দ্রীভূত করে শিক্ষকের টেবিলে আনা হয়েছে। এই জন্যেই শিক্ষক নিয়োগ করার সময় পরিচালক-সমিতি সব-খোল-চাবির অনুসন্ধান করেন। কিন্তু সব-খোল-চাবি বেশি ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায় এ কথা তো জানা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এ ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান তো হয়ই না, বরং আরও বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে।

সমাধান করবার পথে আমাদের দু-একটা বিষয় ভেবে নিতে হবে। প্রথম কথা, অবসর সময়ে যাতে শিক্ষকদের সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া যায় সে বিষয় চিন্তা করা। কিংবা, পাঠ্যপুস্তকের আবর্ত থেকে যতখানি নিষ্কৃতি দেওয়া যায়, সেই বিষয় ভেবে দেখা। কোন মানুষই কাজ করতে নারাজী নয়। শুধু কাজের একঘেয়েমিকে কাটাতে চায় সবাই।

বিশ্রামের সময় যদি কাজ দিতেই হয়, তবে একঘেয়েমি কতখানি নষ্ট করা যায় সেই দিকে নজর রাখতে হবে। দ্বিতীয় কথা, এই অবসর ঘণ্টায় কোন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে যাঁরা ক্লাসগুলোর ভার নেবেন তাঁদের যাতে কোন অসুবিধা না ঘটে তা দেখা। ইস্কুলের গ্রন্থাগারকার হেডেও বড় কাজ হবে, ছেলেদের কোন কিছু শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে নিয়ে যাওয়া।

এই ছুটো দিক বজায় রাখতে হলে, ইস্কুলের পরিবেশ প্রথমেই বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে হবে। ইস্কুলের ব্যবস্থা ছেলেদের মনে যাতে রুচির পরিচয় নিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষায়তন মুদিখানার দোকানের চেয়েও বড় বেশি অগোছালো। সরকারী শিক্ষাবিভাগের এই

দিক দিয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে, যেমন নিয়েছিল বিলেতের সরকার। 'শিক্ষা' পুস্তকে শিক্ষাতত্ত্বের এই অমনোযোগের কথা বলেছি। আইন মানুষকে দিনই করবার জন্যে প্রযুক্ত না হয়ে মানুষকে তৈরী করবার জন্যেই বিনিযুক্ত হওয়া উচিত।

যদিও কটির পরিবর্তে আমরা শিক্ষকেরা পাথর পাচ্ছি, তবু একটা কথা সত্য, আমরা যদি সত্যিকারের শিল্পী হই তবে ঐ পাথর কেটেই মন্দির মন্দিরেও আমরা কিছু একটা গড়ে তোল। শিক্ষাতত্ত্বের এই রূপ সরকার না বদলালেও আমরা আমাদের সামর্থ্যের ভেতরে থেকেই এই বিষয়ে কিছু কাজ করতে পারি, সে বিষয়ে একটু ইঙ্গিত দেওয়া যাক।

ধরা যাক, কোন একজন শিক্ষক অনুপস্থিত হলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানের ক্লাসগুলো তাঁরা যাচ্ছে। অথচ্ছি একই ঘণ্টায় সমস্ত ক্লাস তাঁকা যাচ্ছেনা। এখন, আমাদের ইস্কুলে যদি বড় একটা (কিছু বড়) হলঘরের মতো থাকে, তবে ঐ ক্লাসের ছাত্রদের সেখানে পাঠাতে পারি। কিন্তু সেখানে গিয়ে করবে কি? এইখানেই আমাদের শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের সুযোগ রয়েছে। এইখানেই 'নতুন পদ্ধতির' অবসর রয়েছে। এই হলঘরে, নতুন পদ্ধতিতে ইতিহাস পড়ানোর মতো ব্যবস্থা থাকবে। সময়-রেখা (শিল্প সমেত), মানচিত্র, ছোট ছোট জীবনী, যুগের সমাজ তত্ত্বের দিক, নতুন চলচ্চিত্র, সাময়িক পত্রিকা, গুরু প্রবন্ধের সহজ-সারাংশ, নতুন-নতুন খবরের টুকরো, শিল্প-জগতের কিছু নিদর্শন প্রভৃতি এখানে থাকবে। ভূগোলের আসবাব-পত্রও এমনি থাকবে, তা ছাড়া আছে সাহিত্যের দিক। ঐ সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিক। এইখানে ছেলেরা নিজেরা কাজ করতে শিখবে। ইতিহাস, ভূগোল সাহিত্যের বিষয়-বস্তু নিজেরা সংগ্রহ করে পাঠ্য বিষয়ের প্রবন্ধ লিখবে, উপাদান সংগ্রহ করবে। ছোটদের জন্যে থাকবে শব্দ-খেলা, মেকানো, আরও শিক্ষা-মূলক খেলা।

এসব করতে হলে কিন্তু হলঘরটি সুন্দর আর আরামপ্রদ হওয়া চাই। ছাত্রদের বয়স-মাপ অনুপাতে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা থাকবে, বেঞ্চ নয়। নয়নরঞ্জন-সম্মত অন্যান্য ব্যবস্থাও থাকবে। এক একটা বড় টেবিলকে ঘিরে যদি দশটি ছাত্র থাকে, তবে দশটি টেবিলের ব্যবস্থা করলে অনেক ছাত্রের সঙ্কুলান হয়।

প্রথম প্রথম শিক্ষককে এই দিক পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু পরবর্তী কালে ছেলেরা আপনা থেকেই এ বিষয়ে উৎসুক হয়ে উঠবে। সে সময় একা গ্রন্থাগারিকই সব ব্যবস্থা করতে পারেন। আর, গ্রন্থাগার যখন রয়েছে তখন একজন শিক্ষকও এখানে বসে থাকতে আপত্তি বোধ করবেন না, এ কখনও সম্ভব নয়। এমনি করে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা ইস্কুলের এই সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে পারি। আমেরিকাতে এই রকম প্লেটুন-প্রথা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাদের ঐ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটিও আছে। সেই ত্রুটিটা বাদ দিয়ে না গেলে তার ভালো দিকটা তো নিতে পারি।

অনেক ইস্কুলে শিক্ষকদের বেতন নিয়মিত দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু রিজার্ভ ফণ্ডে বহু টাকা আছে। সেই টাকা থেকে কিছু খরচ করে এমন হলঘরের ব্যবস্থা করা যায়। তবে হলঘর যেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়। অনেকে হয়ত বেশি উৎসাহী হয়ে ওখানেই সভা-সমিতি বা Assembly Hall এর কাজ নির্বাহ করতে গেলেন। এমন হাট বাজারের ঘর ওটি হবে না। হলঘর হওয়ার পর বছর পাঁচেক পেটেখুটে তার অন্যান্য ব্যবস্থা এমনভাবে করা যায় যে, পরবর্তীকালে খুব সামান্য সংস্কার করলেই কাজ বেশ চলে যাবে।

বৈজ্ঞানিক বা নতুন পদ্ধতির অনেক ভালো দিক এই ব্যবস্থায় অনুসৃত হবে সে তো আমরা অনুমানই করতে পারছি। দ্বিতীয় আর একটা ভালো দিক দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থাগারের বই ব্যবহার করতে ছেলেরা বেশ শিখে নেবে।

এই সামান্য পরিবর্তনটুকু ইস্কুলে কেন হবে না বুঝতে পারি না। তবে এটুকু বেশ শুনতে পাচ্ছি —'আরে রাখুন, রাখুন মশাই, ইস্কুলে কাজ করা অত সোজা নয়, কত ঝঞ্ঝাট, কত—।'

তবু বিচক্ষণ প্রধান শিক্ষক আর পরিচালক-গোষ্ঠীর জন্যে এই লেখাটা লিখলাম। জগতে কিছুই তো হারায় না।

নিকারাগুয়া

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

আজ নিকারাগুয়ার শিক্ষাব্যবস্থার কথা লিখিতেছি। মধ্য আমেরিকার এই দেশ একদা স্পেনের অধীন ছিল, এখন স্বাধীন। পানামা খাল এই নিকারাগুয়ার মধ্য দিয়া যাইবে, এই ব্যবস্থা প্রথমে হইয়াছিল। কিন্তু সে বহুর ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, অনেক বাড়ীঘর নষ্ট হইয়া যায়। সেসটা পর্বতবহুল, পার্বত্য অঞ্চল দিয়া খাল কাটা হইলে ভবিষ্যতে ভূমিকম্পে খালের ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট মহাশয়ের চেষ্টায় পানামার মধ্য দিয়া খাল কাটা হইবে ইহাই ঠিক হইল। অবশ্য সে জন্য অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। পানামা ছিল তখন ভেনেজুলা রাজ্যের মধ্যে। খাল কাটা লইয়া ভেনেজুলা ও কথাকাটি আরম্ভ করিল। তখন পানামা রুজভেল্ট মহাশয়ের পরোক্ষ সাহায্য পাইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বাধীন হইল। তাঁহারা খুব খাল কাটিতে সহজেই অনুমতি দিল।

প্রজাতান্ত্রিক দেশ। আয়তন ১৪৭,০০০ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা পনের লক্ষ। রপ্তানি দ্রব্য কফি, সোনা, তুলা ও কাঠ।

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, যদিও কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে বেতন দিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হয় ক্যাথলিক না হয় প্রোটেস্টান্ট গীর্জার অধীনে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছয়টি শ্রেণী। ভাষা স্প্যানিশ। কিন্তারগার্টেন শিক্ষা চালু আছে। স্প্যানিশ ভাষায়ও ঐ একই নাম। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে Escuela Elemental বলে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে Escuela Secundaria O Intermediaria বলে; কিন্তু কোনও শ্রেণী নাই। পাঁচ বছর পড়িতে হয়। নির্দিষ্ট স্থান থাকে। গভর্নমেন্ট কোর্স ঠিক করিয়া দেয়। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকই যে পড়াইবেন এমন কোনও কথা নাই। প্রাথমিক শিক্ষা সকাল ৮টা হইতে ৪টা পর্যন্ত বসে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান হয় অঙ্ক, স্প্যানিশ, ড্রেস, প্রাথমিক পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র, ব্যায়াম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। প্রধান শিক্ষককে ডিরেক্টার বলে। পরিদর্শক মাঝে মাঝে গিয়া দেখেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যা শেখান হইতেছে। একটু বিস্মিতও হন। তবুও

ও চমৎকার সাহায্যে যে পদার্থ বিদ্যা শেখান যাইতে পারে চার পাঁচ বছর আগে "ইণ্ডিয়ান" পত্রিকায় সে বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। আজকালকার নামধর্ম্ম বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সেই কথা হয়ত চমক দিবে। প্রত্যেকেই শিক্ষার আদর্শ হইতে চ্যুত হইতেছেন। পরিদর্শক মহাশয়গণ যদি ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করিয়া শিক্ষকদিগকে শিখাইয়া লেন তবে ভাল হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি কোর্স নয় মাসের জন্য পড়ান হইয়া থাকে। কোনও কোনও কোর্স সপ্তাহে ছয় ঘণ্টা পড়ান হয়।

প্রথম বৎসরের কোর্স

১। পাটিগণিত ২। স্যানিশ নং এক ৩। পৃথিবীর ইতিহাস নং এক ৪। পৃথিবীর ভূগোল নং এক ৫। বেখাঙ্কন নং এক ৬। ইংরেজী নং এক ৭। Ethics & Social Relations ৮। Geology & Mineralogy ৯। ব্যায়াম নং এক ১০। সঙ্গীত নং এক

দ্বিতীয় বৎসর

১১। বীজগণিত ১২। বেখাঙ্কন নং দুই ১৩। ইংরেজী নং দুই ১৪। সঙ্গীত নং দুই ১৫। উদ্ভিদ বিদ্যা ১৬। পৃথিবীর ভূগোল নং দুই ১৭। স্যানিশ নং দুই ১৮। ব্যায়াম নং দুই ১৯। পৌরশাস্ত্র ২০। ব্রিটানিয়ার ইতিহাস

তৃতীয় বৎসর

২১। ইংরেজী নং তিন ২২। পৃথিবীর ইতিহাস ২৩। Physiology & Hygiene ২৪। Plane Geometry & Space Geometry ২৫। প্রাথমিক স্যানিশ সাহিত্য।

চতুর্থ বৎসর

২৬। মধ্য আমেরিকার ভূগোল ও ইতিহাস ২৭। দর্শন নং এক ২৮। সাহিত্যের ইতিহাস ২৯। ফরাসী ভাষা নং এক ৩০। Inorganic Chemistry ৩১। Trigonometry ৩২। পদার্থ বিদ্যা নং এক

পঞ্চম বৎসর

৩৩। দর্শন নং দুই ৩৪। সমাজ বিজ্ঞান ৩৫। Cosmography ৩৬। পদার্থ বিদ্যা নং দুই ৩৭। Organic Chemistry ৩৮। ফরাসী ভাষা নং দুই ৩৯। পশু চিকিৎসা শাস্ত্র ও কৃষি বিজ্ঞান।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককেও ডিরেক্টার বলে। স্কুল কখন বসিবে এবং কখন ছুটি হইবে তাহা তিনিই ঠিক করেন। প্রতি ঘণ্টা ষাট মিনিট ধরিয়া চলে। নম্বর দিবার প্রথা নাই, গ্রেড দেওয়া হয়। কোনও প্রশ্নে ৯০ নম্বর পাইলে "A" ৮০ পাইলে "B" ৭০ পাইলে "C" ও ৬০ পাইলে কেন করা গ্রেড পাইতে হয়। স্কুলেই সব শেষ পরীক্ষা লওয়া হয়।

যে সব ছাত্র ফেল করে, চার মাস, ছয় মাস, বা নয় মাস অন্তর পুনরায় সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিবার সুযোগ পায়। অবশ্য তাহারা নিয়ম মাফিক ক্লাসে উঠিয়া নিয়মিত পড়াশুনা করিতে পারে। এই নিয়মিত পড়াশুনা করিবার সময় যদি ফেল করা বিষয়ে পাশ করে তবে ভালই; নতুবা তাহাকে উপরের ক্লাসে উঠিয়াও নীচে নামিয়া যাইতে হইবে। শিক্ষক যে ছাত্রকে ক্লাসে পড়াইবেন, টাকা লইয়া গৃহশিক্ষক রূপে বাহিরে তাহাকে পড়াইতে পারিবেন না।

সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ দিন স্কুল বসে। দুইটি বড় ছুটি থাকে। স্বাধীনতা উৎসবের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে পনের দিন ও বড়দিনের জন্য চৌদ্দ দিন এবং অন্যান্য ছোট খাট উৎসবে পাঁচ ছয় দিন স্কুল ছুটি থাকে। জুন হইতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইস্কুলের বৎসর বলে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাশ করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা সাত বছর, আইন পাঁচ বছর, ধর্মবিদ্যা পাঁচ বছর, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাঁচ বছর পড়িয়া ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়া যায়। দর্শন ও সাহিত্যকে

Humanities বলা হয়। দর্শনের মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সব কিছুই পড়ে; তিন বছর পড়িয়া ডিপ্লোমা এবং চার বছর পড়িয়া Licenciado উপাধি পাওয়া যায়। Licenciado উপাধিধারী ও উকীলগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে Humanities পড়াইয়া থাকেন। নিকারাগুয়াতে উকীলদেরই পোয়া বারো। কতকটা আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই মত। আমার এক নামকরা অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি প্রতিকারযোগ্য অসুবিধা দূর করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তিনি বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "কি করব; হাইকোর্টের রাজত্ব যে।" অবশ্য পরিচালনা ব্যাপারেই উকীল ব্যারিষ্টারদের হাতের মধ্যে; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উকীল শিক্ষক খুব কমই আছেন। সে বিষয়ে নিকারাগুয়ার উকীল শিক্ষকগণ ভাগ্যবান। আমার সিনিয়র আমার "ব্রীফলেস" উকীল ভাবে সে দেশে থাকিলে হয়ত তাহার একটা "হিল্লে" হইত।

নিকারাগুয়াতে মোট চারটি নর্মাল স্কুল আছে; একটি মেয়েদের জন্য এবং একটির উপর সরকারী কর্তৃত্ব নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া নর্মাল স্কুলে পাঁচ বছর পড়িয়া পাকা হইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা যায়। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ট্রেনিং প্রাপ্ত।

উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, লাইসেন্স প্রাপ্ত, এবং যাহারা দুই বা তিন বছর কলেজে পাঠ শেষ করিয়াছেন তাহারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন।

দেশে একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। শতকরা সত্তর জন অশিক্ষিত। পনেরটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা পনেরজন শ্বেতকায়, আশীজন বর্ণসঙ্কর (আদিম অধিবাসী ও শ্বেতকায়ের সংমিশ্রণ) ও শতকরা পাঁচজন নিগ্রো।

নিকারাগুয়ার এই সব তথ্য নিউইয়র্কে ইন্টার ন্যাশনাল হাউস-এ থাকিবার সময় সেই দেশের এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তিনি কিছুদিন ওকালতী করিয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। তাঁহার ঠিকানা:

Dr. Carlos Jose Gonzalez,
Calle Ruben Dario 18
Leon, Nicaragua
Central America.

বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা জানা ও তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগাইয়া তুলিবে এই বিশ্বাসে বিভিন্ন দেশের কথা লিখিয়া যাইতেছি।

আমেরিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা লিখিলাম। কানাডা এবং আমেরিকা যুক্ত রাজ্য দেশ দুটি যদি না ধরা যায় তবে বলা যায় যে মহাদেশে (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) আদিম অধিবাসীর সংখ্যা ইউরোপিয়ানদের চাইতে অনেক গুণ বেশি। এই আদিম অধিবাসী (Red Indian) কোথাও বা মিশ্র রক্তের, কোথাও বা অমিশ্র রক্তের। প্রত্যেক দেশেই ইউরোপিয়ানদের বংশধর আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অল্প বিস্তর আদিম অধিবাসীর রক্ত আছে। এমন কি, কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জায়গায় আদিম অধিবাসীরা ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে এখন আস্তে আস্তে মিশিয়া যাইতেছে। তাহাদের রং কালো নয়। সুতরাং, নিগ্রোদের মত অত অপছন্দের জীব নয়। এমন কি, এই আফ্রিকা বিদ্বেষের দিনেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোথাও কোথাও নিগ্রো ও গোরার বিবাহ হয়। এ বিষয়ে উত্তরাংশ আদর্শ স্থল। গত গরমকালে নিউইয়র্ক সহরে একাধিক নিগ্রো পুরুষ ও গোরা স্ত্রীলোক হাত ধরাধরি করিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

মেক্সিকো হইতে চিলি পর্যন্ত সর্বত্র আদিম অধিবাসীদের অবস্থা শোচনীয়। যাহাদের দেহে বিশুদ্ধ ইউরোপিয়ান রক্ত আছে বা যে সব শ্বেতকায় অল্প মাত্রায় বর্ণসঙ্কর, তাহারা অধিকাংশ দক্ষিণ-আমেরিকার উপর প্রভুত্ব করে, যদিও তাহারা সকলেই রোমান ক্যাথলিক এবং প্রায় সকলেই গণতন্ত্রের ভক্ত। কোনও কোনও দেশ প্রটেস্টাণ্টদের উপর অত্যাচার করিতে এখনও ছাড়ে না। সংখ্যা-গুরুদের উপর সংখ্যালঘুদের এই রাজনৈতিক প্রভুত্ব যে সব দেশে আছে, তাহার মধ্যে আফ্রিকা এশিয়াও পড়ে, সে সব অঞ্চলকে অধ্যাপক আর্থার টয়েনবী "Social Asia" বলেন। এই Social Asia-র উন্নতি না হইলে জগতে শান্তি আসিবে না, সমাজ কল্যাণময় হইবে না। রাশিয়ার অধিকতর প্রচেষ্টায় ও প্রসারে এই Social Asia-র সর্বত্র সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এই আশঙ্কা অধ্যাপক টয়েনবী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, পণ্ডিতদের মধ্যে একটা মত আছে, আমেরিকার আদিম অধিবাসী কোন সুদূর প্রাচীনকালে বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিল। এ বিষয়ে বহু গবেষণা হইয়াছে। আমাদের দেশের কেদারনাথ চন্দনলাল মহাশয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া "Hindu America" নামে একটা বই কিছুকাল আগে লিখিয়াছিলেন। বইটি পড়িলে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যাইবে।

বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মীদের কথা

শ্রীরামচরণ উপাধ্যায়

[ইনি বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিচালনার প্রথম হইতে তিনটি পদের অধিকারী। ইহার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রণিধানযোগ্য বলিয়া অনুরোধ করিয়া এখানে করিলাম। স]

১৯৩৮ সনে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার তত্ত্বাবধানে বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষার আরম্ভ হয়। সাধারণ ভাবে ইহা শিক্ষাবিভাগেরই অন্তর্গত। কিন্তু বুনিয়াদী পদ্ধতির বিচারধারা ও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাইবে, এইজন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ও বিশেষজ্ঞদের কয়েক জনকে লইয়া একটি বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষা, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের তত্ত্বাবধান, শ্রেণীবিভাগ আর উপযুক্ত সময়ে শিক্ষক, ছাত্র ও তত্ত্বাবধায়কদের সহযোগ সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে কতখানি উন্নতি হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা, এই হইল বোর্ডের কাজ। পদাধিকারবলে শিক্ষামন্ত্রী এই বোর্ডের অধ্যক্ষ, আবার লোক-শিক্ষা নির্দেশক পদাধিকারে তিনি এই বোর্ডের সদস্য। অন্যান্য যাঁহারা সদস্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী, ভারতীয় সংস্কৃতির আবশ্যকতায় বিশ্বাসী এবং বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী। বোর্ডের সেক্রেটারিই (মন্ত্রী) এই প্রথম আট বৎসরের প্রধান কর্মকর্তা বা সঞ্চালক ছিলেন। একশ সত্তরটি মাইনরের মধ্যে যে ৩০টি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ও শিক্ষকভবন খোলা হইয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচালনা ইনি নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহার অধীনে তিন জন অধিকারী, একজন ব্যবস্থাপক আর দুইজন

পরিদর্শক আছেন, যাঁহারা নিকটে থাকিয়া শাসন ও শিক্ষা উভয় দিক হইতেই এই সংস্থাগুলির প্রয়োগ ও পদ্ধতির চালনা করেন। বৎসরে একবার পরীক্ষার জন্য বোর্ড নিযুক্ত হয়। এই বোর্ড কম পক্ষে এক সপ্তাহ বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে ও অধিকাংশ প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে বাস করিয়া নয়ী তালিমের বিভিন্ন কর্মের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, বিচার বিতর্ক দ্বারা তাহাদের যুক্তি খণ্ডন ও নিজেদের যুক্তি পরিষ্কার করেন, তাহাদের সফলতা ও বিফলতার বিষয় অবগত হন, এবং অসুবিধাগুলি দূর করিয়া কি ভাবে অগ্রগতি আনা যায় সে বিষয়ে শিক্ষক ও কর্মী উভয়কে যুক্তি পরামর্শ দেন। তখন শাসক কর্তৃপক্ষ এই বোর্ডকে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপারে বিশিষ্ট পরামর্শদাতারূপে দেখিতেন এবং এই বোর্ডের সুপারিশ অনতিবিলম্বে কাজে পরিণত করিতেন।

১৯৩৯এর শেষে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগের পর বিহার গভর্ণমেন্টের শিক্ষা-পরামর্শক মণ্ডলও এই বোর্ডকে কায়েম রাখেন ও শিক্ষামন্ত্রীর স্থানে গভর্ণমেন্টের শিক্ষা-উপদেষ্টা বেসিক এডুকেশন বোর্ডের অধ্যক্ষ হইলেন। Cousins নামে একজন ইংরেজ পরামর্শদাতা বেসিক এডুকেশন বোর্ডের অধ্যক্ষ বলিয়া নয়ী তালিমের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করিয়া তুলিলেন। বোর্ডের বৈঠকে ইহার বিভিন্ন সমস্যা শুধু মহাত্মাজির সঙ্গে বিচার করিয়াই তিনি কাজ হইলেন না, মাঝে মাঝে গিয়া কয়েকদিন টানা ঐ সব বিদ্যালয়ে থাকিতেন, অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ নিজের চোখে দেখিতেন, কিসে ভাল হয় সেই শিক্ষা দিতেন এবং কর্মীদের উৎসাহিত করিতেন। ফলে বিহারের নয়ী তালিমের নাম যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল আর যখন উড়িষ্যা সরকার নয়ী তালিমের প্রচলন স্থগিত করিয়া দিলেন, তখন তাহার কাছে শুধু সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, ভারতীয় বিদেশী সরকারও নিন্দা করিল এবং নিন্দা করিবার সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যা সরকারের সম্মুখে বিহার সরকারের প্রয়োগ দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইল। যখন বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক সরকারও তাহার পর নিজ নিজ প্রদেশে ইহা বন্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন ভারত সরকার তাহাদের পরামর্শ দিলেন: বিহার সরকারের অভিজ্ঞতা দেখিয়া কাজ কর; এবং বিহারের তখনকার লোকশিক্ষা-নির্দেশক বোম্বাই সরকারের নিমন্ত্রণে বোম্বাই গেলেন এবং মধ্যপ্রদেশের এক উচ্চ পদাধিকারীকে বিহারে পাঠানো হইল। স্বয়ং ভারত সরকারের শিক্ষা-পরামর্শদাতা মিঃ সার্জেন্ট এবং তাঁহার নিজস্ব সচিবদ্বয়ও বেসিক স্কুলগুলি বেড়াইয়া আসিলেন এবং ভারতের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-বিকাশ-পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে মুখ্য স্থান দিলেন। বিহার প্রদেশের যুদ্ধোত্তর বিকাশ-সঙ্ঘের শিক্ষা-বিভাগ পুনরুজ্জীবন সমিতি সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট স্বীকার করিয়া লইল এবং বিহারের প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শে প্রস্তুত করা হইল, আর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও ৪০ বছরের এক শিক্ষা-বিকাশ-কার্যক্রম প্রস্তুত হইল। তাহাতে বিদ্যালয়ে পড়িবার বয়সের শিশুদের চতুর্থাংশ বিশুদ্ধ বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিবে আর তিন-চতুর্থাংশের জন্য প্রাইমারি মিডল্ স্কুলগুলি এমন উন্নত করা হইবে যে, বুনিয়াদী স্কুলে পরিণতি না করিলেও অল্প সময়ে অধিক কাজ পাওয়া যাইবে।

১৯৪৬ সালে বিহারে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডল পুনরায় স্থাপিত হইল, আর ১৯৪৭ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় শাসনও রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে আসিল। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-সচিব ও লোকশিক্ষা নির্দেশকদের দিল্লীতে একসভায় ঘোষণা করিলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের গতি সার্জেন্ট শিক্ষা পরিকল্পনা হইতে অধিক দ্রুত করা হইবে। বিহারের বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীদের

হৃদয়ে বড় বড় আশা জাগিল। রাজ্য সরকারের কাছে হাজার হাজার একর জমি আর লক্ষলক্ষ টাকার উপকরণ ও শ্রম এই শিক্ষার প্রসারের জন্য আসিয়া জুটিল। সতের বৃদ্ধির পরিকল্পনাও তৈয়ার করা হইল। বুনিয়াদী শিক্ষালয় হইতে যে সব ছাত্র বাহির হইয়া আসিতে লাগিল সেই সকল ছাত্রের জন্য উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল। আর, যেদিন ঐসব বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত হইবে তখন কি উপায়ে উহাতে শিক্ষিত ছাত্র নিজের নিজের প্রবৃত্তিধারা লক্ষ পরিকল্পনা-অনুরূপ বিভিন্ন কর্মে এবং উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা তাহার সমান বহুমুখী শিক্ষা পাইতে পারিবে তাহারও চিত্র অঙ্কিত রহিল। দিন যায়, আর্থিক অনটন ও নানাপ্রকার অসুবিধার কাহিনী আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল আর নঈ তালিমের প্রসারকে ঐ বৎসর পর্যন্ত যতখানি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত আর্থিক অসুবিধার জন্য ১৯৪৯-৫০ এর পরে প্রগতি দুই তিন বৎসরের জন্য বন্ধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৯-৫০ এ স্বীকৃত ১৯৫৩ সনের সীমা পর্যন্ত গৃহীত পরিকল্পনার জন্য কিছু আর্থিক ও শাসন-নিয়ম স্বীকার করা হইল। সেই অনুসারে এখন পর্যন্ত বিহারে বুনিয়াদী সংস্থাগুলির ব্যবস্থা চলিয়া যাইতেছে।

এইভাবে দেখা যায় যে, ১৯০৯ হইতে ১৯৪৯ পর্যন্ত বিহারে নঈ তালিমের প্রথম অবস্থায় তাহার বিভিন্ন অঙ্গের সেবা ও পুষ্টির জন্য একাগ্র চিত্তে সম্পূর্ণ সময় দিতে পারে এমন ধরণের অনেক কর্মী পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে একদিকে প্রতিষ্ঠানগুলির বিস্তার ও প্রসার হইল, অন্যদিকে এই সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা, সেবা, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরাপুরি সময় দিতে পারেন এই ধরণের শ্রদ্ধাবান্, বিশেষ ভাবে শিক্ষিত, অনুচর্যা ও অধিকারী কর্মীর সংখ্যা প্রায় নগণ্য হইয়া পড়িল বলিলেও চলে। এই সময়ে ব্যবস্থাপরিবর্তনের ফলে শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩; বুনিয়াদী শিক্ষা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০০; উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছিল একটি। ঐ বৎসরই প্রসারণ নীতি গ্রহণের পর বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়াইল—বুনিয়াদী বিদ্যালয় ৫৩৫; উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় ১৫; প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ১৯। শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ মিলাইয়া এক সর্বোদয় মহাবিদ্যালয় এবং একটি পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষালয়। এই বন্যার সঙ্গে সঙ্গে নঈ তালিম প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ শিক্ষা-বিভাগের ব্যবস্থায় লীন হইয়া গেল। বেসিক এডুকেশন্ বোর্ডের সেক্রেটারি প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার উপনির্দেশক হইলেন। তাঁহার সহ-সচিব পদ লোপ পাইল। বুনিয়াদী সাহিত্যের সম্পাদিকারী সাধারণ শিক্ষা বিভাগীয় টেক্সট্-বুক্-কমিটির সেক্রেটারি হইলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভার বিভাগীয় পরিদর্শক, তাঁহার অধীন জেলা-পরিদর্শক এবং তাঁহারও অধীন অবর-পরিদর্শকের উপর দেওয়া হইল। বিভাগীয় পরিদর্শকের সাহায্যের জন্য বুনিয়াদী ও সামাজিক শিক্ষার অধ্যক্ষ দেওয়া হইল। প্রত্যেক জেলায় এক একটি পরিষদ স্থাপিত হইল। তাহার অধ্যক্ষ হইলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং সেক্রেটারি হইলেন জেলার পরিদর্শক। সমস্ত হইলে নঈ তালিমে নিষ্ঠাবান, অন্তত পক্ষে উহার জ্ঞান রাখেন এমন হইতে হইবে, এইরূপ কোন বাধ্যতামূলক নিয়ম রহিল না।

বিভাগীয় বুনিয়াদী ও সামাজিক শিক্ষার অধ্যক্ষ তাঁহার পদাধিকার বলে অবশ্যই প্রত্যেক জিলা পরিষদের সদস্য থাকিবেন। কিন্তু পরিষদের অধিবেশন ম্যাজিস্ট্রেটের সুবিধা অনুসারে হয় আর অধ্যক্ষ পরিষদের অধিবেশনে অবশ্যই সশরীরে উপস্থিত থাকিবেন এরূপ সম্ভব নহে। বিদ্যালয়ের বাড়ি, ছাত্রের

কাজ শিখিবার তাহার উপকরণাদি সমস্ত যেমন পরিদর্শকের হাতে সমর্পণ করা হইল। এই সমস্ত নূতন বিদ্যালয়ের মধ্যে শতকরা ৫০টি সপ্তাহপ্রতিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইল। উহাদের সকল শিক্ষককেই এক বৎসরের জন্য অস্থায়ী সরকারী চাকুরিতে নয়ী তালিম বিদ্যালয়ে নেওয়া হইল। আশা করা গিয়াছিল যে, তাহারা এক বৎসরের মধ্যেই নিজেরা পড়িয়া, দেখিয়া ও অভ্যাস করিয়া নিজেদের নয়ী তালিমের বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিবেন—সঙ্ঘী ও পরিদর্শকেরা তাঁহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে সত্য সত্য কাজ করিলে এবং অন্যের সাহায্য লইয়া কাজ করিলে বাঞ্ছিত ফল না পাওয়া যাইত। আজকার বিহার ও ভারতের নয়ী তালিমের প্রধান কর্মীদের মধ্যে প্রায় সকলকেই নিজেদের চেষ্টাতেই উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নয়ী তালিমের পথে নিজেদের চেষ্টা (অর্থাৎ অভ্যাস, লেখাপড়া ও সৎসঙ্গ) করিয়া চলিতে হইয়াছে। যদি ১৯৪৯-৫০ এ শাসন কর্তৃপক্ষ এমন আশা করিয়াছিলেন যে সপ্তাহপ্রতিক স্কুলের শিক্ষক ও পরিদর্শকেরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলে মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের উপরে বিশ্বাস রাখিয়াই ঐরূপ করিয়াছিলেন। যদি কয়েকজন লোকে এই বিশ্বাসের মর্যাদা না রক্ষা করিয়া থাকেন অথবা কেহ কেহ আলিস্য বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাহাকে দোষ দিব? শাসনের দিক হইতে এই অবস্থায় উচিত ছিল ক্রমে ক্রমে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সীমাবদ্ধভাবে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়া—তাহা হইতেছিল। আবার এক খুব বড় শিক্ষাবিষয়ক প্রসারের কার্যক্রম সঞ্চালনের পূর্বে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অনুভবশূন্য অথবা অল্পানুভবী এবং অপ্রত্যয়ান ব্যক্তির হাতে দিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে লাভের চাইতে লোকসানই বেশি হয়। পূজ্য বিনোবাজীর কথায় ইহাতে কম জায়গায় শির পড়িতে যান হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বাড়ি ঘর, উপাদান উপকরণের পরখ পড়িয়া থাকিলেও তাওয়াই থাকিল; আর, স্থানীয় লোকের দেওয়া জিনিসপত্র ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভোজন আবশ্যকের জন্য যে জমি দেওয়া হইয়াছিল তাহা চেষ্টা ও উপাদানের অভাবে পড়িয়া রহিল। লোকেদের মধ্যে বৈরাগ্য বাড়িয়া চলিবে, ইহা ত স্বাভাবিক; যোগ্য কি অযোগ্য, কর্তব্যনিষ্ঠ আর দায়িত্বজ্ঞানহীন, পরীক্ষা না করিলে কর্তব্যচ্যুতির পথই প্রশস্ত হইয়া যায়। যাঁহারা স্বাবলম্বন কখনো নিজের জীবনে লক্ষ্য করেন নাই তাঁহারাই যদি অধিকার পাইয়া স্বাবলম্বন পথের কর্মী হন তাহা হইলে কর্মীদের মধ্যে যাঁহারা খুবই শক্ত তাঁহারাই শুধু টিঁকিয়া থাকিবেন। যাহারা শিক্ষা দেয় নাই তাহারা কি করিয়া শিক্ষা পরিদর্শন করিতে পারিবে? আর, যাহারা কখনো উৎপাদন ক্রিয়ার অভ্যাস করে নাই, তাহারা উহা ভাল না মন্দ, কি করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন? ইহার অন্তর্গত শিক্ষার সম্ভাবনা পরীক্ষা করিবার কথা ত দূরে থাকুক, পরিদর্শকদের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা জানেন এমন লোকও নাই। স্কুলের আবশ্যকতা বিষয়ে গ্রামের প্রধানদের আবেদন মাঝে মাঝে কার্যালয়েই পড়িয়া থাকে; তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানের অভাবে নিশ্চয় করিয়া মত প্রকাশ করা কঠিন হয়। উৎপাদন ও শিক্ষণের আবশ্যক পরিপোষণ সময়মত পাওয়া যায় না।

নয়ী তালিমের জীবন দর্শন যদি বিহারে আজ ব্যাপকরূপে না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সাহস করিয়া বলিব যে, তাহার মূলে আছে আদর্শের

এই দক্ষতার ব্যাপারে সমাজের মেয়েদিগের তথাকথিত সমাজ সম্বন্ধে অনিশ্চিত রূপরেখা। আজ শাসন আছে গণতন্ত্রের আধারে, সমাজের মতামতের দ্বন্দ্ব, তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবিম্ব আছে গণতন্ত্রের শাসনে। শাসন উহার উপরে উঠিতে পারে না। উপযুক্ত সময়ের পূর্বে উঠিতে চেষ্টা করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মীদের কর্তব্য তাঁহারা যে অবস্থায় কাজ করেন তাহার বিবরণ দিলেই শেষ হইবে না। বিপরীত অবস্থার জ্ঞানও প্রয়োজন এবং সেই অবস্থার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য সেদিকে মন দেওয়াও প্রয়োজন। আমরা সরকারের সহানুভূতি ও সহায়কৃতি পাইবার জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি কিন্তু অবস্থার সংশোধনের ভার শুধু তাঁহাদের উপর দিলে চলিবে না। নিজে কর্তব্যে দৃঢ় থাকিয়া, নিজের আচরণ দ্বারা নিজের সিদ্ধান্তকে প্রচার করিতে হইবে। এই প্রচারের দ্বারা যখন সমাজের চিন্তার পরিবর্তন আনিতে পারিব, তখন সরকার আগাইয়া আসিয়া সাহায্য করিবেন। অনুকূল সামাজিক বা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া না হইলে নঈ তালিম পুরাপুরি বাড়িয়া উঠিতে পারে না, আর নঈ তালিম না হইলে সমতা ও সর্বোদয়ের উপযুক্ত আবহাওয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। এই পাপচক্রকে কোনো না কোনো দিকে ভাঙিতে হইবে, কাহাকেও না কাহাকেও ভাঙিতে হইবে। সৌভাগ্যবশত ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রবর্তকরূপে সন্ত বিনোবা এখন আমাদের মধ্যে নিজের কর্মক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন। এই পাপচক্র ভাঙিবার যে কাজ আমাদের, তাহা তিনি নিজের প্রশস্ত স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়াছেন। আমরা যদি আমাদের যেটুকু করণীয় তাহা আমাদের দিক হইতে করি আর সমাজ-নির্মাণের শিক্ষায় কার্যক্রমে তাঁহার মত প্রচারের কাজ সক্রিয়রূপে নিজের নিজের সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক কাজের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে নঈ তালিমের ব্যাপক জীবনদর্শন অবশ্যই অবিলম্বে সার্থক হইবে।

নঈ তালিমের শিক্ষক ও পরিদর্শক ব্রত গ্রহণ করুন—

১। আমরা বিদ্যালয়ে বা যে ক্ষেত্রেই থাকি না কেন, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা।

২। এই লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রত্যেক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বুনিয়াদী, উত্তর বুনিয়াদী অথবা সর্বোদয় উত্তর বুনিয়াদী অথবা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়) এক আদর্শ মুক্ত সুস্থ মধুর জীবনের প্রয়োজনপূরণে তৎপর শ্রমজীবীদের সহযোগী সমাজরূপে গড়িয়া তুলিব।

৩। আমাদের বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠানের সামুদায়িক সমাজ হইবে স্থানীয় আশেপাশের গাঁয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই আমরা নিজেদের বিদ্যালয়কে করিব স্থানীয় রসনাত্মক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র। যদিও আমরা গ্রামের সকল ঝগড়াঝাঁটি হইতে দূরে থাকিব।

৪। আমরা স্বীকার করি যে, এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে প্রথম স্থান হইবে শিক্ষকের (পরিদর্শকও শিক্ষকের সংজ্ঞায় পড়েন)। শিক্ষক স্বাবলম্বনের আদর্শে প্রত্যুষান, নিষ্ঠাবান ও উৎসাহী হইবেন এবং নিজের জীবনে সেই আদর্শে পৌঁছিতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। তিনি নিজের জীবনের দৃষ্টান্তেই প্রতিষ্ঠান ও গ্রামকে পূর্ণ স্বাবলম্বনের প্রতি ধাবমান হইবার প্রেরণা দিতে পারেন।

৫। আমাদের নিজের নিজের জীবনের পূর্ণ বিকাশের প্রতি যত্নশীল থাকিতে হইবে। এইজন্য স্বাধ্যায় ও সৎসঙ্গের উদাহরণ নিজেদের শিক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত করা চাই। বিদ্যালয়-আশ্রমে শিক্ষকের নিজের জীবনে এই প্রকার দৃষ্টান্ত না দেখাইলে শিশুদের জীবনের সর্বাঙ্গীন

বিকাশ অর্থাৎ তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কথাবার্তা, দেহ ও মনের সমান ভাবে বিকাশ অসম্ভব।

৬। দশ সঙ্ঘ পাইবার জন্য আমাদের নিজেদের সংঘের মধ্যে সংগঠিত করিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইবে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান এবং প্রত্যেকের সাফল্য হইতে অপরকে লাভবান করা। নিজেদের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদানের জন্য এবং নিজেদের সর্বোদয় ভাবনাকে দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্য আমরা পরস্পরের সহযোগে সর্বোদয় সাহিত্য, সর্বোদয়, নয়ী তালিম, বুনিয়াদী শিক্ষা, হরিজন সেবক, ভূদানযজ্ঞ বিচার, গীতা প্রবচন প্রভৃতি নিয়মিতভাবে আলোচনা করিব।

৭। বিদ্যালয় ও নিজের আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানের জন্য সহযোগসমিতির সুব্যবস্থাও করিতে হইবে।

এই উল্লিখিত ৭টি ব্রত আমরা নয়ী তালিমের সিদ্ধান্ত অনুসারে পালন করিব। তাহা হইলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষণ, পরিদর্শন এবং পরীক্ষাগ্রহণের ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টির অভাব পরস্পর সহযোগে দূর করিতে পারিব। আর অনায়াসেই নিজের নিজের শিশুদের জীবনকে সর্বতোমুখী বিকাশের উপযুক্ত আধার করিয়া তুলিতে পারিব।

নয়ী তালিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষক নিজেও তাঁহার ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত শক্তি দ্বারা অনেক কিছু করিতে পারেন, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান স্থানে থাকিয়াও শিক্ষক সর্ববিষয়ে নিজেই কর্তা নহেন। নিজের কাজে সফলতার জন্য তাঁহাকে পরিপোষক ও সরকারের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইবে। পরিপোষকের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এখনও গ্রামে শিক্ষার প্রচার অত্যন্ত কম কিন্তু পরিপোষক শিক্ষার উপযোগিতা বোঝে না, বিশেষ করিয়া যখন তাহার সম্মুখে শিক্ষার ফলস্বরূপ নিজের গৃহ-পরিবারের জীবন হইতে পৃথক, লেখাপড়া জানা, অন্যশ্রেণীর উদাহরণের অভাব নাই। পরিপোষকদের অধিকাংশের আর্থিক অবস্থাও এমন যে, যদি তাহাদের ছেলেপুলেরা অনেক ঘণ্টা ধরিয়া স্কুলে বসিয়া পড়াশুনা করে, তাহা হইলে পরিবারের জীবিকার বাধা হয় এবং সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষার লাভ তাহারা দেখিতে পায় না। দিনের অধিকাংশ সময় যদি শিশু উৎপাদন কার্যে ব্যয় করে এবং এমন ব্যবস্থা হয় যে, তাহার খানিকটা লাভ তাহারও আবশ্যক কার্যে বিশেষত অন্ন বস্ত্রের জন্য লাগে আর নিত্য এক দেড় ঘণ্টা তাহার বাক্য ও মনের বিকাশে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয় পরিপোষকদের সহযোগিতা পাইতে পারে। পরিশেষে যদি শিশুকে খোলা পরিষ্কার হাওয়াতে কাজ করা, সব কিছু নিয়ে সুন্দর আহার ও স্বাস্থ্যকর চিত্তবিনোদন, পরস্পরের প্রতি আচরণ, সংযম ইত্যাদি অভ্যাস করানো যায়, তাহার তাহার সুন্দর জ্ঞান হয়, সময়ের জ্ঞান হয়, আধকালকার দেশ বিদেশের সমস্যার কিছু ইঙ্গিত সে পায়, প্রয়োজনমত অঙ্ক পাতের সঠিক জ্ঞান হয়, তাহা হইলে পরিপোষকদের এই শিক্ষায় বিশ্বাস হইবে না কেন? যদি আজ এইরূপ বিশ্বাস আমরা উৎপন্ন করিতে না পারি তবে আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের ত্রুটি কোথায়। কখনও কখনও আমরা শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে ও সময়ের গোলমালে বড়ই অসুবিধায় পড়িয়া যাই। একথা ভুলিয়া যাই যে, যতক্ষণ শিশু আমাদের কাছে আসে ততক্ষণ তাহার বিকাশই আমাদের ধ্যানের বস্তু, শিক্ষাক্রম কি করিয়া পূরণ করিব, তাহা নয়। জীবন যদি পবিত্র হয়, সম্পূর্ণ সুখী হয়, চারিদিকে সুষমা বজায় থাকে, যেমন যেমন জ্ঞানের পিপাসা জাগে, তেমন তেমন সেই পিপাসা মিটাইবার সুযোগ পাওয়া যায়, যদি এমন হয়, তাহা হইলে কে বলিবে যে, বিদ্যালয়ে শিশুর পড়ানো হয় না, ও শিক্ষার কোন ফল হয় না?

এখন শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শাসন বিষয়েও কিছু ভাবিয়া দেখা যাক। আমাদের নয়ী তালিম বিদ্যালয় প্রায় সবগুলিই সরকারি। যদি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় চালাইতে হইত, তাহা হইলে নিজেদের ও শিশুদের অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজের যথোচিত সম্পর্ক আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু সরকারি স্কুলে কাজ করিবার জন্য ও সরকারি বস্তুরের অঙ্গ হইবার জন্য আমরা শাসনসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধের দিকে মন না দিয়া পারি না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের সরকারি চাকরির জন্য শিশুদের ও স্থানীয় সমাজের প্রতি উপযুক্ত মাত্রায় মন দেয়া দিয়া শুধু উচ্চ পদস্থদের যেন তেন প্রকারেণ খুশি রাখিতে চান। ইহা আমাদের দুর্বলতা, কিন্তু শিশু, অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজের উচিতমত আলোচনা করিতে গিয়া সরকারি অনুশাসন মানিয়া চলা, সরকারি নিয়ম পালন করাও নিজের কর্তব্য হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা শাসনযন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া এইটুকু আশা করি, অন্য সরকারি বিভাগের কর্মীগণ যে সুখসুবিধা পান, আমরা বুনিয়াদী শিক্ষক বলিয়াই তাহা হইতে বঞ্চিত হইব না, তাহা হইলে আমার মতে আমাদের দাবি অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হইল উৎপাদক কর্ম। ঐ কর্ম সম্পাদন করিতে হইলে কাঁচা মাল ইত্যাদি বৎসরের আরম্ভে অথবা ফসল লাগাইবার উপযুক্ত সময়ে যদিবা পাওয়া যায়, তাহা অনেক পরে পাওয়া যায়, আর যখন পাওয়াও যায়, তখন হাতের কাজের প্রয়োজন হিসাবে বা কর্মীদের সংখ্যা হিসাবে অথবা যে পরিমাণ বস্তু উৎপন্ন হইবে, তাহার অনুপাতে বড় একটা পাওয়া যায় না। নীচ হইতে উপর পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে এই সবের আনুমানিক হিসাব পরীক্ষা করিবার মত যোগ্য লোক কোথায়, আছে কি নাই, সেই খোঁজ সরকারই দিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ পদে বিশেষ বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পূর্ব প্রস্তুতি না থাকিলেও কখনও কখনও বাধ্য হইয়া নিযুক্ত করিতে হয়। আবার, যদি এই সব বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা নয়ী তালিমের আদর্শ অনুযায়ী গুণবান ব্যক্তি গঠন করিতে হয় তাহা হইলে সরকারের দিক হইতে এমন কিছু না কিছু চেষ্টা তো করা চাই, যাহাতে শিক্ষক শিক্ষা না থাকিলেও সজ্জন, যথাসম্ভব শীঘ্র নিজেকে তিনি উচিত ছাঁচে ঢালিয়া লেন এবং নয়ী তালিমের বাতাবরণ বিশুদ্ধ রাখিবার দিকে চেষ্টা করেন। আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন আমাদের পদ্ধতিতে শিক্ষিত শিক্ষক বা পরিদর্শক দ্বারাই হওয়া চাই। অন্তত, এমন লোকের দ্বারা কখনও হওয়া উচিত নয় যে কেবল পুথি অবলম্বনের কথা বলে, এমন কি, যে উৎসাহী কিন্তু অনভিজ্ঞ; অপরিণত কর্মীর মনে সংশয় জাগাইয়া পণ্ডশ্রম করিয়া ফেলিলেই নিজের কর্তব্য করা হইল বলিয়া মনে করে।

শাসন ও ব্যবস্থা বিষয়ে নয়ী তালিমের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ক্রমে সঙ্কুচিত হওয়া চাই, আর তাহারই অনুপাতে স্থানীয় শাসন ও ব্যবস্থার সীমা ক্রমে বেশি হওয়া চাই। যদি নিজের বিদ্যালয়কে গ্রামের বৃহত্তর সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিচালনা করিতে হয়, আর বিদ্যালয়কে স্থানীয় বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত করিতে হয় ও স্বাবলম্বী ও স্বাশ্রয়ী হইতে হয় তাহা হইলে স্বাবলম্বনের উপায় সংগ্রহে ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ে গ্রামের সম্পূর্ণ সংযোগ ভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব হইবে। স্থানীয় সহযোগিতা পাইতে হইলে বিধানকর্তাদের ব্যবস্থা ও শাসন বাহির বা উপর হইতে না হইয়া গ্রাম ও ভিতর হইতে হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা সম্ভব যে এই পদক্ষেপের আরম্ভেই খানিকটা ক্ষতি হইবে, কিন্তু ইহাতে যে লাভ হইবার কথা তাহা মনে করিয়া আমাদের ক্ষতির দমুরীন হওয়া উচিত। আজকার

বাহিরের ও উপরের ব্যবস্থা হইতে যে অসুবিধা অনুভব করা যাইতেছে তাহার কিছুটা উল্লেখ উপরের অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। সরকার ও সমাজের যাত্রাযাত্রি উপরওয়ালা বেলা-বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় শিক্ষক-দের যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইত তাহার কথা আমরা সকলেই জানি। আজ অনেকদিন কইভোগের পর আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক তাহা হইতে মুক্তির অল্প কিছুটা হাঁফ ছাড়িয়া হয়ত বাঁচিয়াছেন। আবার যেসব জেলায় যে-সব সংযোগসমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষকদের কোনো স্থান নাই। বুনিয়াদী শিক্ষার শাসনব্যবস্থা যদি এইরূপ আধাআধি সরকারি ব্যবস্থা হইতে সুরক্ষিত করিতে হয় তাহা হইলে আমাদের স্পষ্ট কথায় বলিতে হইবে যে, আমরা উহাদের অপেক্ষা গ্রামের শিক্ষকের ব্যবস্থাকে সাদরে বরণ করিব, এখনকার পরিস্থিতিতে কিছু ক্ষতি যদি হয় তাহা হউক। যদি এইরূপ স্থানীয় ব্যবস্থা নয়ী তালিম ও তাহার সফলতার জন্য স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রসরকারের দায়িত্ব এই পর্যন্তই হইবে যে, সরকার শিক্ষণ-শিক্ষা, পথপ্রদর্শন ও পরিদর্শন ঠিক ভাবে করাইবেন। আর শিক্ষকদের চাকুরির অবস্থা ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিবেন, এবং বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় নিয়মিত পরীক্ষা দ্বারা স্বীকৃত বজায়-যথোচিত ব্যবহার বিষয়ে আশ্বস্ত করিয়া রাখিবেন। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার নাগপাশ হইতে বাহিরে আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা নিত্যবাহিত ও স্বাধীনতাকে পুষ্ট করিতে পারে না। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত এবং বিশেষজ্ঞদের প্রদর্শিত আত্মকর্তৃত্বের বলেই ইহা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিবে আর যখন উহা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবে তখন সংবিধানে প্রতিশ্রুত আট বৎসরের ন্যূনতম শিক্ষা কেবল এই উপায়েই গ্রামের অর্থাৎ দেশের সকল নাগরিক পাইতে পারিবে।

নয়ী তালিম, ১৯৪৪ সনে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত বিহার রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষক সংঘের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতার প্রথম অংশ।

———

অক্সফোর্ডের চিঠি

পার্থসারথি গুপ্ত

আমি লণ্ডনে যে হস্টেলে ছিলাম, সেখানকার ব্যবস্থাদি ভাল, কেবল ছেলেরা একটা প্রগা খিচুড়ি রকমের। অনেকে তেমন সুবিধার নয়। তাই সাধারণ অভ্রতা আর সামাজিকতা ছাড়া ঘনিষ্ঠতা আমার কারো সঙ্গে হয়নি, করতে ইচ্ছে হয়নি। অক্সফোর্ডে অনেকটা congenial আবহাওয়া পাচ্ছি। এর ফলে, লণ্ডনে গেলে হাতে কোন কাজ না থাকলে বড়ো homesick লাগে, ঠিক দেশের কোন বিশেষ জায়গার কথা নয়, কিংবা কোন ঘটনার কথাও নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে, রৌদ্র-ঢালা সকালে বা কুয়াশাঢাকা বিকেলে বা বাদলা দুপুরে লণ্ডনে পথ চলতে বা টিউব ট্রেনে একটা করুণ সুর যেন বাজতে থাকে। আর থেকে থেকে তখন মুহূর্তের জন্য দেশের ঘটনার স্মৃতিগুলো এক একটা মনে জেগে উঠে সরে যায়।

এই mood কাটানোর উপায়, কোন interesting hobby বা এমন কাজ খুঁজে নেওয়া যাতে মন ডুবে যায়। তাই আমি সেসময়টা লণ্ডনে ঘুরে ঘুরে বেড়ি। দ্রষ্টব্য জায়গার মধ্যে টাওয়ার অফ লণ্ডন, চিড়িয়াখানা, কিউ গার্ডেনস ইত্যাদি কয়েকটা জায়গা ছাড়া অনেক কিছুই দেখে নিয়েছি। ন্যাশনাল গ্যালারির কথা আগেই লিখেছি, যে সব বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবি এতদিন Photogravureএ বা রঙীন ছাপায় দেখেছি, তা এবার মূলে অনেক দেখতে পেলাম। ন্যাশনাল গ্যালারির পাশেই ট্রাফালগার স্কোয়ার, নেলসনের মূর্তি, ফুয়ারে ফোয়ারা, এবর্কি পায়রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন দুপুর কাটালাম কতগুলো বইয়ের দোকানে—এক জায়গায় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বইএর একটা একতিবিশান হচ্ছিল, আর বিকেলের দিকে গেলাম সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রালে।

সেদিন দেখলাম এদেশে এমন অনেক ভারতীয় (এবং বাঙালী) ছাত্রছাত্রী আছে, যারা কি করতে এসেছে এখানে বুঝি না। এদেশে এসে নিজেদের এক একটা ছোট ছোট দল করে নেয়, তার মধ্যে সবিশেষ, insular ব্যবহার করে, ছেলেরা দেখে আড্ডা দিতে, Smart Alec হতে, আর মেয়েরা লিপস্টিক লাগাতে। এখান থেকে কিছুই গ্রহণ করেনা যা ভালো হতে পারে, পড়াশুনা ঘুরে থাক। অবশ্য সবাই এমন নয়, কিন্তু 'সাপের পাঁচ পা' দেখা অনেকে আছে। সেদিন লিপস্টিক মাখা মুখে যেখানে ভনতে এসে খাপছাড়া লাগছিল যে, রসটা উপভোগ করতে পারিনি; সামঞ্জস্যের সংকোচ হচ্ছিল। তাছাড়া বাঙলা গানের মধ্যে 'নীল অঞ্জন ঘন' হল। এ সমস্ত পরিচালনা করলে লণ্ডন মজলিসের গানের দল। ছায়াদি পরে বলেন, সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের Hendon এর বাসায় গিয়েছিলাম, যে অক্সফোর্ড মজলিস এর চেয়ে ভালো হতে পারে।

এখানে ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রভিডেণ্ট অ্যাসোসিয়েশনে ছাত্রদের নানারকম অসুখবিসুখের জরুরি চিকিৎসার জন্য কলেজ প্রাঙ্গণেই ব্যবস্থা আছে, বেটা আমাদের পাঠিয়েছিল, আমি এখানে এসে তার জন্য দরখাস্ত করলাম, সব খুটিনাটি ভালো পড়ে। কেননা এতে সময় নষ্ট হয় না। National Health Serviceএ আজকাল লম্বা লিস্টে দাঁড়াতে হয়, সামান্য বা বড় রকমের কিছু হলেও। ব্যাটেলে প্রতি টার্মে এজন্য এক পাউণ্ড চার্জ করে।

এখানে এখন শরতের বৃষ্টি সুরু হয়েছে এবং

আবহাওয়া বড় বিশ্রী, তিনদিন আগে অবধি সুন্দর ছিল; সেরকম বোধহয় আবার আসতে এখন অনেক দেরি।

আমার অনেক ছেলের সঙ্গে আলাপ আর পরিচয় হয়েছে, তার হয়নি। টার্ম সুরু হবার আগে Osborne বলে একটি ছেলের সঙ্গে খাবার টেবিলে আলাপ হয়, নিজে থেকে কৌতূহলী হয়ে কতগুলো প্রশ্ন করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, বিশেষ করে বৃটানিয়া সম্বন্ধে। ও এখন থার্ড ইয়ারে Modern Greats এ বি.এ. পাশ করেছে এ বছর; তারপর আর দুবছর Theology Honour School এ পড়বে। বেশ ভাল মনে হল, দেখি তার ভাবিষ্যৎ হবে, তিমারের পরে ওর ঘরে কফি খেতে বলেছিল, তারপর আর তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি; কেবল রোজ দু'একটা কথাবার্তা ছাড়া। Brian Reuben এখানকার ইউনিয়ান সোসাইটির বলের প্রতিনিধি, তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। একটু বেশি পরিচয় হয়েছে Allen Wilson আর John Bonnor এর সঙ্গে, এরা সেকেণ্ড আর থার্ড ইয়ারের, আমাদের বলের থেকে সোশ্যালিষ্ট ক্লাবের প্রতিনিধি। সবার সঙ্গেই খাবার টেবিলে গল্প হয়। আমাদের টিউটার Mr Prestwich সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে যোগ রাখতে বলেন, তাতে নাকি পড়াশুনা আর সাধারণ পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়। আমাদের টিউটোরিয়ালে মডার্ণ ইতিহাসের গ্রুপে আলাপ হয়েছে David Irwin আর Tom Whitehead, Brian Burrows আর Mirzoeff এর সঙ্গে, পড়ার মাধ্যমে। Irwin আর Mirzoeff—একজন Ministry of Education এর Scholarship নিয়ে এসেছে, আরেকজন বলের স্কলারশিপে পড়ছে। Corrino বলে একটি কথাসি ছেলের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছে।

এখানে গত রবিবার কেম্ব্রিজ মজলিস এসেছিল, সেই সূত্রে অমর্ত্যর সঙ্গে আবার দেখা হল। ও ছাড়া কেম্ব্রিজের অন্যান্য বাঙালী ছেলেদের আমার তেমন ভাল লাগল না।

এখানে দুজন বাঙালী ছাত্র (গতবছর এসেছেন) কয়েকদিন আগে তপনদা আর আমাকে চায়ে বলেন; বসুধীর চক্রবর্তী (গত বছরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃত্তিধারী পলিটিক্সে ডি-ফিল ছাত্র) আর মিনুর বহরান সিদ্দিকী। সেইদিন অনেকগুলো বাংলা গান শুনলাম রেকর্ডে, 'যাই নাই ওর,' 'বধূবাসু যদি বেসে', 'নৃত্যের তালে তালে', 'পাষাণতলে' 'বাপার', 'মাস্তি', 'টেনসিং'। এখানে যে কয়টি বাঙালী পাকিস্তানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে সবাইকে খুব চমৎকার আর ভালো লোক, বাঙালীত্ব বজায় আছে। বসুধীর একটা ইলেকট্রিক গ্রামোফোন ভাড়া করেছেন এ টার্মে, তাতে বাজান।

এখানে এখন বেশ শীত পড়েছে, ঘরটাতে রাত্রে আগুন জ্বালতে হয় (ইলেকট্রিক) নয়ত বেশি রাত অবি টেঁকা যায় না। 'প্রবাস' সাহেবের চিঠি পেয়েছি; শুক্রবার অকস্‌ফোর্ডে আসবেন দুপুরে, স্টেশনে দেখা করব জানিয়েছি। তারপরে তিনি লিখেছেন কোথাও লাঞ্চের পর ঘুরে দেখে নেবেন কেমন আছি এখানে। আমি ওঁকে একদিন দেখেছিলাম, সুতরাং চিনতে পারব মনে হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর—

Mrs. Scott Russell এর বাড়িতে লাঞ্চ খুব উপভোগ করেছিলাম। আমি ছাড়া আর দুটি ছেলে (ওভারসীজ) গিয়েছিলেন। একজন টম হাজলি, সুবিখ্যাত হাক্সলির ভাইপো এবং এখন রিসার্চ করছেন, অন্যজন Charles Barthin Bank, সেন্ট্রোকের রিসার্চ ছাত্র এবং টিউটার। লাঞ্চের আগে আমরা বাগানে সাহায্য করলাম, লাঞ্চের পর ডিস্ ধোওয়া।

১১ই সেপ্টেম্বর :—

ক্রিষ্টমাসের ছুটিতে কোথায় থাকব ভাবছি। আমাদের কলেজের নিয়মের মধ্যে একটি অদ্ভুত নিয়ম আছে যে ছুটির সময় Carfax (City Centre) এর তিনঘাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কেউ আসতে পারবে না বিনা অনুমতিতে। অবশ্য অনুমতি নিয়ে পুরো ছুটি অক্সফোর্ডে ডিগ্‌স ঘুরে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

'প্রসাদ' সাহেব এসেছিলেন। খুব ভাল লাগল ভদ্রলোককে। সেদিন দিনটাও ছিল চমৎকার, সুন্দর সোনালী। বেলা বারোটার সময় ওঁর সঙ্গে স্টেশনে সাক্ষাৎ করে তারপর সেলাম একটা রেস্তোরাঁতে খেতে। তারপর আমার ঘরে এলেন, কলেজের কম্পাউণ্ডে আমার দুএকটা ফটো তুললেন, তারপর সহরটা আর কলেজটা ঘুরে দেখালাম। বিকেলে কিছুক্ষণ চা খেতে খেতে গল্প করা গেল, তারপর স্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম। উনি কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা পৌঁছাবেন। অগস্টটা এত ছোট হয়ে গেছে। গত শুক্রবার অক্সফোর্ড লেবার ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ব্রিটিশ সিভানার ডাঃ জাগান আর মিঃ বার্ণহাম এসেছিলেন বক্তৃতা করতে। দুজনা আকণ্ঠ ভরে গিয়েছিল, আর যদিও কয়েকটি কন্‌সারভেটিভ rowdies গোলমাল বাধানোর চেষ্টায় ছিল, সে সব কিছু হয়নি এবং যুক্তি-পরম্পরায়, বক্তৃতাবৈশিষ্ট্যে জাগান আর বার্ণহাম সমস্ত সভাকে খুব impress করেন। জাগানের চেয়ে বার্ণহাম আরও ভালো বক্তা। জাগান ভারতীয়, বার্ণহাম নিগ্রো।

৬ই ডিসেম্বর :—

আজ থেকে ছুটি সুরু। আমি অক্সফোর্ডেই থাকার ব্যবস্থা করেছি। এই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই জানুয়ারি অবধি ছুটি। আজ উঠে এলাম 'ডিগ্‌স্'এ। সকাল দশটা থেকে চারটে অবধি বইপত্র আনা, গোছানোতে গেল। আমার ঘরটা ভাল, একটি চারকোনা ছোট 'বেড্ সিটার'। পড়ার টেবিল জানালার সামনে, ড্রেসিং টেবিল ঠিক বিপরীত দেওয়ালে, পড়ার টেবিলে বসে জানলার দিকে মুখ করি, ডান দিকে বিছানা দেওয়াল ঘেঁষা, মধ্যে একটা টিপয়, বিছানার পায়ের দিকে একটা 'চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স'। বাঁ দিকের দেওয়ালে 'কায়ার প্লেস', একপাশে একটা মুখ ধোবার বেসিন। পাশেই বাথরুম। পাশে কাপড় রাখার আলমারি, ড্রেসিং টেবিলের পাশে একটা বইয়ের তাক্। পড়ার টেবিলের চেয়ার ছাড়া আরও দুটো চেয়ার—একটা আর্মচেয়ার, একটা বেতের চেয়ার, কুশান দেওয়া। বাসে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এলাকা আর Carfax (City Centre) পাঁচ-মিনিটের পথ; হেঁটে পঁচিশ তিরিশ মিনিট, সাধারণভাবে আস্তে হাঁটলে।

আমাকে সাপ্তাহিক খাওয়া খাওয়া সহরে সারতে হবে। নটা থেকে একটা লাইব্রেরি, তারপর লাঞ্চ সারবো লিয়নসে, আবার দুটো থেকে সাতটা লাইব্রেরি খোলা, তারপর ডিনার মেয়ে বাড়ি ফেরা। এই ডিগ্‌সে এখন আমি ছাড়া আর দুটি ছেলে আছে, একজন Nigerian, আগে চিনতাম, অন্যজন পশ্চিম ভারতীয়, চিনিনা।

এখানে এখন বড়ো গরম পড়েছে। কয়েক মধ্যে দিনের বেলা কোট না খুলে থাকা যায় না। কাগজেও এই নিয়ে আলোচনা চলছে, গতকাল ব্রাইটনে ৮২° হয়েছিল, মোটামুটিভাবে ইংলণ্ডের এই দক্ষিণাংশে ৬৮° মতো। তবে তদ্বি ফটল্যাণ্ডে ইতিমধ্যে শীত এসে গেছে। তাঁরা মনে হয় কেবল ভোর বেলা আর সন্ধ্যাবেলা।

এতদিনে প্রসাদ ফিরে গেছেন, তোমাদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে, ফটোগুলি তোমাদের দেখিয়েছেন? এখানে মধ্যে মধ্যে দেশের খাবারের জন্য বড় ইচ্ছা হয়, হোটেল রেস্তোঁরার কালিয়া

পোলাও নয়, বাসার ভাত মাছের ঝোল, নিমকি শিঙাড়া হালুয়া সন্দেশ ইত্যাদি। একদিন হঠাৎ কুচো নিমকি আর সন্দেশ খেলাম মিসেস চ্যাটার্জির বাড়ীতে। এঁর স্বামী একজন বাঙালী বিলাট স্টুডেন্ট।

এখানে আমাকে সকালের ব্রেকফাস্টটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয় অনেক দিন, কেননা ন'টার আগেই লাইব্রেরির দরজায় না দাঁড়ালে হয়ত দেখব ১৫ মিনিটের এদিক ওদিকেই যে বই চাই সেইটে নিয়ে অন্য কেউ কাজ করছে। তাই কোন কোন দিন দুধ, কর্ণফ্লেক্স্ আর অন্য পরটার পরেই উঠে যাই কফিটায় চুমুক দিয়ে। যেদিন লাইব্রেরিতে যেতে হয় না, সেদিন বসে অনেক টোষ্ট মাখন আর মার্মালেড দিয়ে খাওয়া যায়।

মোটের উপর ভালই আছি। তবে strain পড়ে প্রতি সপ্তাহেই কোন না কোন সময়ে, গোড়ায়, মাঝে যা শেষে। সেটা যত planning এও এড়ানো যায় না। কেননা সেটা বাড়তি কাজের চাপ, সেটাকে সাতদিনের ফাটলের মধ্যে ঢোকাতেই হবে। যেমন, আজ আমি অনেক দিন পর একটু নিশ্চিন্ত, তবে হয়তো শীগগিরই একটা Essay লেখার বা ক্লেস পরীক্ষার সমস্যা সামনের সপ্তাহেই এসে হাজির হবে। এই বাড়তি কাজের চাপের সমস্যা সর্বদা বিদ্যমান। তার ফলে সাপ্তাহিক কাজের ঠেলাঠেলি।

১৬-১-৫৪

এবার চিঠি দিতে একটু দেরি হলো, কেন না Collection (পরীক্ষা) শুরু পড়ছিলাম। কাল আর আজ গত টার্মের উপর পরীক্ষা হয়ে গেল, Locke টা ভালই হয়েছে। Historical Geography আরেকটু জোর দিয়ে পড়তে হবে, উত্তর সবই করেছি ম্যাপ টাপ দিয়ে, তবু।

অক্সফোর্ডে এখন শীতের প্রকোপ তেমন নেই, যখন পড়ার সময় যেমন ছিল। কাল থেকে দিনে রাতে পরিষ্কার আকাশ আর আলো দেখা যাচ্ছে।

পাকিস্তানে U. S. Base সম্বন্ধে এখানকার সরকারি প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানের পক্ষে। প্রেস-গুলি নেহেরুকে যাচ্ছে তাই গালাগাল দিচ্ছে। New Statesman and Nation এর মতটা এ বিষয়ে ভালো। গত সংখ্যার আগের সংখ্যায় রমুবৌয়ের বন্ধু মহম্মদ আলীর একটা ভালো চিঠি বেরিয়েছে এই প্রসঙ্গে; তিনি মুসলমান আলীর ভাইপো। তোমরা পড়েছ কি?

১

পাঠক্রমের সংশোধন

কুমারী রেখা বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. লখ্‌নৌ

কোন দেশের শিক্ষানীতির আদর্শ কি তা জানতে হলে সেইদেশের পাঠক্রম কি রকম তা আমাদের দেখতে হবে। শিক্ষানীতির আদর্শ কোন দেশে শিশুদের দিকে তাকিয়ে আছে, কোথাও বা তার দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। কোথাও অতীতের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির ধারা রক্ষা করছে, কোথাও বা ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধানের জন্যে পাঠক্রম পরিবর্তনশীল, আর তার নির্বাচন ঐ সমস্যার দ্বারাই নির্ধারিত হচ্ছে।

প্রাচীন যুগের ভারতে বা মধ্যযুগের ইউরোপের মঠের শিক্ষানীতি ধর্মকেন্দ্রিক ছিল, সুতরাংসেই ধর্মকেই সংস্কৃতি রক্ষার প্রধান উপায় ধরা হত। গ্রীক বা রোমান শিক্ষানীতির মধ্যে ধর্মের স্থান নীচে ছিল, মনুষ্যত্ব চর্চা ও অতীতের গৌরবময় ইতিহাসে সেখানে একটা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শবাদ (Secular idealism) সৃষ্টি করেছিল। ইউ-রোপের নব জাগরণের ফলে শিক্ষাধারার মধ্যে ধর্মের ভাব বদলে আদর্শবাদের যে প্রাধান্য এল তার মধ্যেও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাধারা স্থান পেল।

সংস্কৃতিরক্ষণের আদর্শই পাঠ্যতালিকাকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে ভাগ করেছে। সব বিষয়ের সব অভিজ্ঞতা ত আর একই সময়ে এক সঙ্গে ছাত্রদের দেওয়া যায় না। কাজেই নানান বিষয়-বস্তুতে তাকে ভাগ করে বয়স অনুসারে আর অভিজ্ঞতার শ্রেণীবিভাগের অনুসারে এই বিষয়-বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়বিভাগ কিন্তু ছাত্রদের রুচি অনুসারে হয় না। বিশেষজ্ঞই ঠিক করে দেন কোন বিষয় কোন বয়সের উপযোগী, আর তা কিভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া যাবে। এই রকম বিষয়বিভাগে ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত (Logical) যুক্তির যতটা প্রাধান্য থাকে, মনোবিজ্ঞানের (Psychological) নীতির স্থান ততটা থাকে না।

শিক্ষাদানের পদ্ধতির দিক থেকে দেখতে গেলে এই নীতি খুবই সহজ, কারণ সমস্ত সংস্কৃতিকে মোটামুটি কয়েকটা বিষয়বস্তুর মধ্যে ভাগ করতে আর শিক্ষকদের এক একটা ভাগের বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে পারলেই হল। এতে একদিকে বই রচনাও যেমন সহজ তেমনই বইগুলো পড়াবার জন্যে শিক্ষক তৈরীও কঠিন নয়। কিন্তু এর ফলে শিক্ষাধারা প্রগতিশীল থাকে না, চর্বিতচর্বণই তার লক্ষ্য হয়। যে যত বেশি তথ্য (information) সংগ্রহ করতে পারে, সে তত বেশি জ্ঞানী বিবেচিত হয়। ফলে মুখস্থবিদ্যার দ্বারা পরীক্ষা-পাশ-করা ছাত্রের আদর বেশি হয়, আর তারাই অভিজ্ঞতার দাবী করে, যদিও তাদের সত্যিকারের অভিজ্ঞতার দাবী কিছুই থাকে না।

পাশ্চাত্য দেশে এই সংস্কৃতি রক্ষার আদর্শের বিরোধী আর প্রগতিশীল স্বভাববাদ (Naturalism) অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঠ্য তালিকার সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া বর্তমানে প্রাচীন সংস্কৃতির সাহায্যে সমস্যাকেন্দ্রিক (Problem Centred) পাঠ্য তালিকার সৃষ্টি করলেও আমরা এখনও সেই গতানুগতিকতার যুগেই পড়ে আছি। আমাদের ছাত্রেরা এখনও চার্বিতচর্বণেই অভ্যস্ত, একটা নূতন কিছু সৃষ্টির আশা তাদের কাছে করা যায় না।

শিক্ষার মধ্যে এই অসঙ্গতি দেখেই পাশ্চাত্য দার্শনিক জন্ ডিউই (John Dewy) আর তাঁর

শিক্ষণ স্নেডন (Sneddon) ও কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick) সমস্যামূলক পরিকল্পনা নীতির (Project Plan) প্রয়োগ করেন যাতে একটা সামাজিক সমস্যা সমস্ত পাঠক্রমের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, আর ভূগোল, পদিত ইত্যাদি সমস্ত বিষয় ঐ সমস্যার সমাধানে যখন যেটুকু দরকার, তখন ততটুকুই শিক্ষা দেওয়া হয়। সতের বছর আগে মহাত্মা গান্ধী যে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তার আদর্শ ও ঠিক তাইই। প্রভেদ শুধু এইটুকুই যে কেন্দ্রীয় বিষয় পরিবর্তনশীল নয়। একটা মূল শিল্প ধরেই কেন্দ্রীয় বিষয় থাকে। এটা শুধু বৃত্তি শিক্ষার উপায় নয়, সব পাঠ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই রকমের পাঠ্য তালিকাকে কেন্দ্রীয় পাঠক্রম (Core curriculum) বলে। এই ধরনের শিক্ষার সবচেয়ে বড় কথা, প্রয়োজন অনুসারে যখন যে বিষয়ে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মধ্যে আপনি জাগবে, আর যখনই জ্ঞান লাভের রুচি স্বাভাবিক রূপে ফুটবে, তখনই সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। মূলবৃত্তি শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক (Activity centred) হওয়ায়, চোখ আর কানের সঙ্গে সঙ্গে হাত আর স্পর্শ শক্তিও শিক্ষার সহায়ক হয়ে ওঠে।

মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষায় অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হস্তশিল্পের উপার্জনের দ্বারা বিদ্যালয়গুলিকে স্বাবলম্বী করে তোলা। ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশে গঠিত খের কমিটি (Kher committee) বিদ্যালয়গুলির আংশিক ব্যয়নির্বাহ হস্তশিল্প-শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করলেও কেন্দ্রীয় নীতির কোন পরিবর্তন করেন নাই।

দুঃখের বিষয় বাঙলা দেশে বৈদ্যবাটি বা খড়গপুর, চম্পারণ (বিহার) বা বর্ধা প্রদেশের সেবাগ্রামের শিক্ষা ধারার এই মূল নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেও, উত্তর প্রদেশে বা মাদ্রাজে যে ব্যাপকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষানীতির প্রয়োগ হচ্ছে, তাতে হস্তশিল্প একটা অন্যতম অবশ্যপাঠ্য বিষয় মাত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ রক্ষার প্রয়াসও দেখা যায় না। তথ্য সংগ্রহের (information gathering) চেষ্টা এই সকল তথাকথিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ঠিক আগের মতনই রয়ে গেছে।

ডাক্তার মুদালিয়ারের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যে মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার প্রবর্তন করেছেন তাতেও পাঠ্য-তালিকার পরিবর্তনে আগেকার দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বদলায় নি। কমিশনের রিপোর্টেও ১১ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত হস্তশিল্প একটা অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হলেও তা বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি আর সেগুলির আলাদা আলাদা সত্তা স্বীকৃত হয়েছে।

যতদিন না আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করতে পারছি, আর বিষয়গুলির আলাদা আলাদা শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করে তাদের একটা মূল বিষয়ের অঙ্গ করতে পারছি ততদিন শিক্ষা গতানুগতিকভাবে চলতে থাকবে, এ অবস্থায় শিক্ষায় তথ্য সংগ্রহের দিকেই বেশি জোর দেওয়া হবে আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য দেওয়া হবে না। এ রকম শিক্ষায় ছাত্রদের পাঠ্যতালিকার প্রতি স্বাভাবিক রুচিও আসে না আর তাদের নিজেদের সমস্যার নিজেরাই সমাধান করতে শিক্ষা দিয়ে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করাও সম্ভবপর হয় না।

পাঠ্য তালিকা ছাত্রদের রুচিকর না হওয়া আর তা তাদের বর্তমান সমস্যা সমাধানে অসমর্থ হওয়াই যে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাভঙ্গের যে সকল অভিযোগ শোনা যায় তাদের অন্যতম কারণ, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যতদিন পাশ করলে চাকুরি পাওয়া সুলভ ছিল, ততদিন ছাত্র বিদ্রোহ ছুইনাইন গেলার মত ছাত্রেরা এই অস্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সহ্য করে এসেছে। আজ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যত ছাত্র শিক্ষা লাভ

করছে, তার সামান্য অংশই চাকুরি পেতে পারে। বাদ বাকী সকলকেই এই শিক্ষার সাহায্যে বৃত্তির পথ খুঁজে নিতে হবে, গতানুগতিক শিক্ষাধারা এ দুইয়ের কোনটির সমাধান করতে সমর্থ নয়। চিন্তাকর্ষকতার অভাব থাকায় শিক্ষার মাধ্যমে আপনা-আপনিই নিয়মানুবর্তিতা আসতে পারছে না।

পক্ষান্তরে যখন শিক্ষা ছাত্রদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে, যখন একটা সমস্যার সমাধানই শিক্ষার লক্ষ্য হবে আর সেই সমস্যার সমাধানে আনুষঙ্গিক ভাবেই বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞানলাভ সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে তখনই একদিকে শিক্ষা রুচিকর হয়ে ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা শেখাবে, অন্যদিকে ছাত্রদের সৃষ্টিধর্মী ভবিষ্যতের দিকে সন্ত্রদারিত করে তাদের গতানুগতিক চরিত্র গঠনের অভ্যাস দূর করে স্বাংক্রিয়াশীল (creative) ও প্রগতিশীল করে তুলবে।

আমাদের দৈনন্দিন অভাব পূরণে সমর্থ একটা শিল্পকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষা যে সম্ভব তা মহাত্মা গান্ধী দেখিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব বিদ্যালয়ের বুনিয়াদী আমূল পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের শিক্ষায় বর্তমান কর্ণধারেরা সমস্যার এই দিকটার প্রতি নজর না দিয়ে মহাত্মা গান্ধীপ্রবর্তিত বুনিয়াদী নামটার অপপ্রয়োগ করছেন, আর কোন না কোন প্রকারে সামান্য পরিবর্তনের সঙ্গে গতানুগতিক কাঠামোকে বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন। যতদিন না আমরা এই বুনিয়াদীর আমূল পরিবর্তন করতে সমর্থ হব, ততদিন সমস্যা ক্রমশই জটিল হতে থাকবে, ততদিন শিক্ষা জীবনের কোন সমস্যাই সমাধান করতে সমর্থ হবে না, আর শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের রুচিও আসবে না। তাই আজ দরকার আমাদের সৃষ্টিধর্মীর আমূল পরিবর্তন ও সেই পরিবর্তন অনুযায়ী একটা সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার সৃষ্টি।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ তোতার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। সিল্কের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ তোতার লেন, পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কস্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | আষাঢ় ১৩৬১ | ৮ম সংখ্যা

আলোচনা

ভাইসচ্যান্সেলারের বক্তৃতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ছাত্রদের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার প্রশ্ন লইয়া ব্যাপক আলোচনা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বলেন, এই ব্যর্থতা দেশের যুবশক্তি, আর বলিতে কি, জাতির জনবলের মস্ত অপচয়েই পরিচয়। তিনি বলেন যে, ছাত্রদের অমনোযোগিতা, বাড়ির আবহাওয়া, ভিতরের অব্যবস্থা প্রভৃতি ছাত্রদের এই ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী সন্দেহ নাই, কিন্তু কতকগুলি কলেজের ভাল ফলের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে শিক্ষাদান কার্যের উন্নতি করিতে হইবে। শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে অন্যান্য কলেজগুলিও ভাল ফল দেখাইতে পারিবে।

ডাঃ ঘোষের এই মন্তব্যটির সহিত আমরাও একমত। ছাত্রছাত্রীদের অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের পূর্ব পাঠে না, উচ্চ শিক্ষালাভে ব্যাকুলতা লইয়াই তাহাদের অধিকাংশ কলেজে প্রবেশ করে। তখন তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার অন্যতম প্রধান উপায় অধ্যাপক ও শিক্ষকেরই হাতে। শিক্ষাদান প্রণালীর এমন হওয়া দরকার যাহাতে ছাত্রের শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষার উদ্ভূত চিত্ত আকৃষ্ট হয় ও তাহার জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত হয়। তরুণ হৃদয়গুলি স্পর্শ করিবার সোনার কাঠি শিক্ষকেরই কাছে। অবশ্য বাহিরের বিক্ষোভ আছে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, যে কলেজে সত্যই ভাল পড়ানো হয় সেই কলেজের কর্তৃপক্ষ অল্প একটু সজাগ থাকিলেই ছেলেদের বহির্মুখী মনকে আয়ত্তে রাখিতে পারেন। এবং সেই কলেজে ছেলেদের পরীক্ষার ফল ভাল হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

উচ্চ শিক্ষায় হিন্দী

আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে এই মূল নীতি কংগ্রেস সরকার মানিয়া লইয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধা দূর করিবার জন্য হিন্দী বা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়ার অনুমোদন করা হইয়াছে, তবে সাধারণ নিয়মে আঞ্চলিক ভাষাই আমাদের দেশের শিক্ষার বাহন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি কাকাসাহেব কালেলকার প্রমুখ কয়েক-জন শিক্ষাবিদ্ উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে হিন্দীর উপযোগিতা সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। তাঁহাদের মতে হিন্দীকে জোর করিয়া চাপাইলে তাহাতে সমূহ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা। তাঁহারা মনে করেন ইহাতে আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ব্যাহত হইবে। যে প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষা হিন্দী তাহার অন্য বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি হইবে।

অন্ধদের বৃত্তি শিক্ষার কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের সহকারী শিক্ষাসচিব মিঃ কে, জি, সৈয়াদীন সম্প্রতি বেঙ্গালুরে অন্ধদের জন্য একটি বৃত্তিশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

এই প্রতিষ্ঠানে একটি ছাপাখানা ও হাতের কাজের কারখানা থাকিবে। অন্ধ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য কাজের ব্যবস্থা থাকিবে। অনুমান করা যায়, এই প্রতিষ্ঠানে অন্ধ কোন ব্যক্তি প্রতি মাসে গড়ে ৬০৲ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিতে পারিবেন। সহসচিব ডাঃ সৈয়াদীন বলেন যে প্রতিষ্ঠানটি আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারিলে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্যের বহু অন্ধ পুরুষ ও নারী এখানে জীবিকা অর্জন করিবার সুযোগ পাইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

নিখিল ভারত শিক্ষা-সমিতি-সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ অমর নাথ ঝা ভারত সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কমিশন গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ডাঃ ঝা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, দেশের শিক্ষাসমস্যাকে এক সমগ্র সমস্যা রূপে দেখা প্রয়োজন। সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশন গঠনের পর প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করা আজ বিশেষ আবশ্যক। সর্বত্র এক অখণ্ড আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সর্বত্র তালিম না দেওয়াইলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের অবদান ও বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসভা

বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে পরলোকগত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলা দেশের শিক্ষার সর্বতোমুখী উন্নতির জন্য চেষ্টিত, ছিলেন ও শিক্ষক এবং ছাত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখিতেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁহার দরদপূর্ণ সহানুভূতি ও কল্যাণ-চেষ্টা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, দুঃস্থ ও অন্যান্য সঙ্কটকালে তিনি দুঃস্থ শিক্ষকদের কত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় অপূর্ব নিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার দেশহিতৈষণা শিক্ষার পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালীর মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা কাহারও অবিদিত নাই। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য প্রসার সমিতির নিকট হইতে দান হিসাবে প্রাপ্ত ৩,৪০০৲ টাকা দ্বারা তাঁহারা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি পারিতোষিক বিতরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে কোন রেজিষ্ট্রীকৃত কলেজের ছাত্রের দ্বারা বাঙলা ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য প্রতি বৎসর ইহা হইতে একশত টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিবেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তের দ্বারা শুধু পরলোকগত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইতেছে না, উড়িষ্যা ও বাঙলার সাংস্কৃতিক বন্ধনের পরিচয়ও

পাওয়া যাইতেছে। বাঙলা দেশে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা কি অবলম্বন করা হইয়াছে?

কালিদাসের সময়ে দেশের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা

আষাঢ়ের প্রথম দিনটি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত গোটা আষাঢ়ের সমাগমটিকে দেশব্যাপী সম্বর্ধনা জানানো হয়। বিভিন্ন স্থানে মেঘদূতের কবি কালিদাসের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে সভাসমিতির আয়োজন করিয়া গুণগ্রাহী দেশবাসী শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করে। সম্প্রতি হাওড়া পণ্ডিত সমাজে মেঘদূত উৎসবের অনুষ্ঠানে ডাঃ নরেন্দ্র নাথ সেন কালিদাসের কাল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, কালিদাসের জন্ম সময় ও তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ-কাল সম্বন্ধে সঠিক ভাবে বলা যায় না। কালিদাসের সঠিক পরিচয়, তিনি বাঙালী না অবাঙালী, এসকল আজও তর্কের বিষয়। কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন সেই বিক্রমাদিত্যের পরিচয়ও অনুমানের বিষয়। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহাকবি কালিদাস ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নরপতির সভাকবি। রাজত্বের সমৃদ্ধির সঙ্গে কাব্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রাবল্য দেখা যায়। কালিদাসের কালে কাব্যচর্চার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে তখনকার রাজত্বের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল।

দেশের শাসনভার রাজাদের হাতে ছিল আর সাংস্কৃতিক সমস্ত অনুষ্ঠানের ভার পণ্ডিতদের উপর ন্যস্ত ছিল। আজ দেশের শাসন-ব্যবস্থা জনসমর্থিত সরকারের হাতে, সুতরাং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভারও বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে। তাই আজ দেশের বর্তমান অবস্থা ও প্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ও সাধ্যমত বিধান করিয়া রাষ্ট্রের শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সমাজের অবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা দেখিয়াই ভবিষ্যৎ কাল রাষ্ট্রবিধির বিচার করিবে।

শিশু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্নাতকোত্তর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা

শুনা যাইতেছে কলিকাতায় একটি শিশু-স্বাস্থ্য ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইহাতে শিশু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্নাতকোত্তর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কলিকাতার শিশু চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ কীরোদ চন্দ্র চৌধুরী ঐ প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার জন্য আবশ্যকীয় অর্থাদি ও নগরে সেড়লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত হিন্দুস্থান স্ট্রীটে এই উদ্দেশ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের দুই বিঘা জমি দান করিয়াছেন।

শিশু-স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য এই ধরণের কোন ইন্‌স্টিটিউট ভারতে নাই। ইহাতে ১৫০টি শয্যা থাকিবে। বহির্বিভাগে রোজ ৩০০ হইতে ৪০০ শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইবে। শিশু কল্যাণের জন্য এই প্রচেষ্টার আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, ইহাদের স্বাস্থ্যের উপর জাতির কল্যাণ নির্ভর করে। কলেজের পাঠ শেষেই সব কিছু শিক্ষা শেষ হয় না। স্নাতকোত্তর ছাত্ররা যদি এই ইন্‌স্টিটিউটে হাতে কলমে কাজ করিয়া শিশু-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে ও গবেষণা করিতে পারে তবে এই প্রতিষ্ঠানটি দুই দিকেই দেশের উপকার করিবে। আশা করি শীঘ্রই ইহার কাজ আরম্ভ হইবে, ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এই প্রচেষ্টা জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিয়া সফলতার মণ্ডিত হইবে।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বিগত ১লা জুলাই প্রকাশিত হইয়াছে। এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় যে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল তাহাতে আমাদের আশঙ্কা হইয়াছিল

ফল বাহির হইতে আরও বিলম্ব হইবে। পরীক্ষার পরিচালক ও কর্মীবৃন্দের বিশেষ চেষ্টায় বেশ খানিকটা আগেই বাহির হইয়া গেল। শুনিলাম এবারে ৯৩% ছাত্র পাশ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। গত বৎসর পাশের হার ছিল ৫০। এই বৎসর প্রায় ৫৬,০০০ ছাত্রছাত্রী মূল কাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেহ এক বৎসর পরীক্ষা দিতে পারিবে না, কেহ দুই বৎসর। একটি ছাত্রের ৪ বৎসরের জন্য পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। পরীক্ষার হলে দুর্নীতি অবলম্বন ও অসদাচরণের সংখ্যা বেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের সজাগ হওয়া কর্তব্য।

কল্যাণীতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা

আমরা আগে শুনিয়াছিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করা হইবে। বলা বাহুল্য তাহাতে লোকের মনে উল্লাসের সঞ্চার হয় নাই। ঐতিহ্য জিনিসটি উপেক্ষার বিষয় নয়, যহ সৃষ্টিবিরচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল উপড়াইয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া অর্থ অনেক কিছুর মূলে কুঠারাঘাত করা। তাহা ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে প্রাণকেন্দ্র, কর্মস্থান, বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত কলিকাতা নগরকে কেন্দ্র করিয়া। হঠাৎ কল্যাণীতে তাহাকে লইয়া গেলে তাহার প্রাণপ্রবাহই যে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। যাহা হউক, শুনিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ও অন্যান্য শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও পল্লীর অর্থনীতি, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমাইবার উদ্দেশ্যে মফঃস্বলের কলেজগুলিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনিবার পরিকল্পনা হইতেছে। কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলের কলেজগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই থাকিবে।

নয়ী তালিম

বিনোবা ভাবে

আপনারা সকলে জানেন যে তিন চার মাস পূর্বে আমি সর্বোদয়ে নয়ী তালিমের বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, আর তাহাতে এক ধরণের ত্রুটির বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। আজ সারা দেশ জুড়িয়া সরকারি ও বেসরকারি ধরণে যাহা চলিতেছে তাহার সম্বন্ধে আমি নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আমার এই তালিমের উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমি স্বীকার করি যে আজ হিন্দুস্থানের সম্মুখে যে সব সমস্যা উপস্থিত ইহা ভিন্ন তাহা সমাধান করিবার শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না।

এখন প্রত্যক্ষ নয়ী তালিমের বিষয়ে যে কথা, তাহা আপনাদের সম্মুখে বলি। দিল্লীতে যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহার কথা মনে পড়িতেছে। সেখানে কিছু বলিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেখানে আমি বিস্তৃতভাবে কিছু বলিয়াও ফেলিয়াছিলাম। তাহার পর এত দিন এখানকার কাজে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং এ বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছি

তাহা হইতে এই তালিমের উপর আমার যে বিশ্বাস ছিল তাহা দৃঢ় হইয়া গিয়াছে।

আজ আপনাদের কাছে নয়ী তালিমের বিচার-ধারা উপস্থিত করিতে বসিয়া আমার স্যর সির্জা ইস্মাইলের উক্তি কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার উক্তির সার কথা হইল যে, নয়ী তালিমকে স্বীকার করার অর্থ আধুনিক বিজ্ঞান আর তাহার প্রগতির পথ ছাড়িয়া দেওয়া। আমি তাঁহার বক্তব্যের মূলকথাটি নিজের ভাষায় বলিলাম। কিন্তু আমার দাবি হইল যে, আধুনিকতম বিজ্ঞান এই নয়ী তালিমের পিছনে থাকিবে ও ইহার বল বৃদ্ধি করিবে।

চার পাঁচ মাস আগের কথা। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের এক বৈঠক হইয়াছিল। তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আজ পৃথিবীতে নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি হইতেছে, ডাক্তারদের মজাদার চেষ্টা সত্ত্বেও!

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা ব্যতীত প্রাকৃতিক জীবন কিরূপে যাপন করা সম্ভব সেই বিষয়ে গবেষণা না করিয়া কেবল রোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনকারী ডাক্তার শুধু রোগ বাড়াইবেন, কমাইবেন না। উহাতে মূলে অসংখ্য করাই হইবে, মূল ছেদন করা হইবে না।

সেইরূপ, প্রাকৃতিক জীবন কিরূপ, তাহার কিছু প্রয়োগ পরীক্ষা না করিয়া রোগ নিবারণের প্রয়াসে মূল ছেদন না করিয়া মূলে জল সেচন করা হইবে। শাখা কাটিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু শিকড় গাড়িয়া যাওয়ায় বৃক্ষ বাড়িয়াই চলে। আজ শিক্ষারও সেই অবস্থা। ক্যাসিজমের শিক্ষাব্যবস্থায় সারা দেশের ছেলেদের কেবল ক্যাসিজমের মহিমাই শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলে শিশুদের কাছে হিটলার মুসোলিনীর মহিমা প্রচার করা হয়। ইস্কুলের নীচের ক্লাসই এই দুই জনকে দেওয়া হয়। ঠিক ঐ ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে সব স্কুলে কমিউনিষ্ট মতবাদে শিক্ষা দেওয়া হয়। একই পুস্তক নিষিদ্ধ হয় সকল স্কুলের জন্য। বিদ্যার্থীদের মনের মধ্যে একই বিচার ধারা ঢুকিয়া দিবার উপযোগী শিক্ষাবিধি নির্দিষ্ট হয়। তাহার ফলে হয় কি, মানুষ বুদ্ধিমত্তা আর থাকে না। আর্মান যুদ্ধের দৃষ্টান্ত দেখুন। এক হুকুম হইল, আর লক্ষ লক্ষ লোক অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য সাজিয়া দাঁড়াইল। আর সমস্ত বিশ্ব দেখিল, ইহারা কেমন বীর, কেমন ইহাদের সংঘবদ্ধতা। কিন্তু চার বৎসর পরে যখন আর্মান সেনাদল দেখিলেন যে সামনেই আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে আর তাহার সঙ্গিন কাছে উহারা টিকিতে পারিবে না, তখন আবার হুকুম হইল। তখন, একদিন যেসব এক কথায় লক্ষ লক্ষ লোক অস্ত্র ছাড়িতে বিধাবোধ করিত, আজ আবার সেই এক হুকুমে তাহারা নিজের হাতে লক্ষ লক্ষ হাতের অস্ত্র নামাইয়া রাখিল ও অধীনতা স্বীকার করিল। তাহাই দেখা যাইতেছে, যে সৈনিকেরা লাখে লাখে এক হুকুমে মরিতে প্রস্তুত আবার দ্বিতীয় হুকুমে অধীনতা মানিয়া লইতে প্রস্তুত, তাহাদের কি কখনও মন আর বিচারবুদ্ধি থাকিতে পারে? আর এই দোষ শুধু সৈনিকের নয়, সমস্ত দেশেরই এই অবস্থা। কারণ আঠারো বৎসর বয়স হইলেই উহাদের সেনাদলে নাম লেখাইতে হয়। তাহাই ঐ যুদ্ধে সমস্ত দেশের যে পুরুষরা নিয়োজিত হইয়াছিল তাহাদের সৈন্যদল ছিল বলবৎ, বুদ্ধি বিচারবিহীন। যে সমাজ এইরূপ একের আজ্ঞায় ওঠে বসে চলে, সেই সমাজ বুদ্ধিহীন যন্ত্রে পরিণত হয় আর গোলাম হইয়া যায়। আজকাল সৈনিকের সব চেয়ে বড় গুণ ধরা হয় আজ্ঞানুবর্তিতা। কথায় বলে, yours not to question why, yours but to do & die"

কথা আর বাড়াই। কেন যুদ্ধ করিতে হইবে, কাহার সঙ্গে লড়াই, এই সব প্রশ্ন করিবার নয়। আজকাল সব দেশেই ইহাকে কর্তব্য বলিয়া

যাওয়া হইতেছে। হিন্দুস্থানেও এইরূপ হইতে পারে। সম্প্রতি একটা কথা শোনা যাইতেছে যে সমস্ত বেসরকে মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া হইবে। এইরূপে কতিপয়ের উপর বিশ্বাস রাখিয়া বাকি সমুদয় লোকে উঁহাদের আজ্ঞাধীন থাকিবে, সমরকালের শিক্ষানীতির মধ্যে এই যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য আমার তো মনে হয় শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। আইন যেমন স্বতন্ত্র হইতে পারে, বিচারপতি সরকারি বেতন পান, কিন্তু তবু তাঁহারা স্বাধীন। তাঁহারা কেবল আইনের অনুসারে বিচার করিবেন। তাঁহাদের উপর সরকারি হুকুম খাটে না। ঠিক সেইরূপ শিক্ষাব্রতীকেও সম্পূর্ণ স্বাধীন মতের হইতে হইবে, তা তিনি সরকারি বেতন পাইলেও। বিচারপতির যেমন প্রচলিত আইন অনুসারে রায় দিবার দায়িত্বশূন্যতা থাকে, তেমন বন্ধন শিক্ষকেরও থাকিবে। আপনাদের রচিত নিয়ম-কানুনে যিনি বা শিক্ষা দিতে পারেন না। বিনোবা আর কোন বন্ধন তো মানেই না, এমন কি আপনাদের সংবিধানের বিধানকেও স্বীকার করে না। আমার মতে জ্ঞান স্বাধীন। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,

যন্ত্রতন্ত্রস্থং ন তু পুরুষতন্ত্রস্থং।

জ্ঞান যন্ত্রতন্ত্র, ব্যক্তিগত নয়। আমার সম্মুখে অবস্থিত পদার্থটি যদি গোল হয় আমি তাহাকে গোলই দেখিব, আমি উহাকে ত্রিকোণ দেখিতে পারিব না। চিনি মিঠা, আমাকেও চিনিকে মিঠা বলিতে হইবে। টক বা কটু বলিলে চলিবে না। চিনি সম্বন্ধে এই জ্ঞান আমার মধ্যে নাই, উহা চিনির মধ্যে। ঠিক সেইরূপ, বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান কাহারও হাতে নয়, উহা বস্তুর মধ্যেই নিহিত। ইহা যন্ত্রতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র নয়। সেজন্য স্বাধীনতার দাবি যদি কাহারও থাকে তবে শিক্ষকের, আচার্যের। কিন্তু আজকাল তো শিক্ষক শত শত, হাজার হাজার। প্রাচীন কালে গুরু অতিশয় স্বাধীনচেতা হইতেন, তাঁহারা চিন্তাশীল ছিলেন। জ্ঞানের চর্চা করিতেন, আর আপনার বিচারবুদ্ধি দ্বারা যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাই বলিতেন, সামনে বসে যতো জ্ঞানীই থাকুন না কেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষার ক্ষেত্রেই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বিপদ উপস্থিত। শিক্ষার ভার যতদিন সরকারের হাতে থাকিবে, ততদিন পৃথিবীতে হাইড্রোজেন বোমা, এটম বোমার বিস্ফোরণ তো হইবেই না, বরং বাড়িয়া চলিবে।

আজ শিক্ষা মন্ত্রীরা মন্ত্রী নয়, শিক্ষা-তন্ত্রী মাত্র। সরকার যে মন্ত্র দেন ইহারা সেই অনুসারেই কাজ করেন। সারা পলিসি ক্যাবিনেটই ঠিক করিয়া দেন। আমেরিকা রাষ্ট্রে যখন সৈনিক নির্বাচন হইল তখন জানা গেল যে, সেখানকার প্রত্যেক বালককে এই শিক্ষা দিতে হইবে যে, হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারী করা অত্যন্ত জরুরি কাজ। ইহা deterrent, সকলের সম্মুখে এক রাক্ষস অবস্থিত। এই রাক্ষস কমিউনিজম চীন—এই রাক্ষসের ভয় বালকদের দেখান হয়, আর আর শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাহারা হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারী করিতেছে তাহারা দয়ার অবতার। 'কাহাকেও আক্রমণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দয়াপরবশ হইয়াই এই বোমা উৎপন্ন করা হইতেছে, যাহাতে জগতে শান্তি থাকে।' যেন পৃথিবীতে শান্তির জন্য বাইবেলের প্রয়োজন নাই, উপনিষদের আবশ্যকতা নাই, sermon on the mount-এরও দরকার নাই।

প্রত্যেক শিশুকে ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস, যাহাই কেন না পড়ান হউক, শেষ পর্যন্ত ইহাই বলা হয় যে রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যই সব। ইহার বিপরীত যে বলে সে মূর্খ। ইহা ভিন্ন অন্যরূপ হইতেই পারে না। আর, ওদিকে রাশিয়ায় কি চলিতেছে, তাহা দেখুন।

সেখানেও ঐ ব্যাপার, Mechanism বা শ্রীকরণ। সেনাবিভাগে যেমন যন্ত্র বানানো, শিক্ষাবিভাগেও তাহাই। দেশের সব ইস্কুলে একই বই পড়ানো হয়। মনের, চিন্তার, স্বাধীনতা জিনিসটি সেখানে কোথাও নাই। যেদিকেই তাকাই, আজকার শিক্ষার ধারায় সর্বত্র এই যান্ত্রিক ছাঁচ চোখে পড়ে। আর যেখি উহাতে শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষাই বেশি হইতেছে। আপনারা কি মনেন যে, আজ যে শিক্ষা চলিতেছে উহা বন্ধ হইয়া গেলে শিশু পুত্রকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা, দেশভক্তির জ্ঞান, কাজেকারবারের জন্য দিবে না? শিশুকে সর্বপ্রথম শিক্ষা পিতা মাতাই দেন। পিতা মাতা যে শিক্ষা দেন তাহা হইতে আর কিছু বেশি শিক্ষা দেন গুরু। সেজন্য আমরাই শিক্ষা দিই, এমন অহঙ্কার যেন আমরা না করি। মা যে শিক্ষা দেন তাহা এক নম্বরের শিক্ষা। পিতার শিক্ষা দুই নম্বরের, আর গুরুর শিক্ষা তিন নম্বরের, আর সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় যে শিক্ষা তাহার তো নম্বর দেওয়া যায় না, কারণ উহা একই ছাঁচে সকলের জন্য ঢালা। ঈশ্বরের এমন বিধান পিতা মাতা ব্যতীত শিশুর রক্ষা হয় না, শিশুর জন্মমাত্র মাতৃস্তনে দুধের সঞ্চার হয়। শিশুর মুখ দেখামাত্র মায়ের অন্তরে দুগ্ধ পান করানোর প্রেরণা আগে। এইভাবে জন্মকাল হইতেই মায়ের নিকট হইতে শিশুর প্রেমের শিক্ষা সুরু হয়। শিশুকে মাতৃভাষা শিখাইতে মায়ের কত টাকা লাগে, বলুন। দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে মাতা শিশুর মুখে ভাষা দেন। দুনিয়ার শিশু মায়ের কাছে প্রথম শিক্ষা করে। মা শিশুকে আদর করিয়া বলেন, ঐ দেখ চাঁদ, শিশু কাণে শোনে। মা আবার বলেন, কোথায় চাঁদ, তাকো তো চাঁদকে। এই ভাবে পরীক্ষা করেন। শিশু আঙুল দিয়া আকাশে চাঁদ দেখায়। কিছুদিন পর শিশু বলে চ, চ, ন, ন, তার পরে চাঁদ শব্দ উচ্চারণ করে। আগে জিনিসটা দেখে পরে কথা বলে। এই যে জ্ঞান দান, এই যে ভাষা শিক্ষা, ইহা কি অন্য কোন শিক্ষা অপেক্ষা কম? দুই আড়াই বৎসরের মধ্যেই সুস্থ হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাতাই এইসব করেন। সেজন্য শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুভব আর অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, জীবনের প্রথম দুই তিন বৎসর বয়সে শিশু যত জ্ঞান অর্জন করে, ভবিষ্যতে সারা জীবনেও ততটা পারে না। এই সময়েই আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা, সংস্কার আর ভাষা এই চারিটি জিনিস মা শিক্ষা দেন। এইজন্য দুনিয়ার লোক এই কথা স্বীকার করে যে মায়ের সংস্কারবশে দুনিয়া রক্ষা পাইবে। আর এজন্যই জননী পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ গুরু। সন্তানমাত্রেরই জননী আছে। আর সন্তানমাত্রেরই জন্য জননীর স্নেহ আছে। জননী অনেক কিছু দেন। গুরুর জন্য সামান্যই বাকি থাকে. গুরু তো finishing touch দেন। দেহের মাল প্রস্তুত হইলে পর তাহার উপরে একটা পালিশ দিতে হয়, তেমনই গুরুর কাজ কেবল উপরের পালিশ চড়ানো। যদি এই শিক্ষকের দল সরিয়া পড়ে তবে শুধু উপরকার পালিশেরই ক্ষতি হইবে, আর কিছুর নয়। উপরের পালিশ খারাপ দিলেও ভিতরকার জিনিসের কোন ক্ষতি হয় না, কেবল পালিশ ভাল হইলেই তাহা উঠিয়া গেলে দুঃখ পাইতে হয়। কিন্তু আজিকার পালিশ ভাল নয়। আর দুনিয়ায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে লাখ লাখ টাকা খরচ হইতেছে, কেন না আজ যে রাষ্ট্রব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার বিচারই সবকে সব কিছুতে ঢুকাইয়া দেওয়া হইতেছে।

এই পৃথিবীতে যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন, দুনিয়ায় যাঁহারা বিচারধারা দিয়াছিলেন, সংস্কার সাধিত করিয়াছিলেন, ভগবান বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, তুলসীদাসের মত তাঁহারা ছিলেন

স্বাধীন মতবাদের। আর আজকাল পৃথিবীর এই যে প্রচলিত শিক্ষাবিধি ইহা দুনিয়াকে কি দিয়াছে? আপনার অনুকূল মত সৃষ্টি করিবার দিকেই ইহার দৃষ্টি। আমরা যদি দুনিয়ার মঙ্গল চাই তবে শিক্ষাপ্রণালীকে স্বতন্ত্র, মুক্ত হইতে হইবে। এই আমার নিবেদন। তবেই অহিংসার উদ্ভব হইবে।

আমার আর একটি নিবেদন আছে। আমি জানি না, লোকে আমার বিচার মানিয়া লয় কি না। আমার সেজন্য চিন্তাও নাই। আমার যাহা ঠিক মনে হয়, তাহা বলিব। ঈশ্বরের নিয়মে খারাপ কাজের ফল খারাপ হয়, ভাল কাজের ফল ভাল হয়। ঈশ্বরের শিক্ষা দেওয়ার রীতিই এই। ইহাকেই বলে কর্মবিপাক; আর ঈশ্বর যদি নিশ্চিন্ত আছেন, তবে আমি কেন চিন্তা করি? তাই আমার বিচার ব্যবহারযোগ্য কিনা আমি তাহা চিন্তা করি না। দুনিয়া তাহা বিচার করিবে। আমার মতে শিশুর শিক্ষাক্ষেত্র হইতে পুরুষদের সরিয়া থাকা উচিত, শিশুদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে মেয়েদের হাতে থাকা উচিত। মেয়েদের হাতে শিক্ষার ভার থাকিলে শিশুর হৃদয় বিকশিত হইবে। বুদ্ধির বিকাশ পরে। শিশুদের হৃদয়ই প্রধান, বুদ্ধি নয়। এ কথা যে অস্বীকার করে সে শিশুর প্রকৃতি নিরীক্ষণ করে নাই, বলিতে হইবে। শিশুদের আগে হৃদয় পরে বুদ্ধি, সেজন্য আগে চাই হৃদয়ের বিকাশ, বাকি সব জিনিস এই হৃদয়বত্তার সঙ্গে আপনি আসিয়া জুটিবে। আজ এই যে কেতাবের মধ্যে সব কিছু ঢুকাইয়া দেওয়া ইহা আমার পছন্দ হয় না। আমার চরখার সঙ্গে সব কিছু ঘুড়িয়া দেওয়াও আমার পছন্দ নয়। তবে হাঁ, চরখা চলিলে কিছু কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। কিন্তু ইহাদের মনে ইন্দ্রিয় বিকাশের চিন্তা কেন আসিয়া উঠিয়াছে তাহা আমি বুঝি না। ইহারা হৃদয় বিকাশের কথা ভাবেন না। কিন্তু আমার কাছে হৃদয় বিকাশের কথাই বড়। বুদ্ধির সম্বন্ধে জ্ঞান আপনা আপনি আসিবে। ইন্দ্রিয়ের বিকাশ তো সমানেই চলিতেছে। শিশু যখন বাহিরে সূর্যনারায়ণকে দেখিবে তখনই তাহার চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সাধিত হইবে। আমাদের আলাপ আলোচনা শুনিয়া তাহার কানের বিকাশ হইবে। সৃষ্টিতেই আমাদের উপর এত চাপ পড়ে যে গাধারও ইন্দ্রিয়বিকাশ হয়। উহার চক্ষু ঠিক তাহাই দেখে যাহা দেখা উহার দরকার, যেখানে যাওয়া দরকার সেইখানেই উহার পা পড়ে, যাহা শোনা দরকার তাহা শোনে। এজন্য কোন শিক্ষা বিচারের প্রয়োজন নাই। তাই ইহারা যখন ইন্দ্রিয়বিকাশের কথা বলেন, আমি বলি, তাই, হৃদয়বিকাশের কথাই বড়। শিশু কোন ভাল কাজ করিয়া থাকিলে দুনিয়ার আর যে যাহা বলুক, মা যদি বলেন কাজটি ভাল হইয়াছে তবেই তাহার সারা দুনিয়ার পুরস্কার লাভ হয়। তাই বলি, শিশুর শিক্ষার ভার মায়েদের হাতে রাখিতে হইবে। যেদিন সারা দুনিয়ায় এই নিয়ম প্রচলিত হইবে, সেদিন জগৎ হইতে হিংসা লোপ পাইবে। সেজন্য আমার নিবেদন, দুনিয়াদারী শিক্ষার কাজ মেয়েদের হাতে থাকুক।

আমার তৃতীয় নিবেদনও জানাই। যে লোক পৃথিবীতে কোনও পুরুষকার দেখায় নাই তাহার শিক্ষক হইবার অধিকার থাকা অনুচিত। আজকাল তো দেখি কুড়ি বৎসরের যুবক শিক্ষক হইয়া আসে। ইহাদের না আছে ব্যবহারিক বুদ্ধি, না খেত খামারের জ্ঞান, না সৈনিকের অভিজ্ঞতা। এই সব কোন ক্ষেত্রে ইহারা ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয় নাই। যাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই, যাহার বিন্দুমাত্র অনুভব নাই, এমন শিক্ষকের হাতে যদি শিশুকে দেওয়া হয় তবে শিশুর প্রকৃত শিক্ষা কি করিয়া হইবে? সেজন্য আমার মতে এই রকম অনভিজ্ঞ

লোককে শিক্ষার ভার না দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন এরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষকতায় কাজ দেওয়া কর্তব্য। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাভ্যাস শুরু হয়। সেজন্য গুরুগৃহে যাওয়া দরকার। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে পর পৃথিবীর সব কাজকর্ম করিতে হয়, আর বানপ্রস্থের পর সেবা আর শিক্ষাদানের কাজ করিতে হয়। পেনসন পাইয়াছেন, অথচ প্রাণশক্তি কিছু অবশিষ্ট আছে, এরূপ লোককে যদি আমরা স্বেচ্ছাকর্মী শিক্ষকরূপে পাই তবে শিক্ষার খরচ বেশি হইবে না, অথচ শিক্ষার কাজ ভাল চলিবে। বর্তমানে তো অল্পবয়স্করা শিক্ষকতা করিতেছেন। তাঁহাদের বেতন ক্রমশ বৃদ্ধি করিতে হয়, কারণ সংসার বাড়িয়া চলে। সেজন্য তাঁহারা কিছু উপার্জন করিয়াছেন, এখন খরচের ভাবনা নাই, বিষয়বাসনারও নিবৃত্তি হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি শিক্ষক হইবার যোগ্য। অন্যের সে অধিকার নাই। আর যাঁহারা শিক্ষক হইতেছেন তাঁহারা অনধিকারী। কোথায় যেন পড়িয়াছি, পাশ্চাত্য সরকারের এক সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করিবেন না, কারণ তাহা ছাত্রদের পক্ষে আশঙ্কাজনক। ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেন থাকে না। সরকারকে এই সার্কুলার জারি করিতে হইল কারণ শিক্ষকেরা অল্পবয়স্ক। আমি তাই বলি, বানপ্রস্থ লওয়ার পর শিক্ষকতা গ্রহণ করার উৎকৃষ্ট সময়। তবে ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি কিছুটা থাকিতে থাকিতেই বানপ্রস্থ লওয়া উচিত। এখন তো দেখি ইন্দ্রিয়গুলি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে তবু লোকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে চায় না। পাশ্চাত্যে আশ্রমকে যেমন অন্তিম সংস্কার বলিয়া ধরা হইয়াছে, তেমনই পাশ্চাত্য আশ্রম হইতে নিবৃত্ত হওয়াকেও একটি সংস্কারের মধ্যে গণ্য করা প্রয়োজন। এই বানপ্রস্থে বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, জীবিকার চিন্তা থাকিবে না। ইহার জন্য বিষয় বাসনা ত্যাগ করার একটা প্রথা রচনা করিতে হইবে। এইরূপ এক ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতে হইবে। আমি আজ দেখিতেছি, কুয়ানের কাজ করিবার জন্য সন্তান কাজ করার মত সেবক পাওয়া যায় না। যিনি সেবক হইয়া আসেন, তাঁহার উপর সংসারের ভার ন্যস্ত থাকে। কেহ কেহ উৎসাহবশে কাজে আগাইয়া আসে, কিন্তু পাঁচ সাত দিন কাজ করিয়াই থামিয়া যায়। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লজ্জা পাইয়া যায়, কিন্তু জানেন, এই কাজ গৃহস্থাশ্রমী লোকের নয়। সার্বক্ষণিক কাজে আজ আমাদের চাই সন্তত-কাজ-করিবার জন্য লোক। এমন লোক বেতন দিয়া মেলে না। সেজন্য বানপ্রস্থ আশ্রম স্থাপন না করিলে সমাজসেবক তৈয়ারি হইবে না। আর উহা ভিন্ন শিক্ষক-সমাজও গঠিত হইবে না। শতকরা ৮০জন শিক্ষক এই বানপ্রস্থী-দের মধ্য হইতে লওয়া উচিত। ৪০/৪৫ বৎসর বয়স্ক লোক যিনি পূর্বোচিত কাজ কিছু করিয়াছেন, তাঁহারই বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করা কর্তব্য। তবেই শিক্ষকের পৌরুষ, শিক্ষকের অনুভব, শিক্ষকের বীর্য ছাত্রদের উপকারে লাগিবে। শিক্ষক বলিবেন, আমি যখন রাজা করিতাম তখন এইরূপ করিয়াছিলাম, আমি সেনাদলে এই সব বীর্য ও সাহসের কাজ করিয়াছিলাম, আমি মন্ত্রী ছিলাম, মন্ত্রিত্বকালে এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতাম, ইত্যাদি। শিক্ষকের অভিজ্ঞতায় ছাত্রের শিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। কিন্তু বর্তমানে তো দেখি, শিক্ষকের কোন অভিজ্ঞতা নাই। মূর্খ লোকেও শিক্ষক হইতেছে। কথাটি শুনিয়া আপনারা ক্ষুব্ধ হইবেন না। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা তো আপনাদের আছে। কিন্তু দুনিয়ায় চলিবার জন্য যে জ্ঞান, যে সাহস ও পরাক্রম প্রয়োজন তাহার শিক্ষা তো আপনাদের হয় নাই। আমাদের দেশে যেমন ছিল যে গুরুর সঙ্গে শুরুপত্নীও থাকিবেন। কিন্তু আজকালকার গুরুপত্নীরা তো জানেনও না তাঁহাদের

পত্নিরা কি কাজে নিযুক্ত আছেন। আপনারাই বলুন, কল্পনায় পত্নী প্রকৃত সহধর্মিনী? পত্নী রান্না করিবেন, পুত্রকন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, কিন্তু পতির বাসনার খসড়া কি তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে হইবে। আপনি বক্তৃতা দিবেন, স্ত্রীকে কি উহার নোট লিখিয়া দিতে হইবে? আর ইহাই কি সহধর্মিনীর লক্ষণ? আমার মতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুরুর সঙ্গে গুরুপত্নীরও থাকা বিধেয়। ছাত্রাবাসের সমুদয় কাজ গুরুপত্নীর হাতে থাকিবে। তাহাড়াও প্রথম শ্রেণীর পড়া তাঁহার হাতে থাকিবে। শিশুরা গুরু-পত্নীর স্নেহ লাভ করিবে। এবং গুরু ও গুরুপত্নী উভয়ের অভিজ্ঞতায় শিশু লাভবান হইবে। ইহা এমন কিছু তুর্লভ নয়, এজন্যই আমার তৃতীয় প্রার্থনা যে, শিক্ষকতার কাজ বানপ্রস্থীদের হাতে থাকুক। এই ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতে হইলে গুরুর বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হওয়া চাই। অবশ্য যদি কেহ যৌবনেই বাসনামুক্ত হইয়া এই কাজে যোগ দেয় তবে তো ভিন্ন কথা। কিন্তু এমন শঙ্করাচার্যের মত লোক তো এক আধটি কচিৎ মেলে। তবে কিছুদিন গৃহস্থের ধর্ম পালন করার পরে এই ত্যাগের বেতাজে ক্রমে প্রবর্তন করা কর্তব্য। তুলসীদাস বলিয়াছেন, ভগবান মনু বৃদ্ধ বয়সে কাজ কারবার সব ছেলেদের হাতে সঁপিয়া দিয়া বনে গিয়াছিলেন। তিনি ছেলেদের ব্যর্থতা উপস্থিত, কিন্তু বিষয় বাসনা যায় নাই। তাই তিনি মনের উপর জোর চাপ দিলেন এবং বাসনামুক্ত হইলেন।

মনকে জোর করিয়া শাসন করিতে হয়। নতুবা আগে বাসনা যাক বলিয়া পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে মনের গতির সঙ্গে দেহ দুর্বল হইয়া পড়িবে তবু বাসনা ঘুচিবে না, আবেগও দূর হইবে না। এই সব জানিয়াই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, আধাধির নিবৃত্তি না করিলে এক দেহের অবসানে মানব অপর দেহ অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে জন্ম লয়। সেই জন্য ৪০/৫০ বৎসর বয়সের পর বানপ্রস্থাশ্রমে যাওয়ার যে রীতি ছিল, তাহার পুনরায় প্রবর্তনা আবশ্যক। উহার ফল কি হইবে, ভাবিয়া দেখুন। একটি ফল তো হইবে, আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, তাহার একটা নিষ্পত্তি হইবে। বিবাহের বয়স যদি ১৫/১৬ হইতে ২০/২৫ বৎসরে দাঁড়ায়, আর ৪০/৪৫ বৎসর বয়সে বানপ্রস্থ লওয়ার রীতি চালু হয় তবে গৃহস্থাশ্রমের কাল কমিয়া যাইবে, মোট ১৫/২০তে দাঁড়াইবে। বর্তমানে তো ১৬ বৎসর বয়স হইতে সুরু করিয়া ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৪৪ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে কাটিয়া যায়। এই দীর্ঘ সময়কে কমাইয়া আনিতে হইবে। ইহাতে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির পথে আপনি বাধা পড়িবে, আর যে সন্ততি হইবে তাহারা জ্ঞানবান, দীর্ঘবান ও তেজস্বী হইবে। অতএব দেখুন, শিক্ষকার্য এবং জনসংখ্যা উভয়দিকেই বানপ্রস্থ আশ্রম আজ বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থ, আর একটি কথা বলিব। গোড়ায় হৃদয়ের বিকাশ দিবে, পরে বুদ্ধির এবং তার পরে ব্যবহারিক কুশলতার। হৃদয়ের বিকাশ হয় ভক্তির পথে, ভজন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, গৃহসজ্জা, রন্ধন, এই সব কাজের মাধ্যমে। রন্ধনের মত কাজ নাই। ইহাতে হৃদয়ের বিকাশ সাধিত হয়। যাকে আমরা যদি অনেক কিছু বকশিস দিয়া বলি, তোমাকে মাসা করিয়া ছেলেদের খাওয়াইতে হইবে না, তবে তাহার মাথা আনা কাজ ফুরাইয়া যায়। আমার মনে পড়ে, আমরা যখন সমবয়সী আশ্রমে থাকিতাম তখন খাওয়ার সময় বাপু উপস্থিত থাকিলে পরিবেশনের কাজ তিনি নিজে করিতেন। তাঁহার হাতের স্পর্শ করা খাবার আমরা সবাই খাইতাম। ঐ পরিবেশনের মধ্যে তাঁহার কাছে যাহা পাইয়াছি, তাঁহার ব্যাখ্যানের মধ্যেও তাহা পাই নাই। শৈশবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াছিলেন। উহার অবতারলীলা শৈশবেই হইয়াছে। সেজন্য এদেশে বালগোবিন্দের পূজা প্রচলিত আছে।

কিন্তু অবস্থাবলীলার এত সব দেখিয়াও তাঁহার পিতার মনে হইল তাঁহাকে ঠিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। তাই তাঁহাকে গুরুর কাছে পাঠান হইল। গুরু এক মাসের মধ্যেই সার্টিফিকেট দিয়া দিলেন, বলিলেন, আপনি জ্ঞানী, আপনার সকল বিদ্যা সমাপ্ত হইয়াছে, আপনি এখন যাইতে পারেন। আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন, আপনি বর প্রার্থনা করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কি প্রার্থনা করিব, আপনি আমাকে অনেক দিয়াছেন, আমি সবই পাইয়া গিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ কৃতকৃতার্থ, পূর্ণকাম ছিলেন। এ তো শুধু অভিনয় করা। তবু গুরু বলিলেন, তাহা হউক, গুরুর মর্যাদা রাখিতে কিছু প্রার্থনা কর। কৃষ্ণ তখন চাহিলেন, মাতৃহস্তের ভোজনম্—আমি যেন চিরদিন মায়ের হাতের রান্না খাইতে পারি। আপনারা হয়তো জানেন না, শ্রীকৃষ্ণজননী পুত্রের প্রয়াণের পর দেহত্যাগ করেন। তাই বলি, ভোজনশাস্ত্র হৃদয়বিকাশের শাস্ত্র। প্রেমভরে, আন্তরিকতার সহিত খাওয়াইতে হইবে। একদিন ভগবান বুদ্ধের এক শিষ্য এক ব্যক্তিকে বুদ্ধের কাছে আনিয়া বলিলেন, ইহাকে ধর্মদীক্ষা দিন। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি খাইয়াছ? লোকটি বলিল, আমি কাল থেকে উপবাসী আছি। তখন ভগবান শিষ্যকে বলিলেন, আগে উহাকে খাইতে দাও। শিষ্য বলিলেন, কিন্তু আপনি উহাকে ধর্ম দীক্ষা তো দিলেন না। বুদ্ধদেব বলিলেন, মূর্খ, ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোই ধর্ম। ও ক্ষুধার্ত ছিল। ক্ষুধিতকে অন্নদানই ধর্ম। এই কথা আমাদের শিখিতে হইবে। শৈশবেই মা শিশুকে আপন হাতে মাখিয়া খাওয়ান, উহাতে শিশুর হৃদয় বিকশিত হয়। আজকাল ছেলেদের রন্ধন শিক্ষা দেওয়া হয় না। শুধু মেয়েদের এই কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। পুরুষদেরও রান্নার কাজ করা চাই। ঐ কাজের মধ্যেই সারা হৃদয়ের প্রেম প্রবাহ চলিতেছে, কাজেই এই রন্ধন কাজের মধ্যে হৃদয়-বৃত্তির শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিরও বিকাশ হইবে। শাস্ত্র, বিজ্ঞান, বয়ন বিদ্যা, গৃহ নির্মাণ, ব্যবহারিক নিপুণতা এই সবের শিক্ষা দেওয়া পিতার কাজ। আর হৃদয় বিকাশের প্রথম ধাপ সুরু হইবে গৃহকর্মের মাধ্যমে, তারপর আসিবে লেখাপড়া, বাহিরের কাজকর্ম, অন্য সব। ইহার অর্থ এই নয় যে, ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন নাই। ইহার অর্থ, শিশুর শিক্ষায় রন্ধন, ভোজন করানো প্রভৃতি মুখ্য স্থান লাভ করিবে। এই সব কাজের দিকে দেখিলেই বোঝা যাইবে যে শিশুর শিক্ষাদানের সময় মাতা-পিতা এবং গুরু-গুরুপত্নী দুইজনেরই আবশ্যকতা আছে। এই দুইয়ে একত্র না থাকিতে পারিলে শিশুর বিদ্যালাভ হইবে না। যাঁহারা শিক্ষার বর্তমান ঠাট তৈয়ারি করিয়াছেন তাঁহারা বলেন এতদিন পর্যন্ত শিক্ষা, তারপর ভক্ষণ ও রক্ষণ। ইহা মস্ত ভুল। শিক্ষা তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলে। আমি তো এত কাঠখোট্টা যে কাহারও পেট ব্যথা হইলে আগে তাহার কারণ অনুসন্ধান করি, এবং কারণ নির্ণয় হইলে আনন্দ অনুভব করি। ঐ ব্যথার জন্য আমার চিন্তা নাই, কিন্তু ব্যথার কারণ-নির্ণয় করিতে না পারিলে আমার দুঃখ হয়। কারণ নির্ণয় না হইয়াই যদি ব্যথা সারিয়া যায়, তবে আমার দুঃখ হয়। হায়, গুরু আসিলেন কিন্তু জ্ঞান দান না করিয়াই চলিয়া গেলেন! এই ভাবে পেটের ব্যথাও আমাদের গুরু। মরিয়াও কেহ আমাদের গুরু হন, আবার জন্ম গ্রহণ করিয়াও কেহ গুরুর আসন পান। তেমনই, সারা দুনিয়ার আমাদের শিক্ষার জন্য গ্রন্থের পর গ্রন্থ পড়িয়া আছে। সকলের কাছেই আমরা জ্ঞান লাভ করি। গীতায় আছে,

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।

যিনি নিঃসঙ্গ হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে স্থির হইয়া গিয়াছে, তিনি কর্ম করিলেও যজ্ঞের জন্য

তাহা করেন। কর্ম ইহার বন্ধন নয়। ইহাতে কতটুকু জ্ঞান লাভ হইবে, সেই দিকে ইহাদের দৃষ্টি থাকে। ইনিই ইহার মতে আদর্শ শিক্ষক। আপনারা এই আদর্শ মানুন আর না-ই মানুন, এইরূপ ব্যক্তি যে কোন কাজ করেন তাহাই জ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়। রোগে ভুগিলেও জ্ঞানের বলেই ঐ রোগের অবসান হয়। ইনি কাজ করেন, চক্ষু দিয়া দেখেন, বা কান দিয়া শোনেন, সব কিছুরই পর্যবসান হয় জ্ঞানে। এই ভাবে ইহার সকল কর্ম জ্ঞানময় হইয়া উঠে। নদী তালিমের রহস্য এইখানে —ইহাতে জ্ঞান ও কর্মের ভেদ লোপ পাইয়া যায়।*

* নদী তালিম, ১৯৩৪ সনের জুন সংখ্যা হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে।

শুভ শিক্ষা, অশুভ দৃষ্টি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

কিছু দিন আগে কোন সমাবর্তনভাষণে ডক্টর মির্জা ইস্‌মাইল্ বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার কথা, বুনিয়াদি বিদ্যালয় শিক্ষায়তন নয়, মজুর সৃষ্টির কারখানা। এ-কথা নূতন নয়। পূর্বে আরও অনেকে বলিয়াছেন। লোকে যাহাদের বিবেচক বলিয়া জানে তাহাদের কথায় বিনা বিচারেও লোকে প্রভাবিত হয়। বিবেচক বলিয়া মির্জা ইস্‌মাইল্ সাহেবের খ্যাতি আছে।

বুনিয়াদি শিক্ষা যে মজুর তৈরি করে না এ-কথা মির্জা ইস্‌মাইল সাহেব জানেন না ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত। মির্জা ইস্‌মাইল সাহেব জানেন যে গান্ধী চাহিয়াছিলেন নূতন সমাজ রচনা করিতে, নূতন মানুষ গড়িতে। পুরাতন ছাঁচে-গড়া মানুষ দিয়া নূতন সৃষ্টির কাজ চলে না। তাই গান্ধী নব সৃষ্টির জন্য নূতন মন গড়িতে চাহিয়াছিলেন। বুনিয়াদি শিক্ষা হইতেছে সেই নূতন মন গড়ার নূতন ছাঁচ।

কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকে মজুরিই বা বলিব কেন? শিক্ষা উদ্দেশ্য, আর উৎপাদক শরীর-শ্রম তার অবলম্বন। এ-দৃষ্টিতে দেখিলেই ত জিনিষটা স্পষ্ট হইয়া যায়। আর এই দৃষ্টিতেই ত দেখার কথা। জড় পদার্থ বৃদ্ধি, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য সমর্থ মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু উলটো চশমা আমরা পরি আর উলটো আমরা দেখি।

বুনিয়াদি শিক্ষার পরনা মুণ্ডও নয়, গৌণও নয়। বুনিয়াদি শিক্ষায় কাজ শিক্ষায় বাহন, এ-কথা বলা যায়। কাজ করিলে তার ফল ত আছেই। সে ফল কি ফেলিয়া দিব? বুনিয়াদি শিক্ষায় যে পরনা হয় তাহা খাঁটি প্রাপ্তি।

এ-কথার পরে জিজ্ঞাসা করিব, পরনা যোগফলের উপর যদি যোগও দেওয়া হইত ত ক্ষতি ছিল কি? উলটো বলিব, লাভ-ই হইত। পাশ-শিক্ষা গ্রহণের হাত হইতে ছাত্রসমাজ অব্যাহতি পাইত। আর অব্যাহতি পাইয়া মানুষ হইত। আর যে শিক্ষা চলিতেছে তার বদল আসে কোথা হইতে? আসে আবশ্যকের আর হইতে। কথাটায় খটকা লাগিতে পারে। স্মরণ করাইয়া দিই যে যখনই মজুরিবাধনের প্রশ্ন ওঠে, সরকার বিরোধিতা করিয়া বলে, মজুরিবাধনের কথা বলছেন, কথা ত ভাল। কিন্তু মজুর নিয়োগ করলে আবকারির আয় থাকবে না। আর আবকারির আয় গেলে

শিক্ষায় ব্যয় কোথা থেকে আসবে?" তার মানে লোককে বেশায় প্রলুব্ধ করিয়া জাহান্নমে পাঠাইয়া, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে পথে বসাইয়া পরিবারকে উচ্ছন্নে দিয়া, মানুষকে পশু বানাইয়া যে পয়সা আসে তাহা দ্বারা সরকারী শিক্ষা বিভাগের সমগ্র না হোক, অধিকাংশ খরচ চলে। আর বহুলোককে যমালয়ে পাঠাইয়া যে আয় হয় সেই আয় হইতে আমাদের নন্দ দুলালদের শিক্ষার সুযোগ বা দুর্যোগ হয়। আমাদের নন্দদুলাল মানে মধ্যবিত্ত আমাদের পুত্র-কন্যা নন্দদুলালেরা দুইটি পয়সা মূল-বেতন রূপে দেয়। আর ঐ বেতন দিয়া শিক্ষককে মনে করে পয়সাদ-কেনা নোকর। নোকরের সহিত মনিবের ভক্তি ভক্তির সম্বন্ধ নয়। হাটের সম্বন্ধ। তাই আজ মূল-মন্ত্রের চরম উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে। বুনিয়াদি শিক্ষায় এই উচ্ছৃঙ্খল ভাব সৃষ্টির ও পুষ্টির প্রশ্ন নাই। বুনিয়াদি শিক্ষা প্রাচীন গুরুকুল শিক্ষার আধুনিক যুগোপযোগী রূপ। তাহা নূতন সমাজ, নূতন দুনিয়া গড়ার শিক্ষা। বস্তুত স্বয়ং স্বাবলম্বী বলিয়া বুনিয়াদি শিক্ষা সমাজের একাংশের চরম সর্বনাশের ভিত্তিতে রচিত সৌধ নহে। তাই বলিতেছিলাম, বুনিয়াদি শিক্ষা যদি মজুরি শিক্ষাও হইত ও তাহা নিষ্পাপ হইত, অতএব চলতি শিক্ষা হইতে শতগুণ শ্রেষ্ঠ হইত।

আর কাজে এত ঘৃণাই বা কেন? যে অন্ন না হইলে আমার জীবন বাঁচে না, সে অন্ন ত শরীর-শ্রমেই উৎপাদন করিতে হয়। বস্ত্রের জন্য যে কাপাস হরকার তাহা ত ক্ষেতেই ফলাইতে হয় শরীর-শ্রমে। তবুও উৎপাদক শ্রমে আমাদের বিজাতীয় ঘৃণা। যাহা বন্দনীয় তাহাই আজ নিন্দনীয়। নিন্দনীয় ত হওয়া চাই অনুৎপাদক শ্রমের। পরের মাথায় যাহারা কাঁঠাল ভাঙিয়া খায় তাহাদের আমরা বলি বুদ্ধিজীবী। কবে কোন একদিন বলিবে— "শরীর-শ্রমে যদি আপনাদের এতই ঘৃণা ও বৃদ্ধি, যার এত বড়াই আপনারা করেন সেই বুদ্ধিই আপনারা খেয়ে থাকুন।"

আশ্চর্যের ব্যাপার! আমরা মধ্যবিত্তরা মনে করি চিরকাল আমরা মধ্যবিত্তই থাকিয়া যাইব। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রমিক হইতেছে আর শ্রমিক মধ্যবিত্ত হইতেছে। নিত্য এই পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই নির্মম সত্যটা আমরা স্বীকার করিতে চাই না। যে অবস্থায় আছি তাহা বজায় থাকুক তাহাই আমাদের ইচ্ছা আর সে-দিকেই আমাদের চেষ্টা। মধ্যবিত্তের desk-bias-এর মূলে রহিয়াছে এই অনড় মানসিক স্থিতি। আর এই ডেস্ক-প্রীতির কারণে নিয়তর ঘটমান উত্থান-পতনরূপ পরিবর্তনের দিক হইতে আমরা মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছি।

মধ্যবিত্ত লোকেরা শ্রমকে ঘৃণা করে। তাহারাই আবার আর এক প্রকার শ্রম করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করে, শ্লাঘা বোধ করে। শ্রম না করিলে শরীর টেকে না, মুখে ভাত রুচে না। তাই তাহারা পেটের ভাত হজম করার জন্য মুগুর-ভাবেল ভাঁজে, রিংএ হোলে, ফুটবল-ক্রিকেট করে। হজমের কাজে তাহাদের রুচি, উৎপাদনের কাজে তাহাদের মহা অরুচি। ব্যায়ামের জন্য, ব্যর্থ অনুৎপাদক শ্রমের জন্য আমরা সময় ও পয়সা দুই-ই খরচ করি। ব্যায়ামাগারে কি দিয়া আমরা গলদ্ঘর্ম হই। যত অরুচি উৎপাদক শ্রমে!

ব্যায়ামকে 'ব্যর্থ শ্রম' বলিয়াছি। অনেকের আপত্তি হইবে। বলা হইবে ব্যায়ামে দিব্য-কান্তি লাভ হয়। উত্তরে বলিব, ব্যায়াম না করিয়াও দিব্য কান্তি লাভ হয়। ট্রামে কোথাও যাইতেছিলাম। কোন খানার জায়গায় ট্রাম আসিয়াছে। দেখিলাম বাঁশের দোকান হইতে একটি লোক ঠেলা গাড়ীতে বাঁশ তুলিতেছে। দুই চোখ ঝলসিয়া গেল। নিশমিশে কালো রং। কিন্তু কী অপরূপ সৌষ্ঠব। দেহযষ্টি উন্নত, পেশী সবল-সুদৃঢ়, যেন কাল পাথরে কুঁদান ভব্য ভীষ্মমূর্তি। মুহূর্তে মনে হইতে লাগ-

সৌন্দর্য উপভিত্তা পড়িতেছিল। বহু বর্ষের কথা, আজও সেই দেহ চোখে ভাসে। সেই রূপের কাছে, সামর্থ্যের কাছে নিঃএ-কোলা, ভাবের তাঁহা ব্যায়ামীর রূপ ও সামর্থ্য লজ্জায় ম্লান হইবে।

পয়সা খরচ করিয়া, ব্যায়ামাগারে গিয়া অনুৎপাদক শ্রম আমরা করি। আর সৌন্দর্যও বোধ করি। আর যে বিদ্যালয়ে উৎপাদক শ্রমের মাধ্যমে দেহ মন যুগপৎ সুগঠিত হয় সেই শ্রমকে বলি মজুরি। একেই বলে বিপরীত বুদ্ধি।

সমাজের অসমতা আমরা দূর করিতে চাই। শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি না পাইলে সমাজের অসাম্য দূর হইবার নয়। বুদ্ধিবাদি শিক্ষাকে যাহারা মজুরি আখ্যা দেন শ্রমকে তাঁহারা মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নহেন। অতএব সামাজিক অসমতা দূর করার কথা যাহা বলি তাহা মুখের কথা।

সাহিত্যে দীক্ষা—বিদ্যালয়ে

শ্রীবকুলমালা সেন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাহিত্যালোচনা করিতে গিয়া অনেক শিক্ষিকা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

নবম দশম শ্রেণীর সহিত প্রথম পরিচয়ের প্রাক্কালে বিশেষ বিশেষ ছাত্রীর সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা অর্জন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সমগ্রভাবে শ্রেণীকে বুঝিয়া না লইলে অধিকাংশের উপযোগী পন্থা অবলম্বনে অসুবিধা ঘটে বলিয়া প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টায় পরীক্ষামূলক মনোভাব লইয়াই শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

নবম শ্রেণী, বাংলা সাহিত্য। 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা" ছাত্রীরা ইতিপূর্বে পড়িয়াছে—তাহারা আনন্দে জানাইল। প্রবন্ধটি তাহাদের ভাল লাগে কিনা এবং কেন ভাল লাগে, এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া শিক্ষিকা ছাত্রীদের একটি প্রবন্ধ রচনা করিতে বলিলেন। তাহারা ভারি খুশী হইল। কারণ গত বাষ্মাসিক পরীক্ষায় এই প্রশ্নটিই তাহাদের প্রশ্নপত্রে সন্নিবিষ্ট ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ইহা ভালরূপ আয়ত্ত করা আছে। মিনিট দশেক লিখিবার সময় দিয়া শিক্ষিকা কয়েক জনকে তাহাদের রচনা পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। দশ বারোটি বালিকা পরপর তাহাদের রচনার কতকাংশ পড়িয়া গেল। শিক্ষিকা অবাক হইয়া দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে মাত্র একজন বাদে অন্যান্য সকলে, এমন কি চিহ্নিত ভাল ছাত্রীরাও হুবহু একই ভাষায় একই কথা লিখিয়াছে। কচিৎ দু-একটি শব্দের প্রয়োগে সামান্য পার্থক্য কাহারও কাহারও লেখায় দেখা গেলেও প্রায় প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে প্রতিটি বাক্য মিলাইয়া লওয়া চলে। অপর কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষিকা জানিলেন, তাহারাও একরূপই লিখিয়াছে। যদি কেহ অন্য ভাষায় অন্য ভাবে অবতারণা করিয়া থাকে, তাহাকে শিক্ষিকা পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন, কিন্তু কেহই দাঁড়াইল না।

শিক্ষক বা শিক্ষিকা শ্রেণীতে আলোচনার সময় যে ভাবে বিষয়টির অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই মনে রাখিয়া লিখিয়া থাকিলে প্রকাশ এরূপ হইতে পারে বটে, কিন্তু এমনভাবে প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে প্রতিটি বাক্য মিলিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং কোন একটি বিশেষ নোটবুকের

তাহা তাহারা বর্ণন করিয়াছে। সকলেই লিখিয়াছে শকুন্তলা প্রকৃতির দুহিতা। কিন্তু প্রকৃতির দুহিতা বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নাই দেখা গেল।

দুই দিন পরে। রচনার ঘণ্টায় কোন একটি বিষয় বস্তু সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর শিক্ষিকা রচনাটি ছাত্রীদের বাড়ি হইতে লিখিয়া আনিতে বলিলেন। ভাল ছাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল—পয়েন্টস্ বলে না দিলে কি করে লিখবো? আগে যিনি পড়াতেন, তিনি প্রত্যেক রচনার পয়েন্টস্ বলে দিতেন।

বলা বাহুল্য এরূপ অনিষ্টকর সাহায্য তিনি ছাত্রীদের করিলেন না। দিন কয়েক পরে তাহাদের রচনার খাতা হাতে পাইয়া শিক্ষিকা বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত পর্যবেক্ষকের মন লইয়া সেগুলি পড়িয়া দেখিলেন। দেখিলেন বাক্যরচনা-গত ও বানানগত বিশুদ্ধতার তারতম্য বাদে খুশী হইবার মত কোন বিশেষত্ব কোন লেখায় নাই। অধিকাংশ রচনাই কোন রচনা পুস্তকের হুবহু নকল। কেহ কেহ রচনা পুস্তকে লিখিত প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য কমাইবার মানসে স্থানে স্থানে গোটা কয়েক করিয়া পংক্তি বাদ দিয়াছে। তিনিত ভাল ছাত্রীদের মধ্যে কাহারও কাহারও রচনায় একটু পার্থক্য দেখা গেল। তাহারা বিষয়বস্তুর উপর কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়া অনাবশ্যক কতকগুলি বিশেষণ এবং তাহাদের বিবেচনায় সুললিত কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়া রচনাকে একটা বাহ্যিক সৌষ্ঠব দিতে চেষ্টা করিয়াছে। হয় তো পূর্বদিনের শ্রেণীর আলোচনায় তাহারা বুঝিয়াছে যে নোটবুক অথবা রচনাপুস্তকের নকল শিক্ষিকা পছন্দ করিবেন না। আবার বিষয়ের আলোচনা শুনিয়া তাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া লওয়াও তাহাদের আয়ত্তাধীন নহে। সুতরাং বিষয়টিকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া সেই অস্পষ্ট কাঠামোটিকে যথাসম্ভবে সুসজ্জিত করিয়া তাহাদের মুখরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শিক্ষিকা বুঝিলেন, বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কোন কোন উপাদান কি ভাবে সন্নিবেশ করিয়া তাহাকে প্রবন্ধের আকার দিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া না দিলে প্রবন্ধ রচনা করা তাহাদের সাধ্যাতীত। প্রথম দিন 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার' প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষিকা ছাত্রীদের রচনার দুর্বলতার যে আভাস পাইয়াছিলেন, আজ তাহা সুস্পষ্ট রূপেই ধরা পড়িল। বিষয় সম্বন্ধে ধারণা যদি সুস্পষ্ট থাকে এবং ভাষার যদি সামান্য অধিকার থাকে তাহা হইলে কেহ পরের ভাষা মুখস্থ করিবার দুর্ভোগ স্বীকার করে না। শ্রেণীর আলোচনায় ছাত্রীগণের অধিকাংশকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই শিক্ষিকার ধারণা জন্মিয়াছিল, সাধারণ হইতে নিম্নস্তরের নয়। তবে তাহারা না বুঝিয়া মুখস্থ করার পথই বাছিয়া লইল কেন? ইহা কি হাতের কাছে নোটবুক থাকার ফল? একবার এক ভদ্রলোকের সহিত শিক্ষিকার পরিচয় ঘটিয়াছিল। বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার দাঁতের জোর এত বেশি ছিল যে তিনি তিলের নাড়ুর মত শক্ত পদার্থও অনায়াসে চিবাইয়া খাইতেন। কিন্তু পান খাইবার সময় তাঁহার দন্তশক্তি ব্যবহার করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ সেবাপরায়ণা অন্তঃপুরিকারা সর্বদাই হামানদিস্তায় পান ছেঁচিয়া দিতেন। নোটবুকের সহায়তা হয় তো এই ভাবেই ছাত্রীদিগকে সাহিত্যের অন্তর্লোকে প্রবেশে বাধা দিতেছে। নোট বুকের বাঁধা ঘাট হইতে তরী বাহিয়া অনায়াসে ওপারে উত্তীর্ণ হওয়া যখন চলে তখন সন্তরণের দুর্ভোগ ভোগ করিবে কে? বিষয়ের সহিত সর্বাঙ্গীণ সংযোগের প্রয়োজন যে আছে এই প্রয়োজনবোধের অভাবই সাহিত্য-পাঠনার মূল উদ্দেশ্যের বিনাশ ঘটাইয়াছে।

রচনায় ছাত্রীদের যে শকুন্তলা আজ শিক্ষিকাকে মর্মাহত করিয়াছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়াও শিক্ষিকা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন। শুধু

পার্থক্য এই যে এক্ষেত্রে ছবিটির কাজ করিতেছে প্রধানত শিক্ষকের ভাষ্য রীতি এবং কতকাংশে বাজারে প্রচলিত অসংখ্য রচনা পুস্তক। বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা শিক্ষক বলিয়া দিবেন, এমন কি কোন উপাদানের পর কোন উপাদান কিরূপে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে তাহাও শিক্ষক ছক কাটিয়া স্থির করিয়া দিবেন। তাবার অধিকার অর্জনের জন্য চেষ্টা করারই বা প্রয়োজন কি? রচনা পুস্তক সে অভাব মিটাইবে। শিক্ষক এ বিষয়ে সচেতন হইলে নোটবুক ও রচনাপুস্তকের বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনা ও লেখার ব্যবস্থা করিলে এ দুরবস্থা হইতে ছাত্র ছাত্রীদের অনেকাংশে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু নানা কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব হয় না বলিয়াই দেখা যায়। কারণগুলি সকল ক্ষেত্রেই অনিবার্য কি না, শিক্ষিকার মনে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও আলোচ্য ছাত্রীদের বেলায় তাহা যে নিবারিত হয় নাই তাহা সুস্পষ্ট। ইহাদের এই অন্তঃসারশূন্য ভাষার বিন্যাসে আর একটি বিষয় শিক্ষিকা লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন, বিশেষ করিয়া ভাল ছাত্রীদের বাক্যের গঠনে অধিকাংশ স্থলে ক্রিয়াপদটিকে বাক্যের প্রথমে আনিয়া কর্তাকে বাক্যের শেষে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা যে তাহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ প্রথমত বিষয়-বস্তুর সহিত অনুভূতির সংযোগ না ঘটিলে প্রকাশ ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত রচনাশৈলীর আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। কিন্তু বিষয়বস্তু ইহাদের অনুভবগম্য যে হয় নাই, রচনার প্রতি ছত্রে ছত্রে তাহার পরিচয় আছে। দ্বিতীয়ত সাহিত্যের নানা বিভাগে নানা লেখকের বিভিন্ন ভঙ্গির রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের ফলে তাহার প্রভাবে একটা বিশেষ রচনাভঙ্গি স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এখনও এমনধারার এমন সর্বব্যাপক আধিপত্য ঘটে নাই যে তাহারই প্রভাবে ছাত্রীদের রচনার ভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সুতরাং ইহা কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া ভঙ্গি। সুন্দর রচনার আদর্শ হিসাবে কেহ ইহা তাহাদের মনের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এ ভঙ্গি ভাল কি মন্দ সে কথা বর্তমান আলোচনার অবান্তর। কিন্তু চাপাইয়া দেওয়া মনোভাবের সক্রিয় উৎস কে বা কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আমরা খুঁজিয়া যাই যে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরাই ভবিষ্যৎ সাহিত্যের আশা এবং ভরসা। আমরা যদি তাহাদের নিজস্ব ভঙ্গি গড়িয়া ওঠার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াই, তাহার ফলে অনাগত কালের সাহিত্যের যে ক্ষতি হইবে, তাহা পূর্ণ করিবে কে? নিজস্ব চিন্তাশক্তি জাগরণের এবং নিজস্ব রচনা ভঙ্গি গড়িয়া ওঠার পথে পাথর চাপা দিয়া যে সাহিত্য-পাঠশালা, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া শিক্ষিকা বিস্মিত হইলেন।

আরও কিছুদিন পরে এক রচনা প্রতিযোগিতার ঘটনায় শিক্ষিকা ইহার মূলদেশের যে যেমনধারার পরিচয় পাইলেন, তাহার অভিজ্ঞতা শিক্ষিকার শিক্ষকজীবনে নিদারুণ বজ্রাঘাতের মতই মনে হইল।

সেদিন শ্রেণীর সকল ছাত্রীকে নির্ধারিত রচনাটি লিখিতে বলা হইয়াছে। বলার শ্রেণী। পূর্বদিন শিক্ষিকা বিষয়টি ছাত্রীদের মোটামুটি ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং যে যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এ বিষয়ে রচনা লেখা চলে, তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। যাহাতে ছাত্রীরা নিজেদের ভাবনা-কল্পনা পরিচালনার উন্মুক্ত ক্ষেত্র পায়, সেই ইচ্ছায় "কি করিয়া আরম্ভ করিব, পয়েন্টস্ বলিয়া দিন" প্রভৃতি আবদারে কর্ণপাত করেন নাই।

তিনটি বালিকার উপর শিক্ষকশিক্ষিকা-বৃন্দের বিশেষ ভরসা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাহাদের

অধিকার সুপরিজ্ঞাত। ইহাদের প্রথমা দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শিক্ষিকা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন প্রথমা কিছুই লিখিতেছে না, দ্বিতীয়া অনুপস্থিত, তৃতীয়া বহুক্ষণ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবার পর এক সময় লিখিতে সুরু করিল। প্রথমা লিখিতেছে না কেন জিজ্ঞাসা করায় সে ভুষ্টিত স্বরে বলিল—'বাড়ি থেকে যদি লিখে আনতে দেন, তা হলে লিখে আনতে পারি।' আশ্চর্য, পূর্বদিন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, একদিন ভাবিবার সময় দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও শ্রেণীকক্ষে বসিয়া রচনা লেখা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। শিক্ষিকা বারবার প্রেরণা দেওয়ার ফলে অবশেষে নিতান্ত বিরস মুখে সে লিখিতে প্রবৃত্ত হইল।

লেখা শেষ হইয়াছে। রচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

টিফিনের ঘণ্টা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই স্বল্প সময়ে যে কয়টি রচনা পড়িয়া দেখা সম্ভব হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটিকেই প্রতিযোগিতায় পাঠানোর যোগ্য বলিয়া শিক্ষিকার মনে হইল না। মন দমিয়া গেল। অপর একজন শিক্ষিকা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আমি বেছে দিচ্ছি। যদি ভাল লেখা পান, এদের কাছেই পাবেন। অন্য মেয়েদের লেখা পড়ে বিশেষ কোন লাভ নেই।" তিনি তৃপীকৃত খাতার মধ্য হইতে প্রথমা ও তৃতীয়ার খাতা খুঁজিয়া বাহির করিলেন, সাগ্রহে পড়িলেন, তারপর নিদারুণ নৈরাশ্যে অপরাপর ছাত্রীদের লেখার সার্থক রচনা খুঁজিতে যাওয়া যে ব্যর্থ শ্রমে পর্যবসিত হইবে, তাহা জানাইয়া দুঃখিত চিত্তে চলিয়া গেলেন। শিক্ষিকাও লেখা দুটি পড়িয়া বুঝিলেন এ রচনা পড়িয়া নৈরাশ্যে পীড়িত হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

কিন্তু শিক্ষিকার মনে কেমন একটা খটকা বাধিল। যাহারা আপনাদের অসমর্থতা জ্ঞাপন করিয়া লিখিতে অনিচ্ছুক ছিল, তাহাদের লেখাই শুধু বিবেচনার যোগ্য, আর যাহারা সোৎসাহে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনর্গল লিখিয়া গেল, তাহারা কি শুধুই আবোল তাবোল লিখিয়াছে?

অবসর সময়ে শিক্ষিকা একের পর এক রচনাগুলি পড়িয়া দেখিলেন। বেশীর ভাগই গতানুগতিক হইলেও মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের সন্ধান যে একেবারে মিলিল না তাহা নয়। কিন্তু সব চেয়ে আনন্দের কথা অপর সকলের লেখা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাহিত্যরসসমৃদ্ধ রচনাও একটি পাওয়া গেল। প্রতিযোগিতায় পাঠাইবার উপযোগী রচনা যে পাওয়া গিয়াছে ইহা আনন্দের কথা বটে, কিন্তু চিহ্নিত ভাল ছাত্রীদের প্রবন্ধ রচনার এই অসামর্থ্য নিতান্তই বেদনাদায়ক। ইহা কি আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতি সচেতনতাপ্রসূত অবহেলার ফল? শিক্ষিকা তাহাদের আর একবার সুযোগ দিয়া দেখিবেন স্থির করিলেন।

পরদিন পুনরায় সুযোগ পাইয়া প্রথমা দ্বিতীয়া ও নির্বাচিত রচনাটির লেখিকা ছাত্রীটি পুনরায় লিখিল। পূর্বদিনের লেখাগুলির মধ্যে ভাল রচনা বেশি পাওয়া যায় নাই বুঝিয়া আর আর প্রথমা অথবা দ্বিতীয়ার লিখিতে অনিচ্ছার প্রকাশ দেখা গেল না। বরঞ্চ প্রথমার মুখে কেমন একটা অসহায় ভাব যেন ফুটিয়া উঠিল।

পরবর্তী অবসরের ঘণ্টায় শিক্ষিকা রচনাগুলি পড়িয়া দেখিলেন। দেখিলেন পূর্বদিনের নির্বাচিত রচনাটির লেখিকা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ অবতারণায় ও পরিণতিতে এমন একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছে যাহা তাহার প্রথম দিনের রচনা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাহা যে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; দ্বিতীয়ার রচনাটিও চলনসই বলা চলে। কিন্তু প্রথমার রচনাটি একেবারে ব্যর্থ রচনা। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল, দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী অবতরণিকায় বড় বড় গালভরা বিশেষণের সমাহার

এবং প্রায় প্রতি ছত্রে ক্রিয়াপদ আগে বসাইয়া রচনা ঝোরালো করিবার বিফল প্রয়াস।

প্রথম যেদিন পরীক্ষামূলক মনোভাব লইয়া শিক্ষিকা ছাত্রীদের রচনা লিখিতে বলিয়াছিলেন, সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িল। আজ নিঃসন্দেহে জানা গেল, অহঙ্কারজনিত অবহেলা নয়, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত কোন সম্পূর্ণ রচনায় কাঠামো হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়াই আজ সে এমন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রায় সর্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া যে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকে বিশেষ করিয়া তাহার মধ্যেই অক্ষমতা এমন নগ্ন মূর্তি লইয়া প্রকাশ পাইল কি করিয়া?

অথবা বলিয়া অবহেলিতা ছাত্রীটির রচনাই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে জানা গেল। প্রথম ও দ্বিতীয়া কোন বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এ সংবাদ যতখানি আনন্দের ততখানিই দুঃখের। যে এতদিন যোগ্যতার সুযোগ না পাইয়া নিরুৎসাহের মধ্যে পড়িয়াছিল, এই সাফল্যের স্বীকৃতিতে সে যে পূর্ণ বিকশিত হইবার বহু দূর অগ্রসর হইবার পথ পাইবে, এ আনন্দের সীমা কোথায়? আর যে বা যাহারা এতদিন সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সর্বোচ্চে আপনাদের স্থান স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করিয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহাদের বিশেষে চিত্তে এ অকৃতকার্যতার দুঃখ যে হতাশা আনিয়া দিবে, তাহার জন্য দায়ী হইবে কে?

একদিন আপনাদের শক্তির পরিচয় দিয়াই যে তাহারা শিক্ষক শিক্ষিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে শক্তি এভাবে পঙ্গু হইয়া গেল কেন?

এ বিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়া শিক্ষিকার মানস-নেত্রে বিগত কয়েক বৎসরের আনুষাঙ্গিক ইতিহাস ছবির মত ভাসিয়া উঠিল।

ছুচারিটি ছাত্রীর রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির বিকাশ দেখিয়া কোন একদিন শিক্ষক বা শিক্ষিকার দৃষ্টি তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইলে তিনি সানন্দে চিত্তে তাহাদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্যের পন্থা নির্বাচনে ভুল হইল। তিনি চিন্তা বা কল্পনাশক্তি জাগ্রত বা পরিবর্ধিত করার দিকে মন দিলেন না। যে পন্থায় মৌলিক ও রচনাসূত্রের প্রাচুর্য চিন্তাশক্তি জাগ্রত করায় ও স্বকৈশিষ্ট্যে তাহা গড়িয়া ওঠার পথে যারা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তিনিও সেই পন্থাই অনুসরণ করিয়া যাহাকে আরও ঝোরালো করিয়া তুলিলেন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনার অকুণ্ঠ পরিবেশনে। তা ছাড়া শব্দ চয়নে ও বাক্যগঠনেও আপনার পছন্দ অনুযায়ী বিশেষ ধারাটি তাহাদের মনে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া অভ্যাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। সুতরাং চিন্তা ও কল্পনাশক্তি—যাহা রচনার সর্বপ্রধান সহায়, উন্মীলনের প্রথম ক্ষণেই তাহাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইল। তাহাদের কাজ হইল শুধু হাতে তুলিয়া দেওয়া উপাদানসমষ্টিকে কথায় সাজাইয়া অলঙ্কৃত করা। এই অলঙ্করণের ভাষাতেও তাহাদের স্বাধীনতা থাকিল না। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠা ছাত্রীটিই সর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগের পাত্রী হওয়ায় তাহার দুর্দশাই হইয়াছে সর্বাধিক। ফুটনোন্মুখ ফুলের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কেহ যদি তাহার পাপড়িগুলি টানিয়া টানিয়া খুলিয়া আপনার ইচ্ছানুযায়ী আকার দিবার ভার লয়, তাহার ফলে দ্বিপর্ণ ফুলটি ফুটন্ত ফুলের একটা বিকৃত আকার পায় মাত্র। আপনার প্রাণশক্তির সুষমায় মাধুর্যময় হইয়া উঠিবার সকল সম্ভাবনাই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ ফুলে যে বাহ্য-পূজার অর্ঘ্য রচনা করা চলে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

যাহারা হয়তো একদিন চিন্তাশীল সুলেখক শ্রেণীর মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া বাংলা সাহিত্যের

সম্বন্ধ করিতে পারিত, এমনি করিয়াই তাহারা শুধু পরের কথার বোঝা পরের ভাবার পরের তত্ত্বিতে পরিবেশনের যন্ত্রে পরিণত হইবার পথে চালিত হইল। ইহার দ্বারা বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার পথ রুদ্ধ হয় না, এবং বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্তন না ঘটিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা উন্মুক্ত পাওয়ার পথেও বাধা অস্বিবার কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এই অপরিসীম ক্ষতির সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরাই শুধু নয়, তাহাদের অভিভাবক এবং বিদ্যালয়কর্তৃপক্ষও সমভাবেই অবহিত থাকেন।

ইহারই পাশাপাশি অনুধাবন করা চলে অবহেলিত ছাত্রীদের ইতিহাস। বিপুল সংখ্যক ছাত্রীসম্বলিত শ্রেণীতে অন্যান্য ছাত্রীরা প্রায় অনিবার্য কারণেই শিক্ষকের মনোযোগের গণ্ডীতে আসিতে পারে নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ীভিত্তিক হওয়ায় তাহার সুফলের অংশ-ভাগী তাহাদেরও হইতে হইয়াছে। তাহার ফলে অল্প সম্ভাবনাসম্পন্ন ছাত্রীদের, যাহাদের সুপ্ত শক্তি অনুকূল পরিবেশে হয় তো একদিন জাগিয়া উঠিতে পারিত, তাহাদের সে সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত বেশী সম্ভাবনাসম্পন্ন যাহারা, তাহারা বিশেষ যত্ন লাভের দুর্ভাগ্য হইতে মুক্ত থাকার জন্য বিরুদ্ধ শিক্ষাদান পদ্ধতির বাধা কাটাইয়া একদিন বিকশিত হইতে সুরু করিল। ব্যক্তিগত স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে তাহাদের মধ্যে অনেকে উৎসাহ ও প্রেরণার অভাবে হয়তো ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, অতি অল্পসংখ্যক হইলেও কেহ কেহ আবার উৎসাহ এবং প্রেরণা না পাইলে, তাহাদের যোগ্যতার স্বীকৃতির অভাব ঘটিলে, আরও দৃঢ় আরও অনমনীয় হইয়া উঠে। বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে যোগ্যতার পুরস্কার না মিলিলেও বাহিরের উদার অনুকূলতর ক্ষেত্রে জয়মাল্য তাহারা পাইবেই—এমনি একটা প্রবল আশা তাহাদের যাত্রাপথের সকল বাধা অপসারিত করে। প্রতি-যোগিতায় বিজয়িনী বালিকাটি এই দ্বিতীয় দলভুক্ত বলিয়াই শিক্ষিকার মনে হইল।

ব্যক্তির বিকাশ, জাতির উন্নতি শিক্ষকের হাতেই ন্যস্ত, ইহা একবাক্যে সকলে স্বীকার করা সত্ত্বেও শিক্ষকের যোগ্য সম্মান সমাজ দেয় না, ইহাই আমাদের অভিযোগ। কিন্তু যেখানে ন্যস্ত অধিকারের এরূপ অপব্যবহার, সেখানে এ অভিযোগের সত্যতার কোন অধিকার আছে কি? অপরিসীম অপরাধের উপলব্ধিতে শিক্ষিকার মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সামাজিক জীবনে শিশুর ক্রমপ্রবেশ

[শ্রীনীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়]

শিশুসমাজে নানা প্রকার শিশু দেখা যায়, কেহ অত্যন্ত চঞ্চল কেহ শান্তশিষ্ট, কেহ কলহ প্রিয়, কেহ অবাধ্য, কেহবা সব সময় প্রশ্ন করে, কেহবা চুপ চাপ থাকে, ইত্যাদি। এই সকল শিশু প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে মোটামুটি ইহাদের চার শ্রেণীতে ভোগ করা যায়। যেমন কর্মঠ, কল্পনা প্রবণ, ভাবপ্রবণ ও চিন্তাপ্রবণ। সাত কিম্বা আট বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের কর্মপ্রবণ দেখা যায়। যে সকল শিশু কর্মঠ হয় তাহারা অলসপ্রকৃতি ও সহিষ্ণু হইয়া থাকে। কোন কোন কার্য বা উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত বোধ করে না। কর্মপ্রবণ শিশুর জীবনে কতকগুলি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক লক্ষণ দেখা যায়।

কর্মপ্রবণ শিশুদের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল থাকে। সাধারণতঃ তাহারা সুগঠনে না হইলেও তাহাদের মাংসপেশী দৃঢ় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়। তাহাদের চোখ উজ্জ্বল ও মুখমণ্ডল বেশ প্রসন্ন থাকে, কর্মপ্রবণ শিশুরা খুব স্ফূর্তিযুক্ত হয়। তাহাদের প্রত্যেক কাজে আনন্দ দেখা যায়। কাজের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে কোন কাজ করিতেই ভালবাসে। ইঙ্গিত করা মাত্র সাড়া দেয়, আদেশ পালন করিতে একটুও ইতস্তত করে না এবং অলসতা প্রকাশ করে না। কর্মপ্রবণ শিশুরা কর্মের প্রেরণায় অনেকক্ষণ কাজ করিতে পারে। কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এই শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সহজ। কারণ ইহারা নিজেরাই ইচ্ছা করিয়া কাজ করিতে চায় এবং শিক্ষকদের আদেশ পালন করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

কর্মপ্রবণতা শিশুর জীবনে সফলতা আনয়ন করে। কাজের প্রেরণা নূতন তথ্য আবিষ্কারে সহায়তা করে। কর্মপ্রবণ শিশু কাজ করিতে ভালবাসে বলিয়া উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে আত্মনির্ভর, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু কর্মপ্রবণ শিশুর মধ্যে একটি দোষ দেখা যায় যে, তাহারা অল্প বয়সে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেও কোন কার্যে অটল থাকিতে পারে না। অসুবিধার সম্মুখীন হইলে কখনও কখনও তাহাদের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। তেমন উপযুক্ত বিচারবুদ্ধি না থাকায় অনেক সময়ে বিপদে পড়ে।

তিন অথবা চার বৎসর বয়স হইতেই শিশু কল্পনার পরিচয় দিয়া থাকে। ছয় হইতে নয় বৎসর পর্যন্ত শিশুর কল্পনাশক্তি বিকশিত হয়। কল্পনাপ্রবণ শিশু সাধারণতঃ কৌণাঙ্গ হয়। অন্তর্মুখিন, চক্ষুর উদাসীনতা, ও বদনমণ্ডলের গাম্ভীর্য প্রভৃতি শারীরিক লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। সে আত্মনির্ভরশীল হইয়া পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে নানা জ্ঞান সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। পরে ঐ সকল দৃষ্ট পদার্থের তথ্যাদি লইয়া মনে মনে সর্বদাই নানা চিত্র অঙ্কিত করে। কল্পনাবলে খেলার পুতুল, কাঠের ঘোড়া অথবা অন্যান্য অচেতন পদার্থসমূহকে চেতন ও প্রকৃত পদার্থ মনে করিয়া তাহার সহিত কথা বলে ও তাহাদের লইয়া নানা প্রকার খেলা উদ্ভাবন করিয়া আনন্দ অনুভব করে। কল্পনাপ্রবণ শিশু কার্যকুশল হয়, তাহার গঠনশক্তি বিকশিত হয় এবং সে কবিতা

ও শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কল্পনাবলে সর্বদা মনে আনন্দ তৃপ্তি অনুভব করে এবং বিচার-বুদ্ধি দ্বারা কথা বলিতে ও কার্য করিতে শেখে। ইহারা সহজেই অন্যের দুঃখ ও দুঃখ অনুভব করে। নানা প্রকার সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ থাকে বলিয়া ইহাদের মন পবিত্রতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণে পূর্ণ থাকে। কল্পনা মানব জীবনকে উন্নত ও মহান্ করে। নানা প্রকার দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে আশা ও আনন্দ দান করে, কিন্তু কল্পনা বিপথে চালিত হইলে জীবনে ক্ষতিও হইতে পারে। কল্পনাপ্রবণ শিশু শুধু কল্পনাই করিতে ভালবাসে, কল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে না। ইহাতে তাহার জীবনে উন্নতির পথে বাধা আসিতে পারে।

শিশুসমাজে আরেক প্রকার শিশু দেখা যায়। তাহারা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়। এই সমস্ত শিশুদের হৃদয়ের ভাব অর্থাৎ স্নেহ, ভালবাসা, ঘৃণা, ক্ষমা ক্রোধ, হিংসা ঘৃণা ইত্যাদি অত্যন্ত প্রবল থাকে।

ইহারা সাধারণত কাঁদুনে, বিষণ্ণ, স্বল্পভাষী ও অভিমানী হয়। সামান্য কারণে হৃদয়ে আঘাত পায় ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সহজে মনের সুখ দুঃখ অপরের নিকট প্রকাশ করিতে চাহে না। কোন কোন শিশু আবার সামান্য কারণেই নিজের মনোভাব শারীরিক অভিব্যক্তি দ্বারা অতিমাত্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এই সকল শিশু বেশ হৃষ্ট, সবল ও প্রফুল্ল থাকে। তাহাদের উজ্জ্বল চক্ষু বুদ্ধির পরিচায়ক হয়। এই শ্রেণীর শিশুরা সর্বদাই বেশ হাস্য কৌতুক দেখাইয়া অপরকে হাসাইতে পারে। ইহারা পরোপকারী দয়ালু এবং চালাকচতুর হয়।

ইহাদের মাথায় নিত্য নূতন ধারণার উদয় হয়। ইহাদের বেশ বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি থাকে। কিন্তু অনেক সময় এই বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ের আবেগ দ্বারা চালিত হয় বলিয়া ইহারা ইহাদের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে পারে না। ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বলিয়া অনেক সময় ইহারা বিপদে পড়ে।

পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুকেও সময় সময় চিন্তা করিতে দেখা যায়। এইরূপ চিন্তাপ্রবণ শিশুর চিন্তার বিশেষ কোন শৃঙ্খলা বা উদ্দেশ্য থাকে না। সাধারণত বারো তেরো বৎসর বয়সে শিশুদের চিন্তাশীলতা সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়।

এই সময় অর্থাৎ কৈশোরের প্রারম্ভে শিশুদের দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অস্থিসমূহ দৃঢ়, বালকদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়। বালিকাদের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখা যায়। ইহাদের স্মরণশক্তি সাধারণত বিষয় ও চিন্তাময় থাকে। চিন্তাপ্রবণ শিশুরা চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতে ভালবাসে। সখী বা আত্মীয় স্বজনের বিষয় খুব কমই লক্ষ্য করে।

অপরের প্রতি সহানুভূতিও খুব কম থাকে। এই শ্রেণীর শিশুদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়। ইহারা অন্যের মত বা অন্যের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে চাহে না। নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া ও নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নূতন নূতন বিষয় জানিতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর শিশুরা বেশ প্রতিভাসম্পন্ন হয় এবং তাহাদের মস্তিষ্ক উর্বর থাকে। বিখ্যাত লেখক, বিচারক ও বৈজ্ঞানিক এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

যেমন প্রত্যেক মানুষের তেমনি শিশুরও একটি সামাজিক ও একটি ব্যক্তিগত জীবন আছে। ব্যক্তিগত জীবন বলিতে তাহার নিজের শরীর মন ও আত্মার সম্বন্ধীয় কর্তব্য বুঝায়, যথা শরীর পালন, জীবিকা অর্জন, নিজ নিজ সুখের প্রচেষ্টা। অন্যের প্রতি কর্তব্য পালন, সামাজিক উন্নতিসাধন, অন্যের প্রতি সহানুভূতি,

দয়া, সহানুভূতি, অন্যের মঙ্গলকামনা ইত্যাদি দ্বারা সামাজিক জীবন বুঝায়। এইরূপ নানা প্রকার কর্তব্য পালন দ্বারা মানবজীবনে সম্পূর্ণতা সাধিত হয়। সহানুভূতি ও স্বার্থত্যাগ দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ নিজ নিজ জীবনে স্বাভাবিক ভাবে সামাজিকতার পরিচয় দেয়। কোন শিশুই তা সে যে শ্রেণীরই হউক, জন্মগ্রহণ করিবার পর প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত কোন সামাজিকতার পরিচয় দেয় না। সেই সময় সে নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকে। নিজের শারীরিক সুখ সুবিধার জন্য নিজের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ভালবাসে। যাহাকে সে অত্যন্ত ভালবাসে সেই মায়ের প্রতিও তাহার স্বার্থপরতার অভিব্যক্তি কম নয়। মা হয়তো একটা জামা শিশুর মুখে তুলিয়াছেন তখন মায়ের হাত হইতে তাহা কাড়িয়া কাটিয়া আঁচড়াইয়া খামচাইয়া যেমন করিয়া হউক ছিনাইয়া লইবার অতি আগ্রহ স্পষ্ট দেখা যায়। মার কোল লইয়া কাড়াকাড়ি, সাথীদের সহিত সামান্য স্বার্থপরতা লইয়া মারামারি ঝগড়াঝাঁটি সর্বদাই দেখা যায়। একজন পাশ্চাত্য শিশুবিজ্ঞানী বলিয়াছেন, "মানুষ জন্মায় পশুপ্রবৃত্তি লইয়া, কিন্তু সে প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠে ক্রমশ উৎকর্ষের দ্বারা। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা দেখিতে পাই উক্ত শিশুই বড় হইয়া নিজে না খাইয়াও মার জন্য ভাল খাবার, মার পছন্দমত বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয় এবং মা তৃপ্তি করিয়া গ্রহণ করিলে নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ বোধ করে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার দয়া, মায়া, সহানুভূতি ও অন্যের মঙ্গলকামনা ইত্যাদি মনোবৃত্তি বিকশিত হয় তখন তাহার সামাজিকতা বৃদ্ধি পায়। সে তখন আর একা থাকিতে ভালবাসে না। কল্পনাবলে মাটির পুতুল, ইট পাথর ইত্যাদিকে বন্ধু করে। দুঃখ কষ্টের কল্পনা করিয়া তাহাদের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করে। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ভালবাসে এবং তাহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। ক্রমে নিজ খেলার সঙ্গী ও প্রিয়জনকে সুখী করিতে ও তাহাদের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে শেখে। সাত, আট বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের সাথীদের সঙ্গে একত্র থাকিতে এবং দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে বা খেলা করিতে ভালবাসে। ঐরূপে সে ক্রমশ বুঝিতে পারে ও অনুভব করিতে পারে যে সম্পূর্ণ একা থাকা বা নিজের ইচ্ছামত কাজ করা অপেক্ষা অন্যের ইচ্ছা মত চলিলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। সুতরাং তাহার একত্ব দূর হইয়া সামাজিকতার আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। তাহার দৈনিক কার্য, খেলাধূলা, চিন্তা, হাবভাব ও কথা দ্বারা বুঝা যায় সে ব্যক্তিগত জীবনে কি ভালবাসে, কোন জিনিসে সে বেশি আসক্ত এবং তাহার মনের গতি কোন দিকে তাহাকে পরিচালিত করিতে চায়। কোন শিশু নানাবিধ যন্ত্রে, কেহ গান বাজনায়, কেহ অঙ্কনে, কেহ খেলাধূলায় আসক্তি প্রকাশ করে। কেহ তাহার অভীষ্ট বস্তু পাইবার জন্য অন্যের দৈর্ঘ ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। কেহ প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু ও তথ্য জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করে ও বাহিরের জ্ঞান সংগ্রহে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। কেহ অন্যান্য শিশুকে নিজের ইচ্ছামত চালাইতে চেষ্টা করে, কেহবা সামান্য বস্তুতেই সন্তুষ্ট হয়। কেহ চঞ্চলতা অপেক্ষা স্থিরতা পছন্দ করে, কেহ সহজেই অন্যের বশীভূত হয়। এই প্রকার বিবিধ উপায় ও কার্যধারা শিশু তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব প্রমাণ করে।

তাহার নিজস্ব শক্তি, চিন্তা ও ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সে যাহা কিছু করে তাহাই তাহার চরিত্রের ব্যক্তিগত উপাদান এবং ঐ সকল দ্বারাই তাহার একক জীবন বিকশিত হয়। অপর পক্ষে এই বিশেষত্ব, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া, সামাজিকতা অনুশীলনের

অন্য শিশু তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলিতে, একত্র থাকিতে ও তাহার প্রিয়জনের সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। অন্যের প্রতি যেন সে দয়া, সহানুভূতি, ক্ষমা, ভালবাসা ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া নানাভাবে তাহাদের সাহায্য করে তখন পরোক্ষ ভাবে সে তাহার সামাজিক জীবনের পরিচয় দান করে।

শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে শিক্ষক শিক্ষিকার তখন বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন শিশুর এই বৃত্তিটি নষ্ট না হয়। কারণ দেখা যায় এই প্রবৃত্তির সাহায্যেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ হয় ও নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। সুতরাং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন শিশুর মনে ভাল হইবার, ভাল কাজ করিবার, ও প্রতিযোগিতার ইচ্ছা জাগরিত হয়। কিন্তু কখনও যেন ঐ প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত না হয়।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয় বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ভোলার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। শিক্ষনের কন্ট্রাক্টের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ভোলার লেন, পোঃ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বাংলার উচ্চশিক্ষা : শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফাল্গুন ১৩৬০। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকখানি বিশ্বভিজ্ঞাসংগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। মাত্র ৬০ পৃষ্ঠার পরিসরে (তাহার মধ্যে ৪ পৃষ্ঠাই সূচী) লেখক ইংরেজি শিক্ষার আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। ইহা বড় সামান্য শক্তির কথা নয়। বিনা,বন্ধ, কোন্ পথে যাই, এই ভাবনায় আমাদের উনবিংশ শতাব্দীতে দেহ বড় কম যায় নাই, এবং লেখক মনে করেন, ইংরেজি শিক্ষায় মোট ফল একেবারে অহিতকর হয় নাই, কিছু কল্যাণও হইয়াছে। আমরাও ইহা স্বীকার করি। তবে 'বিশেষ উক্তি' হইয়াছিল কিনা, সে বিষয় অবশ্য মতভেদ থাকিতে পারে।

কয়েকটি স্থলে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :—

(১) ৪র্থ পৃষ্ঠায়, ৪র্থ পংক্তি, ১৯১৪—অবশ্যই মুদ্রাকরপ্রমাদ, ১৮১৪ হইবে।

(২) শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে (৮ম পৃষ্ঠায়) উহা যে সাধারণ কলেজ নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ও, তাহাও লেখক বলিতে পারিতেন।

(৩) ১৮১৩ সনের সনন্দ আইন ধারাটি যে কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পার্লামেন্ট জোর করিয়া বসাইয়া ছিলেন, তাহাও বলা চলিত।

(৪) ৩৩ পৃঃ কলেজকথার প্রসঙ্গে বলি: এখনও সেণ্ট জেভিয়ার্স 'কলেজ'ই সব, স্কুল তাহার বিভাগমাত্র।

(৫) ২০ পৃঃ, কাশীনাথ মুন্সী 'নিজ টাকীতে' স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—প্রস্তাবক লেখক বলিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার নিজ এলাকায় টাকীতে।

পরীক্ষার জন্যই হউক অথবা অনুসন্ধিৎসার জন্যই হউক, যাঁহারা এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের কথা জানিতে চাহিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক অপরিহার্য। লেখক বাংলার ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া শিক্ষার ব্যাপারে, সুপরিচিত; এত অল্প পরিসরে এত তথ্য সমাবেশ করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কল্চিৎ দুর্মতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ	শ্রাবণ ১৩৬১	৯ম সংখ্যা

আলোচনা

২২শে শ্রাবণ

তেরো বৎসর আগে শ্রাবণ মাসে বাঙলা দেশ ও বাঙালী তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্নকে হারাইয়াছিল। ২২শে শ্রাবণ আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা কি হারাইয়াছি আজ তাহার হিসাব নিকাশ করিয়া দেখার দিন। হিসাব করিতে করিতে চোখে পড়িবে আমাদের কর্তব্যের পথ, কি করিয়া আমরা নানাদিকে তাঁহার অপূর্ব দানের গৌরব স্বীকার করিয়া তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিতে পারিব। আজ তেরো বৎসর অতীত হইল, তবু কি আমরা কবির স্মৃতিরক্ষার যথোপযুক্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছি? সেদিন দেখিলাম টেগোর সোসাইটি হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য আবেদন করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনতিবিলম্বে কাজে পরিণত হওয়া কর্তব্য। কেবল সভাসমিতি করিয়া কর্তব্য সম্পন্ন হয় না।

কবির স্মৃতি তাঁহার কাব্যে, গানে, অন্যত্র লেখার মধ্যে আপনা হইতে লোকের মনে চিরদিন দোলা দিবে। এই পৃথিবীর মাটিতে তাঁহার পায়ের চিহ্ন আর পড়িবে না, কিন্তু তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া তিনি বার বার আমাদের মধ্যে আসিবেন যাইবেন। আমাদের সকল হাসি গানে, সকল চিন্তায় কর্মে কবির বাণী আমাদের প্রেরণা জোগাইবে। কিন্তু সে তো তাঁহার ঐশ্বর্য, আমরা সেই ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারের মর্যাদা দিলাম কিনা তাহা আজ বিচার করিবার দিন, ভাবীকাল তাহা দেখিয়াই আমাদের যোগ্যতার পরিমাপ করিবে।

শিক্ষানায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অবদানের কথা আমরা অনেকেই জানি ও তাহা লইয়া আলোচনাও করি। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নেতৃত্বের নিত্য পরিবর্তন হয়। একদিন যাঁহাকে দেশবাসী সম্মানের উচ্চতম শিখরে স্থাপিত করে, আরেক দিন তাঁহাকে হয়তো পথের পাশে সরাইয়া রাখে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনীষীদের স্থান চিরন্তন মর্যাদা ও স্বীকৃতি পায়। রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ একাধারে দেশের নেতৃত্ব ও শিক্ষাদান কার্য করিয়াছেন। দেশকে ভালবাসিয়া দেশের মানুষ গড়িবার জন্য তিনি শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে নিবিড় প্রীতির বন্ধনের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনে তাঁহার

অপরিসীম চেষ্টা ছিল। রিপন কলেজ, বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

কিন্তু শুধু নামটি বহন করিলেই চলে না। এই নামের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইলে ঐ কলেজের ছাত্রদিগকে নিয়মানুবর্তিতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, দেশপ্রীতি ও স্বাধীনচিন্ততা প্রভৃতি গুণে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিতে হইবে। তবেই বৎসরে বৎসরে তাঁহার স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে।

শিক্ষক সমন্বয় দিবস

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, প্রধান শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষক-সংস্থার প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া সম্প্রতি একটি শিক্ষক সমন্বয় দিবস উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে শিক্ষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা ও শিক্ষকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এই দুইটি এই সম্মেলনের প্রধান কথা। আমরা মনে করি এসম্বন্ধে যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল।

আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ইন্দোরে ছাত্রবিক্ষোভ

আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি অমনিয়ে শিক্ষক বা অধ্যক্ষ স্থানান্তরে গমন করিলে ছাত্র-ছাত্রীরা মনের ক্ষোভ আবেগময়ী ভাষায় লিখিত, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে পঠিত সম্বর্ধনা পত্রের মারফৎ প্রকাশ করিত। আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় আকুল ছাত্রছাত্রীদের ভাষায় ভাবের আতিশয্য অবশ্যই থাকিত। পুনরাহ্বানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকিত, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনও থাকিত। কিন্তু আপন হাতে কর্তৃত্ব গ্রহণের কল্পনা তখন তাহারা পোষণ করিত না। এখন কালের চাকা ঘুরিয়াছে, একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখিতেছি, শিক্ষক বা অধ্যাপকবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির আকর্ষণ যাত্রা ছাড়াইয়া গিয়া বারুদ বিস্ফোরণে পরিণত হইতেছে। এই বিস্ফোরণ আবার শুধু প্রতিষ্ঠানবিশেষে আবদ্ধ থাকে না, স্থানীয় ছাত্র সমাজে ছড়াইয়া পড়ে। আবার কোথাও ব্যাপকতর হইয়া সমগ্র প্রদেশে ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছে।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে সম্প্রতি ইন্দোরে যে ব্যাপার হইল তাহা গভীর পরিতাপের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উত্তর প্রদেশের ছাত্র বিক্ষোভ আন্দোলনের স্মৃতি এখনও ম্লান হয় নাই, ইতিমধ্যেই ইন্দোরে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, আরও বড় আকারে, সত্যই চিন্তার বিষয়। সকল সমাজেই সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির বিরোধী কিছু লোক থাকে, তাহাদের শুধু সুযোগের অপেক্ষা। এই সব আন্দোলনের সুযোগ লইয়া এই শুভাদের উপদ্রব যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার নেপথ্যে বিদেশী শক্তির।

ছাত্র সমাজের অঙ্গে অঙ্গে এই যে নিয়ম শৃঙ্খলা পালনে বিমুখতা, গুরুজনে অশ্রদ্ধা, কর্তৃপক্ষের প্রতি অসহযোগ ভাব আজ উৎকট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, ইহার জন্য শুধু ছাত্রদেরই দায়ী করা চলে না।

আজ কর্তৃপক্ষকেও আত্মবিশ্লেষণ করিতে হইবে, তাঁহাদের কোন্ দুর্বলতার রন্ধ্রপথ বাহিয়া দেশের তরুণদের মনে এই বিদ্রোহবুদ্ধি জাগিয়া উঠিয়াছে? আজ যুবসম্প্রদায়ের মনে শুভবুদ্ধির উন্মেষ করিতে হইলে কর্তৃপক্ষকে একদিকে নিঃসংশয়রূপে বিবেচনাশীল হইতে হইবে, অন্যদিকে সেই বিবেচনাপ্রসূত কর্মপন্থায় দৃঢ় থাকিতে হইবে।

ছাত্রদের প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

বিগত ২৩শে জুলাই আমেদাবাদের এক ছাত্র সম্মেলনে পণ্ডিত নেহেরু ছাত্রদের কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন দেশ স্বাধীন হইয়াছে, চারিদিকে যেমন কতকগুলি উন্নতির ও

অধঃগতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তেমনই জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে নৈতিক অবনতি ও কতগুলি দুর্বলতার প্রকাশ দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভারতের হিতকল্পে এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

এই সব দোষ দুর্বলতা দূর করিয়া আগামী দিনের ভারতকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব তরুণদের। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাহাদের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। তিনি বলেন ছাত্ররা শুধু বই মুখে করিয়া বসিয়া থাকিবে না। শুধু লেখাপড়ায় ভাল হইলেই তাহাদের চলিবে না। জীবনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাহাদিগকে জ্ঞানের ও শরীরের চর্চা যেমন করিতে হইবে, তেমনই সমগ্র দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজসেবার জন্যও কিছু কিছু কাজ করিতে হইবে। নানা স্থানে ছাত্র আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, তরুণ ছাত্রদল নিরীহ ভাল মানুষ হইবে এমন কেহ চাহে না, তাহারা উজ্জ্বল প্রাণশক্তির পরিচয় অবশ্যই দিবে, কিন্তু শিক্ষার্থীর জীবনের, ভবিষ্যতের নাগরিকজীবনের প্রধান কথা যে ডিসিপ্লিন, নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাহাকে অবহেলা করা কোন মতেই চলে না। আজ যাহারা ছাত্র ছাত্রী, কাল তাহাদেরই হাতে দেশের শাসন ও সংরক্ষণের ভার আসিবে। আপনি নিয়ম না মানিলে পরকে তাহারা কি করিয়া মানাইবে?

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা ১৯৫৫

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৫৫ সনের স্কুল ফাইন্যালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের টেষ্ট পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে রাজ্যের শিক্ষা-অধিকর্তার (ডি, পি, আই) সহিত আলোচনা করিতেছেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, পূর্বের ন্যায় এবারও যেন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের আবেদনপত্র গ্রহণ ও টেষ্ট পরীক্ষা পরিচালনের ভার শিক্ষা অধিকর্তার উপর ন্যস্ত থাকে।

স্কুল ফাইন্যালের সাপ্লিমেণ্টারি পরীক্ষা

বর্তমান পরিচালকের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এবার স্থির করিয়াছেন যে ১৯৫৪ সনের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ যে সব ছাত্র ছাত্রী কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়াছে তাহারা এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে একটি সাপ্লিমেণ্টারি পরীক্ষা দিতে পারিবে। এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী যাহাতে জানুয়ারি মাস হইতে কলেজে যোগ দিতে পারে সেজন্য এখন হইতেই পরীক্ষামূলক ভাবে তাহাদের কলেজে সীট দিবার জন্য বোর্ড কলেজকর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে, পরীক্ষার্থীরা যাহাতে এই সেশানেই কলেজে প্রবেশ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে আগামী ২৩শে ও ২৪ সেপ্টেম্বর একটি কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

যেসব পরীক্ষার্থী ইতিপূর্বে ঘোষিত আগামী ডিসেম্বর মাসের বিশেষ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পরীক্ষাদানের যোগ্য তাহারাও ইচ্ছা করিলে সেপ্টেম্বর মাসের উক্ত বিশেষ কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু কেহ উভয় পরীক্ষায় বসিতে পারিবে না।

পাঠ্যক্রম গত ১৯৫৪ সনের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার অনুরূপ থাকিবে।

যে সব ছাত্র সেপ্টেম্বরের বিশেষ কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবে, তাহারা উহাতে অকৃতকার্য হইলে ১৯৫৫ সালের নিয়মিত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারিবে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের ইতিমধ্যে ঘোষিত পরিবর্তনসমেত ১৯৫৩ সালের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে। ১৯৫৫ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার

বিষয়ক পরীক্ষার্থীগণ উপরে উল্লিখিত ১৯৪৩ সালের পাঠ্যক্রমের সুবিধা পাইবে না।

সেপ্টেম্বরের বিশেষ পরীক্ষার কর্মসূচী নীচে দেওয়া হইল :—

২৩শে—সকাল ১০টা হইতে ১টা ইংরাজি প্রথম পত্র

বেলা ২ ,, ,, ৫টা ,, দ্বিতীয় ,,

২৪শে সকাল—ইংরাজি তৃতীয় পত্র ও প্রাচীন ভারতীয় ভাষা

অপরাহ্ণ—ভারতীয় ভাষা দ্বিতীয় পত্র, অন্যবিধ এম. এ ও এম. এস সি পরীক্ষার অন্যবিধান

উচ্চতর প্রবেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এম. এ, এম. এস. সি পরীক্ষার দুই বৎসরের পাঠ্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথম বৎসরের শেষে প্রিভিয়াস এম এ, আর দ্বিতীয় বর্ষের অন্তে ফাইনাল পরীক্ষা গৃহীত হয়। ডিগ্রি এই দুই বৎসরের পরে দেওয়া হয়। ইহাতে ছাত্রদের উপরে চাপ একটু কম পড়ে আর প্রতি বৎসরেই পরীক্ষা হইবে জানিয়া ছাত্রদল গোড়া হইতেই পড়া শোনা করিতে বাধ্য হয়। চাপ কম হওয়ায় পড়াও ভাল হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই নিয়ম প্রবর্তন করিবার কথা শোনা যাইতেছে। আমাদের মনে হয় এই পরিকল্পনা চালু হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধেতনাই করা হইবে। ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হইবে।

উষাস্তু কলোনির জন্য বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মার্কিন ছাত্রছাত্রী এবং কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের সহযোগিতায় বিরচা উষাস্তু কলোনিতে সম্প্রতি কলোনির শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হইয়াছে। মার্কিন ছাত্রদলটি শুভেচ্ছা-মূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বর্তমানে ভারতে আসিয়াছেন। ইঁহারা ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের জন্য উৎসুক ছিলেন। ইহারা বলেন, অনেক বিষয়ে হয়তো ভারতীয়দের সঙ্গে ইহাদের মতের ঐক্য নাই, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং চিন্তাধারার প্রতি মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিলে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা স্থাপিত হইতে পারে। কাজের মধ্য দিয়া মানুষে মানুষে ঐক্যসূত্র গ্রথিত হয়।

শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ ছাত্রেরা এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের ভার হাতে লয়। ঐ কলোনির শিশুরা গাছতলায় বসিয়া পড়াশোনা করিত। ভারতের জলবায়ুতে বৎসরের মধ্যে কিছু সময় ঐরূপ ভাবে ক্লাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই। কিন্তু শীত বর্ষায় অসুবিধা আছে। ছাত্রছাত্রীরা ইহাদের জন্য ঘরখানা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শিশুদের একটি অভাব পূরণ হইল। আর, ছাত্রেরা নিজেরা সম্পূর্ণ ভাবে নির্মাণকার্যটি সম্পন্ন করিয়া কর্মকুশলতা ও সংঘবদ্ধতার পরিচয় দিয়াছে।

স্মৃতিতর্পণ

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, বি, এইচ, ডি

শৈশবে ও বাল্যকালে যাঁদের শিক্ষায় ও চরিত্রের প্রভাবে নানাভাবে উপকৃত হইয়াছে, জীবন-সায়াহ্নে তাঁদের কথা স্মরণ করিতে প্রত্যেকেরই হৃদয়ে কৃতজ্ঞতামিশ্রিত আনন্দের সঞ্চার হয়। এখানে এইরূপ কয়েকজন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকের স্মৃতি-তর্পণ করিতে চাই। ইহা ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তির বিষয় হইলেও 'শিক্ষা'র সহৃদয় পাঠকদের পক্ষেও নিষ্ফলপ্রদ হইতে পারে বলিয়া আশা করি।

পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার এক পল্লীগ্রামে যাঁর নিকট প্রথম অক্ষর-পরিচয় হইয়াছিল তাঁর কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়িতেছে। তাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়। আজীবন শিক্ষকতা করিয়া সুপরিণত বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সুতরাং চারিদিকের বহুগ্রামের কয়েক পুরুষের তিনি শিক্ষাগুরু ছিলেন। 'মাষ্টার মশায়' নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হইয়াছিল। সামান্য কিছু জমি ছিল। তার সঙ্গে শিক্ষকতা করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। শিক্ষকতার জন্য তিনি ছাত্রবেতন ও জেলাবোর্ডের কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতেন। দশ সংসার হয়ত দশ টাকার বেশি তাঁর আয় ছিল না। সুতরাং তাঁর চালচলন ছিল অতি সাদাসিধা। আমরা যখন তাঁর ছাত্র তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের উপর। তাঁর পরনে দেখিতাম একটি খান ধুতি, আর গলায় অঙ্গাবরণ থাকিত একটি সাদা চাদর। রঙ্গ পদ, হাতে ছাতা। পড়ার সময় চশমা ব্যবহার করিতেন। তাও সেকালে পাঁচ ছয় আনায় সহরে কাছারীতে বটতলার দোকান-দারদের নিকট হইতে কেনা। কিন্তু সুগঠিত দীর্ঘদেহ, প্রশস্ত ললাট, শুভ্র-কেশ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ভাবদীপ্ত চক্ষু ও প্রশান্ত আনন্দোজ্জ্বল মুখ তাঁর দরিদ্র-বেশকেও এক বিশেষ আভিজাত্য প্রদান করিত। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত ও উপার্জনশীল লোক ছিলেন। বিদেশ হইতে যখন তাঁরা বাড়ী আসিতেন তখন 'মাষ্টার মশায়ে'র খুঁটিনাটি চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া তাঁরা বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। পল্লীর মাষ্টার মশায়ের শিষ্য-সৌভাগ্যই ছিল বড় সম্বল। অর্থাভাবের কষ্ট তাহাতে নিশ্চয়ই বহু পরিমাণে দূর হইত। তা ছাড়া বিবাহে শ্রাদ্ধে পূজাপার্বণে মাষ্টার মশায়ের নিমন্ত্রণ হইত সর্বাগ্রে। তিনি পূর্ণমাত্রায় তাহা উপভোগ করার শক্তি রাখিতেন। সরলতা, সত্যবাদিতা ও সাধুচরিত্রতার জন্য গ্রামে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। সৌভাগ্যও সকলে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। সুচতুর লোকেরাও তাঁকে বিপদে ফেলিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। গ্রামের বিবাদ মীমাংসার জন্য গ্রামস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে মাষ্টার মশায় একজন অগ্রগণ্য সালিশী ছিলেন। সমাজে তাঁর এই বিশিষ্ট স্থান ছিল বলিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকটও তিনি অধিক শ্রদ্ধা পাত্র হইয়া ছিলেন। ছন্দঃ উচ্চারণ, বিযুক্ত বানান ও গণিতের জটিল সমস্যা সমাধানের শক্তির জন্যও অবশ্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। মাষ্টার মশায় ঠিক কিভাবে আমাদের প্রভাবিত করিয়াছিলেন বলা কঠিন। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বছর পরেও তাঁর কথা মনে করিতে দুঃখ শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে আমাদের পৌরাণী সহরে কটন কলেজিয়েট স্কুলে কিছুকাল পড়ার সুযোগ হইয়াছিল। স্কুলটি ছিল কটন কলেজেরই অঙ্গ-

ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের তখনকার প্রিন্সিপালের তত্ত্বাবধানে একজন প্রবীণ সাহেবের উপাধিধারী সর্বাধ্যক্ষের দ্বারা উহা পরিচালিত হইত। সরকারী বাহুল্যপনার বেশ কড়া আবহাওয়া সেখানে বর্তমান ছিল। মাষ্টারেরা ছিলেন প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারী। পরবর্তীকালে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সহানুভূতির সহিত বিচার করিয়া এখন বুঝিতে পারি, চাকুরীতে উন্নতি করার পক্ষে মাষ্টারি ব্যবসায়ের সহায়ক ছিল না, প্রিন্সিপাল সাহেবকে, ইন্স্পেক্টর সাহেবকে ও তাঁহাদেরই একনিষ্ঠ উপাসক কৃতকার্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে খুশী রাখিতে পারাই অধ্যাপনারও মানদণ্ড ছিল। এমন অবস্থায় নিজের ইচ্ছামত পড়াইবার স্বাধীনতা শিক্ষকদের ছিল না। "লেকচার মুখস্থ" রাখিতেই সবাই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হঠাৎ আসিলেন এক সরকারী স্কুল হইতে বদলি হইয়া আসিলেন সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির এক শিক্ষক, শ্রীযুক্ত হরানন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়। বয়স তাঁর ছিল অবসর গ্রহণের সমীপবর্তী। দেখিলে মনে হইত, জীবনের অনেক কষ্টার্জিত তাঁর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, চাকুরীতে আর কিছু পাইবার বা হারাইবার নাই। তাই ছেলেদের প্রাণ খুলিয়া বিদ্যাদান করাই তাঁর একমাত্র আনন্দ ছিল। আইনকানুন, রিপোর্ট-রিটার্ন ও সাহেব-সুবাদের বিভীষিকা যেন তাঁর ঘুচিয়া গিয়াছিল। শুনিতাম, তিনি কোন স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন, সেখান হইতে অনুপযুক্ততার জন্য তাঁকে সরাইয়া আনা হইয়াছে। তাঁর এই পদাবনতিই আমাদের সৌভাগ্যের সূচনা করিল। তিনি ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা বিষয়ে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ছিলেন। অকাতরে সেই বিদ্যাদানের সুযোগ খুঁজিতেন। ক্লাসের মধ্যে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল ভাল ছাত্রদের প্রতি। তাদের প্রতি যেন তাঁর অপত্যস্নেহ ছিল। একটি বুদ্ধিমান আধাখী মুসলমান ছেলে ছিল তাঁর সব চেয়ে প্রিয়। তার আসিতে দেরী হইলে তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিতেন না। তাঁর পড়ান ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সেজন্যই বোধ হয় কয়েকটি ভাল ভাল শ্রোতা না হইলে তাঁর মন খুলিত না।

যে জন্য তাঁকে এখনও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি, তাহা হইতেছে তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইবার ছলে তাঁর ইংরেজী শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি শিখাইবার চেষ্টা। ল্যাটিন্ গ্রীক্ ইত্যাদি কোন্ শব্দ, ধাতু, উপসর্গ বা প্রত্যয় দ্বারা কোন্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে উহা অনুসন্ধান করার অভ্যাস তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। এই অভ্যাসের জন্য সারা জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের পথ একদিকে অত্যন্ত সুগম হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ধাতু, উপসর্গ ও প্রত্যয় মনে রাখিলে বহুসংখ্যক শব্দের অর্থ ও বানান মনে রাখা অত্যন্ত সহজ হয়। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বড় বড় পারিভাষিক শব্দের অর্থ বোঝা, মনে রাখা ও শুদ্ধ ভাবে বানান করার পক্ষে সারা জীবন ইহাতে আমার অত্যন্ত উপকার হইয়াছে। শুরু-প্রদত্ত এই ব্যুৎপত্তি-শিক্ষার রুচি নিম্ন ক্লাসের মধ্যেও সংক্রামিত করার চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেকবারই সাধুবাদের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়িতেছে এই পর্যায়েরই একজন সুপণ্ডিত সংস্কৃত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত মহাশয়ের কথা। হরানন্দ বাবু প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে ময়মনসিংহে ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সিটি স্কুলে আমাদের দুই বছর সংস্কৃত পড়াইয়াছিলেন। সেই অধ্যাপনার উপকার সারা জীবনই ভোগ করিয়াছি এবং এখনও তাঁর কীর্তি নিজের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পড়াইবার কাজে লাগিতেছে। বাংলা দেশে তখন সাধিনি বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু হরানন্দ বাবু নিজ

চেষ্টায় বোধাই প্রদেশ হইতে তাণ্ডারকার, আপ্টে, কালে প্রভৃতি পণ্ডিতদের পুস্তক আনিয়া পড়িয়া ও পড়াইয়া আমাদের স্কুলে সংস্কৃতশিক্ষার মান অনেক উন্নত করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে পণ্ডিতের মতই আমাদের মথুর বক্সইয়ের কোঠায় পর্যন্ত উঠিত। পাণিনির সূত্র এবং সংস্কৃতের শৈলী আয়ত্ত থাকায় কলেজে গিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও টীকা টিপ্পনী বোঝার পক্ষে অনেক সাহায্য হইয়াছিল, যাহা অন্যের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার মনে হইত। হরানন্দ বাবুর সকল অধ্যাপনার পশ্চাতেও ছিল পরং বাবুরই মত জিজ্ঞাসা ও পাণ্ডিত্যের প্রেরণা। তাহাই ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হইত।

সিটি স্কুলের কথা বলিতেই আজ বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে তদানীন্তন হেডমাষ্টার গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা। আজকালকার প্রচলিত ইংরেজী শব্দ 'পার্সনালিটি' বা ব্যক্তিত্ব অর্থে সাধারণত যে চেহারাটি মনে আসে গিরীশবাবু ছিলেন তার বিপরীত, তিনি কৃশ, খর্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ ও মিতভাষী ছিলেন। বোধ হয় তাঁর পার্থিব দেহের ওজন একশত পাউণ্ডের বেশী ছিল না এবং উচ্চতা পাঁচ ফুটের উপর ছিল না। কিন্তু তাঁর নৈতিক ও মানসিক মান এত উচ্চ ও গৌরবযুক্ত ছিল যে তাঁহার বিরাট বপুবিশিষ্টদের মধ্যেও তাহা বিরল। সিটি স্কুলে তখন প্রায় এক হাজার ছাত্র ছিল। লম্বা লম্বা কতকগুলি ঘরে স্কুল হইত। তার এক প্রান্তে হেডমাষ্টার মহাশয় পদার্পণ করিলে আমরা ক্লাসের ভিতর হইতেই টের পাইতাম। হঠাৎ সব নিষুপ, নিঃশব্দ। কোন দিন তাঁহাকে বেত ব্যবহার করিতে দেখি নাই। কিন্তু অতি দুর্দান্ত ছেলেরাও তাঁর শাসনের জন্য ভীত থাকিত। বোধ হয় প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর তিনি সিটি স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন। পূর্বে কলিকাতাতেও নাকি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁর আণ্ডারে মুখার্জি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁর অনেক কৃতী মানী, ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। সহরে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনেকেই তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেজন্যও আমাদের চোখে তাঁর স্থান ছিল অনেকে উচ্চে।

গল্প শুনিতাম তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্র ৺রজনীকান্ত গুহ মহাশয় যখন ময়মনসিংহ কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসিলেন তখনও নাকি বলিতেন, "গিরীশ বাবুকে দেখিলে এখনও ভয় করে।"

এই ভয় ছিল গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত। পরবর্তী কালে বড় হইয়া আমরাও যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি, আমাদেরও এই ভাবই হইয়াছে। তাঁর পুত্রস্থানে ছিল না। ছাত্ররাই পুত্রস্থানীয় ছিল। স্কুল ত্যাগ করার পরেও কে কি করিতেছে তিনি তাহা লক্ষ্য রাখিতেন ও উৎসাহ দিতেন। তখনকার অধিকাংশ হেডমাষ্টারের মত তিনিও ছিলেন ইংরেজী ভাষার ঐতিহাসিক উপাসক বা সাধক, এবং ইংরেজী ব্যাকরণে ছিল তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অনুরাগ। এণ্ট্রান্স পাস করার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম, তাঁর প্রিয় ইংরেজী ব্যাকরণের সিডন দিকে তাঁর স্কুলের প্রত্যেক বছরের কৃতী ছাত্রদের নাম লেখা আছে। স্কুল ও ছাত্রই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান অঙ্গ। শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি যুগপৎ ভয় ও ভক্তির পাত্র ছিলেন।

এইরূপ আরও কত শিক্ষকের নিকট বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হইয়াছি বলা সম্ভব নয়। তাঁদের সকলের উদ্দেশেই এই স্মৃতি-তর্পণ আংশিক নিদর্শন বা দিগ্‌দর্শন মাত্র।

———

প্রবাসের সমস্যা

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

শুনে চম্‌কে উঠবেন না, ঘটনাটা সত্য। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, পথের বিজলী বাতিগুলো মিট্ মিট্ করে দু একবার জ্বলে নিয়ে গেছে। আকাশে মেঘ থমে থেমে। একটু পা চালিয়ে আসছিলাম, কারণ বৃষ্টি নেমে এলে মিউনিসিপাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে (বা ছুটতে ছুটতে) ভেজা ছাড়া কোন উপায় নেই। হঠাৎ দুই কলেজী ছাত্রের আলাপ শুনে থম্‌কে দাঁড়ালাম। এক তরুণ অপর জনকে জিজ্ঞাসা করছে—হ্যাঁরে, তুই প্রমথ চৌধুরীর লেখা পড়েছিস? উত্তর হল,—দ্যা ভাই,—ছোবরা মন্দ লেখে না।

কথাটা শুনে তখন আপনার মতই আমি চমকে গিয়েছিলাম, আপনার মতই বাড়ী এসে ভাবতে সুরু করেছিলাম, আমাদের ছেলেদের মধ্যে গলদ কতদূর প্রবেশ করেছে যে তারা সাহিত্য পর্যন্ত তুলতে সুরু করেছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, দোষটা তাদের নয়। দোষটা আমাদেরই। আমরা আমাদের নিজেদের জিনিস সম্বন্ধে হয় একেবারেই অজ্ঞ, নয় জানলেও আমাদের ছেলেপিলেদের সে সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করিনা। আর একটা উদাহরণ দিই। অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন—এবং আমার মত যাঁদের পরিণত মনের কোন এক লুকানো জায়গায় একটা ছেলেমানুষের মন লুকানো রয়েছে, তাঁরা এখনও বইখানি পড়ে থাকেন। এখানে একটি ছেলেকে বই খানি দিয়ে দেখলাম, এমন বইও সে ভাল করে বুঝতে পারল না। এর কারণ কি? এর কারণ আর কিছুই নয়, 'বুড়ো আংলা'য় যে বাংলা দেশ চিত্রিত হয়েছে, সেই বাংলা দেশকে, সেই বাংলা দেশের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সাহিত্য, পুরাণ, রূপকথা সব কিছুকে আমরা ভুলে গেছি—শুধু ভুলে গেছি তা নয়, সে সম্বন্ধে আমরা এত উদাসীন যে আমরা আমাদের ছেলেপিলেদের কোন হদিশই দিইনি। তারা শোনেই নি এসব বস্তুর কথা। কাজেই প্রাণবন্তুর সঙ্গে পরিচয় না থাকায় জীবন্ত জিনিসটার রূপ তারা কোন মতেই ধরতে পারে না। কেন এরূপ হচ্ছে? প্রথমত এঁদের অনেকে বাংলা দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কচ্যুত—ন'মাসে ছ'মাসে ছুটিছাটায় কলকাতায় অথবা বাংলার কোথাও কোন গ্রামে দুচার দিন কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া বাংলা দেশের সঙ্গে আত্মার যোগ-সূত্র কিছু নেই। আর এখন দেশের ব্যবচ্ছেদ হয়ে তো অনেকের সেটুকুও লুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই এঁদের ছেলেরা বাংলাদেশের মরমের কথা জানবে কি করে? ইংরেজের ছেলেরা ছেলেবেলায় বাইবেল পড়ে—শুধু পড়ে নয়, মনের ভিতর ঠেসে রাখে। তাদের জাতীয় রূপকথা-গুলো তো তাদের কণ্ঠস্থ। তার উপর দেখে তারা তাদের জাতীয় ইতিহাস, সুতরাং নিজেদের সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা নিয়ে তারা সুরু করে তাদের শিক্ষা। আমাদের ছেলেবেলাতেও আমরা ভোর বাঁশীতে উঠে পিসীমের আদরে ঠাকুরদাদা বা ঠাকুমার কাছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েছি, কাশীদাসের মহাভারত পড়েছি; বুড়ী ঝি ক্ষেমী দাসীর কাছে রূপকথা শুনেছি; পাড়ার ভট্চায মানুষ কাছে পুরাণের গল্প শুনেছি। তাতে আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে যে পাওনা পাবার কথা, তার অন্ত মনটাকে প্রস্তুত করতে পেরেছি। কিন্তু এরা কি পেল? বলুন, আমার পাশের মনোহর

যাদুর কথা। একদা কোন দুযুর অন্তীতে কুমিল্লা জেলার এক গণ্ডগ্রাম থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে এখানে চাকরী করতে এসেছিলেন। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর একটানা চাকরী করে এখন একটা অফিসিয়েটিং প্রমোশন, পৌনে তিনশত্তা ছানা-পোনা, দুখরা গৃহিনী এবং কিছু বাজার দেনা নিয়ে এখানে আঁকিয়ে বসেছেন। এই তিরিশ বছরের মধ্যে তিনবার বাংলা দেশে গিয়েছিলেন, এখানে প্রথম বাসা পেয়ে স্ত্রীকে আনবার জন্য, প্রথম ছেলে হবার সময় স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছে দিতে—এবং কিছুদিন পূর্বে মেয়ের বিয়ে দিতে—শেষের বারটা তো কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম হয়েছিল। তার পরের ছেলেরা এইখানেই হয়েছে, এখানেই মানুষ, কলকাতায় গিয়ে তো বলে হাসিয়ে পড়েছিল। তিনিও বলেন, বাংলা দেশে গেলে পেট ভাল থাকে না, বাত ধরে, শরীর টেঁকে না,—অবসর নিয়ে এখানেই ছোটখাটো একটা বাড়ী করে বসবাস করবেন। আর পার্টিশন হয়ে তো দেশের জমিজমাগুলো সব গেছেই মনায়,—গিয়েই বা কি হবে, কার ঘোষে বা গিয়ে পড়ব। পাশের বাড়ীর ইন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে মশায়ের বাড়ী ধরণী জেলায়—তাঁরও প্রায় ঐ একই কথা—মনোহরবাবু তো তবু তিনবার দেশে গিয়েছেন গত তিরিশ বছরের মধ্যে,—আমি তো একবারও যাইনি। বাড়ী ঘর দোর সব পড়ে গেছে, জায়গাজমি সব জ্ঞাতি গোষ্ঠিরা আত্মসাৎ করেছে। কি জন্যে যাব? আর তার ওপর ম্যালেরিয়া মশায়। উঃ সে কী ম্যালেরিয়া! ব্যাণ্ডেল জংশনে নেমে ছোট রেলে যেতে হয়। সেখানকার পচা পুকুরের জলে ইঞ্জিন চলে মশায়, কার পেতে শুনবেন ইঞ্জিনও কোঁ কোঁ করে কাঁপছে, তাকেও ম্যালেরিয়া ধরেছে। বলুনতো মশায়, কে যায় সেখানে!

এই মনোহর বাবু ইন্দ্রনাথবাবু দিগম্বের ছেলে-পিলেরা অতএব দেশের কিছু জানল না, দেখল না, শিখল না। তারা জানল, বাংলাদেশে শুধু রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, শুনল না বাংলাদেশের সবুজ পাতায় রোদের নাচন, মাঠের ঘাসে কড়িংয়ের মেলা, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেসে যাওয়ার সঙ্গে আগমনী গানের মিঠে সুর, চাখল না ছাঁচতলায় শুটি মেয়ে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে বলেন গুড় আর মুড়ি, নতুন গুড়ের মুড়কী আর কলাইগুঁটী, দেখল না, ঘোমটেখে সকাল সন্ধ্যায় দুল তুলসী বেলপাতা দুর্বা দিয়ে মা ঠাকুরমার দেবসেবা, তুলসী ঝারা, ব্রতব্রত; ঘোর দিলনা ভেঁপু বাজিয়ে আষাঢ়ের রথের মেলায়, বাচ খেলায়, মাছ ধরায়। বাংলা দেশের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, গান, সব কিছু এদের কাছে রইল অজানা।

তার ওপর, কতকগুলো সস্তা সাহিত্যমন্দিরের কৃপায় এক শ্রেণীর সাহিত্য এদের মাথা আরও বিগড়ে দিচ্ছে। শিশুসাহিত্য বলতে যা বোঝা উচিত, খুব কম লোকেই এখন তা বোঝেন। কতকগুলো চকচকে ঝকঝকে রঙচঙে ও ছবিওয়ালা উদ্ভট হত্যাকাণ্ড ঘটিত ডিটেকটিভ নভেল আজকাল শিশু সাহিত্যের ভেজাল হিসাবে বেশ চলেছে। ভাল বইয়ের খদ্দের এমনিতেই তো বেশী নেই, এদেশেতে তো নেইই। ভাল বই চেনবার মত বুদ্ধি, বোঝাবার মত বিদ্যা এবং ভাল লাগবার মত রুচি মনোহর ইন্দ্রনাথ এও কোম্পানীর নেই। যদিবা কারুর ছিল, গতানুগতিক জীবন, আপিস, ঘড়বাবু, বড়সাহেব এবং ছুটির দিনে তাস খেলা ও মাছধরা করে সব খুলে গেছেন। এখন তাঁদের চিন্তা কি করে সাহেবকে বলে করে দুটো বছর এক্সটেনসন পাওয়া যায়, যাতে কোয়ার্টারসটা আরও দুটো বছর ধরে রাখা যায়, সেজো মেয়েটাকেও পার করে দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় ছেলেটা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করলে

চাইলটা দিয়ে কোন একটা আপিসে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এঁদেরও দোষ দিতে পারি না। যদিন আগে দেশছাড়া হয়ে এভাবে সামাজ্য বাহিনীর এদেশে এসে সংসার প্রতিপালন করতে হলে আপনি আমিও ঐ রকমই হতাম। তার উপর, না, না, হাসবেন না, এটা ঘোরতর সত্যকথা, এই সাহেবী স্কুলের উপর মা ষষ্ঠীর কৃপা একটু বেশীই। সুতরাং—

একক্ষেত্রে, যাদের ছেলেরা পাশটাশ করে একটু লেখাপড়া করতে চায়, তাদের পটভূমি থাকে এই রকম। স্কুলে ও কলেজে আমাদের যেটুকু বাংলা শেখানো হয়, সেটুকু নমো নমো করে সারা হয়। নেহাৎ বাঙালী স্কুল না হলে (যেখানে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়ান হয়) প্রথমত বাংলা পড়াবার কথাই ওঠে না; যদি কোন স্কুল কলেজে বাঙালী ছাত্রছাত্রী অধিক হয় এবং তাদের অভিভাবকেরা লড়াই করতে পারেন, অথবা প্রিন্সিপ্যাল ও কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তাহলে বাংলা পড়াবার একটি যেমন-তেমন ব্যবস্থা হয় বইকি। এই রকম একজন শিক্ষকের কথা শুনেছি, তিনি "ভয় পাওয়ার কথা নয়" কে ইংরেজীতে বলেছিলেন "no question of afraiding" এবং "misunderstanding" ও "inaugural address" এর তর্জমা বলেছিলেন যথা ক্রমে "বৈদুষি" ও "সূচনাভিভাষণ"। সপ্তাহে একদিন একঘণ্টা এই রকম পড়ানর ফলে আমাদের বাঙালদের ভবিষ্যৎ কিরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, তা অনুমানের যোগ্য।

তবে বাইরে যারা বাঙলার দিক দিয়ে এই রকম শিক্ষা, তাদের কাছে সকলের প্রত্যাশা করলে আমাদেরই মূর্খতা প্রকট হয়ে উঠবে। এই ছেলেগুলি দেশকে দেখে চিনল না, শুনে চিনলনা, পড়ে চিনলনা। এদের দোষ কি?

আপনি বলবেন, মশাই, আপনি তো বড় বিষনিন্দুক। বাঙালী বিদেশে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করছে; ক্লাব গড়ছে ও ভাঙছে; ড্রামাটিক সোসাইটি এবং থিয়েট্রিক্যাল পার্টিও করে; আর সাহিত্যসভা যে কতশত করে তার লেখা-জোখা নেই। তবুও বিদেশের, বিশেষ করে আপনার ঐ সহরের, যেখানে অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত এগুলো গজিয়ে ওঠে, বাঙালীকে বলবেন কৃষ্টিহারা? কিন্তু কালীবাড়ী গড়লেও, সাহিত্য সভা করলেও, বিদেশে যে বাঙালী আপনার কৃষ্টি ধীরে ধীরে খুলতে বসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কালীবাড়ী দুর্গা ও প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠে। কিন্তু অনেক সাহিত্যসভাতেই আছে তেমাল; উপহারগুলাকে একটু খুশী করার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে এর অনেকগুলো। সাহিত্যস্রষ্টার নাম করে হাত কচলিয়ে একটু "হেঁ হেঁ" হাসির সৃষ্টি হয় এখানে। "আপনি স্যর যা বলেন, অনেক বড় বড় সাহিত্যিকই আজ পর্যন্ত বলেন নি" কথাটা শোনাবার জন্য বক্তা আসেন বলতে এবং তাঁরই আমলা-মামলাদের দস বলবার জন্য থাকেন মুকিয়ে। আমি এমন কথা বলছি না, এদেশে সত্যিকারের বাংলা সাহিত্যিক কেই বা কোন সভাতেই সত্যিকারের সাহিত্যচর্চা হয়না। আমি শুধু বলছি—মোটামুটি হাল এই প্রকার। এই আবহাওয়ায় আপনার ছেলে যদি "প্রথম চৌধুরী ছোকরা মদ খেয়না" বলে, দোষটা কার?

বৈশোরে যা প্রথম যৌবনে সকলেরই একটু সাহিত্যসৃষ্টির আবেগ আসে। আপনি মুখ ফিরিয়ে মুচকে হাসলে চলবে কেন? মনে পড়ে, আপনার অনের মাঝার মনার আপনার কবিতার খাতা আবিষ্কার করে আনন্দ দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন? এটা ভাল কি মন্দ, সে কথা বলছি না। তবে যে পটভূমি থাকলে এই সাহিত্য রচনার বীজ পরে মহীরুহ না হোক, ছোট চারা গাছে পরিণত হতে পারত, এদেশে বাঙালী ছেলেগুলির সেই পটভূমি নেই—এটাই হচ্ছে আক্ষেপের কথা।

আমার এক অধ্যাপক এক সময় উপদেশ দিয়েছিলেন: যেখ বাপু, ভাল ইংরেজী শিখতে চাওতো বাইবেলটি ভাল করে পড়, তারপর পড় ইংলণ্ডের ইতিহাস। আর ভাল বাংলা শিখতে চাও তো আগে একটু সংস্কৃত চর্চা কর, তারপর কৃত্তিবাস কাশীদাস গুলে খাও; তারপর পড় ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্র। এতে তোমার যে শক্ত ভিত হবে, সেই ভিতে রবিঠাকুরের যখনা যিনিয়ে গাঁথতে সুরু কর, ইমারৎ, মন্দির, যা কিছু তাই বানাতে পারবে। কথাটা ভেবে দেখলে দেখতে পাবেন, খুব দামী। বাঙালী কৃষ্টির মূল উৎস যেগুলো, সেগুলোকে উপেক্ষা করলে হাওয়া থেকে কুড়িয়ে এনে বাঙালীর ভাবকে বাঁচানো যায় না। এদেশে আমাদের সেই দিকে নজর দেবার সময় এসেছে।

প্রবাসে থাকলে সে দেশের অনেক কিছু মেনে নিতে হয় সত্য, কিন্তু তাই বলে সেটা নিজের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের বিনিময়ে নয়। প্রবাসে আমরা দুই চাল চালি, আর দুটোই সাঙ্ঘাতিক ভুল হয়; যাদের মধ্যে বাস করি, তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না, সর্বপ্রকারে তাদের এড়িয়ে চলি, আর সমস্তো তাদের মধ্যে এমন ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিই যে নিজস্ব কিছুই থাকে না। এই দুটো গর্হিত "অত্যন্ত" বর্জন না করতে পারলে আমাদের আর উপায় নেই। আমাদের মাতৃ-ভাষার উপর উৎপীড়ন, সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ, প্রবাসে বাঙালী বলে নানারূপ লাঞ্ছনা, মনে হয় এই দুই "অতি"-রই ফল। বাঙালীর মজ্জাগত সৌজন্যের সঙ্গে যদি মেরুদণ্ডটা একটু বলিষ্ঠ হত, তাহলে বোধ হয় এতটা দুর্দশা হত না। বিদেশে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শেখানোতে যে কষ্ট পেতে হচ্ছে, তারও একটা কারণ, এই বলিষ্ঠ মেরুদণ্ডের অভাব। যে অত্যাচার করে, সে অপর পক্ষ দুর্বল জেনেই অত্যাচার করতে সাহস করে। কিন্তু শত অত্যাচারেও যার মেরুদণ্ড নোয়ানো যায় না, তার সামনে থেকে অত্যাচারী দু' পায়ের মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আর মেরুদণ্ড বাঁকা থাকলে জাতির লক্ষ্মীও পালান, সে জাতি আড়ে থাকে না, হাড়েও বাড়ে না, নিজেকে ঘুণে খাওয়ার হতে হতে একেবারেই লোপ পায়। এ সব দেশে আমাদের কি সেই দশা এসেছে? বড়ই দুঃখের কথা।

বলিষ্ঠ মেরুদণ্ডের সঙ্গে দরকার সংঘবদ্ধতা। বাঙালী দলাদলি ছাড়া থাকতে পারে না, এই দুর্নাম বাঙালীর কি যাবে না? কথামালার সেই অতি পুরাতন গল্প—একখানা কাঠি সটু করে ভাঙা যায়, কিন্তু এক বোঝা কাঠি ভাঙা যায় না—এটা কবে আমরা মনে প্রাণে বুঝব? সংঘবদ্ধতা না থাকার জন্যে এসব দেশে আমাদের সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে ওঠেনা—তার ফলে আমাদের ছেলেদের উপযোগী শিক্ষার জন্য চাপ দেওয়ারও আমাদের ক্ষমতা থাকেনা। কালচু পাই, ব্যাঙ ও বিচ্ছন। আমাদের আত্মাভিমান আছে কিন্তু আত্মবোধ নাই। থাকলে কি এমনটি হত?

কলকাতা বাঙলার রাজধানী যে শুধু তা নয়, বাঙালী সংস্কৃতিরও রাজধানী। তাই কলকাতায় যা হয়, তার ঢেউ ছড়াতে ছড়াতে ভারতের অন্যান্য প্রান্তস্থিত বাঙালী সমাজকেও স্পর্শ করে। কিছুদিন ধরে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ও হৈ-হুল্লোর ভাব এসেছে—দেখা যাচ্ছে, ফলে পড়াশোনায় তাদের মন নেই। এসব দেশেও সেই রোগের ছোঁয়াচ এসেছে। ফলে লেখাপড়ায় ছেলেদের মন বসানো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এটা হয়তো সাময়িক, কিন্তু এর ফলটা তো সাময়িক নয়। কলকাতায় যে কারণই থাকুক না কেন, এখানে ভবিষ্যৎ জীবনের নৈরাশ্য পড়াশোনায় ঔদাসীন্যের একটা কারণ। "পড়াশোনা করে কি হবে, চাকরীতো পাবইনা" গোছের মনোভাব

ছেলেদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। আবার, শুধু চাকরীর জন্যই পড়াশুনা বলে জ্ঞানের পরিধি এত সীমাবদ্ধ হয় যে "প্রমথ চৌধুরী ছোকরা" বলা এদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ছেলেদের তো শেখার মন নেই, আমাদেরই বা শেখাবার মন কই? "স্বাধীনতা হীনতায়ে কে বাঁচিতে চায়" মুখে আউড়েছি তো সহস্রবার, কিন্তু ছেলেদের কখনো বলেছি কে এর লেখক? যদুলাল মুখোপাধ্যায় কে ছিলেন? আপনি-আমি "আবার, আবার, সেই কামনে গর্জন" তুলতে বলেছি, আমাদের ছেলেরা নবীন সেনকেও ভুলবে। সিস্টার নিবেদিতা বেড়াতে গিয়ে "উপুলে উঠেছে বেন অনন্ত জলধি" বিড়্ বিড়্ করে বলে কাব্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু বিহারীলালের কাব্যের সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দিইনি। তাদের আর অপরাধ কি? লাইব্রেরী থেকে আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক দু চারখানা উপন্যাস পড়ে (মাফ্ করবেন, অনেক সময় এগুলোর ভাষাই বুঝতে পারি না, এগুলো কি বাঙলা ভাষাতে লেখা না বাঙলা হরফে অন্যকিছু?) এদের যদি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান টনটনে হতে থাকে, কে দায়ী তার জন্য?

আজকাল এখানে আমাদের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, নানা রকম কষ্ট্রা কৌশল করে কিছু উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু তবু যেন মনে হয়, শিক্ষার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে; আমরা শিখছি অনেক কিছু, করছি অনেক কিছু, কিন্তু যা কিছু করছি সবই বাহ্য—অন্তর যেন কিছুতে স্পর্শ করছে না, মন যেন কিছুতে সাড়া দিচ্ছে না। এখনকার শিক্ষার মধ্যে বস্তু পাচ্ছি অনেক, কিন্তু ভাবের অভাব বড় বেশী। তার কারণ, যে মাতৃস্তন্যের ন্যায় শিশুর স্বাভাবিক পুষ্টি সেই মাতৃস্তন্য নিঃসৃত অমৃতকে উপেক্ষা করে ছুটছি বাজারে টিনের দুধ আনতে। আমদানী জিনিষ যতই চাকচিক্যময় হোক, যতই দেখতে মনোহর হোক, তাতে স্বাভাবিক খাদ্যের কাজ হয় না, এই কথাটি খুব বেশী করে বোঝা আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে এদেশে, যেখানে ছেলেরা না পাচ্ছে নিজেদের দেশের জিনিস আর না নিতে পাচ্ছে এদেশের জিনিস।

এসব সমস্যার কি সমাধান, তা আপনারা ভাবুন। কিন্তু একটা কথা, অন্য কিছু উপায় ভাববার আগে একটা জিনিস আমাদের করতে। আমাদের—অর্থাৎ আমরা যারা বাঙলার বাইরে থাকি—বাঙলা দেশকে একটু ভাল বাসতে শেখান, আর সেই ভাল-বাসাটা আমাদের মনে ইঞ্জেকশন্ দিয়ে দিতে হিন, যাতে আমাদের ছেলেরা দেশকে জানতে ও বুঝতে শেখে, মা বলে চিনতে পারে। নৈলে আমরা সংস্কৃতি হারাব, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাব, বাঙালীত্ব হারাব। আর খাঁটি বাঙালী না হতে পারলে খাঁটি ভারতবাসী হতে পারব কেমন করে? বুড়ীমাকে দেশের ভিটায় প্রদীপ দিতে ফেলে রেখে বিদেশে স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর করে কি শান্তি পাওয়া যায়, না পাচ্ছি? আমরা বাঙালী, সত্যেন দত্তর কথায় আমরা মরুদ্যানে বসিনি, মরী নিয়ে ঘর করি—যাকে বশ করি, সাপেরে নাচাই, সাপের মাথায় নাচি। মায়ের আশীর্বাদ মায়ের বরাভয় আমাদের আবার স্বস্থ্যকে জয় করতে সাহায্য করবে। বাঙলা দেশকে যে যাই বলুক, বাঙলা দেশ যাই হোক, তবু সে আমার মা, এই বোধ যদি আমরা নিবিড় ভাবে অনুভব করি ও ছেলেদের প্রগাঢ় ভাবে অনুভব করতে শেখাই, তবেই আমাদের জাতীয়তা, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের নিজস্ব শিক্ষাধারা রক্ষা পাবে, নইলে নয়।

———

নূতন পাঠশালা

শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

মনে পড়ে শৈশবের কথা। পাঠশালায় সময় হলে পায়ে যেন জ্বর আসত। বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে, বট গাছের উপরে কিংবা কোন পাড়ার কতদিন লুকিয়ে কাটিয়েছি। কোন দিন বা শিক্ষক মশায়ের প্রেরিত একটি ছোট্ট ছাত্রদল এসে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে বিদ্যালয়ে এনে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে। তখন মনে হতো, জগৎটা যেন আমার কাছে মিথ্যা। ভূপতিত ভয়ে লজ্জায় শিক্ষকের রক্ত-চক্ষুর সম্মুখে নীল হয়ে যেতাম। সে কি অসহ্য প্রহার আর লাঞ্ছনা! এমনি করে ঘরে বাহিরে অভিভাবক আর শিক্ষকের কাছে অত্যাচার সহ্য করে করে ছাত্রজীবনের প্রথম বছর কয়েকটি ব্যথার স্মৃতি স্বপ্নের মত আজও অনেকের চোখের উপর ভেসে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। আমাদের মন থাকত প্রকৃতির রাজ্যে—কত বৃক্ষ, ফলফুল ও নীলাকাশের মধুময় প্রাঙ্গণে, আর শরীর থাকত শিক্ষক মশায়ের জেলখানায়। সেদিন শিক্ষক মশাইকে ভয় করাটাই ছিল শুভবুদ্ধির চরম পরিণতি। যে ছেলে ভয় করত না, সে নাকি বেপরোয়া, অসভ্য ও দুষ্টু ছেলে। হায়রে, শিশু হয়ে জন্ম গ্রহণ করাটাই যেন আমাদের অপরাধ। শিশুর জগৎ যে বড়দের জগৎ থেকে পৃথক, সে যে মানবসন্তান হয়েও প্রকৃতির রাজ্যের প্রজা, আমাদের শিক্ষক মশায়রা তা আজ অনুধাবন করলেও বহু অভিভাবক সে কথা চিন্তাও করেন না।

অভিভাবকেরা মনে করেন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু গান করে, গল্প শোনে, খেলে বেড়ায়, এ আবার কেমন পড়া? তাবটা যেন শিক্ষকের বেত্রদণ্ডের সম্মুখে ভীত ত্রস্ত বালক বালিকা ক খ গ ঘ মুখস্থ করলেই শিশু মানুষ হয়ে উঠবে। ঐ ভাবে তারা যে মানুষ হয় না, তাদের মনের আসল মানুষটির যে সমাধি হয়, সে কথা অভিভাবকেরা বিশ্বাস করেন না, বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা একটা শিক্ষাই নয়। কিন্তু কোন কিছু সমালোচনার পূর্বে বিষয়টির অন্তর্নিহিত বস্তুটি বিশেষ ভাবে বুঝে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আজ শিশুর মুক্তির দিন। উদার নীলাকাশের নীচে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে, হাসি খেলা গানে নাচে আজ তার শিক্ষার সোপান রচিত হবার কথা শিক্ষাবিদ্‌রা বলেছেন। শিশু প্রকৃতির বুকে ছুটুক, খেলুক, গান করুক, নৃত্য করুক; সেই তার শিক্ষা। শিশুর সভায় শিক্ষক দর্শক মাত্র। তাদের কামনাবাসনাকে শিক্ষক মিটিয়ে দেবেন এবং তিনি জানবেন শিশুর মাঝে তিনি পথের ভিখারী। তিনি আঁধারে মোড় ঘুরিয়ে আলোর দিকে সর্বদাই শিশুকে পরিচালিত করবেন।

শিশু প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তার মনের মধ্যে গৃহের পরিবেশের ছাপ লেগে থাকে। চোখের উপর ভেসে ওঠে স্নেহময়ী মা মাসী, দিদির মুখ, মনে পড়ে গৃহের সুখময় স্মৃতি। বিদ্যালয় নূতন জায়গা, এখানে সব কিছুই সে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখে এবং পদে পদে ভয়ে ভয়ে চলতে চায়। তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিশুর মনকে যুক্ত করে দেওয়াই শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য। দ্বিতীয় কর্তব্য, শিশুকে ধীরে ধীরে লেখাপড়ার জগতের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া।

এই দুই দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুকে অক্ষর পরিচয়ের পূর্বে মৌখিক আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেবার জন্য ছড়া, গল্প, অভিনয়, ধবর বলা ইত্যাদির ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে করতে শিক্ষাব্রতীরা বলেছেন এবং

মুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তাই করান হয়। অভিভাবকেরা তা দেখে সমালোচনা করেন এবং অনেক শিক্ষক আবার সঠিক ভাবে শিশুর মনের মত করে সেগুলির উপস্থাপনা করতে পারেন না।

বাংলা দেশের অনেক জায়গাতে দেখা যায়, একটি বিদ্যালয়ের চারি পাশের গ্রামগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষাভাষী লোক কিংবা বিভিন্ন বাংলা কথ্য ভাষা ব্যবহার করে এমন পরিবার বাস করেন। যেমন ধরা যাক সাঁওতাল, দাঙড়, বাগে বা পলিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম ভাষাভাষী লোক। এদের শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে তখন শিক্ষকের অনেক কথা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়, কিংবা শিক্ষকের শিশুদের ভাষা বুঝতে বেশ কষ্ট পেতে হয়। শিশু না পারে ছড়া ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে, না পারে বিশুদ্ধ ভাবে ধ্বনি বলতে, গল্প বুঝতে এবং অভিনয় করতে গিয়ে তারা পূর্ণ ভাবে আনন্দও পায় না। তাই ছড়া গল্প, অভিনয় এবং ধ্বনি বলা এগুলো বিদ্যালয়ে দান দেবার পূর্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উচ্চারণ বিশুদ্ধি ও বাংলা ভাষার যোগাযোগের দিকে নজর দেওয়া শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। কি ভাবে ভাষার বিশুদ্ধীকরণ হতে পারে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব না কিন্তু কি প্রকারে শিশুর মৌখিক আত্মপ্রকাশকে সুন্দর করে তোলা যায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা দেবার চেষ্টা করব।

শিশুর উপযোগী ছড়া শিশুর কাছে খুবই আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ছড়া ও খেলাতে অথবা অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে একটা নিবিড় যোগাযোগ এনে দিলে আরও হৃদয়গ্রাহী হবে। শিশু খেলতে ভালবাসে। সে যদি বুঝতে পেরে, শিক্ষকের দেওয়া ছড়াটি মুখস্থ না করলে খেলা হবে না তবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শীঘ্র শীঘ্র তা শিখে নিতে চাইবে। ধরা যাক্ শিশুদের এই ছড়াটি বলা হল—

"উপেনটি যাইছোপ্
যাইপেন্ টাইছোপ্।
চুলটানা বিবিয়ানা
লাট্টু বাবুর বৈঠকখানা।
আজ হলেছে খেতে
পান সুপারী খেতে।
পানের মধ্যে মৌরী বাটা
ইস্কিমে চাবি আঁটা।"

ঐ ছড়াটির সাথে সম্বন্ধিত খেলা বাংলা দেশের অনেক শিশুর কাছেই পরিচিত। দুইটি শিশু মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত ধরে মাথার উপর তুলবে এবং অপর শিশুরা এক পঙক্তিতে দাঁড়িয়ে পর পর সকলের কোমর ধরে ঐ শিশু দুটির হাতের নীচ দিয়ে যাবে। এই ভাবে তাদের একজনকে মধ্যে রেখে বৃত্তাকারে ঘুরবে ও সাথে ঐ ছড়াটি সকলে বলবে। ছড়ার শেষের পঙক্তিটি 'ইস্কিমে চাবি আঁটা' বলতে গিয়ে ছড়ার শেষ অক্ষরটি শেষ হওয়ার সাথে যে শিশুটিকে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় শিশু দুটি তাদের হাতের নীচে পাবে তাকে হাত দিয়ে আটকে দেবে। তখন সেই ছেলেটি 'মরা' হয়ে যাবে। এইভাবে যতক্ষণ না সকলে 'মরা' হয়, ততক্ষণ ছড়াটি আবৃত্তির সাথে সাথে খেলা চলবে।

ঐ রূপ বিভিন্ন ছড়া শিক্ষক যোগাড় করবেন কিংবা নিজে রচনা করে নেবেন। ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে শিশুর মাতৃভাষার উপর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে, ছন্দবোধ আয়ত্ত হবে, ভাষার জড়তা কেটে গিয়ে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস আসবে, ভীরুতা লজ্জাশীলতা নষ্ট হয়ে কল্পনাশক্তি, স্মৃতিশক্তির উন্মেষসাধন ও ভাষার সাবলীলতার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।

শিশু গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। নানা জীব জন্তু, পরী ও রূপকথার কাহিনী শুনতে শুনতে সে

তন্ময় হয়ে পড়ে— মন তার চলে যায় কোন্ এক সুদূরে কল্পনার রাজ্যে। গল্পগুলোর মধ্যে নিহিত সুখ দুঃখ, যেমন আনন্দের স্ফূর্তি সহজ সুন্দর ও সত্য পথে চলবার প্রেরণা যোগায়। কুশলী শিক্ষক শিশুর মনের মত করে গল্পের বিষয়বস্তু যাতে শিশুর মনে ছাপ মেরে যায় এমন ভাবে বলবেন। শিক্ষকের সংযত কণ্ঠস্বর এবং মুখভঙ্গি যেন শিশুকে গল্প শোনাতে শোনাতে হাসায়, কাঁদায়, তাঁর আবেগপূর্ণ ভাষা শিশুকে যেন অভিভূত করে ফেলে। শুধু তাই নয়, গল্প বলার শেষে শিশুমনে তার প্রভাব কতখানি পড়ল সেদিকে শিক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে। বনের সেরা পশু সিংহমামার কাহিনী, নীলপরী, লালপরীর ঘুমন্ত খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে ঐ সুদূর নীলাকাশের বুক চিরে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে উড়ে চলার গল্প, বিমাতার কোপে পড়ে কেমন করে রাজপুত্র পাতালপুরীর রাক্ষসদের হত্যা করে সেই দেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ঘরে ফিরল, সেই কাহিনী শুনতে গিয়ে শিশুর যেমন মনোনিবেশ করার শক্তি বৃদ্ধি হবে, তেমনি আবার কোন জিনিস গুছিয়ে বলতে সে অনুপ্রাণিত হবে। তা ছাড়া শিক্ষক তাঁর বলা গল্প শিশুদের বলতে বলবেন কিংবা ছোট ছোট প্রশ্ন করে গল্পটি তারা ঠিক ভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা, জেনে নেবেন। এর ভিতর দিয়ে শিশুর ভাষার জড়তা কেটে যাবে, উচ্চারণের বিশুদ্ধতা আসবে, স্মৃতি ও কল্পনা শক্তি বিকশিত হবে এবং শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।

শিক্ষক হবেন শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল। দিনের প্রথমে বিদ্যালয়ে তিনি তাদের নিয়ে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে বসবেন এবং নানা খবর গল্পচ্ছলে জেনে নেবেন। তারা আজ কে কি খেয়ে এসেছে, পথে আসতে আসতে কে কি দেখেছে, গ্রামের কোন মূল্যবান খবর আছে কিনা—এ সবের মধ্য দিয়ে তার পরিবেশ কিভাবে তার মনে ক্রিয়া করছে, সে কতখানি নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন, তার সুখ দুঃখ ও আনন্দবোধ কতখানি, এবং তার মনের মধ্যে কোন জিনিসের অভাবের বোধ করছে কিনা, তার জন্য শিশুর উত্তর জীবনে কতখানি দান্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হবে, ঐ সব বিবেচনা করে শিক্ষক তার বিহিত ব্যবস্থা করবেন। এর মধ্য দিয়ে তার পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা আনিয়ে পর্যবেক্ষণ শক্তিকে জাগ্রত করে দেওয়া হবে। তাছাড়া শিক্ষক তাঁর দু একটি এমন খবর বলবেন যার মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু আছে। শিক্ষকের বলা খবর যেন এমন হয়, যা শিশুর পক্ষে গ্রহণীয় হবে। অনাগত ভবিষ্যতে এই খবর বলার ক্ষুদ্র বীজটি এক মহীরুহে রূপ নেবে। পরে দেখা যাবে তার আপন পরিবেশের খবর আহরণ করে সে বাহিরের খবরও সংগ্রহ করবে এবং পড়বে।

ঐ সব শিশু ছোটছোট নাটক অভিনয় করবে। যেমন সেয়াল কুমীরের প্রচলিত কাহিনীটিকে অবলম্বন করে কেউ দাদুরে সেয়াল, কেউ বা হবে তার সন্তান সন্ততি, আর একজন হবে কুমীরের ভূমিকা গ্রহণ করবে। কুমীরের ছেলেকে সেয়াল পণ্ডিত পড়াতে পড়াতে তার সব কটি ছেলেকে খেয়ে নিয়ে কি ভাবে পালিয়ে গেল, এবং শেষে একদিন পুত্রশোকাতুর কুমীর নদীর জলে পানরত সেয়ালের পা কি ভাবে ধরে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চাইল; শেষে চতুর সেয়াল তার বিপদ বুঝতে পেরে হেসে বলল, 'লাল লাঠিটা বেলি কি সুন্দর পেলি।' বোকা কুমীর সেয়ালের পা না ধরে তার লাল লাঠিটা ধরেছে বুঝে নেওয়া দিল ও কি ভাবে সেয়াল সে যাত্রা রক্ষা পেল, সেই অভিনয় বিশেষ অঙ্গভঙ্গীসহকারে করতে শিশু আনন্দ পাবে। অভিনয়ের সংলাপ ঐ শ্রেণীর শিশুদের জন্য শিক্ষকই দেবেন এবং কথাগুলি মুখস্থ না করে তার অর্থ ঠিক রেখে তারা অভিনয় করে যাবে। মুখস্থ করান হয়তো সম্ভব হতে পারে কিন্তু প্রথমেই সেই ভাবে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে

বদলে তারা অসুবিধায় পড়বে। অভিনয়ের পোষাক পরিচ্ছদ তারা নিজেরাই তাদের খুশীমত তৈয়ারি করে নেবে; পরে যাতে তারা উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে অভিনয় করবার সুযোগ পায় শিক্ষক তাদের সেই ভাবে সাহায্য করবেন। ঐদিকেও শিক্ষককে উদ্যোগী হতে হবে। তিনি নিজেই সুন্দর সুন্দর শিশুর উপযুক্ত গল্প বলে নাটকে রূপ দেবেন এবং শিশুদেরও নাটক রচনা করতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজন বোধে উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের রচিত ঐরূপ নাটক শিশুদের দ্বারা করান যেতে পারে এবং তাদেরও দু এক জনকে অভিনয়ে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কারণ উপরের শ্রেণীর ছাত্ররা নাটকে কিছুটা পারদর্শিতা লাভ করেছে; প্রথম শ্রেণীর শিশু তাদের সাথে অভিনয় করতে গিয়ে, অভিনয় কেমন ভাবে করলে ভালো হয়, সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা পাবে। কিন্তু শ্রেণীর প্রতি ছেলেমেয়েই যেন অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে শিক্ষককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে; না হলে অভিনয়ের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। অভিনয়ের মধ্যে শিশুর ভীরুতা লজ্জাশীলতা কেটে যায়, তাদের উপর পারদর্শিতা জন্মায় এবং অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনে দশজনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে শেখে। ঐ সব অভিনয়কে অতিক্রম করে উপরের শ্রেণীতে ঐতিহাসিক এবং ভাল সামাজিক নাটক করতে গিয়ে আদর্শস্থানীয় চরিত্রগুলি যেমন শিশুর হৃদয়ে ছাপ রেখে যায়, উত্তরজীবনকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করে, তেমনি আবার খারাপ চরিত্র গুলির জন্য স্বভাবতই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা জেগে ওঠে এবং ফলে সমাজের বুক থেকে অসামাজিক সব কিছুকেই সে মুছে ফেলার জন্য চেষ্টিত হবে।

এইভাবে শিশুকে মৌখিক আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে তার অক্ষরপরিচয়ের প্রথম ভিত্তি রচিত করতে হবে। বিদ্যালয়ের উপর শিশুর মমতা এনে দিতে হবে এবং বিদ্যালয়কে আনন্দের স্থান করে তুলতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্বন্ধ রচিত হবে। শিশু যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিক্ষকের সাথে মিশতে পারে এবং প্রাণ খুলে মনের কথা বলতে পারে। তবে ঐরূপ ভাবে মিশবার সাথে সাথে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলা প্রয়োজন। শিক্ষক শিশুকে ভালবাসবেন সত্য কিন্তু স্নেহের মোহজালে যেন না পড়েন। প্রচলিত শিক্ষা আজও এক শ্রেণীর শিক্ষিত অভিভাবকদের কাছে খুবই প্রশংসা পেয়ে আসছে, কিন্তু শিশুকে সত্যকারের মানুষ করে গড়ে তুলতে হলে, আগামী দিনের সুনাগরিক ও শিক্ষার দীক্ষায় উন্নত করে তুলতে হলে, মুনিয়াদী শিক্ষককে অভিভাবকদের গল্প অভিনয় ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে, এবং শিশুর মনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেইভাবে নানা বৈচিত্রপূর্ণ ছড়া গল্প অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মৌখিক আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে তাকে পুঁথিপড়ার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

———

গ্রীস দেশের শিক্ষা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

আজ গ্রীসের শিক্ষাব্যবস্থার কথা লিখিতেছি। নিউইয়র্ক সহরে ইণ্টারন্যাশনাল হাউস-এ থাকাকালীন দুই গ্রীক ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষাব্যবস্থার কথা লিখিয়া নিয়াছিলাম। দেশটি ছোট, অনুর্বর, বসতি সেই তুলনায় বোধ হয় কম। প্রায় চার শত বৎসর তুর্কীদের অধীনে ছিল। প্রায় সওয়া শত বৎসর আগে স্বাধীন হয়। ঐ স্বাধীনতা যুদ্ধে লর্ড বায়রণ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশীর নিস্বার্থ সাহায্যের দৃষ্টান্ত বোধ হয় লর্ড বায়রণই আধুনিক যুগে প্রথম দেখান। ১৯৩৫ সালে আবিসিনীয়ার স্বাধীনতা হরণে ইটালী যে তৎপরতা দেখাইল, তাহাতে চিন্তাশীল জনমণ্ডলী চমকিত হইল। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইটালী এবং জার্মানী স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদ্রোহীদলকে সাহায্য করিল। ভবিষ্যতের চিন্তাহীন আপনভোলা কতকগুলি যুবক মিলা গঠিত আন্তর্জাতিক বাহিনী (International Brigade) আইনসঙ্গত গভর্ণমেণ্টকে বাঁচাইবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিল। লিটন কমিশনের রিপোর্টকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া তাহার কিছু দিন আগে বা এই সময়ে জাপান লীগ অব নেশনস ত্যাগ করিল। ১৯৩৪-৩৫ সালে জার্মানীর গোপন অস্ত্রসজ্জার জন্য বৃথাই চার্চিল অরণ্যে রোদন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই সকলেরই পরিণতি। অপরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গণতন্ত্রী কোন প্রবল শক্তি ক'ষে আঙুলটিও উঠান নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের নিজেদের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে তাঁহারা কেন সাহায্য পাইবার আশা করেন? প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেও তুর্কীতে অনেক গ্রীক ছিল; গ্রীসেও অনেক তুর্কী ছিল। পরাজিত নিপীড়িত তুর্কী দেখিয়া ক্ষুব্ধ গ্রীসের কিছু হিংসা করিতে ইচ্ছা হইল। দেশের রাজনিষ্টা জোর করিয়া দখল করিল। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী দেশগুলির যৌন সম্মতি ছিল। যত দিন আর বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন রোগা পটকা লোকটাকে (sick man) বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন ছিল; রাশিয়ার জার নিশ্চিহ্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় সমঝটাও করিয়া গেল। তুর্কীর অবস্থাও হয়ত কাহিল হইত, কিন্তু মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে দেশটি রুখিয়া দাঁড়াইল। দেশটা বাঁচিল। ঐ সময় পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দ উত্তরে আর্কাঞ্জেল, পশ্চিমে পোলাণ্ড ও দক্ষিণে সেবাস্তোপোল হইতে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ষ্টালিনের নেতৃত্বে দেশটা পাল্টা আক্রমণ করিল। আশায় ছাই দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেন। সব দেশেই কিন্তু শরণার্থীর প্রশ্ন রহিয়া গেল। সোভিয়েট শাসন স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক রাশিয়ানগণ (White Russians) দেশ ত্যাগ করিল; গ্রীসের রাশিয়া তুর্কীগণ হিজরাত করিল; তুর্কীর রাশিয়া গ্রীকগণ দেশ ত্যাগ করিল। রোমেনী ও গ্রীস এবং রোমের নাম করিতে একদা পশ্চিম ইউরোপের গাল ভরিয়া উঠিত। ইউরোপীয় সভ্যতার জননী গ্রীস ও রোম দুই দেশেরই অবস্থা আজ বড়ই কাহিল। দেশ দুটি আছে বটে, কিন্তু কেহই আজ প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক নয়। প্রসঙ্গত লিখি যে গ্রীকগণ নিজেদের দেশকে মাতৃভাষায় Hellas বলে, যেমন জার্মানী, পারস্য, ফ্রান্সারী, জাপান ও ভারতবর্ষের অধিবাসী নিজ নিজ দেশকে নিজ মাতৃভাষায় যথাক্রমে Deutch land (উচ্চারণ 'ডয়েশ ল্যাণ্ড')

ইরাণ, মঙ্গোলিয়া, সিঙ্গাপুর ও ভারত বলে। কোন কিছু বুঝিবার অতীত অর্থাৎ অবোধ্য অর্থে ইংরাজীতে "Greek" ও "Welsh" কথা দুটিরও ব্যবহার আছে।

গ্রীসে শিক্ষালয় তিন স্তরে বিভক্ত, প্রাথমিক (DEMOTIKO), মাধ্যমিক (GIMNASION) ও বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছয় বৎসর পড়িতে হয় এবং নাম মাত্র ফী (আমাদের দেশের প্রায় ১৷০ মাত্র) লাগে। ৬-৮ বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে হয়। তাহাতে ছয়টা শ্রেণী থাকে। প্রথম শ্রেণীতে অক্ষর পরিচয়, সংখ্যা এবং কিছু শব্দ শিখিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাহাই বেশি করিয়া এবং ধর্ম, খেলা, ও চিত্রাঙ্কন শিখিতে হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাহা পাঠ্য থাকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে তাহাই পড়িতে হয়, এবং পৌরাণিক কাহিনী, স্থানীয় ইতিহাস, সামান্য জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা শিখিতে হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে এই সকল বিদ্যা বেশি করিয়া শিখিতে হয়। এই সঙ্গে আধুনিক গ্রীসের ইতিহাসও পাঠ্য থাকে। পৃথিবীতে যে অল্প কয়েকটি দেশে ধর্ম অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়, গ্রীস তাহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন গ্রীস ছিল পৌত্তলিক। রোমের নিকট পরাজিত হইলেও তাহার সভ্যতার গৌরব ছিল তীব্র। দুইটি সভ্যতার মধ্যেই মিলন হইয়াছিল। আমাদের দেশেও ইস্‌লামিক সভ্যতার পরিচয়প্রাপ্তিতে যাহা দাঁড়াইল তাহা ইসলামিকও নয়, হিন্দুও নয়, তাহা ভারতীয় এবং হিন্দু ভাবধারায় পুষ্ট। উর্দু ভাষাকেও কোন প্রকারেই সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা বলা যায় না। ইংরাজী ভাষা রোম হইতে অক্ষর পাইয়াছিল; কিন্তু গথ, অ্যাঙ্গলস্যাক্সন ও ভাইকিংদের ভাষা মাত্রই এঙ্গলো-স্যাক্সন ভাষা। মধ্যযুগের শেষে রেনেসাঁ হইতেই গ্রীক ও লাতিন ভাষার সম্পদ আহরণ করিয়া ইংরাজী ভাষার আধুনিক রূপ দাঁড়াইল। সেজন্য প্রাচীন ভাষার সাথে আধুনিক ভাষার খুব বেশী পার্থক্য, যেমন বৌদ্ধ চর্যাপদ পড়িয়া আমরা অনেকেই তাহার অর্থ বুঝি না, যেহেতু তাহা প্রাচীনতম বাংলায় লেখা।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতম শিক্ষার নাম গ্রীক ভাষায় যথাক্রমে *Stichiodis*, *Expedeusis*, *Messi Expedeusis*, ও *Anotati Expedeusis*। মাধ্যমিক শিক্ষা দুই শ্রেণীর; প্রথমটিতে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ভাষা, বিদেশী ভাষা, অঙ্ক (বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি), পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত, বেখাঙ্কন, ধর্ম, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, আধুনিক গ্রীক ভাষা, পৌরণাম ও গ্রহ বিজ্ঞান (Astronomy) পাঠ্য। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়কে Classikon Gimnasion বলে, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়কে Praktikon Likon বলে। তাহাতে লাতিন থাকে না; প্রাচীন গ্রীক ভাষা অল্পই পড়িতে হয়, কিন্তু অঙ্ক খুব বেশি করিয়া পড়িতে হয়। প্রাচীন গ্রীসে অঙ্কের অসাধারণ চর্চা হইয়াছিল। ইউরোপীয় ভাষায় অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার নাম গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে। শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে আগে একটা মত ছিল যে অঙ্কে পারদর্শী ছাত্র বেশি বুদ্ধিমান হয়। সে মতবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাক্ সে কথা। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা, ইংরাজী, ভূগোল, মনস্তত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, আধুনিক গ্রীকভাষা ও পৃথিবীর ইতিহাস পড়িতে হয়। বর্তমান গ্রীস যেমন প্রাচীন গ্রীস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আধুনিক গ্রীক ভাষা তেমনই প্রাচীন গ্রীক ভাষা হইতে পৃথক। অবশ্য ভাষা কয়েক শত বছরের পুরাতন হইলে তাহাতে বেশ পরিবর্তন আসে। মনে পড়ে, ইরাণ ভ্রমণে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সী ভাষার অধ্যাপক, যিনি মধ্যযুগের এবং প্রাচীন

পার্শী ভাষাতে সুপণ্ডিত, আধুনিক পার্শী বুঝিতে যথেষ্ট বেগ পাইয়াছিলেন। বর্তমান যুগেও ইংলণ্ডের ইংরাজী ভাষা ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের মধ্য অঞ্চলের ইংরাজী ভাষায় শব্দগত পার্থক্য বড় বেশি। পৃথিবীর ইতিহাস পড়াইবার সময় গ্রীসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রীক ইতিহাসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমি অবশ্য জিজ্ঞাসা করি নাই যে ১৪৫৩ সালে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্ (বর্তমান ইস্তাম্বুল) সহরের পতনের বিবরণ কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শত বৎসর নিউইয়র্ক সহরে প্রবাসী তুর্কীগণ পাঁচ শত বৎসর আগে কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌ল্ যখনের উৎসব সাড়ম্বরে পালন করিল। তুর্কীগণ মুসলমান, খ্রীষ্টানদের দেশে অবাধে উৎসবটি পালন করিল। কিন্তু গ্রীস দেশে বোধ হয় তাহা করিতে পারিত না। গ্রীকগণ যদিও খ্রীষ্টান কিন্তু বড়ই গোঁড়া। ইংরাজীতে তাহাদের ধর্মসম্প্রদায়ের গীর্জার নাম Greek Orthodox Church.

বাণিজ্য শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে; গ্রীক ভাষায় তাহাকে Eborikai Scholai বলে। তাহাতেও ছয়টি শ্রেণী আছে।

গ্রীস দেশে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়, এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয় ও সালোনিকা বিশ্ববিদ্যালয়—গ্রীক ভাষায় যথাক্রমে Panepistimion Athinon ও Panepistimion Thessalonikis নামে অভিহিত হয়। শিক্ষক শিক্ষণের জন্য সাত আটটি কলেজ আছে। এই কলেজগুলিকে Pedagogiki Akademie বলে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া এই কলেজগুলিতে ভর্তি হইতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিবার জন্য দুই বৎসর এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিবার জন্য চার বৎসর ট্রেনিং লইতে হয়। যে কোন বিষয়ে ডিপ্লোমা লইতে হইলে চার বছর পড়িতে হয়; তবে চিকিৎসা বিদ্যায় ছয় বৎসর লাগে। চার বৎসরের অধিক ইতিহাস পড়িয়া আমাদের নামের কেহ যদি গ্রীক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা পান তবে তাহার নাম এই ভাবে লিখিতে হইবে:

Sri Dilip Kumar Biswas, Diplomatouchos Philosophikis Shcolis

ঐ প্রকার, মাষ্টারমশায়ের কেহ ডিপ্লোমা পাইলে তাহার নামের পর এইভাবে লিখিবে:

Sri Haripada Ghosh, Diplomatouchos Politikon Episimon.

বলিয়া রাখা ভাল, ইংরাজী ভাষার বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রভৃতি প্রত্যেক শাখার শব্দসম্ভার প্রায় প্রত্যেক শব্দ হয় লাতিন না হয় গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে। একটু উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী শব্দ দেখিলে মনে মনে চিন্তা করি, ইহা কি গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে? তবে অনেক লাতিন কথাও গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে। লাতিনের সহিত আমাদের সংস্কৃত ভাষার শব্দের নিকটত্ব। গ্রীক ভাষার সঙ্গেও শব্দের আছে; যেমন, ইংরাজী centre কথা গ্রীক Kentron হইতে আসিয়াছে, তাহা আবার সংস্কৃত "কেন্দ্র" কথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইংরাজী ওষুধ ও রোগগুলি—বিশেষ করিয়া রোগের নাম—গ্রীক ভাষাজাত। Oxford Dictionary খুলিয়া দেখিলাম, যে সব রোগের নাম জানি সেগুলির অনেকেরই মূল গ্রীক ভাষা। যে সব রোগের, ও ওষুধের শব্দের উৎপত্তিস্থল লাতিন ভাষা, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে।

কার্থেজ অনেক কিছু আগেই বিভক্ত ইটালীর একত্রীকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, যদিও দেশ এবং গভর্নমেণ্ট রোম নামেই পরিচিত ছিল। ইটালীর চাইতেও আকারে ছোট হেলাস অসংখ্য ছোট ছোট নগর রাজ্য (city state) লইয়া গঠিত ছিল। থার্মোপাইলীর গিরি সঙ্কটে কয়েক লক্ষ পারসীককে রুখিয়া ও ম্যারাথনে পৃথিবীর বিশালতম বাহিনীকে হারাইয়া দিয়া হেলাস শ্রেষ্ঠত্বের চরম সীমানায়

পৌঁছিল। এথেন্স রাজ্যের নায়কত্বে কনফেডারেসী অব হেলাস গঠিত হইল। কিন্তু পেলিক্লিসের স্বার্থপরায়ণতায় বিরক্ত হইয়া চির প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টাকে সামনে রাখিয়া অন্যান্য রাজ্যগুলি বিদ্রোহ করিল। পেলোপনেসীয়ান যুদ্ধে এথেন্সের সৌরব চিরতরে অস্তমিত হইল, কিন্তু স্পার্টারও পরাক্রম বেশী দিন থাকিল না। তারপর থীবিসনের ফিলিপ ও আলেক্সান্দারের আবির্ভাব। থীবিসন কিন্তু অসভ্য বর্বর (ইংরাজী Barbarian কথাটির মূল ঐ একই গ্রীক শব্দ, যদিও গ্রীক ভাষায় শব্দটির বর্ত্তমান অর্থ চলিত ছিল না) বলিয়া বিবেচিত হইত। আলেক্সান্দারের পর আবার দীপ নির্বাণ। তখন হেলাস-এর সৃজনী প্রতিভা খর্ব হইয়াছে; আস্তকলহে দেশটা নিমজ্জিত। আমাদের দেশে যেমন তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরিণামে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ লাভবান হইল আস্তকলহে, তেমনি হেলাস রোমের কুক্ষিগত হইল। কর্ণেল টড যেবারের তুলনা দিয়াছেন। সওয়া শত বৎসর আগে রাজপুতনার পলিটিকাল এজেন্ট হইয়া তিনি যখন যেবারে যান তখন হতভাগ্য মহারাণার মুষ্টিমেয় অনুচর বই গৌরবের আর কিছুই ছিল না। হলদিঘাট ও থার্মোপাইলী এবং যেবারী ও ম্যারাথনের যুদ্ধের তুলনা করিয়া এই বৈদেশিক সৈনিক পুরুষ সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, "Haldighat is the Thermopyle of Mewar; Dewari, her Marathon." অর্থাৎ হলদিঘাট মেবারের থার্মোপাইলী, দেবারী তাহার ম্যারাথন।

হেলাস কেন রোমের কুক্ষিগত হইল? ঐতিহাসী সমরহাসে কর্ণেল টড রাজস্থানের রাজাগুলিকে যথাসম্ভব মর্যাদা দিতে চাহিয়াছিলেন, যদিও পরিণামে তাহাই তাঁহার কাল হইল। একজন সেনাপতির উপর স্বভাবতঃ হেলাস অন্যের ভার পড়িল, নাম Flamineus. কর্ণেল টডের মতনই তিনিও দেশটির পুরাতন গরিমায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন রোমের গৌরবসূর্য মধ্যাহ্নগগনে শোভা পাইতেছে; সাম্রাজ্য বিস্তারের কাল। কার্থেজ জয় করিয়া পূর্ব দিকে সাম্রাজ্যের সীমা অগ্রসর হইতেছে। সেনাপতি ফ্লামিনাস দেশটা জয় করিয়াও দখল করিলেন না, স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু আস্তকলহে এবং অদূরদর্শিতায় স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব হইল না; চিরকালের জন্য পদানত হইল। ইহার পর হইতে পরাজিত হেলাস জয়ী রোমকে বিদ্যের ভাষা এবং কৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করিল। রোম তখন হইতে নিজের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ত্যাগ করিয়া বিলাসিতার পথ ধরিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে যখন শিল্পবিপ্লব আসিল তখন ইংলণ্ডে, বিশেষ ভাবে ম্যানচেস্টারে, প্রাচীন সরল জীবন যাপনের পরিবর্তে আড়ম্বরপ্রিয়তা আসিল, কবি বার্নস্ তাহাতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বকালেই ইহাই ঘটিয়াছে। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর প্রথম চার খলিফাকে "রশীদিন" অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ বলা হইত। তাঁহাদের সময়ে মাত্র সত্তর বৎসরের মধ্যে জিব্রাল্টার হইতে আফগানিস্থানের সীমা পর্যন্ত সব দেশই সারাসেনদের দখলে গেল। হাসান হোসেনকে নিহত করিয়া এজিদ খলিফা হইবার পর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের পরিবর্তে সারাসেন সভ্যতা বিলাসে ডুবপুর হইল। তারপর সারাসেন সভ্যতার আরও বিস্তার ঘটিয়াছে, উহা আশ্চর্যজনক সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু যাহা হারাইল তাহা পাইল না। তাহাদের বংশধরগণ কিছু দিন পূর্বেও পৃথিবীর অন্যতম বলিষ্ঠতম জাতি ছিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন যাযাবর কলহপরায়ণ আরবগণ এক মহান ঐতিহ্যের অধিকারী তাহা আজও তাহারা জানে না। তুর্কীরা আরবদের কৃষ্টি ও ধর্ম গ্রহণ করিল বটে কিন্তু "সেলজুক" শাখার

তুর্কীগণ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া আরবদিগকে অধীনে রাখিল। পরাজিত আরবগণের সামাজিক, আর্থিক, ও কৃষ্টিগত অধোগতি দ্রুত হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী তুর্কীদের অধীনতার পাপপাশে থাকিতে হইল। অবশেষে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আরবের বিখ্যাত লরেন্সের সহায়তায় স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল। স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু দেশটা এখনও মধ্য-যুগের সামন্ততন্ত্রের শাসনে পিষ্ট। সম্প্রতি মৃত ইবন সৌদ বা তাহার পুত্র, মধ্যযুগের Benevolent Despot মাত্র।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিলাম। রোমের ভাষার উপর গ্রীক ভাষার প্রভাব অসামান্য। ইংরাজী History কথা লাতিন Histor হইতে, এবং তাহা আবার গ্রীক Historia (অনুসন্ধান, inquiry) কথা হইতে আসিয়াছে। গ্রীস আরও নানাভাবে রোমকে এতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল যে একটা কথা আছে "Rome was hellenised by Greece." সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস শুধু যে দার্শনিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি সুলেখকও ছিলেন। যদিও তিনি জাতিতে রোমক, তবু তিনি গ্রীক ভাষায় প্রতিদিনের রোজনামচা লিখিতেন। ১৯৪৮ সালে দিল্লীতে যাবে যাইতেছিলাম। বসট মার্কাসের নিকটে এক অতি আধুনিক মহিলাকে এতোধিক আধুনিক পোষাক পরিতে দেখিয়া এক সহযাত্রী হিন্দুস্থানীতে মন্তব্য করিলেন যে ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহার ইংরাজিয়ানা রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের পণ্ডিত নেহেরু সম্পর্কে গান্ধীজী একবার লিখিয়াছিলেন, "He feels more at home with Englishmen than with Indians." ভারত সীমান্ত পার হইলেই পণ্ডিতজী কোট প্যান্ট টাই পরিবেন। বলিতে গেলে তিনিই রাজ্যের প্রধান; বিদেশে তিনি যে পোষাক পরিবেন, স্বদেশী সিদেশী সেই পোষাককেই শ্রদ্ধা করিবে। সাকুল্যার তারী করিয়া দেশদুয়ার প্রতি শ্রদ্ধা আনা যায় না। পণ্ডিতজী যদি পেরোয়ানী পাজামা ত্যাগ করিয়া কোট প্যান্ট পরিয়া ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন, তবে অন্যে পরে কা কথা? "Cultural Conquest" যে কত দূর হইতে পারে ইহাই তাহার এক দৃষ্টান্ত। আমেরিকার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মাথায় দেশী টুপী, গায় গলাবন্ধ কোট ও পাজামা পরিয়া সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিয়াছি, আর শীতের মধ্যে ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া ভাইসপ্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নিক্সন মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিও কোন অসুবিধা বোধ করে নাই। যাক্ সে কথা।

এজিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য এথেন্স সহরে একটি ভাল কলেজ আছে; চার বৎসর পড়িতে হয়। সেখান হইতে পাশ করিলে উপাধি এইভাবে লিখিতে হইবে:

Sri S. C. Ghosh, Deplomatouchos Michanologos Michanikos.

এথেন্স সহরে বাণিজ্য শিক্ষার জন্য Anotati Scholi Oikonomikon Ke Emporikon Epistimon (Superior School of Economical and Commercial Sciences) নামে একটি প্রতিষ্ঠান; পাঠ্য তিন বৎসরের। এথেন্স ও সালোনিকায় কৃষি শিক্ষার জন্য দুইটি বিদ্যালয় আছে, নাম Anotati Geoponiki Scholi (Superior School of Agriculture)। ডিপ্লোমা (৪ বৎসর) পাইয়া পরে ডক্টরেট পরীক্ষা দেওয়া যায়।

যাহারা ভবিষ্যতে সরকারী কাজ কর্ম করিতে ইচ্ছুক তাহারা এথেন্স সহরের Anotati scholi Politikon Ke Oiconomikon Epistimon (Superior School of Political and

Economical Sciences) বিভাগের Administrative Law, Diplomatic History, Constitutional Law, Economics, ও Statistics পড়িয়া থাকেন। পাঠ্যকাল তিন বৎসর মাত্র।

বার্ষিক পরীক্ষার প্রতি বিষয়ে কুড়ি নম্বর থাকে। প্রতি বৎসর দুইটি প্রধান পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে; তাহাতে তিন ঘণ্টা সময়। ঐ দুটি পরীক্ষার মধ্যে অনেকগুলি ছোটখাট পরীক্ষা (test) লওয়া হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষায়তনের শিক্ষকগণ নিজেরাই শেষ পরীক্ষা লইয়া থাকেন। ছাত্র যদি দুই বা তদোর্ধ্ব এক বিষয়ে ফেল করে তবে উপরের ক্লাসে উঠিয়া যায়, কিন্তু একাধিক বিষয়ে ফেল করিলে ক্লাসে উঠিতে পারে না। স্কুলের উপরের শ্রেণীতে Subject Teacher এবং নীচের শ্রেণীতে Class Teacher পড়াইয়া থাকেন। ১লা অক্টোবর স্কুল আরম্ভ হইয়া ২০শে জুন পর্যন্ত চলে। তিন মাসে দশ দিন পরমের ছুটি। শীতকালে সকালে ৮.৪৫ হইতে দুপুর ১।৩০ পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে সকাল ৮।১৫ হইতে ১.৩০ পর্যন্ত স্কুল বসে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং Classikon Gimnasion-এর শিক্ষকগণ গভর্ণমেণ্ট হইতে বেতন পান; তাঁহারা "প্রাইভেট টুইশান" করিতে পারেন না। গ্রীসের আয়তন ১৪০,০০০ স্কোয়ার কিলোমিটার ও লোক সংখ্যা আশী লক্ষ। স্কুল হইতে জল খাবারের কোন ব্যবস্থা নাই।

গ্রীক ছাত্র দুইজন অবশ্য সুপরিচিত। তাহাদের গর্ব যে আমেরিকা বা ইংলণ্ড হইতে উচ্চ অঙ্কের অত গ্রীস দেশের হাইস্কুলে পড়ান হইয়া থাকে। তাহাদের নাম ঠিকানা:

(১) Mr. Zacharias Tsou Garakis
Malaxa (canea),
Creto, Greece.

(২) Mr. Alexander Sakabbaropoulos
57, Charilaou Trikoupi Str.
Athens, Greece.

———

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | ভাদ্র ১৩৬১ | ১০ম সংখ্যা

আলোচনা

অধ্যাপক সম্মেলন

কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক-সমিতির তিন দিন-ব্যাপী যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে শিক্ষক-দের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিভিন্নমুখী বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্মেলনে শিক্ষকগণ দলে দলে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব-গুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

১। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হউক।

২। রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশসমূহ অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য সম্মেলনের দাবী জানান হয়। প্রস্তাবে শিক্ষকদের বেতনের হার ৩০০৲—২৫—৫০০—৩০—৮০০৲ টাকা করার কথা বলা হয়। কলেজগুলির মধ্যে যে "বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী" পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অবিলম্বে দূর করা হউক। এই প্রস্তাবে কলেজের সকল শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, ব্যায়ামশিক্ষক ও ল্যাবরেটারি সহকারী কর্মীদের মাসিক ৪০৲ টাকা মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

৩। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল সমস্যা আছে তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হইতে এই সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধনের জন্য দাবী জানান হয়।

৪। মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে অবশ্যই ও অন্যায়-ভাবে বাতিল করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

৫। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে দেশের সর্বত্র যে ঘুষ খাওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া অবস্থাদৃষ্টের বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন আধুনিক কালের দাবী যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে মিটাইতে হয় তবে বৈজ্ঞানিক, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে একসূত্রে বাঁধিয়া উচ্চ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তৃত করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি শ্রেণী বিশেষে শিক্ষা-বৈষম্যের কথা বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে এই বৈষম্যের জন্য ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার

প্রথা অবৈজ্ঞানিক। তাই তাহারা অবিলম্বে সকল স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ও পরীক্ষা নেওয়ার দাবী করিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে সরকারী কলেজগুলি বাদ দিলে শতকরা ৯০ ভাগ কলেজেরই খরচ চলে ছাত্রবেতন হইতে। সুতরাং ১৯৪৯ সনের পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় যে ফি বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা অসমীচীন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা তদন্ত কমিশন

পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের পরিচালনার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিযুক্ত কমিশনের বৈঠক ১৬ই আগষ্ট বসিয়াছে। যাহাতে অক্টোবর মাসের মধ্যেই রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহার জন্য সরকার বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। ঐ সময়ের মধ্যে কমিশনের তদন্ত কার্য শেষ করিয়া রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিতে হইলে কমিশনের কাজ দ্রুত চলা আবশ্যক।

কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ বি বি দে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসুর সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। ডাঃ দে সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন যে, কমিশন পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষকদের বেতনের হার তুলনা করিয়া দেখিবেন। বিদ্যালয়ের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ের জন্য তাঁহারা কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাঁহারা কিছু সুপারিশ করিতে পারেন। কমিশন বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহশীল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মতামত জানিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

হাবড়ায় জনতা কলেজ

প্রায় সাত বৎসর হইল ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাবড়ায় পশ্চিমবঙ্গের এক বৃহৎ রিফিউজি কলোনি স্থাপিত হইয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষাকেন্দ্র দুইটি হাবড়াকে সুপরিচিত করিয়াছে। ইতিমধ্যে হাবড়া কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট প্রোজেক্টের প্রচেষ্টায় এখানে প্রায় ৩০টি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ১৬ই আগষ্ট এই কলোনিতে একটি জনতা কলেজের উদ্বোধন করা হইয়াছে।

গ্রাম-উন্নয়ন ও গ্রামে বসতিস্থাপন একদিনে সম্ভব নয়। মানুষের জীবনধারণের মূল উপাদানগুলি গ্রামে যাহাতে সুলভ হয় তাহাও যেমন দেখা প্রয়োজন তেমনই শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য চিরন্তন মানুষের যে ক্ষুধা তাহারও নিবৃত্তির পথ থাকা প্রয়োজন। শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষা এই উভয়মুখী বিকাশের ব্যবস্থা থাকিলে তবে সহজে গ্রামগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। হাবড়া কলোনির সর্বাঙ্গীন উন্নতি হউক।

কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি

উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজে স্থান সঙ্কুলান আজ এক বড় সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। এই বৎসর স্কুল ফাইন্যাল ও অন্যান্য পরীক্ষার ফল অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ায় সমস্যা এবার জটিলতর হইয়াছে। এই ছাত্রবৃদ্ধিতে দেশের লোকের মনে শিক্ষার জন্য আগ্রহবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং ইহা সুলক্ষণ মানিতেই হইবে। এখন রাজ্যসরকার যদি নানা দিকে নানাবিধ শিক্ষার পথ খুলিয়া দিয়া ছাত্রছাত্রীদের এই জ্ঞানস্পৃহাকে উপযুক্ত খাতে চালিত করিতে পারেন তবেই দেশের মঙ্গল। একদিকে যেমন বর্তমান কলেজগুলিতে স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করিয়া বাড়তি কাজের জন্য অধিক সংখ্যক অধ্যাপক দিতে হইবে, শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির দিকে বিবেচনাপূর্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে, অন্যদিকে অত্যধিক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী যাহাতে এই সাধারণ শিক্ষার পথে না আসিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আপনাদের ও দেশের উপকার করিতে পারে, তাহাও রাজ্য সরকারকে দেখিতে হইবে।

বন্যাবিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সাম্প্রতিক বন্যায় জলপাইগুড়ি জেলায় যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণ সবিশেষে অবগত আছেন। ডুয়ার্স ও আলিপুরদুয়ারের অঞ্চলের ক্ষতি অপূরণীয়। স্থানীয় সহযোগী পত্রিকা জানাইতেছেন, উক্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অচলপ্রায়। বহু বিদ্যালয় এখনও জলে মগ্ন এবং ভগ্ন অবস্থায় পতিত। কোন কোন স্থানে বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু ছাত্রসংখ্যার সন্তোষজনক উপস্থিতির মূলে যথেষ্ট অন্তরায় এখনও বিদ্যমান। অভিভাবকগণ গৃহশূন্য এবং ছত্রভঙ্গ। তাঁহারা সরকারী এবং জনসাধারণের সাহায্যে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। সুতরাং ছাত্রবেতন আদায় অসম্ভব। শিক্ষকেরাও অভিভাবকদের মত গৃহশূন্য এবং অনাহারে কাল যাপন করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের কোন বিদ্যালয়েই এ পর্যন্ত সরকারী সাহায্য পাঠান নাই। এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও আবেদন বিফল হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলা-সমাহর্তা এবং শাসক মহাশয় বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়াছেন। কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহার সহযোগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে আবেদনও করিয়াছেন। কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় নাই। অনতিবিলম্বে উক্ত বিদ্যালয়সমূহে সরকারী সাহায্য প্রেরণ না করিলে শিক্ষকগণের জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

আমরা এ বিষয়ে সরকার ও মহানুভব দেশবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিক্ষক-সনদ দিবস

আমরা গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, ১৯শে শ্রাবণ কলিকাতায় শিক্ষক-সনদ-দিবস প্রতিপালন করা হয়। শিক্ষকগণ সম্মিলিত ভাবে তাঁহাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষকের মৌলিক কতকগুলি দাবী ও দায়িত্ব স্বীকার করিয়া না নিলে শিক্ষা ও শিক্ষকের যথার্থ মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষকগণ তাঁহাদের অধিকার ও দায়িত্ব উভয় সম্পর্কেই কতগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, শিক্ষক জাতির সংগঠক, কাজেই তাঁহার নিরাপদে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিবার অধিকার আছে। তিনি স্বাধীন মত পোষণ ও তাহার প্রকাশ করিতে পারিবেন, বৈধ সকল প্রকার কাজে যোগ দিতে, নিজের কর্তব্যে ত্রুটি না করিয়া প্রয়োজনবোধে অন্য কাজের দ্বারা নিজের আয় বাড়াইতে, পরিবর্তিত বা অন্য অধিকারভুক্তিতে আবেদন জানাইতে পারিবেন। যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষণ-শিক্ষা পাইবার ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাঁহার অধিকার থাকিবে। শিক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে শিক্ষার্থীর বিশিষ্ট বিকাশের সম্ভাবনা মনে রাখিয়া সুস্থ সংস্কৃতিবান উন্নতচরিত্র নির্ভীক উদ্যোগী ও স্বপ্রতিষ্ঠ ছাত্রদল গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষকের জীবন দেখিয়া ছাত্র যেন তাঁহার কথায় সত্যতা যাচাই করিয়া লইতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সর্বমানবের ঐক্য ও মৈত্রীর নীতি শিখাইবেন, সমাজসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবেন। শিক্ষক নিজে জ্ঞানের মর্যাদায় বিশ্বাসী হইয়া ছাত্রকে সেই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিবেন। শিক্ষক সারাজীবন নিজে বিদ্যার্থী থাকিবেন, অর্থাৎ জ্ঞানের পরিসর বিস্তৃত করিবেন। চিন্তায় ও বাক্যে স্বাধীনতার উপাসক হইবেন।

মৌলিক অধিকার ও দাবীর এই সংকল্পগুলি ঘোষিয়া ভবিষ্যতের সম্বন্ধে মনে আশা জাগে। আশা করি ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে তাঁহাদের সম্মেলন ও দাবীদিবসের সার্থকতা প্রমাণিত হইবে।

নয়ী তালিমের কথা

বিনোবা ভাবে

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বিহারে রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার এক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা চলেছে। সারা দেশের দৃষ্টি ঐদিকে। আজ দেশের সর্বত্র বুনিয়াদী শিক্ষার সম্পর্কে এক অসন্তোষের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। আমরা গুটি কতক গঠনমূলক কাজ চালাচ্ছি, খাদি, গ্রাম উদ্যোগ, নয়ী তালিম এই তিনের এক বিশ্লেষাত্মক পরীক্ষা আর ক্রমান। এই সবগুলি মিলিত হলে এক বিরাট শক্তির উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু এই তিনের মিল নেই। খাদি প্রকৃতির যে কাজ চলেছে তাতে খাঁটি চেষ্টা নেই। গ্রামের জীবনযাত্রা উন্নত করা দরকার মনে করলে যে পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা দরকার তার পরিচয় কোথায়। বাপু যদতেন কিম্বা বিনোবা পণ্ডিতেরা যা-ই বলুন, নয়ী তালিমকে স্বাবলম্বী হতে হবে। কিন্তু আজ তো দেখি বুনিয়াদী শিক্ষা দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। তার কারণ মূল্য পরিবর্তনের কথা আমরা মুখেই বলি, আমাদের কাজে তার প্রমাণ নেই না। শিক্ষাবিভাগের অন্যত্র যেমন বেতনের মানের ক্রম বেশি আছে আজ বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তাই রয়েছে। চাকুরির সেই আগেকার নিয়ম, আগেকার কেরিয়ারের বিচার এই সবই এখানেও চলছে। আমি শুনলাম যে আজ বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক কাজ পান না। আমার ইচ্ছা এরা সাহসী হোন। সাহসে বুক বেঁধে বলুন, বেশ, চাকুরি চাই না, নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করবো, দুনিয়ায় নিজের স্থান করে নেব। কিন্তু আজ শিক্ষকদের সে সাহস কই? আর সেই তো দুঃখের কথা। এটা শিক্ষার দোষ। সরকার যদি কাজ না দেয় তবে সরকারের দোষ। তার মানে, সব বিষয়ে আমরা আজ অস্পষ্ট চিন্তা করি। পুরানো বাবার মূল যত ইচ্ছা খোলা হয়, সে তো গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত, কিন্তু নয়ী তালিমের মূলের বেলায় যত বিপদ। এই মনোভাবের জন্যই আজ এতদিন পরেও বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষাই চলছে। এই রকমই আজ আমাদের সব কিছুতে অস্পষ্টতা। কারো সম্মুখে কোন পরিষ্কার ছবি নাই। তাই আমার আশঙ্কা হয় কোনো ক্ষেত্রে এর অপপ্রয়োগ দেখলেই লোকের কাছে এটা নিষিদ্ধ ফলে দাঁড়াবে।

শিক্ষা বিভাগের এক পদাধিকারী আমাকে বলেছিলেন, সরকারের প্রধান প্রধান পদগুলি ভাল ভাল লোকের হাতে থাকা উচিত।

কথাটাতো ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার কথা হলো যে, আপনাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে অসমর্থ হয় তবে আপনাদের কথামতই গুরুত্বপূর্ণ পদে গেলেও বেকারই থাকবে। যে লোহাকে নিজের কাজে লাগে সে প্রধান মন্ত্রীর পদে বসলেও অন্যদের কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু চাকুরি না পেলে নিজেকে যে ব্যর্থ মনে করে সে যদি বড় পদেও বসে তবু কিছু করতে পারবে না। কায়েমী স্বার্থই তাকে গ্রাস করবে, সে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না। যে সিপাহী নিজের কাজ নিজে হাতে ভাল ভাবে করতে না পারে সে কখনও সিপাহী হতে পারবে না। উঁচু পদে বসিয়ে দিলেও নয়। আজ শিক্ষার উপরকার যে ছাঁচ তা তো পুরানো কালেরই ছাঁচ। বেসিক

শিক্ষার মর্মকথা, বুনিয়াদই ভিন্ন ভাবে গড়তে হবে। তাই উপরের আস্তরও ঢেলে সাজতে হবে। বর্তমান বুনিয়াদী ট্রেনিং-পাওয়া শিক্ষক নিজেকে অসহায় মনে করেন। কিন্তু তাঁদের সাহস ও পৌরুষ থাকা চাই। আজ সর্বত্র যে কাঠামো বর্তমান তার মধ্যে দুই একজন ভাল লোক পেলেও সরকারের পরিকল্পিত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না। নির্বাচনের ভার তো ভোটদাতার হাতে, সরকারের হাতে নয়। শিক্ষকগণ যদি অধিসাধারণের মধ্যে গিয়ে সেলাধেলা করেন তবে তাঁরাই দেশের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করতে পারবেন। তবে সমগ্র ভোট তাঁদের আয়ত্ত হবে। ফলে শিক্ষকরাই দেশের শাসনভার নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাঁরা সরকারের কাজ করবেন না, kingmaker হয়ে সরকার গঠন করবেন। প্রাচীন কালে যেমন গুরু ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের শাসন নিয়ন্ত্রিত করতেন তেমনই এঁরা চাকুরি করবেন না, যারা চাকুরি করবে তাদের চালিত করবেন। নয়ী তালিমের শিক্ষকদের এই সমস্ত শক্তি থাকা চাই। ইহার জন্য চাই মূল্যের পরিবর্তন।

আমার এই ভ্রমণপথে আমি যেখানেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখি, একবার যাই ও শিক্ষকদের কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমার একটি প্রশ্ন, আপনার ছেলে কোন্ স্কুলে পড়ে? কেহ উত্তর দেন গয়ায়, কেহ বলেন পাটনায়। অর্থাৎ তাঁরা নিজের ছেলেকে কাছে রাখেন না; বুনিয়াদী শিক্ষা দেন না। যেখানে যারা আছেন, যেখানে শিক্ষক, পিতা আর উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি তিনটিই আছে সেখানে ছেলেকে নিজের কাছে রেখে শিক্ষা দেন না কেন? তবেই বলতে হয় এই শিক্ষাপদ্ধতিতে তাঁর আস্থা নেই। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে খাদি উৎপন্ন হয় কিন্তু ছেলেমেয়েদের পরনে খাদি দেখা যায় না। অর্থাৎ সেখানে যা উৎপন্ন হয় তা পরা যায় না। তবে তো এটা হোটেলের মত ব্যাপার, যেখানে লোকের ফরমায়েসী রান্না হয়।

আমি আরও দেখেছি ঐ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পত্নী অন্যত্র থাকেন। সহধর্মিণীকে কাছে রাখা শিক্ষকের আদ্য কর্তব্য। কিন্তু দেখা যায়, শিক্ষকের স্ত্রী ছেলেমেয়েসহ শহরে থাকেন। ছেলেমেয়ে মায়ের কাছে থাকে, বাবার কাছে নয়। মা ছেলেমেয়েকে আর যাই শিক্ষা দিন একথা নিশ্চয় বলেন, বাছা, তুমি যেন বাবার মত বেকুব হয়ো না।

আমি শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করি, বলুন এখানে শারীরিক শ্রমের কোন কাজ করা হয়; আপনি তিন ঘণ্টা মজুরি খাটবেন আর তিন ঘণ্টা পড়াবেন, এই তিন ঘণ্টার মজুরিতে আপনি যা পাবেন, তিন ঘণ্টা পড়াবার জন্যও আমি আপনাকে তাই দেব। কোন শিক্ষক যদি তিন ঘণ্টার মজুরিতে আট আনা পান, তিন ঘণ্টা পড়ানোর জন্যও আট আনা পাবেন। রাজী আছেন তো? তা কেউ হয় না, অর্থাৎ, ঐ শ্রমসাধ্য কাজের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। আমাদের সুতো কাটা, কাপড় বোনার মান উন্নত করতে হবে। সেজন্য আমাদের জীবনযাত্রার মান হয়তো নীচে নামতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমরা তার জন্য প্রস্তুত নই। তবে ছেলেদের কেন কাজ করতে বলি? আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, সরকার না হয় আপনাদের সমান বেতন দেয় না, কিন্তু আপনারা কেন সকলের বেতন সমান করে নেন না? শিক্ষকেরা সকলে মিলে যত বেতন পান তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে বেঁটে নেন না কেন? পরিবারের মধ্যে তো ঐ রকমই হয়। কিন্তু একথাও আপনারা মানবেন কি? নয়ী তালিমের একটি গুণও যদি বর্তমান বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠানগুলিতে না থাকে তবে এর পরিণাম কি? এখানে যে শিক্ষা যত হবে তারা কোথায় গিয়ে খাপ খাবে? আমি প্ল্যানিং কমিশনের

কাছে বলেছিলাম, আপনারা বাড়িকে যদি এতই ভাল মনে করেন তবে বাড়ির কাজে উৎসাহ দেন না কেন? আজকাল তো দেখি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোথাও খাদির চিহ্ন নাই, সব বিদেশী জিনিসে ভরা, গ্রামোদ্যোগের নামও করেন না এমন সব লোক বুনিয়াদী শিক্ষাসম্মেলনে এসে গলা পরামর্শ দেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কারও ওপর কটাক্ষ করছি না, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, আপনারা এটা মানেন কি না। বিদ্যালয়ে উৎপন্ন জিনিস যেমি দাম দিয়েও আপনাদের কেনা উচিত। তা, ছেলেমেয়েদের হাতে কাটা সুতোয় তৈরি গুঁতে কেনা যদি আপনারা পরেন না কেন? সাহা দেশের প্রকৃতির রূপ হলে তবে নয়ী তালিম সার্থক হবে। আজকের মত আধাআধি প্রয়োগে কোন দিনই এটি ফুল পাবে না। আমার আরেকটি প্রশ্ন, আপনারা যদি খাদি না পরেন, গাঁয়ের লোকদেরও খাদির কথা বুঝিয়ে না বলেন তবে ছেলেদের দিয়ে সুতো কাটান কেন? আমি হলে অন্য ভাবে কাজ করব। কোন গ্রামে গিয়ে এক ঘণ্টায় একটা স্কুল খুলব, ছেলেরা দায়ী দিন কোদাল কাজ করবে। এক ঘণ্টা স্কুল করবে। নয়ী তালিমের আসল কথাটি কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দান। তা, ছেলেরা বাপের সঙ্গে ক্ষেতের কাজ করবে, এক পয়সাও খরচ হবে না। গ্রামের লোকেদের আমি কিছু কার্পাস বুনতে উৎসাহিত করব। কার্পাস বোনা হলে পরে আমি তাদের বলবো, যাদের চরখা বানাও। সস্তায় চরখা তৈয়ারি হবে। চরখা কি করে তৈয়ারি হয়, সব ছেলেদের শেখাব। এই ভাবে গ্রামের লোকের তৈয়ারি চরখা তাদেরই ছেলেদের অল্প দিনা মূল্যেই পাওয়া যাবে। চরখার মারফৎ গ্রামের লোকের পরিবর্তন হবে এই আশা নিয়ে গ্রামউদ্যোগ হিসাবে কাজ সুরু করে তারপর স্কুলে সেটা প্রবর্তন করবো, তবেই খাদির কাজ সফল হবে, নতুবা খাদি ব্যর্থ হবে।

আমি আঠারো বার আপনাদের এই প্রদেশে সফর করছি, তাতেও যদি নয়ী তালিমের খাতির না বেড়ে থাকে তো আশ্চর্যের কথা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে আপনাদের আট হাজার বিদ্যার্থী আছে, তাদের নিয়ে আপনারা তো বিপ্লব সাধন করতে পারেন। আপনারা গ্রামে গ্রামে যাবেন, বিদ্যালয়ের জন্য সব গাঁয়েই জমি পাওয়া সম্ভব। তাই নিয়ে কুয়ানের কাজ সুরু করুন, আমি সম্প্রতি যে সম্পত্তিদান চালু করেছি তারও কাজ করা হবে। আমাদের একটি ভাই পঞ্চাশ টাকা বেতনে পড়ি, সে টাকায় আনা হিসাবে সম্পত্তি দান করেছে। আমি বললাম, এ বড় বেশি হয়ে পড়লো, আপনি টাকায় এক পয়সা হিসেবে দিন। টাকায় এক পয়সা দিলে বছরে দশ বারো টাকা হবে। তা আমি বললাম, আপনি গ্রামোদ্যোগের জিনিস কিনবেন, তাহলেই সম্পত্তি দান করা হবে। সম্পত্তি দানের কাজ স্কুলের ছেলেরাই গ্রামে গ্রামে বিস্তার করতে পারে। এই ভাবে গ্রামে গ্রামে কূপ খননের কাজ করান যায়। বর্তমানে বিহারের পঁচাত্তর হাজার গ্রামের কেবল পঁচিশ হাজারটিতে কূপ আছে। আর পঞ্চাশ হাজার গ্রামেও আমার কল্পনা অনুযায়ী কূপ যদি করা যায় তবে না আমার পরিকল্পনা সফল হবে।

আজ লোকের মনে আপনাদের বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধে কুল ধারণা জন্মেছে। লোকে ভাবে এখানে বুঝি লিখতে পড়তে শেখান হয় না। আমি তো আরম্ভেই ছেলেদের উপনিষদ থেকে শেখাব। সত্যম্ বদ, ধর্মং চর, এই সব শেখাব। এখন তো শুনি সংস্কৃতের পাঠ্য পুস্তকে কেবল ভোর আর বাজারের গল্প থাকে। এগুলি সম্পূর্ণ নিরর্থক। আমি প্রথম দিন থেকেই শিশুকে উপনিষদের কাহিনী শোনাব। ভাল ভাল শ্লোক মুখস্থ করাব। আজকাল কেহ কেহ মনে করেন যে মুখস্থ করাটা কুল, কিন্তু বাপকিনের পাঁচ বৎসর

যাতে সমস্ত বাইবেল মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আর তাইতেই তাঁর সমস্ত জীবন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন কাক আর পাখীর কাহিনী মুখস্থ করান হয়। ছেলে যদি আলসেমি করে তবে তার উৎসাহ হয় এমন শ্লোক শেখাও, তার পেলে শেখাও নির্ভীকতার শ্লোক। এই ভাবে প্রয়োজনবোধে শ্লোক মুখস্থ করান হবে। উদ্দেশ্যবিহীন যেমন সেখানে কাজ হয় না। নদী তীরিমের শিক্ষার্থী শতকরা তেত্রিশ নম্বরে পাশ করবে না, তাকে একশয় একশই পেতে হবে। তেত্রিশ পেয়ে যে পাশ করা তা তো শিক্ষার পরিহাস। যদি কোন রাঁধুনী এসে বলে একশ' খানা রুটির মধ্যে সে তেত্রিশ খানা রুটি ভাল করে করবে, তাহলে কি তাকে আপনি কাজ দেবেন? তবে শিক্ষার বেলায় এরকম কেন? তবে কি আপনার মতে এই শিক্ষা যাদে একটা ব্যাপার, এর তেত্রিশ ভাগ মনে রেখে বাকিটা ভুলে গেলেই ভাল? শিক্ষার ব্যাপারে কিন্তু শতকরা শতের নীচে নামতে আমি রাজী নই। নদী তীরিমের ছেলে একভাগও ভুলবে না, কারণ সে হাতে কলমে কাজ করতে করতে সব শিখেছে। মনে করুন, একটি ছেলে একটু ধীরে ধীরে সুতো কাটে, ওর গতি কম কিন্তু ওর সুতো বারবার ছেঁড়ে না, আর একজন খুব দ্রুত সুতো কাটে কিন্তু তার সুতো বারবার ছেঁড়ে, আমি তখন তাদের খবগোস আর কচ্ছপের গল্প শোনাব। তাদের অবগতির জন্য জানাবে। আমি বইয়ের বিরোধী নই। আমি বই উঠিয়ে দিতে চাই না তবে বইয়ের সঙ্গে আরও প্রকার রকম জিনিস জুড়ে দিতে চাই। লেখা পড়ার দরকার নেই এমন কথা আমি কখনও বলি না। আমি শিশুদের ভাল ভাল শ্লোক শেখাব আর সেই গুলি পড়তে লিখতে শেখাব। আর, এতে তারা খুবই তাড়াতাড়ি লিখতে পড়তে শিখবে। প্রথমে মুখস্থ করা, তারপর দেখা থেকে সেগুলি পড়া আর পরে তাই লেখা, এ ব্যবস্থা খুবই ভাল। আর এ পদ্ধতিতে আমাদের ছেলেরা বেশ ভাল হয়ে বেরোবে। জ্ঞান বইয়ে আছে, হাতিয়ারেও আছে, সব কিছুতেই আছে।

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন—নদী তীরিমের জন্য উত্তম শিক্ষক চাই, কিন্তু এখন তো দেখা যায় ঐরূপ শিক্ষক মেলা প্রায় অসম্ভব।

উত্তরে আমি বলি, একবার এক স্কুলে আমি একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের স্কুলে কি কি পড়ানো হয়। ছেলেটি উত্তর দিল, সংস্কৃত, গণিত, ইতিহাস ইত্যাদি। আমি তখন প্রশ্ন করেছিলাম এর মধ্যে কোন্ বিষয়টি তোমার ভাল লাগে? ছেলেটি বললো, সংস্কৃত সব চেয়ে কম ভাল লাগে। তার কারণ আমি বলেছিলাম, সংস্কৃতের মত বিষয়ের পড়ানোকে যিনি নীরস করে তুলতে পারেন তিনি তো খুব ওস্তাদ শিক্ষক। যাঁরা বইয়ের ভিতর দিয়ে পড়ানো সহজ মনে করেন তাঁরা ভুল করেন। মনে করুন, অঙ্ক শেখাতে হবে। দুয়ে তিনে মিলে পাঁচ হয় এ কথা বোঝান যাচ্ছে না। ছেলে বেশ হয় দুই দুই-ই থেকে যায়, আর তিন তিন-ই থাকছে, মিলছে কখন? কিন্তু যদি বলি দুটি আম আর তিনটি আম মিলে পাঁচটি আম হলো, তখন ছেলের মত সোজা বুঝে নেয়। আপনারা বলেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মারফৎ জ্ঞান দান করা বড় কঠিন কাজ, কিন্তু আপনারা জানেন না, এখন যে পদ্ধতি চলছে তা কত বেশি কঠিন। প্রকৃতি আর মানুষের মাঝে পর্দার আড়াল সৃষ্টি করে আপনারা শিক্ষা দিচ্ছেন—সে যে অত্যন্ত কঠিন কাজ। অশ্ব অর্থ horse বলা হয় কিন্তু ঘোড়া দেখান হয় না। আপনারা জিনিসটা বলেন না, কেবল তার প্রতিরূপ শব্দটি বলেন। অশ্ব অর্থ horse নয়, ঐ যে জীবটি আস্তাবলে বাঁধা রয়েছে, তাকে দেখিয়ে বোঝাতে হবে। পদার্থের মধ্যে আপনারা শুধু তার পদই দেখেন, অর্থটা ভুলে যান।

শুধু পদটি দেখলে ভুল ধারণা হবেই, কিনিষটি প্রত্যক্ষ দেখাতে হবে। কেউ যদি ইংরেজি শব্দের অর্থ শুধু অভিধান দেখেই জানতে চায় তবে তার ভুল হবে। তাই আপনাদের মনে রাখতে হবে বই পড়িয়ে দেখান সহজ কাজ নয়। কিন্তু আজ কাল তো তা-ই চলেছে, আর কেউ কেউ তাতেই সুপণ্ডিত হয়েছেন। আপনারা আঠারো বছর বিশ বছর ধরে ঐ বিদ্যাই শিখছেন। মামুলী কায়দায় শিখতে সাত আট দিন লাগে। ক্ষেতের বিদ্যা তিন চার দিনে দেখা যায় অথচ আপনারা তো আঠারো বৎসর ধরে লেখা পড়া শিখছেন, শিখে তাতে পণ্ডিত হয়েছেন আর এখন মনে হচ্ছে, প্রণালীটি ভারি সোজা। আসলে কিন্তু সোজা নয়। বইয়ের মূল্য আমি দিই। কথা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে। ছেলেদের শুদ্ধ উচ্চারণ দেখিয়ে দিতে হবে, তবে তারাও শুদ্ধ উচ্চারণ করবে। একদিন আমাদের সফর এসে থামলো পোইবা গাঁয়ে। গাঁয়ের নাম শুনে আমি ভাবতে লাগলাম, পোইবা কথাটার অর্থ কি? মনে হলো, কথাটা হয়তো ছিল পুণ্যবান, উচ্চারণ মাধ্যমে পুণ্যবা, পুণ্যমী পরে পুইবা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিনকার সভায় আমি এই ভিন্ন ধরা নামের কথা সবাইকে বললাম। শিক্ষার জন্য প্রথমে কাজ, তবে পেশা, শুনে উচ্চারণ করা, তারপরে লেখা এই নিয়মে হওয়া চাই। এ নিয়মে বইকে খতম করে না কিন্তু তার সমুচিত প্রয়োগের ফলে জ্ঞান পাকা হয় আর কারেও ছেলে পোক্ত হয়। সে জন্যই এই প্রণালীটি সহজ। এজন্য ট্রেনিং দরকার নেই এমন কথা আমি বলি না। আপনাদের নিয়মে তো বি. এ পাশ করলেই বি. টি পড়া দরকার। এই পদ্ধতিতেও ট্রেনিং দরকার তবে সে ট্রেনিং খেটিতেও হতে পারে। গান্ধীজি একবার বলেছিলেন, আমি এর জন্য ম্যাট্রিক ফেল ছেলে চাই। যে নিরাশ হয়েছে তাকে আশা দিতে হবে। গান্ধীজি তো এই রকম কত কথাই বলতেন। এই প্রথায় বেশি নয়, তবে সামান্য কিছু ট্রেনিং দরকার। শুনতে পাই, নয়ী তালিমে শিক্ষা কিছু হয় না। একটা কথা যখন রটে তখন তার কিছু ভিত্তি থাকেই। আর সত্যি তো আমাদের ছেলেরা শিক্ষায় কাঁচা। ওজরাটিতে একটা প্রবাদ আছে, সাধুর দুই নৌকায় পা। একজন লোক সংসার করার ঝকমারি থেকে সন্ন্যাসী হওয়া সহজ মনে করে সন্ন্যাস নিল। তার না হলো সন্ন্যাস না হলো সংসার। আমাদের স্কুলগুলিতে ঐ দশা, ছেলেরা না লেখাপড়ায় না কাজে পটু।

নয়ী তালিমের ট্রেনিং সেন্টারে যেখানে শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা নেই। কিন্তু গুরুপত্নী বিনে আশ্রম তো হতে পারে না, আশ্রমে গুরু আর গুরুপত্নী দুজনকেই চাই। উপনিষদের একটা গল্প আছে। উপকোশল নামে একটি ছেলে গুরুগৃহে ছিল। একদিন সে ভাত খেল না, খাওয়া ছেড়ে দিল। সে গুরুকে ভয় করতো, তাঁর কাছে গিয়ে কোন কথা বলার সাহস তার ছিল না। গুরুপত্নী ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি খাবার খাচ্ছ না কেন? ছেলেটি বললো, প্রত্যেক লোকের আলাদা রুচি ও বাসনা। সেই বাসনা পূর্ণ না হলে খাওয়াতেও রুচি থাকে না। গুরুপত্নী স্বামীকে গিয়ে বললেন, এই ছেলে বিশেষ কিছু জানতে চায়। ওকে সেই শিক্ষা দাও। এভাবে আমরা দেখি গুরুর কাছে পৌঁছবার সেতু গুরুপত্নী। তাই যদি শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর পত্নীও থাকবেন। আমি তো এও বলি, শিক্ষকপত্নীকেও বেতন দাও, তিনিও বাচ্চাদের পড়াবেন। মায়ের মধ্য দিয়েও শিক্ষা দেওয়া যায়। শিক্ষায় একটা সহজ উপায় মায়ের মধ্য দিয়ে হতে পারে।

আজকাল নয়ী তালিমের বিরোধিতা করা হয়। তার একটা কারণ বেশির ভাগ বুনিয়াদী বিদ্যালয় তো গ্রামেই খোলা হচ্ছে। আর, সব দেখে শুনে গাঁয়ের লোক ভাবে, এটা আমাদের উপর দয়া

দেখাতে সরকার করেছেন। মাদ্রাজে গে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ পদ্ধার বিরুদ্ধতা দেখা গেল, তারও ঐ কারণ, ঐ প্রয়োগ শুধু গাঁয়ের লোকের জন্য গাঁয়েই চালু করা হলো, সহরের জন্য নয়। ওখানে তো আবার ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণেতরদের মধ্যে ঝগড়া। ব্রাহ্মণরা বেশির ভাগ সহরে থাকেন আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তাই মাদ্রাজের ব্রাহ্মণেতর জাতিরা বলছে, ব্রাহ্মণদের জন্য তো বেশ ভাল সহরে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, আমাদের বেলায় শুধু এই নদী তালিম, যাতে লেখা পড়ার কথা নেই। আগে যেমন ব্রাহ্মণরা আর্যদের আক্রমণ করতো, এখন সে রকম ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে চলেছে।

আমি দুটি কথা বলতে চাই। এক কথা, নদী তালিমের শিক্ষা যারা পেয়েছে তারা চাকুরির অভিলাষী হবে না। দ্বিতীয় কথা, এঁদের জন্য চাকুরির দরজা কিন্তু খোলা থাকবে। এরা চাকুরি চাইলে যেন সরকার সুবিধা করে দেন। গৃহাশ্রমের সুবিধা আছে তবু ব্রহ্মচর্য নিল, তবে তো ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য, নতুবা ছেলের দশ কলেজীকেই তো ব্রহ্মচারী বলা যায়। সেই রকম, যে চাকুরি চায় তার জন্য চাকুরির দরজা খোলা থাকা চাই। অথচ চাকুরির অভিলাষ থাকবে না, এমন মনোভাব উৎপন্ন করতে হবে। দুটিই চাই, চাকুরির সুবিধাও চাই আবার চাকুরি-নিরপেক্ষ বৃত্তিও থাকা চাই।

বর্তমান সময়ে আমরা বুড়ো কাঠুরের সঙ্গে কথা বলতে হলে 'তুই' বলি অথচ ম্যাট্রিক পাশ ছোকরাকে 'আপনি' করে কথা বলি। নদী তালিমে এই ভেদ দূর করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর সুদামা দুজনে গুরুগৃহে একই কাঠ কাটার কাজ করতেন। এই হলো যুগিয়াধী শিক্ষা। ভবিষ্যতে সুদামা গৃহে ফিরে ভিখারী হলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাজা হলেন কিন্তু গুরু গৃহে দুজনে সমান শিক্ষা পেলেন আর একই কাজ করলেন। আজকাল বড় বড় লোকে ভগবান পড়লে ঝাড়ুদারের মত কাজই করেন, কিন্তু কার সাহস বলে, আমার বাড়ী এসে ঘর ঝাঁট দাও। আমাকে কেউ বলবে না বিনোবাজী, আমার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দাও কিন্তু দেখ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেমন মহৎ ও বিনম্র ছিলেন যাতে অর্জুন তাঁকে নিজের অশ্বটির পরিচর্যা করতে বলেন। তিনি এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন আর এমন সহজ ভাবে মিশতে পেরেছিলেন যে অর্জুন সহজ ভাবে ঐ কথা বলতে পারলেন। পরে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুন বলেছিলেন, তাঁর ভুল হয়েছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নি।

এখন তো দেখি একটা শত্রুপক্ষ-সমধর্মী-চক্র সৃষ্টি হয়েছে। আমি যদি যদি উপর থেকে সমুদয় অসাম্য দূর হলে তবে নদী তালিম কৃতকার্য হবে তবে তো নদী তালিমের গোড়াতেই ভুল হবে। আমি নদী তালিমে সব রকম বৈষম্যকে ছেঁটে ফেলতে বলি। মনুষ্যদেহে যদি এ বৈষম্য আসে তবে দেহের আধার থেকেই দেহকে কেটে ফেলবো। উপর থেকে বৈষম্য গেলেই বিপ্লব আনা সম্ভব হবে তাও ঠিক নয়। এর বিপরীত করতে হবে। এই বৈষম্য দূর করার কাজ সরকারের নয়। সমাজের দেহে যে বৈষম্য, সরকারের দেহে তারই প্রতিবিম্ব। তাই সমাজের যে দিন বদল হবে, সমাজে যেদিন সাম্য স্থাপিত হবে, সরকারকেও সেদিন সমাজের অনুসারে বদলাতেই হবে। আমি চাই যে আপনাদের শিক্ষাবিভাগের হাতেই এই বিপ্লবের কাণ্ডা থাকে। যে ঘরে বাস তাতেই আগুন লাগাতে হবে। শিক্ষকদের নিয়ে এমন এক সেনাদল গড়তে হবে যারা সেনানায়কের কথায় coup de etat বলদেই উঠবে, কিন্তু অহিংস ভাবে চলতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে সে শক্তি আছে। শিক্ষাবিভাগ এমন করুন যেন এরা বিপ্লব আনতে পারে। এ বিপ্লব আনতে পারলে যাদের মধ্যে আনবে তারাও খুসিই হবে, কারণ বৈষম্য দূর হোক এটা তারাও চায়, যদিও দূর করার শক্তি নিজেদের নেই।

গোড়ায় এক কাজ করা চাই—গুরুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও থাকবেন। আপনারা বলবেন, তা অসম্ভব মনে হয়। আমি বলি এ ছাড়া নয়ী তালিম চলবে না। আজ সমাজে একটা ধারা চলে আসছে, তার মাঝে থেকেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। একটা কাজ তো আমরা করতে পারি। যারা বেশি বেতন পায় তাদের কমিয়ে দেব আর যারা কম পায় তাদের বাড়িয়ে দেব। এমু কিছু তফাৎ থাকবেই, তবে কিছু কমবে। গুরুপত্নীকেও পৃথক বেতন দিতে হবে। আজ আপনারা হয় তো শিক্ষককে ১০০৲ টাকা দেন, তার জায়গায় তাঁকে ৮০৲ দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ৪০৲ দিন। গুরুপত্নী বয়স্কদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বিতরণ করবেন। রান্না কাজটি বুনিয়াদী শিক্ষার এমন এক উপাদান যাতে এক পয়সার খরচ নেই কিন্তু সকলেরই সময় প্রয়োজনে লাগে। সংসারে সবই জ্ঞানের উপকরণ, কেউ জন্মালো, কারও মৃত্যু হলো, কারও রোগ হলো, কেউ সেরে উঠলো;—সবেতেই আমাদের শিক্ষার বিষয় আছে। যার চারি দিকে জ্ঞানের আয়োজন সে কেন অজ্ঞান থাকবে? রান্না করা, কুটনো কোটা, জল তোলা সবের মধ্য দিয়েই কিছু দেখা যায়, শেখানো যায়। অথচ এক পয়সাও খরচ হয় না। কি করে উনুন তৈরি করলে কাঠ কম লাগে, ধোঁয়া হয় না, এ সবই শেখাবার জিনিস। কখন খাবে, কি খাবে, কি খেলে পুষ্টি হয় এ সব শিখতে হয়, আর খাওয়ার সময় গুরুপত্নী এই ট্রেনিং দেবেন। এ সব সহজ পথ কিন্তু আপনারা বন্ধ করছেন।

এখন খরচের কথা আসছে। স্কুলে যা কিছু উৎপন্ন হবে ওখানেই খেয়ে ফেলতে হবে। যে তরকারি, মাখন ইত্যাদি হবে, তার উৎপাদনের খরচটা হিসাব করে শুধু সেটুকু রাখতে হবে, বাকি সব ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। ঐ চাষে, যে খাদি ওখানে তৈরি হবে তা ওখানকার ছেলেরাই ব্যবহার করবে। আপনারা শুধু দেখবেন ঠিক ভাবে তৈরি হচ্ছে কি না। এতে প্রথমটায় খরচ একটু বেড়ে যাবে কিন্তু গোড়ায় তা যাক্‌, ক্ষতি কি? বাজে শিক্ষার জন্য মোটেই খরচ হবে না, এমন কোন কথা নেই। যাঁ, আমি মানি যে শিক্ষা স্বাবলম্বী হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু গোড়ায় কিছু খরচ হলেই এমন কোন ক্ষতি হবে না। আর আমি তো বিনে খরচায় এক ঘণ্টার স্কুলের কথাও আপনাদের কাছে বলেছি। খরচের প্রশ্নে আমি একটা কথা বলবো। শিক্ষক আর শিক্ষকপত্নীর বেতন বাড়িও না, তাদের বন স্কুলের উৎপন্ন আনাজপাতি তারা পাবে। আমি শুধু পরিবর্তনের রাস্তা বাৎলে দিচ্ছি। এর উপর অনেক কিছু ভাবতে পারা যাবে। তবে আসল কথা, শিক্ষক আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই থাকবেন। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাস করবেন। তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবেন।

শিক্ষক দেশকে গড়ে তোলার মালিক। উপর থেকে সমগ্র ঢাঁচ আমরা বদল করতে পারি না, নীচে থেকে করতে হবে। ভোটদাতারা আমাদের পক্ষে। আপনারা তো বর্তমান প্রথার বদল চান, আপনারা চান মুখ্যমন্ত্রীর আর শিক্ষকের বেতন সমান হক, তবে ভোটারদের সে কথা বলুন আর বুঝিয়ে দিন। নিজের ছেলেদের সে ভাবে শিক্ষা দিন। জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে এই পরিবর্তন আনতে হবে। আপনারা এমন ভাবে ছেলেদের গড়ে তুলুন যাতে তারা সরকারের মধ্যে পরিবর্তন আনবে। বাপের হাতে তো শুধু নিজের ছেলেটি, কিন্তু আপনাদের হাতে সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ। আপনারা যেমন চাইবেন দেশের তেমনই রূপ দিতে পারবেন।

নয়ী তালিমের শিক্ষক আর ছাত্র মিলে চায় আর বাট, মোট চৌষট্টি হাজার সেনা। আগামী ১৮ই বোধ হয় সর্বোদয় সম্মেলন হবে। এই আট দশ দিন আপনারা ওখানের কাজে লেগে যান, পরেও এই কাজে লেগে থাকুন তবে এর থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ টিকে যাবে আর তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার হবে। •

• সোমবাটি (গয়া) নয়ী তালিম শিক্ষক সম্মেলনে ১৯৪৮ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখে শিক্ষা বিভাগের জন্য কয়েক কর্মী ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিনোবাজীর কথোপকথন থেকে অনুবাদ করা হইল।

শিক্ষায় ব্যভিচার

(পৌষ ১৩৬২এর প্রবাসী হইতে সংক্ষেপিত পুনর্মুদ্রণ হইতে)

শ্রীজীবনময় রায়

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত দেশের সমস্ত পরিস্থিতি বদলাইয়া গিয়াছে অথচ সেই পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবার মত সজীব কল্পনাশক্তি আমাদের নাই বা তাহাকে আপন শক্তিতে চালাইবার মত সাহস আমরা সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। এমন অবস্থায় পুরাতন প্রকরণের ছেঁড়া প্যাণ্টুলেনের মধ্যে পা গলাইয়া, তাহাদেরই উচ্ছিষ্ট সেবন ও পরিবেষণ করিতে থাকিলে—এতাবৎকাল পর্যন্ত যে অধঃপাতের পথে চলিতেছিলাম সেই অধঃপাতেই যে গিয়া পৌঁছিতেছি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে পর্যন্ত আমরা প্রস্তুত নই। তাহার প্রত্যক্ষ কারণ, অর্ধোপবাসী দরিদ্র অসহায় জনসাধারণের অর্থে মোটা মোটা মাহিনা খাইয়া আমরা অলস ও বিলাসী-'কমলকুক' হইয়া পড়িয়াছি; এবং আমাদের এই অকর্মণ্যতার, এই অপদার্থতার এবং প্রতারণার জন্য জনগণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

আমাদের হৈন্য নাশ করিয়া স্বাধীনতা ও তাহা রক্ষা করিবার গৌরব ও যোগ্যতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বর্তমান অবস্থার উপযোগী করিয়া শিক্ষাপদ্ধতি প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে, দাসত্ব চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে মেকলে-প্রবর্তিত লণ্ডন-ইউনিভার্সিটির তথাকথিত ছাঁটা শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের এই ৯০% নিরক্ষর হঠাৎ-স্বাধীনতা পাওয়া বিমূঢ় গণতান্ত্রিক দেশে যে অচল তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

অতএব নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্কচিত্তে, 'সত্তা রক্ষার জন্য ধনতান্ত্রিক'-তে বিশ্বস্ত, অর্ধমৃত, ক্ষিপ্রোদ্যত মধ্য-(বিত্ত ?) সম্প্রদায়কে রক্ষা দিবার উপযোগী জনস্বার্থ ও পরাধীনতার বিরোধী শিক্ষাপদ্ধতি আমরা চুটাইয়া প্রয়োগ করিয়া লইতেছি। শিক্ষায় বিষয়াদি নির্বাচনে ও বিন্যাসে এবং পরীক্ষা গ্রহণে যাহা করিতেছি, তাহা দেখিয়া বাহিরের লোকে এ কথা না মনে করিয়া পারিবে না যে, আমরা কোনো প্রচ্ছন্ন মৎলব হাসিল করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক ব্যাপক জনশিক্ষার অগ্রগতিতে পূর্বের মতই বাধা দিতেছি। আমাদের এই প্রাগৈতিহাসিক দেশে জ্ঞানের দীপালি জ্বালাইতে হইলে শিক্ষাকে সহজ ও পরীক্ষাকে দুর্লভ করিয়া না-রাখিলেই জ্ঞানলাভে ও পরীক্ষা পাশে জনসাধারণের উৎসাহ উত্তরোত্তর বাড়িবে এবং জনশিক্ষা জনপ্রিয় হইয়া সহজেই বিস্তার লাভ করিবে। মহাত্মাজি আগেভাগে এ কথা আমাদের শিখাইয়াছেন। তাহাতে আর কিছু না হোক, অপরিমেয় অজ্ঞানতা দূর হইবে এবং গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। (অবশ্য উহাকেই বাধা দেওয়া যদি আমাদের শিক্ষাদীক্ষাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য না হয়।) তাহার পর 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনের' স্বাভাবিক নিয়মে অপদার্থ আপনি হটিয়া যাইবে। যাহার মধ্যে যতটুকু পদার্থ থাকিবে সে আবশ্যকের চাপে ততটুকু গড়িয়া উঠিবে এবং রাষ্ট্রের গঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায় হইবে। গণতন্ত্র চালাইবার সত্যকার ইচ্ছা থাকিলে আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ব্যাপক অজ্ঞানতা সম্ভাব্য

ক্রততম পন্থায় দুরীকরণের উপায় উদ্ভাবন করা; এবং তাহার পক্ষে একটি প্রশস্ততম উপায় হইল, নিম্নতম জনশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মধ্যে যে প্রবেশদ্বার তাহাকে প্রশস্ততর, সুখাধিগম্য, ও জ্ঞানদরিদ্র জনগণের পক্ষে নিরাতঙ্ক করা। তাহার জন্য চাই :—

১। নিম্নতম পাঠ্য বিষয়গুলিকে শিশুচিত্তের পক্ষে সুখাদ্য সহজ ভাষায় লেখা। (দুঃখের বিষয় এই যে, টেক্সট বুক কমিটি ইহার প্রতি অত্যন্ত অমনোযোগী। আরো লজ্জার কথা এই যে, পুস্তক নির্বাচন দেখিয়া লোকে, রাষ্ট্রের শিক্ষিততম সংস্থা সম্পর্কে, 'উৎকোচ গ্রহণের' অপবাদ দিবার অবসর পায়।)

২। পরীক্ষাকে দুর্লঙ্ঘ্য না করা।

৩। পরীক্ষা গ্রহণের অপেক্ষা শিক্ষাদানের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া। অর্থাৎ ক্লাসেই পাঠ্য বিষয়গুলিকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া তৈরী করিয়া ছাত্রকে বাড়ী পাঠাইতে হইবে, তা-বই, ছাত্রের প্রস্তুত করিবার ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত কি না, তাহার পরখ না লইয়া, এক গাদা টাস্ক সাবমিট করিবার ভার গৃহশিক্ষকের উপর চাপাইয়া দিয়া, পর দিন ক্লাসে দশটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই শিক্ষকের দায়িত্ব চুকাইবার ব্যবস্থা করা হইবে না; বিশেষতঃ গ্রামের স্কুলগুলিতে—যেখানে ঘরে পড়া বলিয়া দিবার কেহ থাকে না—শিক্ষকেরা যাহাতে নিয়মিত ও নির্ভুলভাবে ছাত্রদের সমস্ত পাঠ্য ক্লাসেই শিখাইয়া দেন, শিক্ষাবিভাগের সে দিকে কড়া নজর রাখিতে হইবে। বিবেকবিহীন পরিদর্শকদের দিয়া এ-কাজ চলিবে না। এই জন্য বহু গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা একেবারেই হয় না। এমন কি, বহু স্কুলে বহু শিক্ষক স্কুলেই আসেন না, এবং আসিয়াও পড়ান না। সরকারকে এজন্য অবহিত হইতে ও সাবধানতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি। নহিলে অচিরে বাংলা দেশ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া যাইবে। মনে রাখিতে হইবে যে বিবেকহীন শিক্ষক ও পরিদর্শক দেশকে সর্বনাশের পথে লইয়া চলিতেছে—তাহাদিগকে বর্জন করা দরকার।

দুই নম্বর প্রস্তাবটির উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন, 'তবে কি পরীক্ষার কোনো মান (standard) থাকিবে না?' হাঁ, অবশ্যই থাকিবে। তাহা হইবে, আমাদের জনসাধারণের পড়পড়তা শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতার মাপে। কিন্তু তাহার পূর্বে, শুধু মধ্যবিত্তের (অর্থাৎ তথাকথিত ভদ্রলোকের) নয় কিন্তু জনসাধারণের আয়ত্ত করিবার পড়পড়তা ক্ষমতার চেয়ে বেশী ও কঠিন পাঠ্যতালিকা দিয়া একঝাঁড়ি গিলাইবার চেষ্টা করিয়া, পরীক্ষায় তাহা ওগ্‌রাইতে দিয়া দায়িত্ব শেষ করিলে চিরদিন ঐ কাণ্ডই ঘটিতে থাকিবে—অর্থাৎ দেশের জ্ঞানলাভের পথ কণ্টকাকীর্ণ থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সেটি এই যে, সমাজের যে অংশ শিক্ষায়-দেড়শত বৎসর অগ্রসর হইয়াছে, এবং যাহাদের সন্তানগণ শিক্ষায় অগ্রসর সমাজের জ্ঞান ও ভাবার মধ্যে মানুষ হইতেছে তাহাদের ও গ্রামে প্রতিপালিত—দরিদ্র, অনগ্রসর, প্রায়জ্ঞানে মূর্খ সমাজ ও সংসারের মধ্যে থাকিয়া যে বালকবালিকারা মানুষ হইতেছে, তাহাদের পাঠ্য তালিকা এক হইতে পারে না। গ্রামীণ ছেলেমেয়ের পক্ষে তাহা অতিরিক্ত বিজাতীয় হইতেছে। তাহাদের পক্ষে সহজ ও পরিচিত বিষয়বস্তু দিয়া সরলতম ভাষায় পৃথক পুস্তকসকল রচনা করিয়া দিতে হইবে—এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

যাহা হউক, তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেদের কথাই ধরা যাক। শতকরা, অন্ততঃ ৭০ জন ছাত্রই তাহাদের পক্ষে পর্বতপ্রমাণ এবং দুষ্পাচ্য পাঠ্যের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতে পারে না। সুতরাং মাটো ছাত্রেরা হতাশ হইয়াই পড়াশুনা এক প্রকার পরিত্যাগ করে, এবং ফলে পথে ঘাটে রক-মজলিসে

তাহারা দেখা দেয় সামাজিক উপদ্রবরূপে। এই কথাটা পাঠ্যপরিমাণ ও বিষয় নির্বাচনকালে আমরা ভুলিয়া যাই যে, ছেলেদের মনে "ইহা সহজেই শিখিয়া ফেলিতে পারিব" এই উৎসাহপূর্ণ ধারণার পরিবর্তে যদি "ইহা পারিব না" এই হতাশার ভাব জন্মায় তবে স্বভাবতই পাঠে তাহাদের অরুচি জন্মিবে।

পণ্ডিত করিয়া দিবার অথবা উৎসাহে একগাড়ি করিয়া ছুপাচ্য বস্তু গিলাইবার চেষ্টায় শতকরা ৭০ জন ছেলের মনে ঐরূপ হতাশার ভাব আমরা জন্মাইয়া থাকি। প্রথমতঃ ভারসাম্যহীন, অসংগত ও বিচিত্র পাঠ্য নির্বাচন করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ সহজ সরল শিশুবোধগম্য নিরুত্তেজ ভাষায় আকর্ষণীয় করিয়া শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে জানি না বলিয়া। বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় শিশুকে যদি পদে পদে শক্ত কথার মানে মুখস্থ করিয়া, এবং জটিল দুরূহ পদের অর্থ বুঝাইয়া লইতে লইতে প্রাণান্ত হইতে হয় তবে বিষয়বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তাহার আপনি মুছিয়া যায়। সাহিত্য-পাঠে তাহাকে যতখুশী ভাষা শিখানো হউক, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে শিশুর পক্ষে সহজ ভাষায় বই না লিখিলে সে পুস্তক অবশ্যই ত্যাজ্য করা উচিত নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি শিশুপাঠ্য পুস্তক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমিটি ধৈর্যসহকারে বিচার যদি না করেন তবে সে কমিটির আবশ্যক কি?

একটু খাটিয়া, চেষ্টা করিয়া একটা নিয়ন্ত্রিত, নির্দিষ্ট মানে সীমাবদ্ধ (standardised) শব্দসম্পদ প্রস্তুত করিয়া দিলে এ সমস্যা সহজ হইয়া আসে। পৃথিবীর সর্বত্র ইহা আছে। যাহাদের সকলে আমরা শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করি তাহাদের ত আছেই। এইরূপ নিয়ন্ত্রিত সরল ভাষায় শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিলে শিখিতে পারিবার আনন্দেই তাহাদের পাঠে মন বসিবে; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে সংযত করিয়া রাখিতে না পারিয়া অভিভাবক, শিক্ষক ও রাষ্ট্রের যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার আশু সমাধান হইবে। আর একটা উপকার এই হইবে যে, দরিদ্র অভিভাবকগণ পরিধায়-পরিচ্ছদের মূখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া এবং ছেলের উপর অমনোযোগের ও নির্বুদ্ধিতার দোষ চাপাইয়া গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন না। পাঠ্য বুঝিতে পারিলে ছেলেরা জ্ঞানলাভের আনন্দেই পাঠ্যপুস্তকে মন দিবে।

এবার স্কুল ফাইন্যালের পাঠ্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। পাঠ্য নির্বাচনের ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে দেশের গ্রহণক্ষমতার হিসাব করিয়া পাঠ্যদান, পাঠ্য পরিমাণ ও আবশ্যক পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার নয়।

অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়ায় শিশু-শিক্ষার শুরু হইতেই একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া শিশুর মানসিক সংগঠন নিয়ন্ত্রিত করা হয়—উদ্দেশ্য এই যে, শিশু আপন পাঠোর সঙ্গে সঙ্গেই দেশের আদর্শ সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান হইতে শিখিবে। আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় না যে কতকগুলি বিষয় গিলাইয়া দেওয়া ভিন্ন আমাদের শিক্ষাদানের আর কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। শিশুকাল হইতে স্বদেশের চেতনায় ও দেশের প্রতি প্রীতিতে অনুপ্রাণিত করিয়া যে শিক্ষা, তাহাই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও নিরাপত্তার রক্ষক ও বাহক হয়। আমাদের শিক্ষার মধ্যে ত তাহার নাম-গন্ধও নাই। অত্যন্ত বিবেচনাপূর্বক অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে দেশ-সংগঠন ও দেশ-রক্ষার উপযোগী শিক্ষা সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে বিরাট একটা বিপ্লবের আতঙ্কে আতঙ্কিত হইয়াই যেন, যেমনটি চলিতেছিল নিঃশব্দে তাহাই চালাইয়া, ঘুমন্ত জাতিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার আদর্শ এবং শিক্ষণীয় এই হওয়া উচিত যে দেশের প্রতি তীব্র দেশাত্মবোধসম্পন্ন

এবং দেশের সংগঠন ও রক্ষার উপযুক্ত করিয়া প্রত্যেক নাগরিককে আমরা গড়িয়া তুলিব। চীন, রাশিয়া প্রভৃতি নবজাগ্রত দেশ সমূহে এই গুরুতর কার্য কি কি উপায়ে সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে এবং তাহার অন্ধ অনুকরণ করিতে চেষ্টা না করিয়া, আমাদের দেশের অবস্থা ও প্রতিভার অনুকূল করিয়া কি ভাবে তাহা প্রয়োগ করা যায় তাহা নির্ধারণ করিয়া সেইভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। নতুবা, একচক্ষু হরিণের মত অন্ধচক্ষুর দিক হইতেই প্রাণান্তকর পরাঘাত হইবে। দেশের শক্তিকে ঘনীভূত করিয়া দেশের ঐক্যবোধ ও স্বাধীনতা-রক্ষার পক্ষে এই শিক্ষা যে অপরিহার্য তাহা আমরা কার্যতঃ স্বীকার করি নাই। ফলে দেশের সমস্ত বিপদ-আপদ-অনাসৃষ্টি-অভাব-নৈতিকজ্ঞানশূন্য তাণ্ডবকে নির্বিচারে গভর্মেণ্ট-সৃষ্ট বলিয়া দোষারোপ করিয়া জনসাধারণ গভর্মেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বার্থান্বেষী দল সকল এই সুযোগকে সানন্দে আপনাদের কাজে লাগাইয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত ও দেশগঠনে বাধা উৎপন্ন করিবার সুযোগ পাইতেছে। দেশের প্রতি মমত্বশীল নাগরিক গড়িয়া তুলিতে পারিলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না।—এবং তাহার জন্য শিশুকাল হইতে শিক্ষা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং অগৌণে শিক্ষার স্তরে স্তরে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সর্বাগ্রে এই স্বদেশ-প্রাণতা ও স্বদেশ-রক্ষার শিক্ষা আমাদের অবশ্য বিষয়ীয়ের মধ্যে পরিবিষ্ট করিতে হইবে। শুধু দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতায় চিড়া ভিজিবেনা।

পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্য-পরিমাণ নির্ণয়ে আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে দেশের বয়স্কাগ্রহ ক্ষীণপ্রাণ বিদ্যার্জনশক্তি ও প্রবণতার উপর যেন অযথা চাপ না পড়ে।

যে বিদ্যা দেশের ৯৯% ছেলেমেয়েরা জীবন-সংগ্রামে, নিজের বা দেশের কাজে লাগাইতে পারিবে না, সে বিদ্যা গ্রহণ করিবার মত মস্তিষ্কের শক্তি তাহাদের উদ্বৃত্ত নাই। এ ধারণা শিক্ষা-বিভাগের কর্তাদের খুব স্পষ্ট করিয়া থাকা দরকার।

এইবার যাহা বলিতে যাইতেছি—এবং যাহা কর্তাদের কর্ণকুহরে আজ সাত বৎসর ধরিয়া অনুপ্রবেশ করিয়া আসিতেছি—তাহাতে দুর্ধর্ষ ইংরাজি ওয়ালাদের কোপে পড়িব, সন্দেহ নাই; তথাপি ইউনিভার্সিটি মহলে (ইংরাজিতে ফেলের কল্যাণে—ফেল-ছাত্রের শতকরা ৯০% ইংরাজিতে ফেল করিয়াছে) এবং অন্যত্রও অনুকূল আলোচনার আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়াই পুরাতন 'প্রবাসী' ও 'শিক্ষা' হইতে বর্তমান প্রবন্ধটি সারবদ্ধ-রূপে পুনর্মুদ্রিত করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

দেশের ১০ কোটি ছেলেমেয়ের মধ্যে নয় কোটি নিরেনব্বই লক্ষ ছেলেমেয়েই ভবিষ্যতে শ্রীমতী পণ্ডিত বা শ্রীযুত যেমন হইতে যাইবে না। প্রচুর পরিমাণে যাঁহারা ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন, ইংরাজির মরশুমের দিনেও, তাঁহাদের কয়জন, ইংরাজি সংবাদপত্র ও ইংরাজি নাটক নভেল পাঠ করা ব্যতীত উপরকালে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন? ইংরাজির অধ্যাপনা ও সরকারী কাজে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যাঁহারা আনাগোনা করেন তাঁহারাই মাত্র উচ্চতর ইংরাজি ভাষাশিক্ষা কতকটা কাজে লাগাইয়া থাকেন। কিন্তু ৩০ কোটির মধ্যে তাঁহারা কয়জন? ঐ সামান্য কয়জনের জন্য সমস্ত দেশের শিক্ষার অগ্রগতির স্রোত রুদ্ধ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? সুতরাং অল্প-পাঠ্যের মধ্যে সহজ ইংরাজি বুঝিতে এবং সামান্য-ভাবে চিঠি পত্র লিখিতে ও বলিতে পারিলেই এখনকার পরিস্থিতির পক্ষে যথেষ্ট দেখা হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে। যাহারা আরো বেশী ইংরাজি শিখিতে চায় তাহারা স্বেচ্ছা-নির্বাচিত হিসাবে

তাহা বড় ইস্কুল—যাহা কি? কিন্তু সকলের পক্ষে অতিরিক্ত ইংরাজি শেখার দুর্দান্ত চেষ্টাটুকু বাদ পড়িলেই এত শক্তি উদ্বৃত্ত থাকিবে যে অঙ্ক ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি আরো অনেক বেশী এবং ভাল করিয়া শিখিবে। নিতান্তই বর্ত্তমান পরিস্থিতির খাতিরে ইংরাজি তাহাকে শেখানো হোক; কিন্তু "ইয়াঙ্কিতে পণ্ডিত না হইলে আতিতে পণ্ডিত হইবে" এমনি একটা চিরাভ্যস্ত দাসমনোভাব আমাদিগকে অবশ্যই বর্জ্জন করিতে হইবে। স্কুলপাঠ্য ইংরাজির 'মান' আমাদের পূর্ব্বকালের New Royal Reader, No 5এর ইংরাজির 'মান' হইলেই যথেষ্ট হইবে এবং তাহারা বাংলায় লেখা ইংরাজি গ্রামার পড়িবে। Selection এর বদলা খিচুড়ী, নানা কালের style এর ইংরাজি পড়িয়া কেহ শুদ্ধ ইংরাজি বা কোনো ভাষাই শেখেনা। যে 'মানে'র ভাষা সে শিখিবে একটানা সেই মানের ভাষার সে আগাগোড়া ইংরাজি পড়িবে, যাহাতে সেই আদর্শ মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। তাহার কেহ পাকা না হইয়া গেলে তাহাকে বিভিন্ন আদর্শের ভাষা (বিশেষত বিদেশী ভাষা) পড়িতে দিলে তাহাকে বিভ্রান্ত করা হয়; কোন্ আদর্শটি সে নকল করিবে? দশ style এর মধ্যে ছট পাকাইয়া কোনোটিই মনে বসে না। যে ইংরাজি তাহার লেখা দরকার সেই আধুনিক ইংরাজি ভাষার একই আদর্শে সমস্ত পাঠ্য তাহাকে লিখিয়া দেওয়া হোক, যাহাতে সেই আদর্শ সে সহজে অনুকরণ করিতে পারে। আবৃত্তি করিবার জন্য কয়েকটি কবিতা দেওয়া যাইতে পারে মাত্র; যাহার বাংলা মানে মোটামুটি জানিলেই চলিবে। প্রেম পত্র সব বাংলায় হইবে এবং চিঠি পত্র লেখা ও সহজ রচনা ব্যতীত আর সবই সে বাংলায় উত্তর করিবে। সহজ এবং বর্ণনামূলক বিষয়ে নিবন্ধ ইংরাজিতে লিখিতে দেওয়াও চলে, চিন্তামূলক প্রবন্ধ নহে। ইহাতেই এখনকার গড়পড়তা ম্যাট্রিকপাশ ছাত্র অপেক্ষা বেশী ও নির্দ্দোষ ইংরাজি সে শিখিবে।

বিচিত্র ভাষার সংকলন যে ভাষা শিখিবার পক্ষে বাধাস্বরূপ, একটু চিন্তা ও পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝা কঠিন নয়। ভাষা শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে তখনি 'মান' ও বিচিত্র style ভাষাশিক্ষার্থীর বয়স্কদের পক্ষে উপযোগী। ভাষা যখন শেখা নাই তখন তাহার নিকট বিভিন্ন আদর্শের ভাষা আনিয়া দিলে কোনো আদর্শই তাহাকে আশ্রয় করে না—সুতরাং ভাষার অনুকরণীয় রূপটি খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে বেগ পাইতে হয়। ধরা যাক, একজন বিদেশী ইউরোপীয়কে আমরা মোটামুটি বাংলা লিখিতে পড়িতে শিখাইতে চাই। ক্রত বাংলায় পণ্ডিত করিয়া দিবার চেষ্টায়, 'চাণক্য' হইতে 'স্বাধীন মতের' কবিতা পর্য্যন্ত, একটা সংকলন তাহাকে পড়িতে দেওয়া গেল—যে ভাষা সে শিখিবে তাহার আদর্শ তাহাকে অবিমিশ্র ভাবে দেওয়া হইল না। তাহাতে কি তাহার বাংলা শেখা হইবে?

Royal Readerএর মত ক্রমোচ্চ 'মানে', একই আদর্শের (ছেলেদের জন্য) সহজ বিশুদ্ধ ইংরাজিতে পুস্তক রচনা করিয়া দিবার মত কৃতী লোকের ভারতবর্ষে অভাব নাই। বাইবেলের গল্প, শেকস্‌পিয়রের নাটক, কি অঙ্ক যাহা আবশ্যক বিদেশ তাঁহারা শিখাইতে চান তাহাই ঐরূপে ভাষার 'মানে'র সমতা রক্ষা করিয়া তাঁহারা সুন্দর করিয়া লিখিয়া দিতে পারেন। Selection, সংকলন বই হইতে দশ ইস্কুল পরীক্ষার্থিগণ পরিত্রাণ পায় ভাষা শিক্ষার পক্ষে তাহাই মঙ্গল।

মনের ভাব বিশেষে ব্যক্ত করিবার মত পুষ্ট বাংলা ভাষা হইয়াছে। যদি তাহা নাও হইত তাহা হইলেও নানা বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য

ইংরাজি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিতাম না। তাহার সব চেয়ে বড় কারণ এই যে চাহিয়া ভিন্ন কোনো জিনিস পড়িয়া ওঠে না। বাংলা ভাষায় শিক্ষা করিবার চাহিদা হইলেই বাংলা আবশ্যক মত দ্রুত পড়িয়া উঠিবে। তা-ছাড়া, ইংরাজি উঠিয়া থাকিলে বাংলা পড়িয়া তুলিবার তাগিদ কমিয়া যাইবে। এই সূত্রে আমার বিশেষ বলিবার কথা এই যে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলিকে প্রথমাবধিই যদি (সারা ভারতবর্ষময়) ইংরাজি রাখা যায় তবে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। 'উদযান' না শিখিয়া 'হাইড্রোজেন' শিখিলে তাহার আবশ্যক ক্ষতি হইবে না। অথচ ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে অন্যের সহিত যোগরক্ষার তাহাতে সুবিধা হইবে। ছোট কথা শুধু বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি বজায় রাখিয়া বাংলা বিষয়বস্তুকে বিবৃত করিলে উচ্চতম বৈজ্ঞানিক বিষয়ও ছাত্রদিগের নিকট অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয় এবং শীঘ্র আয়ত্ত করিয়া অধিক মনে রাখিতে পারে। বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার জটিলতম বিষয়গুলিকে-৯ম ও ১০ম বার্ষিক শ্রেণীতে বাংলায় পড়াইয়া থাকেন এবং তাঁহার মতে ফল তাহাতে ভাল হইয়াছে। বাংলায় (অবশ্য ইংরাজিতে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি রাখিয়া) বি. এস্ সি ও এম. এস সি পড়াইলে এবং বাংলায় প্রশ্ন ও উত্তর দিবার ব্যবস্থা করিলে ফল নিশ্চয়ই খারাপ হইবে না, বরং সেই ঝোঁকে বাংলা ভাষা দ্রুততর পুষ্টিলাভ করিবে এবং সাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যাও দ্রুততর ও ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করিবে। প্রচুরতম দেশবাসীকে স্বল্পতম কালের মধ্যে আবশ্যক শিক্ষাদান না করিতে পারিলে, অশিক্ষিত প্রভার গণতন্ত্র দেশকে হত্যাই করিবে। অতএব আপাতোচ্চ শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে সহজ মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করিতে পারিলে দেশ সেই সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবে।

শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রমের যেমন দেখিয়া লোকের মনে সহজেই সন্দেহ হইতে পারে যে শিক্ষাব্যাপারে নিরক্ষর, শিক্ষা-সম্পর্ক-হইতে চিরদিন-দূরে গ্রামাঞ্চলে নিবাসিত জন-সাধারণের কথা আমরা চিন্তাও করি না। ১৫০ বৎসর ইংরাজের উচ্ছিষ্টে কথঞ্চিৎ পুষ্ট ও অগ্রসর তথাকথিত ভদ্র-মধ্যবিত্তের সুবিধা অনুযায়ী পাঠ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিয়া থাকি। শিশুশিক্ষা হইতে শুরু করিয়া স্কুল কাইন্যাল পর্যন্ত ব্যবস্থা ও পাঠক্রম এমন করিতে হইবে যাহাতে আমাদের অগণিত নিরক্ষর জনসাধারণ শিক্ষার পথে অবাধে ও সানন্দে অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে। সুতরাং শিক্ষার প্রথম স্তরগুলিতে নিছক-বাংলা, এবং শিশুদিগের পক্ষে সহজবোধ্য বাংলায় (আমাদের নিম্নশ্রেণীর বইগুলিতে বিষয়ের পরিচ্ছন্নতার চেয়ে ভাষার পণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা অত্যন্ত অধিক) পাঠ্যপুস্তক রচিত ও নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক—আমাদের Text Book Committeeর তাহার দিকে কিছুমাত্র নজর আছে বলিয়া বোধ হয় না।

শিক্ষাদানকে আমরা সহরবাসী-ইংরাজিশিক্ষিত-মধ্যবিত্তের সাংসারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুখ সুবিধার দিক হইতে ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। সুতরাং সম্পূর্ণ মাতৃভাষার সর্বস্তরের শিক্ষা-পরিবেশন যে সর্বস্তরের প্রজাসাধারণকে দ্রুততর শিক্ষায় অগ্রসর করিয়া দিবে তাহা, ইংরাজিওয়ালা (die-hard) শিক্ষানায়কগণ ভাবিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহেন। পাঠ্য হিসাবে যথার চলতি ইংরাজি পাঠ্য থাকুক, যে ইংরাজিতে আরও পণ্ডিত হইতে চায় সে স্বেচ্ছা-নির্বাচিত বিষয়রূপে আরও পড়ুক, কিন্তু অতিরিক্ত ইংরাজি শিখিবার চাপ দিয়া দেশের সমগ্র শিক্ষাপ্রসারকে পঙ্গু করিতে দেওয়া চলিবে না। দেশের বর্তমান অজ্ঞানতা ও বিপজ্জনক নিরক্ষরতা দূর করিয়া দেশের প্রতি কর্তব্যজ্ঞানে ও সাধনে দ্রুত উপযুক্ত হইয়া উঠিবার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব গভর্মেণ্ট ও শিক্ষানায়কগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

সংবাদপত্র-পাঠকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে গভর্মেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা করিয়া, ছেলেদের উপযুক্ত ও প্রাদেশিক ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করিবেন। ঐ সংবাদপত্র, ছাত্রদের জানিবার উপযুক্ত বহু বিষয়ের সংবাদ বহন করিয়া সহজ ও সুবোধ্য করিয়া লেখা হইবে। তাহা সম্পূর্ণ সুরুচিপূর্ণ হইবে; সিনেমা (শিক্ষা বিষয় ছাড়া) থিয়েটারের কথা থাকিবে না। এই পত্র চারি পৃষ্ঠার অধিক ও দুই পয়সার বেশী দাম হইবে না। ১২ পৃষ্ঠা সুরুচি-পূর্ণ বিজ্ঞাপন থাকিলেই কাগজের খরচ উঠিয়া আসিবে। এই পত্রে (১) সাম্প্রদায়িকতা (২) অশ্লীল কিছু (৩) সিনেমা ঘটিত বা নটনটী সংবাদ (৪) যৌনব্যাপার ঘটিত সংবাদ (৫) উত্তেজিত করিয়া তুলিবার মত সংবাদ (৬) মিথ্যা সংবাদ প্রভৃতি থাকিবে না।

এই সংবাদপত্রে থাকিবে—(১) দেশ ও বিদেশের মোটা খবর, (২) দেশের রাষ্ট্র-চালনাঘটিত খবর, (৩) খেলাধূলা, (৪) বৈজ্ঞানিকী, (৫) জীবনী (মৃত ও জীবিত মহৎ ব্যক্তিদের পরিচয়), (৬) বিবিধ সাধারণ জ্ঞানের কথা।

পাণ্ডিত্য প্রকাশ বা জটিল না করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিলে বহু বিষয় মুখে মুখে নিতান্ত সাধারণ মানুষকেও শিখান যায়। এই উদ্দেশ্যে স্কুলে সংবাদপত্র পড়াইবার বিশেষ শিক্ষক নিযুক্ত থাকিবেন। ছেলেরা শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী রীতিমত অনুশীলনের জন্য খাতা করিয়া প্রতিদিন সংবাদপত্রের চুম্বক লিখিবে এবং বৎসরের শেষে, ও ইউনিভার্সিটিতে ঐ খাতা বিজ্ঞানের খাতার মত নিজের হাতের লেখার পেশ করিতে হইবে। তাহার জন্য ২০ নম্বর থাকিবে। শেষ দুই শ্রেণীতে এই সংবাদপত্র পাঠ্য হইবে। দুই বৎসর রীতিমত এই ভাবে সংবাদপত্র পাঠ করিলে শিক্ষার্থী বহু বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিবে ও মানুষ হইবে।

এখনকার গ্রাজুয়েটের মত কেশবচন্দ্র সেন একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন বা U. N. E. S. C. O. কে United Nation Electric Supply Company বলিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবে না। এইরূপে সংবাদপত্র পড়াইলে ছেলে পাশই হউক, বা ফেলই হউক, ছেলে সাধারণ-জ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া বাহির হইবে—পাশ করা মূর্খ হইবে না। বর্তমান সংবাদপত্রগুলির মধ্যে যে সকল সিনেমা-ঘটিত ও কুরুচিপূর্ণ, কেলাইয়ার মত মিথ্যার ভরা, প্রণ্যাগাণ্ডার বিভ্রান্তিকর সংবাদের আকর্ষণে শিক্ষার্থীদলের অধিক ঘটিতেছে এই পত্র তাহাদিগকে শুধু রুখাই করিবে না পরন্তু গভর্মেণ্ট ও শিক্ষাবিভাগ এই দিকে আন্তরিকতাপূর্ণ নিরলস চেষ্টা করিলে ভবিষ্যৎ যুগকে ইহার সাহায্যে সুরুচিরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ছাত্রকে, ১২ বৎসর হইতে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সামরিক ভাবে নিয়ন্ত্রাধীন থাকিতে হইবে। ইহা দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা বিশদ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। সপ্তাহে দুই দিন বৈকালে তাহারা রীতিমত ফুচ্‌কাওয়াজ শিক্ষা করিবে। ভলান্টিয়ার-রূপে আবশ্যক মত ইহাদের দিয়া দেশের বহুবিধ সামাজিক কার্যে সাহায্য হইবে—দেশ ও সমাজের মঙ্গল সম্বন্ধে এখনকার মত নিষ্ক্রিয় থাকিয়া মানুষ হইবে না।

সংক্ষেপে যে সকল ইঙ্গিত করিলাম, দেশের চিন্তা-নায়ক ও শিক্ষাবিদ্‌গণ তাহা আমার অপেক্ষা অনেক অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝিবেন ও তাহা কার্যে পরিণত করিবার সদুপায় স্থির করিতে পারিবেন এবং যত শীঘ্র পারেন করিবেন, নহিলে, আমাদের ছাত্র বংশধরগণ আমাদের উপর আর বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না এবং তাহারা আমাদের সহিত স্বাভাবিক স্নেহ ও শ্রদ্ধাসম্পর্কের বাহিরে গিয়া পড়িবে। অতএব, সাবধান।

কৃষ্ণনাথ কলেজের শতবার্ষিকী

বহরমপুর

শ্রীআদিনাথ সেন

আমি যে উৎসাহ লইয়া এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহা পূর্বস্মৃতির আলোচনায় অনেকটা মরিয়া গিয়াছিল, কারণ পুরাতন বন্ধুবর্গের অনেকেই এখন জীবিত নাই। বৃদ্ধ বয়সের এই এক অভিশাপ মন খারাপ করিয়া দেয়। আরও নিরুৎসাহের কারণ এই যে, এমন অনেক কথা লিখিতে হইতেছে যাহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত, সুতরাং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমার নিজের বিষয়ে কথা। সেইজন্য প্রথম হইতেই লজ্জিত হইতেছি।

বহু খ্যাতনামা লোক ছাত্র বা শিক্ষকরূপে এই কলেজের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ বিষয়ে অনুশীলন অধ্যাপক হইলেও, হুইলার সাহেবের আমলেই বহরমপুর শিক্ষাকেন্দ্র বাধা তুলিয়া উঠে। মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী এ বিষয়ে মুক্তহস্তে নানা বিষয়ে সাহায্য করেন। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে, হুইলার সাহেবের, খ্যাতনামা পামলিডাল সাহেবের সঙ্গে তুলনা করা হইত, অথচ ইহার শিক্ষকতা ব্যতিরেকেও খেলার মাঠে, খেলোয়াড় হিসাবে ও অন্যান্য দিকে প্রতিভা ছিল। আর এই খেলা সম্পর্কেই লেখক তাঁহার এবং মহারাজা মনীন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং ইহার স্মরণে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই দিকটার আলোচনা শতবার্ষিকী স্মারক উৎসবে অতি সামান্য হইয়াছে।

১৯০৬ সন হইতে প্রায় প্রতিবৎসরই বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সহিত ঢাকা কলেজের ফুটবল ও হকি খেলায়, হয় ঢাকায় না হয় বহরমপুরে, প্রতিযোগিতা হইত। ঐ কালে হকি ও ফুটবল খেলিতে আমি দুই বার ঢাকা কলেজ টীম লইয়া বহরমপুর আসিয়াছিলাম। আমাদের দলের কাপ্তান রায়, বাদু রায়, প্রফুল্ল ব্যানার্জী, উপেন ঘোষ, সতীশ মজুমদার, বুলু চাটার্জী ইত্যাদি খেলায় ও ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কাপ্তান কলিকাতা মোহনবাগান ক্লাবের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়, পরে পুলিস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। বাদু ইহার অগ্রজ, ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। উভয়েই এখন কলিকাতায়। প্রফুল্ল ব্যানার্জী জি, এল্, আর আফিসে উচ্চ কাজ করিতেন, এখন কোথায় জানি না। উপেন ঘোষ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। সতীশ মজুমদার হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। বুলু চাটার্জী ব্যাঙ্কার। ইহারা কলিকাতায়। বহরমপুর কলেজে হুইলার সাহেব, জোসেফ, চিন্থ, যতীন মিত্র, সুধাংশু দাসগুপ্ত, বৈদ্যনাথ, রমা ইত্যাদি তখন অথবা পরে খেলায় সুনাম অর্জন করিয়াছেন। জোসেফ বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন; চিন্থ গেয়ুস্ মাষ্টার। রমা পরে কলিকাতায় এরিয়ান্স ক্লাবে নাম করিয়াছিলেন। সুধাংশু ওয়াকে পাঁচু, বিভূতি, নেতন দাদা এবং যতীশ—ইহাদের বন্ধুত্ব ভগবানের দান হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছি।

আমাদের খেলার দলের একবার মহারাজা মনীন্দ্রের অতিথিশালায় এবং অন্যবার হরিহরবাবুর বৈঠকখানায় থাকিবার বন্দোবস্ত ছিল। ভূরি-ভোজনের প্রচুর আয়োজন থাকিত। শেষোক্ত স্থানে থাকাকালে মধ্যে মধ্যে বৈকুণ্ঠ সেনের ও রামপ্রসাদ

সেনের বাড়ীতে ও অন্যত্র খাওয়ার নিমন্ত্রণ হইত। মহারাজা সর্বদাই নিজে আসিয়া খোঁজ খবর নিতেন এবং এইভাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মিলন হইবে এইরূপ বলিতেন।

এই উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের প্যালেস্ এবং নদীর ওপারে বরাহনগর রাণী ভবানীর গৃহ, সিরাজের কবর ইত্যাদি দেখিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলাম। আমাদের সেক্রেটারী প্রফুল্ল সেন রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাণী ভবানীর বাড়ীতে একখানা পুরাতন তক্তোপোষ দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। কাপেটের বস্তুকে সেবকালে যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। পথে কাঠগোলায় জগৎশেঠের, দেবি সিংহের, নন্দকুমার ইত্যাদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পূর্ব বাসগৃহসমূহ দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল।

আমাদের আড্ডায় প্রায়ই গানের আসর বসিত। আমাদের চাকাই গান ছিল—

আহা যে রসিক নাগর তুমি বড় লটুপটুয়া;
দিলে থাক কদম গাছে, রাত্রে আস কার কাইট্টা।

পাঁচ ছয় বৎসর পরে কলেজে শিক্ষকতার কালে যাত্রার ছেলেদের মুখে ঐ গান শুনিতাম।

হইলার সাহেব অতিশয় ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন এবং আমাদের খেলায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে দুই চারি বৎসরের মধ্যেই অবিনাশ সেন, যোগেন্দ্র বাগ (পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসার) সুধীর রায় (সি আর দাসের জামাতা) ইত্যাদিকে কলেজে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করেন। দুঃখের বিষয় এক অবিনাশ বাবু ভিন্ন আর কেহই বাঁচিয়া নাই। আমিও ১৯১২ সনে, ষোল বৎসর খেলার ঘোরেই, মোহিনী বাবুর স্নেহাকে পদার্থ বিজ্ঞানের সিনিয়র অধ্যাপক নিযুক্ত হই এবং ১৯১৭ সন পর্যন্ত পাঁচ বৎসর ঐ কাজ করি। ঐসময়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্পেক্টার ডাঃ পি, কে, রায় এবং কমার ডাব্ ডাব্ সুরেন কলেজ দেখিতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে আমার কাজের সুখ্যাতি পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

হইলার সাহেবের সঙ্গে আমি অনেকবার শিকারে গিয়াছি এবং অনেক ছুটির দিন এইভাবে আমোদে কাটিয়া গিয়াছে। ইহা তাঁহার সর্বতোমুখী কার্যকলাপের একটি দিক। তাঁহার স্মরণশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল। একবার আমাদের বাড়াইমত ইংরাজী পুস্তকের নির্দিষ্ট অংশ, একবার পড়িয়াই তাহার পুনরাবৃত্তি করিলেন, শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। হইলার সাহেব পূর্ববঙ্গের অনেক বিপ্লবী ছাত্রকে আশ্রয় দিয়া পুলিশের নির্যাতন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন কম খরচে উচ্চশিক্ষার জন্য তথাকথিত বহু ছাত্র রংপুরে পড়িতে আসিত। অত্যধিক খাটুনির জন্য হইলার সাহেব অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে নিয়া আমি কার্সিয়াং পৌঁছাইয়া আসি। কিন্তু আমার কাজের কিছুদিন পরেই তিনি পরলোকে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ তাঁহার প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচনের জন্য স্যার আশুতোষ আসিয়াছিলেন। বোতাম টিপিতেই পর্দা সরিয়া যাইবে, এরূপ ব্যবস্থা, পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে আমিই করিয়াছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল যে বোতাম টিপিলেও পর্দা সরিতে চাহে না। তৎক্ষণাৎ দুইটি ছাত্রকে পর্দার পেছনে দাঁড় করাইয়া, ঘড়ি সংযোগে বোতাম টিপিবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরাইবার বন্দোবস্ত করা গেল। কেহই টের পাইল না।

মহারাজা মনীন্দ্র ও তাঁর আশুতোষ কি রকম অমায়িক ও নিরহংকার ছিলেন তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন আমার দরিদ্রের কুটীরে আমার স্ত্রীর রান্না পরমান্ন খাইয়া এবং পরিতোষ প্রকাশ করিয়া। আমরা কি আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না।

এই সময় কতগুলি মূল্যবান অপ্রাপ্তি

ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিয়া ব্যবসায় করিবার বন্দোবস্ত করেন।

মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে আমরা বহু যাত্রী স্পেশাল ট্রেনে কলিকাতায় যাই। বেলঘরী ফর্মাল ছাপার খাত-নির্ঘণ্ট এখনও আমার নিকট আছে। প্রত্যেকের এক একটি আস্ত ইলিশ মাছ, এই ২০৯ জনার নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বর্তমানে এখানে মেয়েদের কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের সময় পর্দার বিষম প্রচলন ছিল। আমার স্ত্রীকে রাজবাড়ীর সঙ্গীতাচার্য খ্যাতনামা রাধিকা গোঁসাই গান শিখাইতেন। আমি বিলাত ফেরত, আমার স্ত্রীর পিতা, পিতৃব্যেরা তিন ভাইই ব্যারিষ্টার—পাটনার বিখ্যাত উকিল গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র। আমরা জানালা খুলিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চলিলে নানা প্রকার মন্তব্য পরোক্ষে কানে আসিত।

আমি কলেজের বন্ধের সময় এখানে ওখানে (যেমন দালসোনা, ভাগলপুর) বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিতাম। কর্তৃপক্ষ ইহা বিশেষ পছন্দ করিতেন না। প্রায় তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেদিন লাইট হর্সে ট্রেনিং উপলক্ষে কলিকাতায় আসি। ট্রেনিংএর পর তিন বৎসর কোথাও যাইতে পারিব না, এই সর্ত চাওয়াতে, চাকুরি নাই। পরবর্তী কালে কার্যোপলক্ষে বহরমপুর গেলে, কলেজের নানাবিধ উন্নতি দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আমার সময়ে মহারাজার দানে ফুল পদার্থবিজ্ঞানের প্র্যাক্‌টিক্যাল কাজের জন্য প্রকাণ্ড ঘর নির্মিত হয়। আলো সম্পর্কীয় কাজ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল পরীক্ষণের যন্ত্রাদি এই ঘরেই স্থাপিত হয়।

বহরমপুর গোরাবাজারে তখন ভয়ানক মর্পভয় ছিল। কিন্তু ওঝাও সহজে পাওয়া যাইত। এক রবিবার আমাদের বাড়ীতে উঠান পরিষ্কার করিবার সময়ে, দুপুরে জানালা দিয়া বাহিরে একটি সাপের খোলস দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ ওঝা ডাকিয়া পাঠাই। সে আসিলে তাহার ফরমাইস মত সরিষার তেল, তিল, কড়ি ইত্যাদি জিনিস আনান গেল। কিছুকাল মন্ত্র পড়িয়া, পাকের ঘরে সাপ আছে ঠিক করিল। এই পর্যন্ত আমাদের বিশেষ বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু মেঝে খুঁড়িয়া একটি সুরঙ্গ বাহির হওয়াতে আমাদের বিশ্বাস সুরু হইল। ক্রমে সেই সুরঙ্গ ধরিয়া মেঝে খুঁড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না বলিয়া, গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিল। আমরা ঘরের চতুর্দিকে কার্বলিক এসিড ছড়াইয়া কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন সকালে পুনরায় গর্ত খুঁড়িয়া, অল্পকাল মধ্যেই একটি চার পাঁচ হাত লম্বা কোবরা সাপ মাঝামাঝি ধরিয়া গর্ত হইতে টানিয়া বাহির করিল। উহার ফণা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া গেলাম। পরে পাকা বাসাড়ায় আনিয়া, উহার মুখ ধরিয়া বিষ বাহির করিল বলিয়া বুঝাইল। কিছুক্ষণ খেলাইয়া সাপ এবং ১০৲ বকশীস নিয়া গেল। প্রাণের দায়ে উহা অধিক মনে হয় নাই।

আর একবার বড় চোরের উপদ্রব হয়। বহু দিনের বন্ধু, জলের কলের (পরে কলিকাতা টালা পাম্পের) সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, সুশীল ঘোষ আমার বাড়িতে ছিলেন। দুইজনে হকি ষ্টিক লইয়া বারান্দার ক্যাম্পখাটে শুইলাম। ভোরে উঠিয়া দেখি, সদর দরজার কাছে ঘরের জিনিষ পত্র ছড়ান, অথচ কিছুই চুরি যায় নাই। সেই অবধি সুশীল বলিত যে তাহাকে জব্দ করিবার জন্য আমি উহা ফন্দি করিয়াছিলাম। আমি বলিতাম, বন্ধুর কাজই সে করিয়াছিল, কিন্তু দামলাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বহরমপুরের আর একটি লোকের সঙ্গে সংসর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে আড়বেলের বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ নাগের পুত্র

৺হরিচরণ নাগ ঢাকা সার্ভে স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হইয়া যান। এই স্কুল আমার পিতা ৺দীননাথ সেনের স্থাপিত ঢাকা নর্মাল স্কুলের পরিণতি এবং ইহার পরিণতি ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও বর্তমান কলেজ। ৺হরিচরণ নাগ মহাশয়ের পুত্র নিত্যচরণ নাগ আমাদের নেতনদাদা। তাঁহার নাম বহরমপুরে, তাঁহার বহুবিধ সদ্‌গুণের জন্য এখনও সুপরিচিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কো-অপারেটিভ্‌ সোসাইটি তাঁহাদের বৃহৎ বাড়ীতে এখনও বর্তমান। তাঁহার মাসতুতো ভাই যামিনী মিত্র, কো-অপারেটিভ্‌ রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ইনি ঐ কাজে হাত দেন। ৺হরিচরণ নাগ মহাশয় ঢাকায় প্রথমে আমার পিতা ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়া উঠেন এবং আমিও কৃষ্ণনাথ কলেজে বার্ষিকালে নেতনদাদার বাড়ীতে বহুদিন ছিলাম। সুতরাং বহরমপুরের হরিচরণ নাগের পরিবারের সঙ্গে ঢাকার আমাদের পরিবারের তিন চার পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও স্বায়ত্তশাসন

শ্রীকণা সেনগুপ্ত

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার প্রয়োজন সম্বন্ধে সকলেরই এক মত শোনা যায়। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার নিতান্তই প্রয়োজন, শৃঙ্খলা না থাকলে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব। তা ছাড়া আজ যারা শিক্ষার্থী কাল তারাই হবে দেশের কর্ণধার সুতরাং শিক্ষার্থীরূপে শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণালাভ না করলে ভবিষ্যত জীবনে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষাতে তারা কিভাবে সাহায্য করবে, কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করে তোলা একান্তই প্রয়োজন এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় শৃঙ্খলার রূপ নিয়ে। এক সময়ে শৃঙ্খলা বলতে বোঝাত প্রাণহীন, শান্তি। শিক্ষকের ভয়ে শিক্ষার্থীর দল নিশ্চল মিতবৎ হয়ে বেঞ্চীর তথা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধান করত। শিক্ষকও ঐ মত পোষণ করতেন যে spare the rod and spoil the child অর্থাৎ বেতকে বাঁচিয়ে চললে শিশু ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। সুতরাং বেতের দ্বারাই শৃঙ্খলা রক্ষা করা হত এবং বেতের ভয়ে শিক্ষার্থীর দল প্রাণহীন শান্তি রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করত। একে বলা চলে Negative discipline অর্থাৎ দমনমূলক শৃঙ্খলা। প্রাচীনপন্থীদের এই মতকে আজও বহু শিক্ষাব্রতী শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রে মেনে চলেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু দমনমূলক শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে শৃঙ্খলার প্রকৃত রূপের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় হতে পারে না। শিক্ষকের ভয়ে চুপ করে থাকা আর ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য বুঝে অন্যায়কে পরিহার করে তাদের অনুসরণ আপনা থেকেই করতে শেখার মধ্যে দ্বিতীয় পন্থাটিই জীবনে কার্যকরী একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। এজন্য ফ্রোবেল, পেষ্টালজি, মন্টেসরী প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা শিক্ষকের ভয়ে ভীত হয়ে থাকবার চাইতে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী। মন্টেসরী পদ্ধতিতে শৃঙ্খলার গোড়ার কথাই হল Freedom first, Freedom second, Freedom last. আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীপ্রমুখ মনীষিবৃন্দ একই মত পোষণ করতেন যে স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী স্বার অন্তরকে চিনতে শিখবে, শৃঙ্খলাকে মানতে শিখবে। এখানে মনে রাখতে

হবে যে স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক কথা নয়। স্বাধীনতা দেওয়া মানে শিশুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে তাকে অসামাজিক করে গড়ে তোলা নয়—সেটি উচ্ছৃঙ্খলতাতেই নামান্তর। আবার শৃঙ্খলা রক্ষা মানে শিক্ষকের ভয়ে চুপ করে জড় হয়ে বসে থাকাও নয়। যে যত চুপ করে জড় হয়ে বসে থাকবে সে তত শৃঙ্খলা মেনে চলছে এ ধারণাও ততখানি ভুল আবার স্বাধীনতার নামে অসামাজিকতায় প্রশ্রয় দিতে হবে এ ধারণাও ততখানি ভুল। স্বাধীনতা মানে শিক্ষকের খেয়াল অবাধে চরিতার্থ করা নয়।

বিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে দায়িত্ব যেমনভাবে শিশুদের ওপর ছেড়ে দিতে পারলে শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ করার ভেতর দিয়ে শৃঙ্খলার প্রকৃতরূপের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতে পারে। প্রাচীনপন্থীরা হয়তো বলবেন যে তবে শিক্ষকের প্রয়োজন কি, আর শিশুদের বিচার বুদ্ধি কি এতই পাকা যে তারা নিজেরাই দায়িত্ব বহন করতে পারবে। এর উত্তর হল শিশুদের বিচার বুদ্ধি পাকা নয় বলেই তাদের ভুলপথে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। সে ক্ষেত্রেই শিক্ষকের প্রয়োজন শিশুকে পথ প্রদর্শন করা।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আজ একথা বলতে পারি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে শিক্ষার্থী নিতান্তই কচি শিশু সেখানেও স্বায়ত্ত শাসন প্রচলনের দ্বারা স্বাধীনতা উপভোগের ব্যবস্থা করে দিলে বিদ্যালয়সংক্রান্ত নানা বিষয়ে শিশুরা যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে এবং শৃঙ্খলার প্রকৃতরূপের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। কারণ সেক্ষেত্রে শিশু শৃঙ্খলার সঙ্গে, দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করে, শিক্ষকরূপ শাসনের ভয়ে নয়—নিজেদের প্রেরণায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি স্বায়ত্তশাসন প্রচলনের ফলে সুফল দেখা যায় তাহলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে শিক্ষার্থী বেশী বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বলে আশা করা যায় সেখানে স্বায়ত্তশাসন সুফলপ্রসূ হবে এতে সন্দেহ কি?

স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন বিদ্যালয়ে অনেকভাবেই করতে পারা যায়। সাধারণত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কি ধরণের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়ে থাকে সে বিষয়ে এখানে কিছুটা ধারণা দিতে চেষ্টা করব।

নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিচালনার অনেক অংশ শিশুদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে যে সমস্ত কাজের ব্যবস্থা থাকে তার পরিচালনার দায়িত্ব শিশুদের ওপর অনেকটাই অর্পণ করা হয়, যেমন গ্রন্থাগার পরিচালনা, বিদ্যালয়ে নানারকম উৎসব পরিচালনা, বিদ্যালয়ের চারিদিকের পরিচ্ছন্নতা বিধানের ব্যবস্থা করা, টিফিনের ব্যবস্থা থাকলে টিফিন পরিবেশনের ভার, বিদ্যালয়ে অতিথি অভ্যাগতকে অভ্যর্থনার ভার ইত্যাদি শিশুদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এমন কি অপরাধী শিশুর বিচারের ভারও সময় সময় শিশুদের ওপর অর্পণ করা হয়। বলা বাহুল্য নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করতে যত অভ্যস্ত হয় অপরাধের সংখ্যাও তত কমতে থাকে। পালাক্রমে সকল শিশুকেই দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। দায়িত্ব পনেরো দিনের জন্য অথবা অবস্থাবিশেষে এক মাসের জন্যও দেওয়া যেতে পারে। এক পক্ষকাল বা একমাস কাল কার ওপর কোন কাজের দায়িত্ব থাকবে এটি সাধারণ সভাতে শিশুরা নিজেরাই নির্বাচন করে ঠিক করে থাকে। এ ভাবে প্রতি-মাসে বা প্রতি পক্ষে বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এর জন্য শিশু পরিচালকদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয় যেমন নায়ক, নেতা মন্ত্রী ইত্যাদি। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকে যেমন উৎসবমন্ত্রী, অভিথিমন্ত্রী, গ্রন্থাগার মন্ত্রী, সাফাই মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী ইত্যাদি। নাম থেকেই নিশ্চয়ই ধারণা

করা যাচ্ছে মন্ত্রীদের কার কি কাজ। প্রধানমন্ত্রীর কাজ হল প্রত্যেক বিভাগের কাজ ঠিক মত হচ্ছে কি না তার তত্ত্বাবধান করা। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে শিশুদের মানসিক গুণের যথেষ্ট বিকাশ দেখা যায়। তারা ক্রমশ কর্মনিষ্ঠ, কর্মদক্ষ ও সময়নিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের ভেতর পরিচালন ক্ষমতা বেড়ে যায়; দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, সুরুচি বোধ আয়ত্ত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তির বিকাশ সাধন হয়। আত্মবিশ্বাসে জাগ্রত হয়। শিশুদের ওপর কাজের দায়িত্ব থাকাতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দমনমূলক নীতির অনুসরণ করবার প্রয়োজন হয় না। বিদ্যালয়ে তাদেরও অনেক কিছু করবার আছে, বিদ্যালয়ের ভালমন্দ তাদের কাজের ওপর নির্ভর করছে দেখে অত্যন্ত সহজে বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের আনুগত্য আসে।

স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করবার ক্ষেত্রে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে শিশুদের বিচার বুদ্ধি পাকা নয় কাজেই ভুল করবার সম্ভাবনা থাকবে প্রচুর সুতরাং শিক্ষককে সতর্ক এবং সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে সর্বদাই। অপরাধী শিশুর বিচার করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুলে মন্ত্রীর দল তুলে চুরির অপরাধে ফাঁসির হুকুমের মত লঘু অপরাধে গুরু দণ্ডের বিধানও করে বসে। এরকম ভুল করলে শিক্ষকের সাহায্য একান্তই প্রয়োজন। আবার এমনও দেখা যায় যে কোন কোন সমস্যার এমন সহজ সমাধান এরা বের করে যে শিক্ষককে বিস্মিত হতে হয়। একবার তৃতীয় শ্রেণীর এক মেয়েকে নিয়ে সমস্যা হল যে সে প্রত্যেক দিন দেরিতে বিদ্যালয়ে আসে। শিক্ষকের সতর্ক বাণী কিছুই করতে পারল না। মন্ত্রীসভাকে শিক্ষক জানালেন, "সবিতা রোজ দেরিতে বিদ্যালয়ে আসে, ওকে কি শাস্তি দেওয়া যায়?" শুনে মন্ত্রীর দল থেকে একজন বলে উঠল, "ওকে সাফাই মন্ত্রী করে দেব আমরা, তা হলে প্রেয়ার কাজ আরম্ভ হবার আধঘণ্টা আগে আসতেই হবে ওকে, না হলে প্রেয়ার, ঘর, বারান্দা ইত্যাদি পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা হবে কি করে?" পরের মাসে সত্যি সত্যি সবিতাই সাফাই মন্ত্রী নির্বাচিত হল এবং নিজের কাজ ঠিক ভাবে না করলে বন্ধুবান্ধব আবার কি শাস্তি বিধান করে বসে এজন্য সবিতা দায়িত্ব ঠিকভাবেই পালন করছে দেখা গেল। দেরিতে উপস্থিতিও আর হইল না।

স্বায়ত্তশাসনের ভেতর দিয়ে বিদ্যালয়ে কার্য পরিচালনা এবং শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা করলে শিশুরা নিজেদের ওপর দায়িত্ব থাকে বলে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলা মেনে চলতে শেখে এবং শৃঙ্খলার প্রকৃত রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। নীতি-উপদেশ দিয়ে তাদের ভবিষ্যতের নাগরিকের উপযুক্ত গুণ অর্জন করতে শেখাতে হয় না; ব্যবহারিক প্রয়োগের ভেতর দিয়ে তারা নাগরিকতা শিক্ষা করে; ছোট সমাজ পরিচালনার ভেতর দিয়ে বৃহত্তর সমাজ পরিচালনার গুণ অর্জন করে। এ সব কারণে বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত করে শিশুদের স্বাধীনতা দিলেও শিক্ষকের এক বিশেষ দায়িত্ব আছে তা ভুললে বা অস্বীকার করলে চলবে না। সেই বিশেষ দায়িত্ব হল এই যে, যদি দুষ্টামের কারণে জনের অনিষ্টকর প্রভাব বিদ্যালয়জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে তবে জোরের সঙ্গেই তার প্রতিবিধান করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় কখনই দেওয়া চলতে পারে না একথাটি সর্বদা মনে রেখে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর সহায়তায় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয় সমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর
পাঠ্যরূপে অনুমোদিত কতিপয় পুস্তক

ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দমোহন গুপ্ত
প্রণীত

প্রথম শ্রেণীর জন্য	দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য
কথা শেখা	পড়া-শেখা	স্বাস্থ্যের ছবি
লেখা শেখা	পরিবেশের ছবি	সাধারণ জ্ঞানের ছবি
বাঁক-শেখা	ইতিহাসের ছবি	সমাজ জ্ঞানের ছবি

জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা
প্রণীত

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য

১। গল্পের ফোয়ারা ২। গল্পের ঝরণা

দি সিটি বুক কোম্পানি
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার

আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রণীত

মূল্য ১৸০

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | আশ্বিন ১৩৬১ | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

পূজাবকাশ ও ছাত্র-শিক্ষক

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। বাংলাদেশে শারদীয় পূজা সামাজিক মেলামেশা ও আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ উৎসবের সময়। চার দিনের ছুটি হইলেও কর্মীরা ঐ কয়দিনের জন্য সাগ্রহে সারা বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। দেবীর নাম আনন্দময়ী। আমাদের অভাব অনটনের কথা আর বড় একটা তখন মনে থাকে না। উৎসব ও ধর্ম মিলাইয়া আমাদের জীবনে যেন একটা অপরূপ আলো আসিয়া পড়ে।

ছাত্র ও শিক্ষকের জীবনে এই আনন্দ ও উৎসবের কাল আরও দীর্ঘ, আনন্দ ও উৎসবের ওজনও যেন তাই আরও অধিক। এই অবকাশের সময়টি হইতে প্রকৃত লাভবান হইতে হইলে চাই পারিপার্শ্বিকের সহিত ঘনিষ্ঠতর সংযোগ, গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, দেশের লোকের আরও অধিক নিকটে আসা। কাজ হয়তো আমরা কমই করিতে পারিব—রাস্তা তৈরী করা, ময়লা সাফ করা, সাঁকো তৈরী করা, যাহা কিছু নবযুগে শিক্ষক-ছাত্রের সহযোগিতার অপেক্ষা রাখে, সবই হয়তো পরিমাণে কম হইবে, কিন্তু নৈতিক লাভ বাস্তব লাভ অপেক্ষা বেশি। দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন আমরা নূতন সংসারে ঘটাইতে চাই, তাহার জন্য অবকাশ বিনিয়োগের এক বিশেষ রূপান্তর হওয়া চাই। ছাত্রেরা এইদিকে মন না দিলে, বরং আকৃষ্ট না হইলে, অনন্ত যুক্তির পরামর্শে বা আবেদনে কিছুই হইবে না। আনন্দময়ীর আগমন সার্থক হউক। দেশে ও সমাজে আনন্দের বিকীরণ হউক, শিক্ষা বাড়ুক, আনন্দের মধ্যে, প্রাণহিল্লোলের মধ্যে।

শিক্ষায় ইংরেজির স্থান

আমাদের বিদ্যালয়ে ইংরেজির স্থান কতখানি থাকিবে, ইহা লইয়া আলোচনার অন্ত নাই। আমরাও ইতিপূর্বে 'শিক্ষায়' মাধ্যমে এই আলোচনায় যোগ দিয়াছি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর ইংরেজির স্থান বা কাল রহিয়াছে। আশা করা যায় কর্তৃপক্ষ এবারে উপযুক্ত পাঠক্রমের ও পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা করিবেন। সম্প্রতি সিংহল সরকার এদেশে আসিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন যে আমরা

কি ভাবে সমস্যার সমাধান করিয়াছি। সিংহলে আদেশিকরা ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার পরিপন্থী। যথাযথই 'সুভাষা' বা 'স্বভাষায়' শিক্ষা দেওয়া হইত, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমও চলিত। তবে অধিকাংশই সুভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিত, হয়তো শতকরা ৬ জন ইংরেজি ভাষায় শিখিত। এ অবস্থায় ক্রমশ সুভাষার পথ যে বিভিন্ন শিক্ষালয়ে প্রসার লাভ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এখনও অবশ্য সিংহলে বিদ্যালয়ে আট বৎসর ধরিয়া ইংরেজি শিখিতে হয়। আমরা সম্প্রতি এই শিক্ষাকাল ৮ বৎসর হইতে কমাইয়া ৫ বৎসরে নামাইয়া আনিতেছি। অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা জানেন যে কত সহজে ও কত অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার সুনপাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া যায়। তবে পরিভাষা লইয়া অসুবিধা ঘটিতে পারে। যাঁহারা এতকাল ধরিয়া ইংরেজিতে পড়াইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ইংরেজিতে বলা ও ব্যাখ্যা করা সহজ হইতে পারে এবং সেই অনুপাতে মাতৃভাষায় বলা ও ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইতে পারে। আমরা তো মূলে ইহার সমাধান করিয়া দিয়াছি। যাহা কিছু অসুবিধা এখনও আছে তাহা কালের প্রভাবে অন্তর্হিত হইতে পারে। বহু কলেজে এখনও ইতিহাস, নাগরিক শাস্ত্র ইত্যাদি ইংরেজিতে না শিখাইয়া বাংলায় বা ইংরেজি বাংলা মিশাইয়া খিচুড়ি ভাষায় শেখান হয়। এখনও এই রীতি সর্বত্র অনুসৃত হয় নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ পাস কোর্স পর্যন্ত এই রীতি মানিয়া লইয়াছেন যে, ছাত্রেরা বাংলায় বা ইংরেজিতে যে ভাষাতেই হউক অধিকাংশ বিষয়েই উত্তর করিতে পারিবে। কিন্তু অনার্স বা এম্. এ পরীক্ষায় অনুমতি এখনও দেওয়া হয় নাই। হয়তো কালক্রমে দেওয়া হইবে। কিন্তু ছাত্রসমাজ ও শিক্ষকগণ এই অনুমতিটুকুর সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। তাঁহাদেরই এতো উচিত এই অনুমতিকে কাজে লাগান, দেশের লোক সমর্থন না করিলেও বিল্ল আসিবে না যাইবে না।

পুনরায় অভিনয়

আমরা যেখানে মনে করিতেছি, কবে আমাদের শিক্ষকগণের নির্দেশে ছাত্রদের সংহত শক্তি ভগীরথ নির্দেশিত গঙ্গামাতার দুর্নিবার বেগে দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে, সেখানে যখন ছাত্রঅভিনয়ের কথা শুনি, তখন কি মনে হয়? অল্পদিনের মধ্যে পরস্পর ভিন্নরুচি কলেজের কথা শুনিতেছি, ঘটিশ চার্চ, প্রেসিডেন্সি ও মেট্রোপলিটন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা বা অধ্যক্ষকে আটক করিয়া রাখা অথবা অতিথি অভ্যাগতের অসম্মান করা—এসব কর্মের মধ্যে যে অমানুষিকতার ভাব আছে, তাহার সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোনই সম্পর্ক নাই। এরূপ ভাব যত শীঘ্র আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে দূর হয় ততই দেশের মঙ্গল। ছাত্রদের দ্বারাই ভবিষ্যৎ ভারত পরিচালিত হইবে। শিক্ষায় যদি ছাত্রমণ্ডল সাহিত না হয় তবে তাহাতে লাভ কি? আমরা পূর্বাপর যেমন বলিতেছি, ছাত্র ধর্মঘট বা শিক্ষক ধর্মঘট কোনটিরই পক্ষপাতী নই। কি করিয়া ছাত্র সংসদের হৃদয় হইতে এই অভিনয়ের ভাব সমূলে উৎপাটিত হয়, শিক্ষা ব্যাপারে তাহাই আজ ভারতের সবচেয়ে আবার ধারণ করিয়াছে।

কলেজী শিক্ষায় স্তর পরিবর্তন

শিক্ষার পাঠকগণ সম্ভবত অবগত আছেন যে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের শিক্ষার কাঠামোর এক বিশেষ পরিবর্তন আনিবার কথা হইতেছে। এখন ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার পর চার বৎসর কলেজে পড়িতে হয় প্রথম উপাধি গ্রহণের জন্য, তাহার পর এম্. এ. হইল দুই বৎসর। নূতন ব্যবস্থায় ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনালের পর যে দুই

বৎসর পরে আই. এ বা আই. এস্. সি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহা রদ করিয়া স্কুল ফাইন্যালের পড়ার সময় আরও এক বৎসর দীর্ঘ করিয়া স্কুল ফাইন্যালের তিন বৎসর পরে প্রথম উপাধি বা বি. এ বি. এস্. সি পরীক্ষা দেওয়ার কথা হইতেছে। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা গৃহীত হইতে চলিয়াছে। তবে সম্পূর্ণভাবে নহে। অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়ে আর এক বৎসর বিদ্যালয়ের শিক্ষা বাড়ানো এখনই সম্ভব নয়। স্থানাভাব, সরঞ্জামের অভাব, শিক্ষকের অভাব—নিমেষে দূর হইবে না। সময় চাই, অর্থ চাই, ব্যবস্থা চাই। সুতরাং আই. এ বা আই এস্. সি পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়াও স্কুলের পর প্রথম একটা বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি চাই।

কিন্তু চার বৎসর হউক আর তিন বৎসর হউক, ছাত্রকে কি শেখানো হইবে, তাহাই বিচার্য বিষয়। প্রথম উপাধি পরীক্ষায় ছাত্রকে বিশেষজ্ঞ করিবার প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, তাহাকে সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার দিবার কথাই ওঠে। এখনকার প্রবৃত্তি হইতেছে বিশেষজ্ঞ করিয়া তুলিবার দিকে, নানা বিষয় হইতে বাছিয়া লইয়া বাছা বাছা বিষয় পড়াইবার দিকে। তাহাতে বনিয়াদ পাকা হইবার কথা নয়। ছাত্র পল্লবগ্রাহী হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবারণ করার আজ বড়ই প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা 'চৌকস' ছাত্র প্রস্তুত করাই হইল আজিকার চাহিদা।

বুনিয়াদি শিক্ষার অব্যবস্থা

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষার অব্যবস্থার প্রতি শিক্ষার নানা প্রবন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আমি তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। চব্বিশ পরগণার একটী বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্কুলবোর্ড বহুদিন বৎসর হইল গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়টি চালু ছিল এবং তাহার ছাত্র সংখ্যা এখনও প্রায় দুইশত। কিন্তু পাঁচ বার জোর তাগাদা করিয়াও উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও অতিরিক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয় নাই। শিক্ষিকাদের জন্য যে বাসস্থান করা হইয়াছে, তাহা বাজারের অতি নিকটে, এবং তাহার উপযুক্ত আব্রুর জন্য প্রাচীর বা বেড়া কিছুই নাই। আমরা সুতা কাটিতে বলি, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই বুনিয়াদি শিক্ষার বিশেষত্ব, তাহা প্রচার করি, কিন্তু তুলার দাম দিবে কে? শিক্ষিকারা অসুবিধায় পড়িলেও কখনও বিল হারায়, কখনও বিল পাওয়া গেলেও টাকা পাওয়া যায় না। স্কুল বোর্ডের দায়িত্ব সম্বন্ধে বোধ সজাগ না হইলে শিক্ষার সমূহ ক্ষতি হইবে, তাহা বোঝা উচিত।

শিক্ষা ও পরিবার

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মানুষে মানুষে যেমন একটি মৌলিক ঐক্য আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যও তেমনি একটা মৌলিক সত্য। আমরা সবাই মানুষ আর মানুষ হিসাবে আমরা সবাই মূলতঃ এক। এই ঐক্য দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্বের মতো এমন বিরাট সত্যও কি পৃথিবীতে আর কিছু আছে? আমরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয় এবং অনুপম। একজনের মুখের চেহারার সঙ্গে আর একজনের মুখের চেহারার যেমন মিল নেই, একজনের মনের চেহারার সঙ্গেও আর একজনের মনের চেহারার তেমনি মিল নেই। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি এক একটি বিশেষ ক্ষমতা। একজন যা করতে পারে আর একজনের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা। যে-একটি বিশেষ ভঙ্গি প্রত্যেক শিশুর শরীর এবং মন তৈরী হয়েছে সেই ভঙ্গিটিকে জেনে তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে উন্মেষিত করাই শিক্ষকের ও শিক্ষয়িত্রীর আসল কাজ।

আমাদের আধুনিক সমাজ এই ব্যক্তিত্বকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয়কে সমাজ মূল্য দেয়, ব্যক্তি হিসাবে আমরা তার চোখে নিতান্তই নগণ্য। কলকারখানার মানুষের পরিচয় তার নম্বর দিয়ে। তার ব্যক্তিত্বের মূল্য সেখানে নেই বললেই চলে। সে কলের কুলি মাত্র। তার কাজ সারাজীবন ধরে দিনের পর দিন একই ধরণে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া। কোন জিনিসই সে সম্পূর্ণ করে তৈরী করে না। বস্তুর অংশ-বিশেষ তৈরী করাই তার কাজ। সে কাজে বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রই বা কতটুকু? কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো একই পথে সারাদিন সে ঘুরে ঘুরে চলেছে। বন্ধর কাছে তার মনকে বলি দেওয়া হয়েছে। সে যন্ত্রেরই সামিল হয়ে গেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিত্বকে কতটুকু মূল্য দেওয়া হয়? ইস্কুলে এক গাদা ছাত্র-ছাত্রী। মাষ্টার কাকে কেলে কার দিকে নজর দেবেন? পরীক্ষায় কোনরকমে পাশ করিয়ে দিতে পারলেই মাষ্টার মনে করেন কর্তব্য হোলো, অভিভাবকেরাও খুশী থাকেন।

কিন্তু আমরা যদি সবাই হতাম এক ছোতার তবে কোন কথাই থাকতো না। গোরুর পালকে রাখাল যেমন ভাবে চরায় তেমনি ভাবে আমরা পালের মধ্যে সবাই মানুষ হোতাম। কিন্তু মানুষ গোরুও নয়, ছাগলও নয়। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব আছে যা অনুপম। ইস্কুলে একগাদা ছেলেমেয়ের মধ্যে শিশুকে পাঠিয়ে দিয়ে মা-বাপ যদি মনে করেন আর কিছু করবার নেই, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই মারাত্মক একটি ভুল করবেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও চালাকির কোন স্থান নেই। ছেলেমেয়েদের জীবনের পিছনে অভিভাবকের অতন্দ্র পরিচর্য্যা থাকা দরকার। বাপ-মায়ের মতো শিশুর এমন পরিচালক পৃথিবীতে আর কে আছে? জন্ম থেকে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে মা-বাপ যেমন করে জানে—বিশেষতঃ মা—এমন গভীর করে তাকে জানা আর কার পক্ষে সম্ভব? আধুনিক সমাজ একটা প্রকাণ্ড ভুল করে বসেছে শিশুশিক্ষার ব্যাপারে পরিবারের স্থানকে একদম উপেক্ষা ক'রে ইস্কুলকে সমস্ত প্রাধান্য দিয়ে। মায়েরা ছেলেমেয়েকে কিণ্ডার-গার্টেনের হাতে সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত।

নিজেদের নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত। বাপেরাও সাহিত্য,' পোলিটিক্স, খেলাধূলা, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মেতে থাকেন। বেচারা শিশুরা আর সব পায়—পায়না শুধু পরিবারের মিষ্ট আবেষ্টনীর মধ্যে মা-বাপের নিবিড় সঙ্গ। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে শিশুর শিখবার থাকে অনেক। পরিবারের বড়োদের কাছ থেকে শিশু অনেক কিছুই শিখতে পারে। ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে তার বিকাশের ক্ষেত্র খুব বেশী নয়। তার শক্তির পূর্ণতার জন্যে দরকার পরিবারের লোকদের পরিচর্য্যা এবং আপেক্ষিক নির্জনতা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে শানিত করে তোলা তেমন কিছু কঠিন নয়। কঠিন হচ্ছে তার নৈতিক চরিত্রকে গড়ে তোলা, তার মনের মধ্যে সৌন্দর্যবোধকে জাগানো, তার চিন্তকে ঈশ্বরমুখী করা। গণিত, ইতিহাস, ব্যাকরণ ইস্কুল-কলেজে শেখানো যায়। নৈতিকবোধ, সৌন্দর্যানুরাগ, অধ্যাত্মচেতনা—এসব চারিদিকের আবহাওয়ায় না থাকলে, প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত না হ'লে মজ্জাগত হওয়া বড়ই কঠিন। শিশুর জীবনকে বিকশিত করে তোলার ব্যাপারে তাই পারিবারিক আবহাওয়ার প্রভাব যে কত বিপুল তা বলে শেষ করা যায় না। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে অত্যধিক মূল্য না দিয়ে শিশুর পারিবারিক আবেষ্টনীকে যথোপযুক্ত মূল্য দেবার প্রয়োজন আজ পৃথিবীর বহু মনীষীর উপলব্ধির বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিল্প

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য

বুনিয়াদী শিক্ষা কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা এবং সে কাজ সমাজের কল্যাণকর উৎপাদনাত্মক কাজ, এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। তার মানে এ নয় যে সেখানে কাজ ছাড়া আর কিছু থাকবে না অথবা উৎপাদনাত্মক কাজ ছাড়া আর কোন কাজ থাকবে না। ছোট ছেলে গল্প শুনতে ভালবাসে। এটা তার স্বভাব। তার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে তাকে গল্প বলতে হবে এবং সেই গল্পের ভিতর দিয়ে সে অনেক কিছু শিখবে। আর কাজের কথা বলতে গেলে, কাজও অনেক রকমের আছে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবন যাপনের জন্য অনেক রকমের কাজ করতে হয়—যেমন, দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া, স্নান করা, কাপড় কাচা, নিজের বাড়িঘর পরিষ্কার করা এবং জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা। এই সব কাজের গুরুত্ব জীবনে বড় কম নয়। এর ভিতর দিয়ে আর কিছু শেখানো যদি নাও যায়, শুধু এইগুলিই ভাল করে করতে শেখার প্রয়োজন আছে। এই একটা বড় শিক্ষা। তা ছাড়া, শিক্ষার দিকে নজর রেখে করালে এর ভিতর দিয়ে অনেক জিনিস শেখানো যায় এবং বেশ সহজে ও স্বাভাবিকভাবে শেখানো যায়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এর স্থান থাকবেই। তবে, বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষত্ব হল, এর ভিতর এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় একটা শিল্প কাজ থাকবে, এবং এই কাজ হিসাবেই সেটা করানো হবে না, ছেলের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে করানো হবে।

গোড়ার দিকে কাজ নিয়ে অনেক গোলমাল ছিল। সেটা আজ এক রকম কেটে গেছে।

অনেকের ধারণা ছিল, যে কোন উৎপাদনাত্মক কাজই ছেলের পক্ষে ক্লান্তিকর হবে। সেইজন্য উৎপাদনাত্মক কাজ ছেলেকে দেওয়া হবে না। ছেলেকে যে কাজ দিতে হবে সে হবে সৃজনাত্মক কাজ, যা ছেলে নিছক মনের আনন্দে করবে। কোন সৃজনাত্মক কাজও যদি ছেলেকে একটা নিয়ম অনুসারে নিয়মিতভাবে করতে দেওয়া হয় তাহলে সেটা কিছুদিন পরে ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়াবে। গান খুব আনন্দের জিনিস; কিন্তু সেই গানও যদি কাউকে অঙ্কের ফরমাসে করতে হয় তাহলে সেটা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। ছেলে নিছক মনের আনন্দে যেটা করতে চাইবে সে হল পাঁচ রকমের পাঁচটা কাজ এবং তার কোনটাই হয়তো সে নিয়মিতভাবে করতে চাইবে না। এ হলে কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে সুবিধা হবে না। যখন যা মনে হল করলাম, ভাল লাগল তো করলাম নয়তো করলাম না, এ জিনিসটাই ভাল নয়। কাজেই নিয়মিতভাবে কাজ করতে ছেলেকে শেখাতেই হবে। আর, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিতে হলে নিয়মিত কাজ ছাড়া উপায়ই নাই। এই তো গেল এক দিকের কথা। অন্য দিকে, উৎপাদনাত্মক কাজ যে ক্লান্তিকর হতেই হবে এমন কোন কথা নাই। একটা নিয়মের বশবর্তী হয়ে নিয়মিত কাজ করার যে ক্লান্তি সেটা যদি দিলে উৎপাদনাত্মক কাজকে বেশ আনন্দজনক করা যেতে পারে। এ ছাড়াও আর একটা কথা আছে। বুনিয়াদী শিক্ষার একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। সেটাকে স্বীকার করলে উৎপাদনাত্মক কাজ ছাড়া গত্যন্তর নাই। এ কথা ছেড়ে দিলেও কাজের একটা খরচ আছে। কাজ থেকে যদি কিছু আয় না হয়, কাজের উপকরণের খরচটাও যদি না ওঠে, তাহলে কর্মকেন্দ্রিক স্কুল চালানো শক্ত হবে। আর কিছু না হক, এইদিক থেকেও উৎপাদনাত্মক কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তার উপরেও আমাদের এখন সার্বজনিক শিক্ষার কথা ভাবতে হচ্ছে। দেশের সমস্ত ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দিতে হবে। তার মধ্যে দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাও আছে। এই ছেলে-মেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই বাপ-মাকে জীবিকা নির্বাহের কাজে সাহায্য করতে হয়। সকলেই কিছু না কিছু উপার্জন করে। এদের স্কুলে নিয়ে আসতে হলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। উৎপাদনাত্মক কাজ ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

উৎপাদনাত্মক কাজ কি হবে তা নিয়ে মতভেদ ছিল। আজও খানিকটা আছে। তাহলেও এটা আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে, এ কাজ মুখ্যতঃ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের কাজই হবে। অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনই মানুষের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। কাজেই বাগানের কাজ এবং সুতা কাটা, এই দুটি কাজকেই প্রধান ভাবে গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিক থেকেও এই দুটি কাজের একটা সুবিধা আছে। ছেলেদের কাজের ফলে যে জিনিস তৈয়ারী হবে সেগুলি কি ভাবে বিক্রয় করা যাবে, এ হল একটা বড় সমস্যা। অন্য জিনিস বিক্রয় করা কঠিন। কিন্তু তরি-তরকারি ও কাপড় জামা সহজেই বিক্রয় হতে পারে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই বাকির জন্য কিছু কিছু নিতে পারেন। বাকিটা একটু চেষ্টা করলে গ্রামে স্থানীয় লোকদের মধ্যে বিক্রয় হতে পারে। এই দুটি কাজের আয়োজন অপেক্ষাকৃত অল্প খরচেই করা যেতে পারে। তা ছাড়া, এই কাজ দুইটির ভিতর দিয়ে ছেলেকে নানা বিষয় শেখাবার যে সুবিধা আছে অন্য কাজের তা নাই। এই সকল কারণে পরিবর্তে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাগানের কাজ এবং সুতা কাটাকেই মুখ্য শিল্প হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেও তাই এই দুটি শিল্পকেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। তাহলেও কাজ যেভাবে হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। অধিকাংশ জায়গাতে শিল্পকে শুধু শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেই রাখা হয়েছে। শিল্প ভাল করে শেখাবার চেষ্টা করা হয় না। শিল্প থেকে যে আয় হওয়া উচিত তাও হয় না। নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হলে শিল্পের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। সেইজন্য কোন রকমে একটু কিছু করিয়ে তাকে উপলক্ষ্য করে যেটুকু লেখাবার দেখানো হয়। এতে শিক্ষা ভাল হয় না। শিল্পের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার যে উদ্দেশ্য তাও সিদ্ধ হয় না। শুধু তাই নয়। এর ফলে খুব ক্ষতি হচ্ছে। শিল্প যে সত্যই কাজের জিনিস এবং তা থেকে যে আয় হতে পারে, এ ধারণা ছেলের হয় না। শিল্পকে সে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে শেখে, শিল্পের প্রকৃত মর্যাদা তার কাছে নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া, যেমন তেমন করে কাজ করার ফলে ছেলের অভ্যাসও খারাপ হয়ে যায়। ছেলেকে কাজ করতে না দেওয়া বরং ভাল। কিন্তু কাজ করতে দিলে যাতে ভাল ক'রে করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তা না হলে যা তা করে কাজ করতে করতে সেইটাই ছেলের অভ্যাস হয়ে যাবে এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে সে তাই করবে।

এইরকম যে হচ্ছে এর কারণটা কি? প্রথম এবং বড় কারণ, আমার মনে হয়, আমাদের মনোভাব। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই খুব স্পষ্ট নয়। শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও বিশেষ বদলায় নাই। শিক্ষা বলতে এখনও আমরা লেখা-পড়াই বুঝি। ছেলেকে কোন রকমে খানিকটা লেখাপড়া শেখালেই তার শিক্ষা হয়ে গেল, এই আমাদের বিশ্বাস। তাই লেখাপড়া শেখাবার দিকেই আমাদের নজরটা থাকে। শিক্ষা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মতামত যাঁরা জানেন এবং কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার উপযোগিতা যাঁরা বোঝেন তাঁদেরও প্রধান লক্ষ্য লেখাপড়া থাকায় কাজকে তাঁরা কেবলমাত্র উপায় হিসাবে দেখেন। কাজের কোন নিজস্ব মূল্য তাঁদের কাছে নাই। সেইজন্য কাজের উপরে যে জোরটা পড়া উচিত তা পড়ে না।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবও এর একটা কারণ। যে সব বিদ্যালয়ে প্রকৃত মনোভাবসম্পন্ন শিক্ষক আছেন সেখানে বিনা উপকরণে যেটুকু কাজ হতে পারে তা হয়। কিন্তু শিল্পশিক্ষা তো সরঞ্জাম ছাড়া সম্ভব নয়। অবশ্য, আদর্শ ব্যবস্থা হচ্ছে শিল্পের সরঞ্জাম নিজেরা তৈয়ারি করে নেওয়া। ছোট ক'রলে নিজেদের টাকু, এমন কি নিজেদের চরকা, ছেলেরা নিজেরা তৈয়ারি করে নিতে পারে। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে তাতখানি বর্তমানে আশা করা যায় না। এখন কিছুদিন অন্ততঃ শিল্পের সরঞ্জাম আমাদের বাইরে থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। এই বিষয়ে আমাদের খুবই ত্রুটি হচ্ছে। সুতা কাটাকে যেখানে প্রধান শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে প্রত্যেক ছেলের একটা করে চরকা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এত তো বুনিয়াদী বিদ্যালয় হয়েছে; বোধ হয় কোনখানে এই ব্যবস্থা হয় নাই। সুতা কাটার অন্যান্য সরঞ্জাম এবং পর্যাপ্ত তুলারও সর্বত্রই অভাব আছে।

আর একটা কারণ শিক্ষকের শিল্প শিক্ষা দেবার উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব। আমাদের শিক্ষণ-বিদ্যালয়গুলিতে সুতা কাটা শেখানো হয় কিন্তু যেভাবে শেখানো হয় এবং যেটুকু শেখানো হয় তাতে কাজ হয় না। প্রথমত সেখানেও উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাব। শুনলাম, একটি শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৪ খানি চরকা আছে। এমন হতে পারে যে—যদিও তা হবার কোন কারণ নাই—বিদ্যালয় থেকে বেশি চরকার ব্যবস্থা করা

সম্ভব হয় নাই। কিন্তু শিক্ষার্থীদের তো চেকা কিনতে বলা যেতে পারে। তারা বই কিনবে, খাতা কিনবে, চকও কিনবে না কেন? টেক্‌নিকাল স্কুলে যে সব ছেলে পড়ে ড্রইংয়ের সরঞ্জাম তো তাদের স্কুল থেকে দেওয়া হয় না। সে সব তারা নিজেরাই কিনে নেয়। শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের যারা শিল্প-শিক্ষক তাঁদেরও সুতা কাটা ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট দক্ষতা নাই। সুতা কাটার ভিতরকার তত্ত্ব তাঁরা হয়তো জানেন; কিন্তু সেই তো পর্যাপ্ত নয়। কাজও ভাল করে জানা থাকা চাই। নিজেরা ভাল করে কাজ করতে না পারলে তাঁরা শিক্ষার্থীদের শেখাবেন কেমন করে? আর একটা অসুবিধা এই যে, শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল মাত্র এক বৎসর, অথচ শিক্ষণীয় বিষয় এত বেশি যে এই অল্প সময়ের মধ্যে কোন বিষয়ই ভাল করে শেখা সম্ভব হয় না। তার ফল এই হয় যে, শিক্ষার্থীরা শিল্প সম্বন্ধে অতি অল্পই শেখে। শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী যেটুকু জ্ঞান লাভ করে পরবর্তী কালে তা দ্বারা সেটুকু সে অনায়াসেই বাড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু তাও হয় না। বিদ্যালয়গুলির যদি ভাল পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকত এবং পরিদর্শকেরা যদি শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধে একটু সচেতন হতেন তাহলে তাঁরা শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য একটা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারতেন। অবশ্য, পরিদর্শকদের শিল্প-শিক্ষণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হতে হবে। তাঁদের এমন হওয়া চাই যেন তাঁরা অপর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করতে পারেন। তাঁরা শুধু ত্রুটি দেখিয়েই কর্তব্য শেষ করবেন না, সেই ত্রুটি সংশোধনেরও ব্যবস্থা করবেন।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের যথার্থ যে স্থান হওয়া উচিত সেই স্থান যদি তার জন্য আমরা করতে চাই এবং বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক করবার যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে তাহলে এই সকল বিষয়েই আমাদের সবিশেষ অবহিত হতে হবে।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

আমরা মাদ্রাজে অর্ধদিবস-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করি। বর্তমান মাদ্রাজ গভর্মেণ্ট সে ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার তিন ঘণ্টার উপস্থিতিই পর্যাপ্ত এবং ঐ সময়ের মধ্যেই সব কিছু শিখানো যায়, আমার এই দৃঢ় ধারণাই ছিল ঐ ব্যবস্থার মূল। শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ অভিজ্ঞ কর্মচারীগণও ঐ ধারণা যথার্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অর্ধদিবস-বিদ্যালয় অপেক্ষা পূর্ণদিবস-বিদ্যালয়ে দ্বিগুণ ফল আশায় হয়, অতএব এই স্থূল হিসাববোধেরই জয় হইল ও আমার ব্যবস্থাকে ছাঁটিয়া ফেলা হইল।

শিক্ষা আয়জনক চাকরীর জন্য একটা প্রস্তুতি, এইরূপে শিক্ষাকে স্থূল বুঝা হইয়াছে। তাই ইহা সামাজিক সহযোগিতার বিরোধী সকল রকম দোষের আকর এক অর্থহীন জুয়াখেলায় পর্যবসিত হইয়া ব্যাপকভাবে লোকেদের শক্তিহীন করিয়া তুলিবার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শিক্ষা উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের অনেক ছেলের নিকট সরকারী পদমর্যাদা ও আয়জনক চাকরী সুলভ করিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া স্থূল যুক্তির আশ্রয় লইয়া, মনে করা হইতেছে যে অধিকতর শিক্ষা পাইলে প্রত্যেক শিশুই এইরূপ চাকরী ও মর্যাদা পাইতে পারিবে। তাহা অবশ্য অসম্ভব। ইহার ব্যর্থতা ইতিমধ্যে যথেষ্টই দেখা গিয়াছে। ইহাতে নৈরাশ্য দ্রুতগতিতে বাড়িয়াই চলিবে। কিন্তু ইহা বুদ্ধির নাশ করে। ইহা ভাল জিনিষকে মন্দ করিয়া দেখায় ও মন্দ জিনিসকে খুব ভাল বলিয়া মনে করায়।

শিশুর মনের সঙ্গে যাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, অল্পবয়সের শিশুদের কাটিত সমস্ত দিন বিদ্যালয়-গৃহে আটকাইয়া রাখার দৃশ্যে তাহার মনে দারুণ বিতৃষ্ণা আসিবে। যে লোক সর্বক্ষণ শিশুদের ভার লইয়া বসিয়া থাকে তাহার পক্ষে তাহা কত অপ্রীতিকরই না হইয়া উঠে! দৈনন্দিন মধ্যাহ্নে আবার একটা কর্মবিরতির ভাণ করা হয়। বিদ্যালয় হইতে বাড়ী যাইতে, আবার বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিতেই, এই ছুটির সময়টা ফুরাইয়া যায়। তাহার উপর একজন শিক্ষককে দুই, এমন কি তিন শ্রেণীর ছেলেদের একসঙ্গে শিক্ষা দিবার ভাণ করিতে দেখিলে, যার ভাল-মন্দ বোধ আছে তার মনে একটা দারুণ বিরক্তির ভাব না আসিয়া পারে না। চার বৎসর বয়িয়া একজন শিশুকে সমস্ত দিন আটকাইয়া রাখার সময়ের যে অপচয় হয় তাহাও ভয়ঙ্কর।

প্রবঞ্চনা, অপচয় ও শিশুদের উপর একটা নিদারুণ অত্যাচার, এই তিন-এ মিলিয়া সমস্ত জিনিসটাই একটা দুষ্টচক্রে হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ইহারই নাম প্রাথমিক শিক্ষা।

অশিক্ষিতদের সমাজে একটা অর্থহীন ধারণা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, শিক্ষার চাকরী জুটাইবার একটা রহস্যময় শক্তি আছে এবং শিশুরা যত বেশী বিদ্যালয়ে কাটায় সেই অনুপাতে ঐ শক্তি বাড়িয়া থাকে। ধারণাটি এইরূপ: স্কুলে গেলে যদি নূতন জগতে সুবিধা পাওয়া যায় তবে স্কুলের সময়কে দ্বিগুণ করিয়া দিলে সুবিধার পরিমাণও দ্বিগুণ হইবে এবং সময় সর্বেক কমাইয়া দিলে সুবিধাও অর্ধেক কমিয়া যাইবে।

আগ্রহ ও আনন্দের মধ্য দিয়া শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বিকাশ করা হইল মন্টেসরি-নীতি।

গান্ধী-নীতি অনুসারে কেবল মাত্র শারীরিক কাজ নয়, প্রয়োজনীয় কাজই হইল শিক্ষার যথার্থ বাহন। আমি মনে করি এই দুই নীতির সহিত গ্রামের জীবনধারার সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলার নীতিকে জুড়িয়া দেওয়া উচিত। শিশুর পারিবারিক জীবন ও পরিবেশকে যাঁহারা ঘৃণা ও অবজ্ঞা করেন এবং শিশুকে তাহা হইতে সরাইয়া লওয়া যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা যে-শিক্ষার কথা ভাবেন, আমার ধারণা অবশ্য তাহার বিপরীত।

পেশীচালনার ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করাইয়া শিক্ষাদানের যে নীতি পেস্তালৎসি প্রচলিত করিয়াছেন তাহা এবং প্রয়োজনীয় কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি গান্ধীজী প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা এক নহে। প্রকৃত কাজের ভিতর যে অর্থ নিহিত থাকে কেবলমাত্র পেশীচালনার মধ্যে তাহা থাকে না। একটি পাত্র তৈয়ারী করা, একটি জামা সেলাই করা বা তোরঙ্গে-বোনা, এমন কি কুয়োর জন্য কাদা তৈয়ারী করিয়া দেওয়া, বা ঘরের মেঝে কাঁটে দেওয়া কিংবা একটি কর্মক্ষেত্রের ঘর সাজানো গোছানো, এ সবগুলিই কেবলমাত্র শারীরিক অনুচালনা অপেক্ষা বেশী কিছু করা। প্রয়োজননির্বাহের জন্য কাজ করা বাস্তব জীবনের একটি অধ্যায় এবং সামাজিক সহযোগিতার একটি অঙ্গ।

বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাপারে হাতের কাজ মাধ্যমমাত্র, শিল্পশ্রম-নিয়োগের ইহা উপায়মাত্র নয়, এই সত্যের উপর জোর দিবার ইচ্ছায়, এবং প্রয়োজনের বিশেষ তাগিদে, পুরাতন পদ্ধতির পুস্তকসর্বস্ব শিক্ষকদের কোন প্রকারে অসম্পূর্ণ ভাবে হস্তশিল্প শিখাইয়া, তাহাদের দ্বারা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করা হয়। তাঁহারা যাহাতে হস্তশিল্প-শিক্ষকের কাজ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জন্য অল্প সময়ে একটা অসম্পূর্ণ শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। হস্তশিল্পের জন্য এই উপায়ে তৈয়ারী করা শিক্ষকদের উপর আমার কোন আস্থা নাই। আমার ধারণা ইহাতে অর্থের অপব্যয় হইয়াছে এবং ইহাতে ওয়ার্ধা-পদ্ধতিকেই অযৌক্তিক রূপে নিন্দনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। যে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন প্রত্যেক শিক্ষক নিজের শিক্ষাকে কাগজে-কলমে যোগ্যতা অর্জনের উপায় বলিয়া মনে করে, তাহার চেয়ে যে অক্ষরজ্ঞানহীন হস্তশিল্পী শিল্পকাজ করিয়া সংসার চালায় ও শিল্পকাজের আসল সব জানে তাহার নিকট হইতে নীচের অনেক কিছু শেখা যায়, এই আমার দৃঢ় ধারণা। বস্তুত, আমার ব্যবস্থায় বর্ণজ্ঞানহীন কৃষক বা হস্তশিল্পী যে স্নেহ ও সমমর্যাদা লাভ করিবে, তাহাই একটা সামাজিক লাভ হইয়া দাঁড়াইবে এবং অন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুদের মনে এইরূপ একটা ধারণা জন্মায় যে চর্মকার, গ্রাম্য কর্মকার, তন্তুবায় বা কৃষক অপেক্ষা বিদ্যালয়গামী শিশুরা ভিন্ন উচ্চজাতের লোক, তাহাদের পক্ষে আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থা নাগরিকশিক্ষার উপায় হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রত্যেক নূতন ব্যবস্থাতেই অসুবিধা দেখা দিবে। কিন্তু সেই কারণে সকল রকম প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া একটা মন্দ ব্যবস্থাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা যাইতে পারে না। আমাদের মৌলিক ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করিয়া লওয়া দরকার এবং তাহা কাজে পরিণত করিতে গিয়া কোন বাধা দেখা দিলে তাহা অতিক্রম করার উপায় বাহির করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা এমন একটি ফুলাখেলায় পর্যবসিত হউক যাহাতে শিক্ষার্থীরা সব কিছু খোয়াইবে অথচ কিছুই লাভ করিবে না—ইহাই কি আমরা চাই, অথবা প্রাথমিক শিক্ষাকে পৌরশিক্ষায় ব্যবস্থায় পরিণত করিতে চাই? এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হইবে।

'হরিজন পত্রিকায়, সৌজন্যে

সাহিত্যে দীক্ষা—গৃহে

শ্রীবকুলমালা সেন

প্রতিভা অমরগুপ্ত, কিন্তু প্রকাশের পথ না পাইলে তাহা চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যায়। নিরুদ্ধ দুয়ারে মাথা কুটিয়া কত প্রতিভা যে বিফল হইয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব কে-ই বা রাখে।

বৈজ্ঞানিক, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর যেমন বিশেষ বিশেষ গুণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, সাহিত্যিকও তেমনি তাহার রসানুভূতির মধুরতাও লইয়াই পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই তাহার আবরণ উন্মোচিত না হইলে তাহা সাহিত্যে রূপায়িত হইবার পথ পায় না। এই আবরণ উন্মোচনই সাহিত্যে দীক্ষা।

লোকের বিরহ-বেদনা অথবা প্রেয়সীর বিমুখতা সাহিত্যে দীক্ষাগুরুর সমান লাভ করিয়া আমাদের সাহিত্যিকদের ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। এরূপ আকস্মিক কারণ ক্ষেত্রবিশেষে অমোঘ ফল দান করিয়া থাকে, ইহা নির্ভুল সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াও বলা চলে সাধারণের জন্য সাধারণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে।

দুইটি বালক বালিকাকে সাহিত্যপথের ভাবী পথিক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহাদের বয়স সাত বা আট বছর। এক জন পড়ে কথামালা, অপর জন সাহিত্য-সুধা বা ঐ জাতীয় আর কোন বই। যা একদিন তাহাদের দুই জনকে দুইটি মোটা মোটা খাতা দিয়া বলিলেন, যেদিন এই খাতা তোমাদের নিজেদের লেখা গল্প ও কবিতায় ভরিয়া ফেলিবে, সেই দিন ছাপাইয়া দিব।

বালক বালিকা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। অন্য দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতে কোথা হইতে রাজ্যের ঘুম আসিয়া চোখে আড্ডা জমাইয়া বসে, কিন্তু আজ চোখে ঘুম নাই। স্কুলের পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার তাহারা নূতন খাতা লইয়া লিখিতে বসিল। একজন একচক্ষু হরিণের গল্পটিই একটু অদল বদল করিয়া লিখিয়া ফেলিল। হুবহু বই-এর মত হইলে তো নিজের রচনা করা হইবে না, নিজের রচনা না হইলে আবার ছাপা হইবে না। অপর জন "অগতির গতি তুমি জগতের নাথ" কবিতাটির নব রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইল—"অগতির গতি, তুমি জগৎপতি" ইত্যাদি। লেখা শেষ হইলে নিজেদের লেখা পড়িয়া তাহারা মুগ্ধ হইল। এ খাতা ভরিয়া ফেলিতে যে বেশী সময় লাগিবে না, এবিষয়ে তাহাদের মনে কোন সন্দেহ রহিল না।

রাত্রিতে ঘুমাইয়া বালিকা স্বপ্ন দেখিল—একটা মস্ত বড় ঘর বই-এর আলমারিতে ঠাসা। স্কুলে যাইবার সময় হইয়াছে, বই গুছাইয়া লইবার জন্য যে বই টানিয়া বাহির করিতেছে তাহাতেই দেখিতেছে গ্রন্থকর্ত্রী রূপে তাহার নিজের নাম লেখা। বালক স্বপ্ন দেখিল—সে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় কবিতা আবৃত্তি করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে। মাষ্টারমশায় শিখাইয়া দিয়াছেন আবৃত্তি আরম্ভ করিবার আগে লেখকের নাম ও কবিতার নাম বলিতে হইবে। কিন্তু বলিবার সময় সে রবীন্দ্রনাথের বদলে নিজের নাম বলিয়া ফেলিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এরূপ বলা ভুল হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিল না, কেহ অসন্তুষ্টও হইল না। বরং করতালি ধ্বনিতে চারিদিক ভরিয়া গেল।

দিনের পর দিন নূতন খাতার পাতার পর পাতা নানা জাতীয় রচনায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

দুই বছর পর। এখন তাহারা রবিবার ক্রমে পড়িয়াছে, ঠাকুরমার ঝুলি পড়িয়াছে, মায়ের বাবার কাছে রামায়ণ মহাভারতের বহু গল্প শুনিয়াছে, দাদার কাছে দিদির কাছে মাথার পাকা পোকা। অসভ্যদের কথা, উটে চড়া বেদুইনদের কথা, উত্তর-মেরু দক্ষিণমেরুর ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিনের কথা প্রভৃতি অনেক কিছু জানিয়াছে। সুতরাং এখন তাহারা নিজেরাই গল্পের নায়ক নায়িকা হইয়া কখনও মরুভূমির মরুদ্যানে, কখনও মেরু-প্রদেশের তুষার গৃহে, কখনও বা জনশূন্য দ্বীপের পর্বতগহ্বরে অথবা "পবনের নাও" এ মেঘের রাজ্যে স্বর্গ পড়িয়া তুলিতেছে। পুরানো খাতা দুটি কি করিয়া যেন হারাইয়া গিয়াছে। এবার আর মাকে খাতা কিনিয়া দিতে হয় নাই। নিজেরাই নিজেদের জমানো পয়সা হইতে খাতা কিনিয়া লইয়াছে।

এমন সময় অপূর্ব সুন্দরী একটি বই হাতে পাওয়া গেল। চারু ও হারু, কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের সচিত্র বিচিত্রিত মহাভারত। দাদা দিদিরা কেহ বা জন্মদিনে কেহ বা স্কুলের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরস্কার পাইয়াছে। বই গুলি ছবিতে রঙে দেখার এক মুহূর্তে মন আকর্ষণ করিয়া লয়। কিন্তু দাদা দিদিরা বই যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ইচ্ছামত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখার উপায় নাই। বালক বালিকা পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিল—ছবি না হইলে চলিবে না। ছবি ছাড়া কি আবার বই হয় নাকি?

অত্যুগ্র আগ্রহ ঘুমকে বেশছাড়া করিয়াছে, ঘুম পাইতেছে না। দাদা দিদি মা বাবা ঘুমাইয়া পড়িলে সন্তর্পণে ঘুমনে উঠিল বসিল। মেঝের মাদুর পাতিয়া নিঃশব্দ লঘুপদে তাকের উপর হইতে বই নামাইয়া লইল। তারপর খাতা পেন্সিল লইয়া দুজনে বসিয়া গেল—চারুকে নূতন নূতন ঘটনার সন্নিবেশে সাহায্য করিতে এবং তাহাকে নবতর গৌরবে মণ্ডিত করিতে। কথার পাশে পাশে ছবির পর ছবি আঁকিয়া খাতার পাতা ভরিয়া ফেলিল। অবশেষে মহাভারতের "দুর্ধর্ষা তপতী" শীতলের দেওয়া রূপকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া বালক বালিকার খাতার নবমূর্তিতে আবির্ভূতা হইল।

মায়ের চোখ এড়ানো গেল না, তখনকার মত মিষ্ট তর্জনা সহ করিতে হইল বটে কিন্তু লাভ হইল আশাতীত। মায়ের ব্যবস্থায় পরদিন হইতে বই ব্যবহারের অবারিত অধিকার পাওয়া গেল। দিন কয়েক পরেই দেখা গেল কাশীরামের সকল কীর্তি রহিত করিয়া বালক নূতন মহাভারত রচনা করিয়াছে। কীচক বধের জন্য ভীমসেন বন বন গদা আস্ফালন করিয়া "দয়াময়ী জগৎ পিতাকে" সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—"কব সম প্রতিজ্ঞা না করিনু—"

আরো দুই বছর পরে। দ্বিতীয় খাতা দুটি প্রথম খাতা দুটির পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছে এবং নূতনের আবির্ভাব ঘটিতেও বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু আসল কথাই এখনও বলা হয় নাই। কোথা হইতে কি উপলক্ষে যেন এক সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মুখে সর্বদা শিশুসুলভ হাসি সুতরাং বালক বালিকা তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া চিনিয়া লইতে ভুল করে নাই। বাবার সঙ্গে যখন তিনি কি সব গুরুগম্ভীর কথা বলেন, তখন অবশ্য তাঁহাকে ঠিক পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। তখন মনে হয় যেন কি এক রহস্যময় সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহার গল্পের ঝুলি খুলিয়া বসেন, তাঁহার যাদুর্মে বালক বালিকা একেবারে ডুবিয়া যায়। সব বুঝিতে পারে না। কতকগুলি যেন ছুঁয়া করিয়া যেন ধরা যায় আবার কতকগুলি স্বপ্নের মত একটু ছোঁয়া দিয়াই চলিয়া যায়। দেবী চণ্ডী শাঁখারীর নিকট হইতে বালিকা যেন শাঁখা পরিয়া গেলেন, ইহা নিতান্তই সম্ভবপর ঘটনা মনে হয় বটে কিন্তু পণ্ডিত সাধকের সীতা সম্বোধন

করার লাল কালির দাগ কেন যে তাঁহার আধাগ্য দেবতার পিঠে প্রহারের রক্তচিহ্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিল কে জানে। মন কেবলই উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু বুদ্ধের সমের ভাণ্ডার অফুরন্ত। এখনকার খাতার পাতায় ইহার প্রভাব না পড়িবার পথ ছিল না। এতদিন তাহারা মহাভারত ও রামায়ণ ও মহাভারতের বহু প্রকার ঘটনার বিচিত্রতার উড়িয়া বেড়াইতেছিল, এখন কুরুক্ষেত্রের ভাণ্ডার তাহাদের যেন সমুদ্রের তীরে আনিয়া খাড়া করাইয়া দিল। অসংখ্য ঝিনুক, শঙ্খ তার কারুকার্য—ঢেউএর সঙ্গে সঙ্গে তীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এ একেবারে ধরা ছোঁয়ার মতো, বোঝা যায়। কিন্তু ঐ অতল জলরাশির গর্ভে না জানি কি আছে। তার অতলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিন্তু উপলব্ধিগম্য হয় না। না-ই হোক, এখনকার খাতার পাতায় এই রহস্যের ছোঁয়া লাগিল। এবার একেবারে প্রেমে পড়িবার যোগ্য করিয়াই দেখা হইতেছে। সমরে প্রচ্ছদপট চিত্রিত করা হইয়াছে এবং অভ্রান্ত-ভাবের সঙ্গে কবিতার প্রবন্ধে রচনার তারিখ দিতে ভুল হইতেছে না। ভবিষ্যতের সাহিত্যসমালোচক এবং জীবনী লেখকদের যাহাতে বেশী কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, সেজন্যই এ সুবিবেচনা। কিন্তু এখন আর আপনাদের প্রতিটি রচনাই মনকে মুগ্ধ করে না, কেমন যেন স্থানে স্থানে বেখাপ্পা মনে হয়। যাহা বলিতে চাই, তাহা বলিবার মত ভাষা যেন মিলিতেছে না। যে শব্দ ব্যবহার করিলে ঠিক ঠিক কথাটি বলা হইবে, সে শব্দ যেন জানা নাই। এমনই একটা অপ্রাপ্তিবোধ এমনই একটা অতৃপ্তি মনের কোনে জমা হইতে থাকে। অবশেষে একদিন একটি কবিতা লইয়া বালিকা সসঙ্কোচে পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, এটা একটু ঠিক করে দেবেন? পিতা কবিতাটি পড়িয়া উৎসাহ দিয়া বলিলেন, এতো বেশ সুন্দর হয়েছে, চমৎকার। বালিকার মন প্রবোধ মানিল না, কবিতার দুএকটি পংক্তি নির্দেশ করিয়া বলিল—এই যে, এখানটা কেমন যেন হয়েছে। পিতা হাসিয়া বলিলেন, না, না, কে বললে খারাপ হয়েছে? সুন্দর হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। বালিকার মনের খোঁকা সম্পূর্ণ না কাটিলেও আশা পল্লবিত হইয়া উঠিল। চুপি চুপি কবিতাটি গোটা গোটা অক্ষরে একটি কাগজে লিখিয়া তাহাদের নিত্যপাঠ্য শিশু মাসিক পত্রিকায় পাঠাইয়া দিল। তারপর একমাস গেল, দুমাস গেল, তিন মাস গেল। ডাকে দুবকরা যখন মাসের পত্রিকাটি দিয়া যায় তখনকার উত্তেজনা অবর্ণনীয়। প্রতিটি পৃষ্ঠা দুতিনবার করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও যখন কবিতাটির কোন হদিস পাওয়া যায় না, তখনকার নৈরাশ্যের তীব্রতাও বর্ণনাতীত। নিষ্করুণ বিধাতা পুরুষের উপর অভিমানে বালিকার মন ভরিয়া গেল। কিন্তু তাঁহারই বা দোষ কি? বালিকা জানিয়াছে, সে মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া তাহার প্রথম পৃথিবীর আলোক স্পর্শের ক্ষণটিতে বাড়িতে নাকি কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছিল। এমন অবাঞ্ছিত যে তাহাকে সম্পাদকই বা ছাপিয়া না করিবেন কেন? তাই ক্রৌঞ্চের বিরহবেদনা নয়, পৃথিবীর মর্মান্তিক অবহেলা নয়, নিতান্তই শিশুমাসিকের সম্পাদক মহাশয়ের অস্বীকৃতি কবিতায় প্রেরণা দিল। বালিকার মনের দুঃখ তাহার অসম্পূর্ণ শব্দ ভাষার পথ ধরিয়া কবিতায় উৎসারিত হইল—

দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে
ঘোরাতে গেল পড়ে,

নাচার বিধি শুকনো কলম বুলিয়ে গেলেন তাতে।
লিখেছিলেন ভালই বটে, ফললো না ফল কালে।

বালক সান্ত্বনা দিল। সম্পাদকগোষ্ঠির মুণ্ডপাত করিয়া বলিল—ওরা নিজেদের আত্মীয় স্বজনের লেখাই কেবল ছাপে, তা জানিস না বুঝি? তার

চেয়ে আমরা নিজেরাই একটা পত্রিকা বের করি, সেই বেশ হবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই নানা গল্প কবিতায় সমৃদ্ধ হইয়া হাতে লেখা পত্রিকা জন্ম লাভ করিল।

এমনি করিয়াই গৃহের পরিবেশে বালক বালিকারা সাহিত্যে দীক্ষা লাভ করে। এ বিষয়ে যদি অভিভাবক বা অভিভাবকস্থানীয় অন্যান্যের সচেতন দৃষ্টি থাকে, তবে পথ আরও সহজ হয়।

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ

শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য পরিভ্রমণের কথা অনেক শিক্ষাবিদ্ বলে থাকেন। এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যেতে পারে। প্রথম কথা হচ্ছে শিশু তার আবেষ্টনীকে ভাল করে চিনবে, তবেই তার শিক্ষা দানা বেঁধে উঠবে। ম্যাকের মেগাই ১৯৩৮ সনের Year book of Education এ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে সাহিত্যিক শিক্ষা আমাদের মনকে বইয়ের পড়ার মধ্যে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, আমরা মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে কোন কিছুই দেখতে পারিনা। ভূগোল মুখস্থ করে পৃথিবীর কোন জায়গায় কি আছে, তাহা অনায়াসে আমরা বলে দিতে পারি, অথচ আমাদেরই গ্রামে আমারই অদূরে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে কার বাড়ি তা আমরা জানি না। তার কারণ আমাদের পর্যবেক্ষণশক্তির অভাব।

বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত পরিভ্রমণের সংজ্ঞা দিয়েছেন F. F. Gaither। তাঁর "the Excursion Project নামক প্রবন্ধে তিনি বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত পরিভ্রমণকে "any type of Project that lends itself to investigation, exprimentation, exploration and gaining knowledge by first-hand contact with life, the individual's environment and the world at large". বস্তুত পক্ষে বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার উপায় নেই, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা, শিশুরা অনুসন্ধান করে গবেষণা করে, পর্যবেক্ষণ করে, পরীক্ষা করে প্রত্যক্ষভাবে হাতে কলমে লাভ করবে। প্রতি বয়সের শিশুর জন্যই এইরূপ পরিভ্রমণ কার্যকরী হবে বলে সকলেই বিশ্বাস করেন। প্রথম স্তরের শিশুর জন্য পরিভ্রমণ হবে সীমাবদ্ধ থাকবে নিজস্ব গ্রামের মধ্যে আর পঞ্চম শ্রেণীর শিশুরা হবে গ্রামের বাইরে নিকটস্থ সহরে বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যাবে।

বর্তমান শিক্ষার ধারায় আমরা শিশুর প্রয়োজনকে মূলধন করে শিক্ষা দিতে চাচ্ছি। তাহলে শিশু যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠছে, সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকা একান্তই আবশ্যক। সে পরিবেশকে দেখবে, পরিবেশের স্বকীয় মর্যাদা সে দেবে এবং যে পরিবেশ অপরিবর্তনীয়, সেই পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সে চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজন বোধে সচেষ্ট হবে পরিবেশের উন্নতি বিধান করতে চেষ্টা করবে। শিশুর পরিবেশে ও সমাজে এমন কতকগুলি সামাজিক ও নৈসর্গিক বস্তুসম্ভার আছে যার

প্রভাবে সেইস্থানের জীবনযাত্রা প্রণালী একটা বিশেষ প্যাটার্ন অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত সেই ধারা অবলম্বন করে গড়ে উঠবে। এই অবস্থায় শিশুর শিক্ষা ঐ-সম্পর্কিত লেখা পড়া, অঙ্কেই শুধু পর্যবসিত না হয়ে—ঐ সম্পর্কিত নানা সমস্যার সহিত জড়িত হয়ে যাবে। শিশু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নিজে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে দেখবে এবং বস্তুর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে। প্রকৃত পক্ষে শিশুর পরিবেশের বস্তুসমূহ শিশুর পাঠ্যক্রম হয়ে দাঁড়াবে।

পরিভ্রমণ দ্বারা শিশুর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে এই ধারণাকে ভিত্তি করে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের উপরে হবে শিক্ষাবিদ্‌গণ পরিভ্রমণকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে আসছেন। জন ডিউই ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকেই সামাজিক অভিজ্ঞতাকে বিদ্যালয়ে কার্যকরী করবার জন্য প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন যে শিশুর পক্ষে তখনই খুব অপচয় দেখা যায় যখন শিশু তাহার বিদ্যালয়ের বাহিরের অভিজ্ঞতাকে বিদ্যালয়ে কার্যে পরিণত করতে পারে না, পক্ষান্তরে সে বিদ্যালয়ে যাহা কিছু শেখে তাহাও সে জীবনে প্রয়োগ করতে পারে না।

ডিউই ছাড়াও শিশুর বিদ্যালয়ের জীবনের বহির্ভূত জীবনের সম্পর্কে আরও অন্যান্য শিক্ষাবিদ্ তিন খৃষ্টাব্দী থেকে দেখে বলেছেন যে শিশুর সামাজিক পরিবেশ থেকে সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক শিশু তার স্বকীয় সামাজিক পরিবেশের সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবে। দ্বিতীয়ত, সে সমাজের সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে ভাল মন্দ ইত্যাদি বিচার করে গ্রহণ ও বর্জন করতে শিক্ষা করবে। বলা বাহুল্য শিশুকে যদি সমাজের সমস্যার সঙ্গে জড়িত করে দেওয়া যায়, তাহলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি শিশুমনে চিন্তার খোরাক জোটাবে, যথা—সমাজ ও স্বাস্থ্যরক্ষা, সমাজ ও জীবন, সমাজ ও আমাদের স্বাবর অস্থাবর সম্পত্তি; সমাজের উৎপাদনশক্তি, সমাজ ও অন্যান্য প্রাণীজগৎ, ইত্যাদি। এই সমস্ত সমাজ সম্পর্কিত সমস্যা শিশুমনে উদয়ের ব্যবস্থা করা যায়, যদি বিদ্যালয়ের পরিভ্রমণগুলি সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠন করা যায়।

বিদ্যালয়ের পরিভ্রমণ সম্পর্কে পরিবেশের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করায় কেহ যেন মনে না করেন শিশুর নিকটস্থ পরিবেশই শিক্ষাব্যাপারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের পরিভ্রমণের ক্ষেত্র শিশুর স্তরভেদে পৃথক হবে। পরিভ্রমণের মূল কথা হচ্ছে, শিশু শ্রেণীকক্ষে তার পুস্তকে যা কিছু পড়বে, সেই সমস্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা শিশুর নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে।

পরিভ্রমণের গুরুত্বকে আরও বেশী স্বীকার করে নিতে হচ্ছে এইজন্য যে পরিভ্রমণ শিশুর প্রয়োজন এবং আগ্রহ এই দুই অবস্থাতেই যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছে। সমস্ত সাধারণ-পর্যায়ভুক্ত শিশুই নানা কাজে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে থাকে। শিক্ষা ব্যাপারে এই আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই শিশু ও তার পরিবেশকে সম্পর্কের প্রতি ক্রিয়াশীল করে অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষাগ্রহণে শিশুকে সাহায্য করে। সাধারণত শ্রেণীকক্ষ শিশুর জগৎকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, এই অবস্থায় যদি শিশু তার শ্রেণীকক্ষের বাহিরে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করবার সুবিধা পায় তাহলে শিশুর পক্ষে যে কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জনই সুখকর হবে। প্রকৃতপক্ষে পরিভ্রমণে শিশুর দল তাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেষ্টা করে। সাধারণত সাধারণ-পর্যায়ভুক্ত শিশুর দল কর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং পরিভ্রমণের দ্বারা শিশুরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে নানা কর্ম করতে সুযোগ পেয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ে পরিভ্রমণ একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত হলেও, তার সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রশ্ন

ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। পরিভ্রমণে অনুমতি দান করা কিংবা সে বিষয়ে বন্দোবস্ত করবার পূর্বে শিক্ষক-শিক্ষিকা ভেবে দেখবেন যে বিশেষ করে ঐ সময়ের জন্য প্রস্তাবিত পরিভ্রমণের প্রয়োজন সত্যি করে আছে কি না। তাছাড়া শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঐ জাতীয় পরিভ্রমণে আছে কি না, পরিভ্রমণের পরিকল্পনা ঐ স্তরের শিশুদের উপযুক্ত হয়েছে কি না, ইত্যাদি অনেক কিছু শিক্ষকের চিন্তা করে দেখতে হবে।

শিক্ষাবিদেরা বলেন যে—শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ ব্যাপারে শিশুদের প্রতি শিক্ষকের তিনটি দায়িত্ব আছে। প্রথমত শিশুগণ যে সমাজে বাস করে, তার সঙ্গে তাদেরকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন অনুসারে তাদেরকে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোন হতে গড়ে তুলতে হবে এবং তৃতীয়ত প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিত্বকে তার নিজস্ব শক্তি-অনুযায়ী ফুটিয়ে তুলতে হবে। যদি পরিকল্পিত পরিভ্রমণ এই সমস্ত চাহিদাকে মেটাতে পারে, তাহলে পরিভ্রমণের বন্দোবস্ত করতে হবে। আর যদি পরিভ্রমণ দ্বারা এই সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে পরিভ্রমণ বর্জন করতে হবে।

এই প্রশ্নের সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন জড়িত। কখন পরিভ্রমণের বন্দোবস্ত করতে হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে যে যখন শিশুরা পরিভ্রমণে যাবার জন্য উপযুক্ত হয়েছে তখনই তাদের পরিভ্রমণে নিয়ে যেতে হবে। কোন কাজের ইউনিট স্থির করার পর যদি শিশুরা ঐ কাজের ইউনিটেরই কোন একটি অংশ দেখতে চায় তাহলে তখন তাদের পরিভ্রমণে নিয়ে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোন এক শ্রেণীর শিক্ষক হয়তো তাদের বিদ্যালয়ের জন্য একটি পাকা খাবার ঘর তৈরী করবার কথা প্রকাশ করলেন, তখন ছেলেরা ইট কি করে পোড়াতে হয় তা জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করবে। তখন তাদের যেখানে ইট কাটা হচ্ছে সেইখানে পরিভ্রমণে নিয়ে যেতে পারা যায়। কিংবা এক শ্রেণীর শিশুরা যখন বললো যে তারা চিড়িয়াখানার প্রজেক্ট করবে, কিংবা হাওড়া পুলের প্রজেক্ট করবে, তখন তাদের সেই সময় যানে পরিভ্রমণে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া বইয়ে যদি কোন একটি বিষয় পড়ে শিশুরা আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সেই জাতীয় কাজ যেখানে হচ্ছে সেখানে যেতে চায়, তাহলেও সেখানে যেতে পারে। 'দামোদর বাঁধ' চতুর্থ-শ্রেণীর 'কিশলয়ে' পড়ে যদি চতুর্থ-শ্রেণীর শিশুরা বাঁধ দেখতে যেতে চায় তাহলে তারা সেখানে যেতে পারে। অবশ্য পরিভ্রমণের স্থলগুলি খুব বেশী দূরে যদি হয় তাহলে সেখানে নিয়ে যাওয়া শিক্ষকের পক্ষে খুবই মুস্কিল, তার কারণ নানারকম প্রশ্ন তখন তার মনে জড়িত হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে শিশুদের পরিভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশ-দরিদ্র। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের তহবিলে এত টাকা নাই যে সকল শিশুকে বেশ একটু দূরে পয়সা খরচ করে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। অথচ পরিভ্রমণের প্রয়োজনীয়তাও যে খুব বেশী আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় শিক্ষক গ্রামের সমস্ত অভিভাবককে ডেকে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারেন। অভিভাবক-বর্গকে পরিভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলে হয়ত কয়েকজন বড়লোক অভিভাবক নিজেদের বাস্, গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি দিয়ে শিশুদের সাহায্য করতে পারবেন। প্রস্তাবটা হয়ত অনেক শিক্ষক গ্রহণ করতে পারছেন না। কিন্তু তহবিলের যখন অভাব, তখন তাঁদের হাল ছাড়লেও চলবে না। গ্রামের মধ্যে অনেক সজ্জন ও উৎসাহী অভিভাবক আছেন, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চললে অনেক সময় অনেক কাজে তাঁদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পরিভ্রমণের পরিকল্পনা হবে সহযোগিতামূলক। শিক্ষক যদি শিশুদের নিয়ে পরিভ্রমণে যাবার ব্যবস্থা করেন, তবে প্রত্যেক শিশুর অভিভাবকের কাছ থেকে শিক্ষক অনুমতি চেয়ে নেবেন। শিক্ষকের যেমন নানা ভাবে পরিকল্পনা করবার কাজ আছে, সেইরূপ শিশুদেরও এই পরিকল্পনায় দায়িত্ব আছে। তারা পরিভ্রমণে গেলে কিভাবে সেখানে যাবে, কি কি খাবার জিনিস সাথে নিয়ে যাবে, পথে তারা কিভাবে চলবে, কিভাবে অন্যের সাথে ব্যবহার করবে, কি ভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করবে, ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিচার করে—তারাই শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে-তাদের পক্ষ থেকে পরিভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। পরিভ্রমণের কেন্দ্র যদি নিকটে হয় তবে যে বয়সের শিশুরা পরিভ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে তারাই শুধু যাবে। আর যদি পরিভ্রমণের কেন্দ্র দূরে হয় এবং কোন কোন সময় অভিভাবকের সুবিধার জন্য যদি যানবাহনের যোগাড় করা যায় এবং সমগ্র বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে যাওয়ার স্থান যদি যানবাহনাদিতে থাকে তাহলে সকল শিশুদেরই নিয়ে যাওয়া উচিত হবে। তবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক থাকবেন। তাঁরা স্ব স্ব শ্রেণী পরিচালনা করবেন এবং শিশুদের বয়স অনুযায়ী আগ্রহের কেন্দ্র স্থির করে শিশুদিগকে সেইভাবে অভিজ্ঞতা দানে করতে চেষ্টা করবেন।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। সিঙ্গেল কলামের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি

শ্রীপবিত্রকুমার চক্রবর্তী

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে আজ আর কাহারও দ্বিমত নাই এবং অনেকদিন ধরিয়াই নানাদিক্ হইতে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। পুথিসর্ব্বস্ব এই শিক্ষাব্যবস্থাতে ছাত্রগণের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ থাকে না; তাই পর্বতপ্রমাণ মুখস্থ করিয়া ও লিখা লিখা কাগজ লিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া ছেলে-মেয়েরা যখন বাহির হইয়া আসে, তখন জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহারা আর নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না। বহুদিন হইতেই এইজন্য শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কর্মসংযুক্তির কথা নানাজনে নানাভাবে বলিয়া আসিতেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজের ব্যবস্থাও দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু এই সমস্ত কাজ এতদিন পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত বিষয় ছিল বলিয়া এবং পরীক্ষাপাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইত না বলিয়া, শিক্ষক ও ছাত্রগণের কাছে কোন গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। আজকাল বহুমুখী বিদ্যালয়ে এবং পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়ে কৃষিকে ঐচ্ছিক বিষয় রূপে গ্রহণ করিবার কথা শোনা যাইতেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই কর্মমাধ্যমে শিক্ষার সূত্রটি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে নিত্য কাজ প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষিবিভাগ সংগঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বর্তমান ব্যবস্থায় অষ্টমশ্রেণী হইতে কৃষিকর্ম আরম্ভ করিবার কথা। ইহাতে অসুবিধা এই যে, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষিকাজ করিয়া আসিবার পর ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে করণীয় কিছু পাইবে না। সুতরাং এই দুই বৎসরের জন্য তাহাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। অন্তত তাহারা উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের কাজে সাহায্য করিতে ও পর্যবেক্ষণের ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারে। আবার, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ব্যবস্থা থাকিলে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে নবম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হইতে হইবে। এ সম্বন্ধেও দুই বিদ্যালয়ের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

জমি :—পল্লী অঞ্চলে জমি সংগ্রহকরা খুব কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার হইবে বলিয়া মনে হয় না। উচ্চ-শ্রেণীর প্রতি ৩০-৪০ জনের জন্য এক বিঘা করিয়া ভাঙ্গা জমি, ও এক বিঘা করিয়া খানী জমির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ইহা ছাড়া স্থায়ী ফলের গাছের জন্য দুই বিঘা জমি থাকিলে ভাল হয়। মোটামুটি প্রতি বিদ্যালয়ে দশ বিঘা জমি—দুই বিঘা ভাঙ্গা ও চার বিঘা খানী জমি থাকিলেই যথেষ্ট, যদিও জমির পরিমাণ ছাত্র-সংখ্যার উপর নির্ভর করিবে।

ফসল :—ধানের ও ফলের জমিতে সকলে সমবেত ভাবে কাজ করিবে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজগুলি উচ্চশ্রেণীর ছেলেদেরই করিতে হইবে। অবশিষ্ট জমি শ্রেণিগত ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে, এবং একই শ্রেণী এক জমিতে বারবার তিন বা চার বৎসর পর্যন্ত কাজ করিবে। ইহাতে সুবিধা হইবে এই যে, শস্যপর্যায় ও সময়ের প্রভাব সম্বন্ধে ছাত্রগণের একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

প্রথম বৎসরে ছাত্রগণ চাষের অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়াগুলি করিবে। তাহারা বর্ষাতি ফসলের মধ্যে শণ, তুলা, ঝুমড়ো, সুঁই, ঢেঁকস ও বেগুন এবং শীতের ফসলের মধ্যে মটর, মূলা, পালং, পিঁয়াজ ও

টম্যাটো উৎপাদন করিতে পারে। প্রতি ফসলের জন্য নির্দিষ্ট জমি আইল দ্বারা চিহ্নিত থাকিবে, এবং উহার নম্বর ছাত্রগণের নিকট থাকিবে। তাহারা প্রতিদিনের কাজের হিসাব ও পর্যবেক্ষণের ফল খাতাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে তাহারা শিক্ষক মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া যাহা কিছু সমস্যা তাহা সমাধান করিয়া লইবে ও ভাবী কাজের নির্দেশ লইবে।

দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা চিনে বাদাম, আম, আউস ধান, তুলা, তিল ও স্থানীয় প্রকৃতি বর্ষাতি ফসল উৎপাদন করিতে পারে, এবং শীতের ফসলের মধ্যে আলু, কপি, বীট, গাজর, লিম, পটল প্রভৃতি উৎপাদন করিতে পারে। পূর্ব্ববর্তী বৎসরের জমিগুলিতেই নতুন বৎসরে ফসল লাগাইবে এবং ইহা শস্যপর্যায়ে সূত্র ধরিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

তৃতীয় ও সম্ভব হইলে চতুর্থ বৎসরে ছাত্রগণ ফসল উৎপাদন ব্যতীত আরও কতকগুলি কাজ করিবে এবং ফসল উৎপাদনের ব্যাপারেও তাহারা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করিবে,—যেমন বিভিন্ন জাত, সার ও চাষের আধিক্য লইয়া পরীক্ষা। এতদ্ব্যতীত তাহারা চারা তোলা, সার তৈরী করা (সবুজ সার প্রয়োগ, কম্পোষ্ট প্রভৃতি), বলম, গুটি প্রভৃতি তৈরী করা ইত্যাদি এবং সম্ভব হইলে হাঁস মুর্গী পালন করিবে। ইহা ছাড়া তাহারা শস্যসংরক্ষণ সম্বন্ধেও কিছু কিছু কাজ করিবে।

জমি :—ফসলের জন্য প্রায় দুই বিঘা জমি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ইহার মধ্যে কাঠা খানেক জমিতে ভাল জাতের অধিক ফলপ্রদ কলা লাগাইয়া দেওয়া সমীচীন। অধিক পরিমাণ পেঁপে চাষের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা ছাড়া পেয়ারা, আতা, লেবু এবং কয়েকটি নারকেল চারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লাগানো দরকার। ফলের বাগানে প্রত্যেক শ্রেণীর ছেলেরাই সাধ্যানুযায়ী কাজ করিবে। পেয়ারা, লেবু প্রভৃতির কলম ও গুটী তৈরী করাও ছেলেরা শিখিবে। লেবু এবং পেয়ারা বাগানটি তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া লইতে পারিলে ঐ গণ্ডীর মধ্যেই মুর্গী পালন করা যায় আর বিদ্যালয়ে পুকুর থাকিলে হাঁস পালনেও অসুবিধা হইবে না। বিদ্যালয়ের জমিতে উৎপন্ন ফসল হইতেই উহাদের খোরাক সংগৃহীত হইতে পারে।

অপাতি :—বিদ্যালয়ে ফলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। গ্রাম হইতে চারা কিনিয়া লইলেই সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে। তবে উন্নত ধরণের একাধিক নারকেল বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে এবং ছাত্রগণ স্থানীয় ও উন্নত ধরণের নারকেলের তুলনামূলক বিচার করিবে।

কোদাল, নিড়ানি, কাস্তে প্রভৃতি প্রচলিত হাতিয়ার ছাড়াও কিছু কিছু শ্রমলাঘবকারী উন্নত ধরণের হাতিয়ার থাকা প্রয়োজন। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে এই সব হাতিয়ারের ব্যবহার শিখিয়া গেলে উত্তর জীবনে সংসারক্ষেত্রে তাহাদের কাজে লাগাইতে পারিবে। খর্ক, রেক (নারিকেল) প্রভৃতি যন্ত্র এই পর্যায়ের। ইহা ছাড়া লাইনে বীজ ফেলিবার জন্য সীড ড্রিল, লাইন ধরিয়া জমি নিড়াইবার জন্য হ্যাণ্ডহো প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহারও তাহাদের জানা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা শুধু গতানুগতিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হইলে চলিবে না আধুনিক সাধ্যায়ত্ত ভাবে যন্ত্রীকরণের চেষ্টা করাও উচিত হইবে না। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা করিয়া উত্তর জীবনে যাহাতে নিপুণ কৃষক হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া-ই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

কীটঘ্ন ঔষধ ছড়াইবার জন্য ডাষ্টার, স্প্রে প্রভৃতি যন্ত্র না কিনিয়া কৃষি দপ্তরের সহযোগিতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতে পারিলে ভাল হয়। জল সেচের জন্য খামারের মধ্যে নলকূপ বসাইতে হইবে অথবা পুকুর কাটিতে হইবে। পুকুর হইতে জল তুলিবার জন্য পাম্প কিনিবার প্রয়োজন নাই।

আজকাল ভাড়া করা লাঙ্গল সংগ্রহ করা কঠিন নহে।

সিলেবাস :—প্রচলিত সিলেবাসটি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া কৃষিবিজ্ঞানকে যদি তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে আশঙ্কা হয়, ছাত্রগণ কিছুই শিখিয়া যাইতে পারিবে না—তাহারা শুধু পরীক্ষাই পাস করিবে। যে সমস্ত ছাত্র কৃষিবিজ্ঞানকে পঠিতব্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিবে তাহাদের জন্য সিলেবাস একটু ভিন্নতর রকমের করা দরকার। মাতৃভাষা ও ইংরেজী সম্বন্ধে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। ভূগোল বিজ্ঞান ও অঙ্কে কৃষিবিজ্ঞানের পরিপূরক বিষয় রূপে আরও অধিক মর্যাদা দিয়া নতুন করিয়া চালিয়া সাজিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি কার্যকে অনুসরণ করিয়া এই বিষয়গুলির নববিন্যাস করিতে পারিলে ভাল হয় এবং উহা করিতে গিয়া কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্জনের প্রয়োজন দেখা দিলে তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে করাই উচিত হইবে। কৃষি—শাখার জন্য ইতিহাস সংক্ষিপ্তসার করিয়া সংকলন একেবারে বাদ দিতে পারিলেই ভাল হয়। যাহাই হউক, সিলেবাস সম্বন্ধে ভাবিবার ও করিবার অনেক কিছুই আছে।

শিক্ষক :—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। কারণ যাহারা কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী তাহারা সাধারণত শিক্ষকতায় শিক্ষা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ব্যাপকভাবে আলোচনার ইচ্ছা আছে। আরম্ভ হিসাবে বিদ্যালয়ে একজন করিয়া কৃষি গ্র্যাজুয়েট নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তিনি কৃষিবর্গ ব্যতীত উদ্ভিদ্ বিদ্যাও পড়াইতে পারিবেন এবং নীচের শ্রেণীতে বিজ্ঞানও পড়াইতে পারিবেন। তবে কৃষিগ্র্যাজুয়েট অধিক বেতন আশা করিতে পারে না। প্রয়োজন হইলে তাহাই দিতে হইবে।

শিক্ষক ব্যতীত সর্বদা খামার দেখিবার জন্য একটি মালীও নিযুক্ত করিতে হইবে। গ্রামের অভিজ্ঞ চাষীদের একজনকে এই পদে নিযুক্ত করিতে পারিলে ভাল হয়।

বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা প্রধানত কাজের ভিতর দিয়া হইবে। কাজ করিতে করিতে এবং কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ছাত্রেরা মূলগত তত্ত্ব আহরণ করিবে। বাহিরে অথবা যেমন কাজ হইবে তেমনি ঘরে বসিয়াও কিছু কিছু পরীক্ষা করিতে হইবে। রসায়ন বিদ্যা ও উদ্ভিদ্ বিদ্যায় অনেক পরীক্ষাই ঘরে বসিয়া করা চলে। ইহা ছাড়া মৃত্তিকা বিশ্লেষণের কাজও তাহারা করিবে। কৃষি শিক্ষাও যাহাতে কাগজে কলমে হইয়া না দাঁড়ায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান প্রবন্ধে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা প্রবর্তনের গোড়ার কথা লইয়া কিছু আলোচনা করিলাম। সময় এবং সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতে ইহা

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাসংস্কার। শ্রীজনার্দ্দন সাহু প্রণীত। সন ১৩৫৪ সাল।

"বৃদ্ধ শিক্ষক ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য" জনার্দ্দন বাবু বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দুঃসংবোধ করিয়া যে ভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও প্রতিকারের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শিক্ষানুরাগী পাঠক উপকৃত হইবেন। পুস্তিকায় আয়তন সামান্য ৬১ পৃষ্ঠা মাত্র, মুদ্রাকার্য্যের প্রমাদ সামান্য নহে, কিন্তু ইহার বক্তব্যের ও প্রকাশভঙ্গীর গুরুত্ব আছে।

শিক্ষাও গঠনমূলক কার্য; অন্য গঠনমূলক কার্য্যে শিক্ষার্থীরা যদি যোগ দেন তবে তাঁহাদের শিক্ষার উন্নতি হইবে। একথা বড়ই সত্য যে "এখনও বিভিন্ন রাজনৈতিকদল স্বার্থসিদ্ধির আশায় ছাত্রসমাজের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহাদের ছাত্রছাত্রীদিগকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।"

কিন্তু গঠন কার্য্যের জন্য চাই প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিমাণে ভূমির ব্যবস্থা। লেখকের বক্তব্য এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে কলেজ পর্য্যন্ত ৬ একর হইতে ৬০ একর জমির আবশ্যকতা আছে, সেখানে কৃষি, গোপালন শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। অবশ্যই এ প্রস্তাব সাধু।

লেখক যেখানে বলিতেছেন, "ইংরাজ উচ্ছেদ সিদ্ধির জন্য বেয়ানী গড়িতে অন্ন পরিসর স্থানে স্কুল কলেজ গড়িয়াছিল" তাহা সত্য নহে, কারণ ইংরাজ নিজেরা মিশনারীদের তরফ হইতেই হউক আর সরকার হইতেই হউক, যে সব বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় খুলিয়াছিল, সর্ব্বত্রই কৃষির জন্য না হইলেও খেলাধূলার জন্য যথেষ্ট জমি রাখিয়াছিল।

লেখক সমুদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন। আমরা ইহা বিশ্বাস করি যে জাতীয় সরকারের কর্ম্মপন্থা সোচ্চার্যমান হইলে জাতির ক্ষতি; কিন্তু সমাজকেও যে অগ্রসর হইতে হইবে; সমাজহিতৈষী শিক্ষক বা প্রচারকের তাই আজ এসব বিষয়ে প্রচার করার নিতান্ত প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের যে ব্যবস্থা জনার্দ্দনবাবু করিতে চাহিতেছেন, তাহা কিন্তু সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না। এজন্যের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতিকেই বা কেন চাই? তাহার চেয়ে সরকার পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিন, প্রকাশকেরা পুস্তক লেখান, শিক্ষক গ্রহণ করুন, তাহাই বরং ভাল।

লেখকের আর একটা কথার প্রতিবাদ করিতে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ "গরীবের পুরী খাইবার জন্য যখন ছানা চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন"—হিন্দুর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা কি করিয়া পোষণ করা সম্ভব?

লেখক তাঁহার পুস্তিকার ৫৮ পৃঃ লিখিয়াছেন, "অন্ততঃ মেদিনীপুর জেলার কোন বুনিয়াদী স্কুল এ পর্য্যন্ত প্রকৃত গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করে নাই।" এভাবে "ঝাঁটাইয়া" (sweeping) কোনও কথা বলা চলে না। হরিজন-সেবক-সংঘের সাহায্যে চলিতেছে এমন একটি বিদ্যালয়ের কথা বলি। তমলুকের অন্তর্গত সুতাহাটা থানার নিকট ভিহি শিবরামনগরে একটি নিম্ন বুনিয়াদী পাঠশালা আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মোটামুটি ভালভাবেই চলিতেছে।

ছাত্রসমাজের নিকট লেখকের বিশেষ আবেদন মর্ম্মস্পর্শী। আশা করি ইহা একেবারে ব্যর্থ হইবে না।

প্রত্যেক শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগারে এই বইগুলি সম্পদ বৃদ্ধি করিবেই

1. Central Banking in Undeveloped Money Market—S. N. Sen

2. Stock Exchanges in India —Dr. K. L. Garg

3. Recent Industrial Problems— Prof. U. P. Varma

4. The Abroginal Races in India—Dr. S. S. Sirker

5. Reconciliation in Indian and the status of the Indians under International Law— Dr. Junkerstorff

6. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা
—শ্রীভূদেব চৌধুরী

7. জগদানন্দের পদাবলী
—অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর
সম্পাদিত

8. বাংলা উচ্চারণ কোষ
—অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর
সম্পাদিত

9. শরৎচন্দ্রের পদাবলী
—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

10. বিপ্লবী যুগের কথা
—শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদিত

11. কস্তুরবা গান্ধী
—শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়

12 বুদ্ধচরিত
—ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড্
প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা
১, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১২শ বর্ষ | কার্তিক ১৩৬১ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

দ্বাদশবর্ষ উদ্‌যাপন

বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এবং নিজেদের নানাপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমরা কার্তিক সংখ্যায় শিক্ষার দ্বাদশবর্ষ সমাপ্ত হইল, একথা বলিতে পারিতেছি। শিক্ষা পরিচালনে যাঁহাদের সহানুভূতি পাইয়াছি তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এক সময় ভাবিয়াছিলাম, দ্বাদশ বার্ষিকী ব্রত উদ্‌যাপন হইল, 'শিক্ষা' ছাড়িয়াও দিতে পারি। আজ মনে হইতেছে, 'শিক্ষা' এখনও চালাইবার প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এই সম্পর্কে নানা সমস্যার আলোচনা করা; কবিতাহীন কাহিনীহীন এই পত্রিকায় সমস্যাই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লেখক সৃষ্টি করা; নূতন লেখক দুই চারিজন পাইয়াছি, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু শুধু নিজেদের মতের কথা নয়, অন্য সকলের, অর্থাৎ পাঠক পাঠিকাদেরও সমালোচনা চাই, লেখকদেরও বলি, তাঁহারা অতীতের আলোকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের পথ চলার পরামর্শ দিন।

শিক্ষক-বিয়োগ

দুইজন বিশিষ্ট শিক্ষকের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার সুবিমল চন্দ্র সরকার, প্রেসিডেন্সী কলেজের সুপরিচিত অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অগ্রজ ছিলেন। সুবিমল বাবু শিক্ষাবিজ্ঞানে কৃতবিদ্য ছিলেন, এবং শান্ত ও নম্র স্বভাবের ছিলেন। পাটনায় তিনি বহুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তমলুক মিত্র ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার লিখিত গণিত শাস্ত্রের পুস্তক পড়িয়া বহু ছাত্র ছাত্রী গণিত শিখিয়াছে। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়স্বজন সহকর্মী ও ছাত্র সমাজ শোকসন্তপ্ত হইয়াছে। এই এ উভয়কেই আজ স্মরণ করি।

অধ্যাপক জীবনানন্দ দাস কবিতার জন্যই সুপরিচিত; কিন্তু তিনি শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এক শোচনীয় ট্রামদুর্ঘটনায় আহত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত

হইয়াছেন। তাঁহার কথাও আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি

বর্তমান জেলা স্কুল বোর্ডের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত বিমল সুধার ভট্টাচার্যকে শিক্ষা'র পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানাই। বিমলবাবু গঠন-কর্মী এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার নিষ্ঠা ও অধিকার সর্ববাদীসম্মত। বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত তাঁহার যোগ ঘনিষ্ঠ, এবং আমাদের এই সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার বিস্তর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করি। গত ১৪ই অক্টোবর এক বিশেষ সভায় তিনি বর্তমান স্কুল বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি।

ছাত্রদের পরিভ্রমণ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত বৎসর মাথা পিছু ৩৲, পঁয়ত্রিশ টাকা লইয়া ৫০০ ছাত্র ছাত্রীর পরিভ্রমণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দামোদরপুরের কারখানা, সিন্ধ্রির রাসায়নিক সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা, চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা ইত্যাদি দেখার ব্যবস্থা হইল। একবারে অনধিক পঞ্চাশ জনে পরিভ্রমণ করিতে পারিত। শোনা যাইতেছে এবারও অনুরূপ নীতি চলিবে। আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা দেশের কর্ম ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে যতই পরিচিত হইবে ততই মঙ্গল। দৃষ্টির প্রসারই শিক্ষা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষকে এজন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্প অধিকারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আমরা আশা করি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

বাস্তহারা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

বাস্তহারা প্রাথমিক শিক্ষকেরা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষকদের সহিত যোগ না দিয়া পৃথক্ সমিতি গঠন করিয়াছেন, কারণ বহুদিন উদ্বাস্তু থাকিতেছেন ততদিন তাঁহাদের সমস্যা পৃথক্। গত ২৭ অক্টোবর তাঁহাদের সমিতির এগারো জন প্রধান সভ্য মহাকরণভবনে উদ্বাস্তু মন্ত্রীর সহিত দেখা করেন; অধ্যাপক বিমল বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দেব তাঁহার অসুস্থতার জন্য আসিতে না পারিলেও সমিতির দাবীগুলির প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমিতির দাবী সবগুলিই মানিয়া লইতে না পারিলেও প্রতি-নিধি শিক্ষকেরা মন্ত্রীর সহানুভূতিশীল মনোভাবে প্রীত হন। শ্রীযুক্তা রায়ও সহযোগিতামূলক 'সংগ্রাম'কে অভিনন্দন জানান; ধর্মঘটের দ্বারা নয়, পরস্পর আলোচনার দ্বারাই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পরীক্ষা

[শ্রীবকুলবালা সেন]

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে যত প্রকার মতবাদ শোনা যায়, তাহার অধিকাংশই এককালীন সমগ্র পাঠ্যাংশের পরীক্ষা লওয়ার সমালোচনা। এ ব্যবস্থায় সমস্ত বৎসর ফাঁকি দিয়া পরীক্ষার পূর্বে অতিরিক্ত পরিশ্রমে যাহা যাহা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখিবার দিকেই অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী ঝুঁকিয়া পড়ে। তাহার ফলে বিদ্যালয়ের সত্যকারে যাওয়া যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও যথেষ্ট থাকে।

কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাপ্তাহিক বা দৈনিক পরীক্ষার রীতি সমর্থন করেন। অর্থাৎ প্রতিদিনের বা প্রতি সপ্তাহের অধীত অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান বিচার করিয়া যে নম্বর দেওয়া হইবে, বৎসরের শেষে তাহারই গড় করিয়া ছাত্র ছাত্রীদের বাৎসরিক নম্বর নির্ধারণ ও যোগ্যতা বিচার করা হইবে। সাধারণতঃ আমাদের বিদ্যালয় সমূহে যে সাপ্তাহিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রত্যেক মাসে প্রতি বিষয়ের পরীক্ষা একবার করিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ইহা দিনের হিসাবে সাপ্তাহিক পরীক্ষা হইলেও বিষয় হিসাবে মাসিক পরীক্ষা।

এইরূপ মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি এককালীন বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি হইতে যে অধিক উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৎসরের শেষে মাসিক পরীক্ষার মতই বিনা আড়ম্বরে সমগ্র পাঠ্যাংশের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া সমাপ্তির রেখা টানা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইলে মাসিক পরীক্ষাগ্রহণ রীতির সংশোধন করা প্রয়োজন। নতুবা উদ্দেশ্য পণ্ড হইবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকিবে।

মাসিক পরীক্ষাগুলিতে সাধারণতঃ বার্ষিক পরীক্ষার মত সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। ফলে পাশাপাশি বা তাহাদিগের সমপাঠী ছাত্রছাত্রী পাশাপাশি বা আগাপাছি করিয়া বসিয়া উত্তর লেখে। পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশুদ্ধ উত্তর সঙ্গে লইয়া তাহাদের হাতের কাছেই সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। পরস্পরের খাতা দেখিবার সুযোগ থাকে মাত্র বলিলে ঠিক বলা হয় না, বরঞ্চ না দেখিবার দিকে বিশেষ সতর্ক না থাকিলে না দেখিবার উপায় থাকে না বলিলেই ঠিক বলা হয়। এইরূপে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর খাতায় লেখা এবং পরীক্ষণীয় বিষয়ের বই অসাধু পন্থা গ্রহণে উৎসুকদের তো বটেই, অনিচ্ছুকদেরও অতর্কিতে উত্তর দানের মাল মসলা জোগাইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ পরীক্ষায় উত্তরপত্রের নম্বর ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের সঠিক মান হিসাবে গ্রহণীয় হইতে পারে না। শুধু তাহাই নয়, উত্তর পত্রে নম্বর দিবার সময় শিক্ষক শিক্ষিকাগণের মধ্যেও নানারূপ ভাবের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ প্রশ্নপত্র রচনায় সমগ্র মাসের অধীত বিষয়ের সামগ্রিকতার দিকে লক্ষ্য রাখা অনেক সময়ই হয় না। ছাত্র ছাত্রীদের আবৃত্তির অনুযায়ী কোন কোন অংশে বাদ পড়ে। তা ছাড়া পরীক্ষার ফল শিক্ষক শিক্ষিকাগণের শিক্ষাদানে যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া ছাত্র ছাত্রীদের অধিকাংশ যে সকল প্রশ্নের উত্তর

অনায়াসে দিতে পারিবে বলিয়া জানা আছে, প্রশ্নপত্রে তাহারই সমাবেশ সাধারণত ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ বিষয়ানুসারে এবং শ্রেণীগত মান অনুসারে না হইয়া ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমতানুযায়ী প্রশ্নপত্র রচিত হইয়া থাকে। আদর্শের দিক দিয়া দেখিতে গেলে পরীক্ষণীয় বিষয় ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশের সাধ্যানুযায়ী হওয়া উচিত বটে; কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রায় প্রতি শ্রেণীতেই সেই শ্রেণীতে শিক্ষালাভের অনুপযুক্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাই থাকে বেশী। সুতরাং এরূপ পরীক্ষা গ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষার পরিচয় লওয়ার ব্যবস্থা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রেণীগত মানানুযায়ী শিক্ষার পরিচয় মেলে না। সুতরাং এই পরীক্ষার নম্বরের উপর ভিত্তি করিয়া উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থা করিলে শ্রেণীগত মান রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। শুধু তাহাই নয়, মাসিক পরীক্ষায় আরও যে সব গলদ থাকিতে পারে, তাহাও উপেক্ষা করিবার মত নয়। মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতিতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর পরীক্ষার খাতা দেখিবার পাট থাকে। শ্রেণীর কাজ ও বাড়ির কাজের খাতা তো তন্নতন্ন বোঝা—সাকের আঁটি নয়। একাধিক শ্রেণীর কাজ, বাড়ির কাজ ও পরীক্ষার খাতা—যদি যোগ্য নম্বর ও মনোযোগ দিয়া দেখিতে হয়—শুধু তাহাই হইলে শ্রেণী পাঠনার জন্য প্রস্তুতির সময় থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং শিক্ষকগণের বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সঙ্গে আর্থিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় একাধিক গৃহশিক্ষকতা থাকা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং উপযুক্ত সময় ও মনোযোগ দিয়া খাতা দেখিবার সময় তো তাঁহাদের থাকেই না, যেমন তেমন করিয়া মোটামুটি ভাবে দেখার সময়ও অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। বিশেষ বিশেষ ছাত্রছাত্রী—যাহারা আপনাদের কৃতিত্বে শিক্ষক শিক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—তাহাদের ঔচিত্যমত খাতা যথাযোগ্য মনোযোগের সহিত দেখিয়া অন্যান্য খাতার নম্বর দিবার বেলা উত্তরপত্রের মূল্য ঠিকমত যাচাই করা হয়, একথা বলিলে অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা কথনের দোষ এড়ানো যাইবে না বলিয়াই আশঙ্কা হয়। এরূপ অবস্থায় নম্বর দিতে গিয়া শিক্ষক শিক্ষিকাগণ তিন প্রকার মনোভাব দ্বারা চালিত হন। প্রথমত যদি মাছ না ছুঁই পানি গোছ—অধিকাংশকে পাশের কোঠায় ফেলিলে সব দিক রক্ষা হয়। কারণ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হইলে তাহা শিক্ষকের অকর্মণ্যতার প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। ফেলের কোঠায় যাহাদের ফেলা হইবে, তাহাদের নম্বরও পাশের কোঠার কাছাকাছি রাখিয়া দিলে পাশ এবং ফেলের নম্বরে বেশী পার্থক্য থাকিবে না। সুতরাং কোন অভিভাবক বা বিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ খাতা পরিদর্শন করিলেও এ ফাঁকি সহজে ধরা পড়ে না। কারণ দু-একটি বিষয় বাদে অন্যান্য বিষয়ের নম্বরে নম্বরদাতাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী কিছু বেশী বা কম হওয়ার পর স্বাভাবিক নিয়মেই খোলা থাকে। সুতরাং সেদিক দিয়া ধরা পড়িবার কোন ভয় নাই। তা ছাড়া, বিশেষ ভাবে জানা, বিশেষ বিশেষ ছাত্রছাত্রী বাদে আর কাহাকেও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বেশি নম্বর কিছুতেই দেওয়া চলে না। কারণ হৈবাৎ খাতা কাহারও নজরে পড়িলে নম্বরের যোগ্য লেখা যদি তাহাতে না পাওয়া যায়, তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের আর কোন পথ খোলা থাকে না। কিন্তু ভাল লেখা সত্ত্বেও নম্বর কম থাকিলে অনায়াসে বলা চলে যে আমার শিক্ষাদানের মান উঁচু, এজাতীয় লেখায় আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এরূপ লেখাতেই যদি বেশি নম্বর দেওয়া যায়, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি শিখিবার চেষ্টা করিবে না। সুতরাং সৌভাগ্যবশত একবার যে সকল ছাত্রছাত্রী আপনাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া

শিক্ষক শিক্ষিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা বাদে অন্যান্যের মধ্যে যদি কেউ আপনার প্রচেষ্টায় অথবা স্বাভাবিক শক্তি স্ফুটনের পথ ধরিয়া মার্কামারা ভাল ছাত্রছাত্রীদের সমকক্ষ অথবা তাহাদের অপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের অধিকারী হইয়া থাকে—নম্বরের অঙ্কে তাহার পরিচয় থাকা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না, কারণ বহুর সঙ্গে বহুর অংশরূপে তাহারা বৈশিষ্ট্যহীনের পর্যায়ে পড়িয়া আছে। তাহাদের এ পরিবর্তন আবিষ্কার করিবে কে? আবার যাহারা বহু হইতে পৃথক বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, চিহ্নিত হইয়া যাওয়ার প্রায় নির্ধারিত ফল স্বরূপ তাহাদের মধ্যে অনেকের শিক্ষনীয় বিষয়ে বহু করিয়া যাইতে দেখা যায়। যদিও তাহাদের উত্তর-পত্র যোগ্য সময় ও মনোযোগ দিয়া দেখা হইয়া থাকে এবং তাহাদের এই অবনতি শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না, তবুও নম্বরের অঙ্কে পূর্বাপর সামঞ্জস্য না রাখিলে চলে না। কারণ মার্কামারা ভাল ছাত্রছাত্রী যদি ভাল নম্বর পাইবার যোগ্য উত্তর লিখিতে না পারে, তাহা শিক্ষকের অকৃতকার্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে নম্বরের অঙ্কে পূর্বাপর বেশী পার্থক্য সৃষ্টি না করার দিকেই শিক্ষকের মন ঝুঁকিয়া পড়ে। ফলে উত্তর পত্রের নম্বর ছাত্রছাত্রীর বিষয়জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ রূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা হারায়।

সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বরের সমষ্টিকেই যদি, বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরের মুখ্য অংশরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তবে সাপ্তাহিক পরীক্ষারও বার্ষিক পরীক্ষার ন্যায় সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। পরীক্ষা-গ্রহণ প্রীতিতেই শুধু নয়, প্রশ্নপত্র রচনাতেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন পত্র রচনার সময় অধীত বিষয়ের সমগ্র অংশ এবং শ্রেণীগত মান চেতনায় জাগ্রত না রাখিলে সেরূপ পরীক্ষাগ্রহণকে শিক্ষক ও ছাত্রের সময় ও শ্রমের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। তা ছাড়া শিক্ষকগণ যাহাতে উত্তর পত্রে যথাযোগ্য সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের কাজের ভার লঘু করাও প্রয়োজন। আরও একটি দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনীয়। সাধারণত সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণের দিন কয়েক আগে পরীক্ষণীয় বিষয় ও পরীক্ষা গ্রহণের দিনের কথা ছাত্র ছাত্রীগণকে জানাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে এ জাতীয় পরীক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন ঘটে। প্রথমত যাহারা নৈমিত্তিক পাঠাভ্যাসে শিথিলতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহারা তাহাদের সে অভ্যাস দূর করার আবশ্যকতা বোধ করে না। যেদিন পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ জানিতে পারে, সেইদিন হইতে তাহারা অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়া শুধু পরীক্ষণীয় বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়া থাকে। তাহার ফলে সে কয়েকটি দিন অন্যান্য বিষয় সম্পূর্ণ-রূপেই উপেক্ষিত হয়। শ্রেণীতে শিক্ষক শিক্ষিকা-গণ নিয়মানুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের যথারীতি আলোচনা করিয়া যান বটে, কিন্তু তাহাদের মন থাকে তখন বিষয়ান্তরে। সুতরাং শিক্ষাদানের যোগ্যফল পাওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাৎ শ্রেণীতে বিষয়া-লোচনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অভ্যাসের যে প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাহার অভাব ঘটায় বিষয়টি যথাযথ স্থিতি লাভ করিবার অবকাশ পায় না। সুতরাং সেই সব বিষয়ের আবার যখন পরীক্ষা গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহা ছাত্র ছাত্রীদের সম্মুখে প্রায় নূতনের রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ শ্রেণীতে বিষয়ালোচনার সময়ের আনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, অমনো-যোগী ও অনগ্রসর ছাত্র ছাত্রীগণ পূর্ব হইতে পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ জানিতে পারায় সেদিন যে কোন অজুহাতে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইয়া থাকে। এই সমস্যা নিরসনের একমাত্র পথ, পরীক্ষার পূর্বদিন পর দিনের পরীক্ষার বিষয় জানানো এবং সেইদিন বিশেষ

কেহ অনুপস্থিত হইলে তাহার যথাযোগ্য কারণ দর্শাইয়া অভিভাবকের নিকট হইতে চিঠি আনিতে না পারিলে এরূপ অনুপস্থিতিকে অনুপস্থিতির পর্যায়ে না ফেলিয়া তাহারা পরীক্ষায় মূল নম্বর পাইয়াছে বলিয়া নম্বর বুকে রেকর্ড করা। এরূপ ব্যবস্থা করিলে সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষার কুফল হইতে অনেকটা মুক্ত থাকা যাইতে পারে।

পরীক্ষার তারিখ পূর্বে জানানো হইবে না, ইহা যদি ছাত্র ছাত্রীদের যাবপাঃ একবার বলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিদিনকার পাঠাংশ প্রতিদিন নিয়মিত অভ্যাস করার দিকেই তাহাদের মানসিক প্রবণতা দেখা দিবে এবং অপরাপর বিষয়ের শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া পরীক্ষাগ্রহণ সম্ভব হইতে পারে।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া, সকল দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া যদি সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ইহা প্রহসনে পরিণত হইবে না অথবা শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে না। তখন ইহার ফল ছাত্র ছাত্রীদের অর্জিত বিদ্যার সত্যকার মান হিসাবে গৃহীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে। এরূপ পরীক্ষার ফলের গড় মানাঙ্ক যে একক্ষণীয় বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণকারী লক্ষ মান হইতে অধিক নির্ভরযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন নিঃসন্দেহে ইহা বার্ষিক পরীক্ষাগ্রহণ রীতি হইতে সকল দিক দিয়াই অধিক উপযোগী হইয়া উঠিবে।

নারী শিক্ষা

[বিনোবা]

(২৬-৩৪ পৃষ্ঠা মোড়, কস্তুরবা গ্রাম সেবিকা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ হইতে)

পুরুষ অপেক্ষা নারীর অনেক অধিক গুণ ও শক্তির সুশিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন এই মত প্রায়ই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি। বর্তমানে শুধু ভারতে নয় সারা দুনিয়ায় স্ত্রীজনের কর্মক্ষেত্র অনেকখানি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে নরনারীর কর্মক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিনিষেধ ঘটে, কিন্তু আরও অনেক বিধিনিষেধ পুরুষদিগের কৃত লোকাচার মাত্র। বিশেষতঃ যে সকল মহিলা সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন তাহাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সেই শিক্ষা জীবনযাত্রার প্রকৃতি স্বরূপ হওয়া চাই। বর্তমানের মত উহা সুখান্বেষণ অভিমুখী হইলে ঠিক হইবে না। আমার প্রত্যয় এই যে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এবং বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত মহিলারা শঙ্করাচার্যের মত মহান এবং গুণবান হইয়া সমাজে আবির্ভূত হইবেন এবং তখন তাঁহারা দেশে সত্যকার বিপ্লব সাধন করিতে পারিবেন। হিন্দু সমাজে নারী জাতি সোচনীয়ভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া আছেন। আইনগত এবং সামাজিক অক্ষমতা ছাড়াও স্ত্রীলোকদিগের মর্যাদা এবং সামর্থ্য সম্বন্ধে ধর্মগত কুসংস্কার-জাত আরও কতকগুলি অক্ষমতা আছে। এমন এক যুগ গিয়াছে যখন স্ত্রীলোকদিগের বেদপাঠ করিবার অথবা ব্রহ্মচর্য পালন করিবার অধিকার ছিল না। সমাজে সুপরিচিত ব্যক্তিগণও এই মতাবলম্বী ছিলেন। এইরূপ ধারণা সমাজে প্রচলিত থাকিলে স্ত্রীজাতির

উন্নতি লাভের পথ স্বভাবতই নানা বিঘ্নকণ্টকিত হয়। তখন বিঘ্নাচ্ছিন্ন জীবন ছাড়া তাহার সম্মুখে আর কোন আদর্শ থাকে না। তাহার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা এই বিঘ্নচ্ছিন্ন জীবন লক্ষ্য করিয়া উদ্ভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। স্ত্রীজনেরা স্বাধিকার বলে স্বাধীন জীবনযাপন করিতে পারেন এবং ব্যাপক সামাজিক, রাষ্ট্রীক অথবা আধ্যাত্মিক আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন এরূপ ভাবাই যেন আমরা ধারণাই করিতে পারি না। স্বামী বা পুত্রের মাধ্যমে নারীরা সেবাকার্য করেন তাহা সামান্য এরূপ আমি বলি না। তবে ইহা অবশ্য বিশ্বাস করি যে, স্ত্রীলোকেরা যদি ইচ্ছা করেন তবে স্বাধীন ভাবে সেবাকার্যের উদ্‌যোগ করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। কিন্তু সামাজিক সংস্কারের বশে হিন্দুরা এখনও ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় নাই। অনেক টীকাকার ত এতদূর বলেন যে, পুরুষার্থ শব্দটি হইতেই সুস্পষ্ট হয় যে বীরত্ব এবং সাহসের কাজ কেবল পুরুষদিগেরই যোগ্য, স্ত্রীলোকেরা কেবল পুরুষকে উহাতে সাহায্য করিবেন মাত্র।

এই বিষয়টি গভীর মনঃসংযোগে তলাইয়া তাঁবিয়া দেখা প্রয়োজন। আমি এক্ষণে যতটা বিচার করিতেছি তাহার অধিক স্থান দিতে হইবে।* তবু এইমাত্র বলি, যে-মতবাদের প্রভাবে স্ত্রীলোকদিগকে সমাজে অবনত পর্যায়ে নামাইয়া দেওয়া হয়, সেই মত দ্বারা আত্মার অবমাননা করা হয়, কারণ আত্মা সর্বত্রই সমান; অতএব আধ্যাত্মিক মতে নর ও নারীর মধ্যে কোন অন্যায় ভেদাভেদ থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

নারী শিক্ষার বিষয়বস্তুর কথা বলিতে গেলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল সূত্রগুলি তাহাদিগকে সর্বপ্রথম শিক্ষা দিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে নারীরা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভে ছিলেন। মহাভারতে মাতা তনয় এবং সুলভার কথোপকথনের উপাখ্যান আছে। মহিলা সুলভা ঋষি ও দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি রাজর্ষি জনককে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধে দীক্ষাদান করেন। এই প্রকারের আরও নানা কাহিনী আছে। একালে ভারতবর্ষে নারীদের এতদূর মহান মর্যাদার স্থান ছিল! আজ অবস্থা শোচনীয় ও বিপরীত হইয়াছে। কোন প্রকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রথম প্রয়োজন হইল আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান। আমরা শরীরের শরীর মাত্র নহি। আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র, উহা শরীরের ন্যায় নশ্বর নহে উহা অবিনশ্বর; ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া আমাদের বশে আনিতে হইবে; ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রহিয়াছেন; আমরা যদি যথার্থভাবে প্রয়াস করি তবে এই জীবনকালেই আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে পারি; সকল জীবই আত্মার বিভিন্ন রূপ, অতএব সকল জীবের প্রতি আমরা একান্ত এবং অবিচল। এই সকল সত্যই মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে। মহিলাদিগকে এই সকল জ্ঞানচর্চার পাশে হইতে হইবে। শিক্ষার ভিত্তিই হইবে আত্মজ্ঞান চর্চা। সত্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা এবং জীবনযাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধন, এই সকল গুণগুলি মেয়েদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিহিত ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিবার উপযোগী সাহস তাহারা সঞ্চয় করিতে পারিবে। যে ব্যক্তির আত্মার অমরত্বে জ্ঞান লাভ হইয়াছে সে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। বিশ্বসুদ্ধ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও সে ভীত হইয়া নত হইবে না। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারাই আমরা আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে পারি, ইহাই আমার দৃঢ়

বিশ্বাস। পুস্তক পাঠে এই জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়। কতকগুলি ভাল বই পাওয়া যায়, গীতা, হইতে উপনিষদ এবং আমাদের আমলে ভাল লেখকদের লেখা অন্তান্ত বই। কিন্তু আমি কেবল পুঁথিগত বিদ্যালাভের কথা বলিতেছি না, ঐ সকল লেখার যে মূল চিন্তা অভিব্যক্ত করিবার প্রয়াস আছে সেই মূল ভাব ও চিন্তাকে অধিগত করিতে হইবে। সেই মূল ভাব আয়ত্ত করিতে পারিলে অপর সব কিছু উহাতে সহজেই যুক্ত করিয়া লওয়া যায়।

মেয়েদের কাজের কথা প্রসঙ্গে আমার মত এই যে, কয়েক প্রকার কাজ মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে রক্ষা করা কর্তব্য। গ্রামবাসীরা যেভাবে পল্লীবাসীদের গৃহশিল্পগুলি হরণ করিয়া লইতেছে সেইভাবে পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের শিল্পগুলি হরণ করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে মাত্র ভোগের বস্তুতে পরিণত করিয়াছে। সমাজের যে অংশকে অভিজাত বা ক্যাসক্রয়ন্ত শ্রেণী বলা হয় সেই শ্রেণীর মধ্যে এই অবস্থা বিশেষভাবে ঘটিয়াছে। ঐ শ্রেণীর মধ্যে মেয়েদের এমন ভাবে রাখা হয় যে তাহারা জীবন্ত মানুষ নহে, প্রাণহীন পুতুলি মাত্র। মেয়েদের কোন দায়দায়িত্বই নাই। তাহাদের জীবন আমোদপ্রমোদের প্রবাহ মাত্র। একথা বলিয়া দিতে হইবে না যে, জীবনযাত্রার প্রতি এরূপ মনোভাব সমাজকে অবনতই করিয়া দিয়া উহার সর্বনাশ সাধন করে।

আশ্রমে যখন এই স্থানে বিদ্যালয়টি ঘুরাইয়া যেখান হইতেছিল তখন বিদ্যালয়ের বয়ন-বিভাগ দেখিতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করি যে কেবল প্রাথমিক বয়ন-শিক্ষার বন্দোবস্ত রাখা হইয়াছে কেন? মেয়েদের উচ্চতর বয়ন-শিক্ষা দেওয়া হইবে না কেন? এমন যুগ ছিল যখন বয়ন-কার্যকে কেবল মেয়েদের জন্য রক্ষিত কাজ বলিয়া স্বীকার করা হইত। বর্তমানে পুরুষেরাই মূল বয়নকার্য করে এবং স্ত্রীলোকেরা কেবল বয়নের আনুষঙ্গিক কতকগুলি কাজ করিয়া থাকে। সেলাই-এর কাজেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। যন্ত্র আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরা মেয়েদের সেলাই-এর কাজ কাড়িয়া লইয়াছে। এইভাবে একের পর এক করিয়া প্রায় সকল কাজই মেয়েদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা আজ যে দাসীবৃত্তির পথে নামিয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, জীবিকা অর্জন করিতে পারে তাহাদের এমন কোন বৃত্তি নাই। তাহারা উন্নত রন্ধন কার্য করিতে পারে, কেবল তাহাই নহে, স্বাস্থ্যপ্রদ অন্নও তাহারা পাক করিতে পারে। তাহাদিগকে স্বাস্থ্য-বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ এই রন্ধন বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। শুচি-শুশ্রূষারীর ব্যাপার করিতেও তাহাদিগকে শিখিতে হইবে। তাহাদিগকে গোপালন করিতেও শিখিতে হইবে।

এই সকল কাজের সহিত মেয়েদের অন্তত একটি ভাষার অর্থাৎ মাতৃভাষার, প্রাদেশিক ভাষার অথবা রাষ্ট্রভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে। এইস্থানে আশ্রমের ক্ষেত্রে হিন্দীভাষাই ঐ তিন স্থানে অতিরিক্ত হইয়া আছে। অতএব হিন্দী ভাষায় আপনাদিগকে বিশেষ নিপুণ হইতে হইবে এবং উহার পরিপূরক রূপে কিছু সংস্কৃত ভাষাও শিখিতে হইবে।

মাত্র দুই বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্রীরা গ্রামবাসীদের মধ্যে গিয়া কিরূপে তাহাদের সেবা করিতে পারিবে তাহা আমি ধরিতে পারি নাই। অল্প শিক্ষা বা কেবল প্রাথমিক শিক্ষালাভ হইলে ত কাজ চলিবে না। শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া অর্থে স্বয়ং চেষ্টা দ্বারা নূতন জ্ঞানলাভে সামর্থ্য অর্জন করাকে আমি বুঝাইতে চাই। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল ছাত্রীরা জ্ঞানার্জন করিতে থাকিবে আমি এইরূপ বলি না। আমি বলি, কোন একটি বিশেষ শিক্ষণধারা শেষ করিয়া, ছাত্রীদের অভিজ্ঞ কর্মীদের কর্মস্থলে

পাঠাইয়া তাহাদের সঙ্গে রাখা উচিত। সেখানে তাহারা কাজ করিবার সুযোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়া লইবার সুযোগ পাইবে। এইরূপে বয়েই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তবে কর্মীদিগকে কোন অঞ্চলের কর্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া সঙ্গত।

অনুমানসাপেক্ষ পর কতক কাজ অবশ্যই গভর্মেণ্টকে করিতে হইবে। কিন্তু এমন বহুপ্রকারের কার্য আছে যাহা গভর্মেণ্ট করিতে পারে না। ধরুন, মেয়েদের পর্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে আনিতে হইবে। কে এই কাজ করিবে? বরপণ-লেনদেনের কুপ্রথা দূর করিতে হইবে, মেয়েদের বিবাহ দিবার বয়স বাড়াইতে হইবে। শিক্ষা, সমাজসেবা ও অন্যান্য নানা কাজ করিতে হইবে। এই সকল কাজ কে করিয়া দিবে? গভর্মেণ্ট এই সব কিছু করিতে পারে না। আমাদিগকেই উহা করিয়া তুলিতে হইবে। লোকশক্তি গড়িয়া তুলিয়া আমাদের এই সব কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। বর্তমানে এই সকল কাজ তাহাদের অবশ্য কর্তব্য, এই অনুপ্রেরণা জনগণের মনে উদ্দীপিত করিতে হইবে। আমার আশা এই যে, আমাদের দেশে সাহসী ও বীর্যবতী নারীরা জন্মিয়া উঠিবেন। তাঁহাদের প্রভা সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হওয়ায় তাহার উজ্জ্বল কিরণমালায় সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হইবে।

(হরিজন পত্রিকার সৌজন্যে)

শিশুর খেলা

[শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য]

খেলার সঙ্গে শরীর ও মনের গভীর যোগাযোগ আছে। তাই শারীরিক শক্তিও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। তা না হলে মানসিক শক্তির বিকাশ নিরর্থক হয়। প্রচলিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এবং অনেক অভিভাবকের সহানুভূতিসম্পন্ন, সংবেদনশীল মনোভাব ও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব শিক্ষাকে নিগূঢ়ভাবে জানবার ও বুঝবার পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। এই অন্তরায় যতদিন না অন্তর্হিত হয় ততদিন শিক্ষার সাথে শরীরচর্চার সম্পর্ক স্থাপিত হলেও নিগূঢ় অন্তরের যোগ প্রতিষ্ঠিত হবে না। নূতন পাঠশালায় যে কাজের কথা বলা হয়েছে তাতে একদিকে যেমন শারীরিক শক্তির পুষ্টি সাধন হয় তেমনি মানসিক শক্তিরও উন্মেষ সাধন হয়। খেলার সাথে শিক্ষাদীক্ষার মিলন ঘটানো প্রয়োজন এবং সেইজন্যই নূতন পাঠশালাকে শিশুর খেলাঘরে রূপায়িত করা হয়েছে।

খেলার মধ্য দিয়ে উপকরণ শিশু পরিচালনা করে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে ঐ উপকরণ অপচয় মনে হয় তবু শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি হচ্ছে খেলা। আমরা যদি প্রাণী-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাই, তারা মানবশিশু অপেক্ষা অনেক অল্প সময়ের মধ্যেই এই পৃথিবীর উপর বিচরণ করতে পারে। আমাদের আগামী দিন কয়টিকে বেঁচে থাকতে হয় নানা প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করে। আমাদের জীবনযাপন, সুখ ও দুঃখ, বেদনা ও আনন্দ প্রাণীজগৎ থেকে ভিন্ন। তাই আমরা হাঁটতে শিখি ধীরে, কথা কইতে শিখি দেরিতে এবং নিজে খেতেও শিখি অনেক দিন পরে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন শৈশবে খেলার মধ্য দিয়ে আদিমযুগের পূর্বপুরুষদের বর্বরতার ভরা দিনগুলিকে, যাদের আচরণকে অতিক্রম করে তবেই আমরা এই সভ্য জগতের মানুষের সাথে

শিশুরা অধিকার অর্জন করি। স্যামুয়েল হল্ বলেছেন, আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে যদি কোন ভাল খাতে বইতে দেওয়া না হয় তবে চারিত্রিক উৎকর্ষ হয় না। শিশুর ঐ প্রবৃত্তিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিব্যক্ত করে দিতে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যই খেলা শিক্ষার সহায়ক। শিশুজীবনের রুদ্ধতা থেকে পলায়নের আশ্রয়, অতৃপ্ত কামনা বাসনার পরিতৃপ্তির উপায়, সব কিছুতে দক্ষতা অর্জন, ভাবী জীবন-সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা ও কাজের পরিশ্রম অপনোদনের একমাত্র উপায় খেলা।

শিশুমনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিব্যক্তি, বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ এবং উপরোক্ত বিষয়গুলির সহিত শরীর গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে পরেই আমরা শিশুশিক্ষায় ছেলে ভুলান বলে গণ্য না করে পারি না। আমাদের দেশের পিতামাতাদের প্রায়ই বলতে শুনি, 'ছেলেটার দিনরাত শুধু খেলা—খেলা, খেলা। কখন বলে কপাল গুণে পোষাপ মেলে। ও পাড়ার রমীদরের ছেলেটার কি পড়া! এক মুহূর্ত বই ছাড়া নাই। আর আমার ছেলে কি কুলাঙ্গার ছেলে, ইত্যাদি। ঐ বেদনার্ত পিতামাতাকে সন্তান কুলাঙ্গার কি অনন্যার সে কথা শিক্ষকদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। প্রত্যেক ছেলেটাই যে আজ আর শিক্ষার মাপকাঠি নয়—এই সহজ সত্য কথাটুকু না লেখাই ভাল। খেলা শিশুর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সে খেলুক। এই সুযোগ দিলে শিশুর আনন্দ-মুখর কলরবে, তার ছন্দময় পদধ্বনিতে ঘর ভরে উঠুক। শিশুর দেহমন এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শকে আলিঙ্গন করুক। আজ বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলি শিশুকে খেলার আসরে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে—ছেড়ে দিয়েছে ধরার ধূলির মাঝে সোহাগ করে। বিশ্বের শিশুর খেলার অধিকার আছে, নাই শুধু আমাদের এই হতভাগ্য দেশের শিশুর। পায়ে কাঁটা ফুটল, কিংবা গাছ থেকে পড়ে শরীরে একটু আঘাত পেল, হয়তো খেলতে গিয়ে ধূলিধূসরিত হল, আর অমনি জননীর করুণাসিন্ধু উথলে উঠল। সীমাহীন সহানুভূতি ও অশ্রুসিক্ত গদ্গদ ভাষায় স্নেহোক্তি শোনা যায়, 'যাট্—যাট্, যাদুর আমার একি অবস্থা! ওগো জল নিয়ে এস, তাকার নিয়ে এস।' পিতাঠাকুরও হয়তো পুত্রস্নেহের উপহারস্বরূপ পোটা কয়েক দিন চড় হস্তভাগ্য শিশুর পিঠে বসিয়ে দিলেন আর শিশুর খেলার সাধ সেই থেকে মিটে গেল। কলমুখর ঘরে ফিরল দুঃখে, কার এক সুকোমল করস্পর্শের অভাবে খেলার ধারকো ছুয়ে পড়ল, শ্যামলা ধরিত্রী কোন এক আহ্বান খুঁজে বোকসুমান সন্তানকে কোলের কাছে না পেয়ে, কত সন্ধ্যা কত সকাল শুমরিয়ে শুমরিয়ে কাঁদল, কিন্তু শিশু আর খেলতে এল না। তারপর এ-দিন জীবনমধ্যাহ্নে যৌবনের প্রথমে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, ঈশা খাঁ, বিজয় সিংহ ও একালের চিত্তরঞ্জন, নেতাজীর বংশধর হয়েও প্রত্যেক দুর্বল বাঙালী বাবু সেজে ফাইল হাতে অফিসের মুখে ছুটল। দুই শত বর্ষব্যাপী ব্রিটিশের কুশাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের এই অবস্থা করেছে। কি গভীর ব্যথা, কি গভীর দুঃখ, হৃদয়ের কি যে মর্মান্তিক জ্বালা ঐ বুকে মেপান রয়েছে তার হিসাব প্রচলিত শিক্ষা রাখে না; শুধু মাত্র যৌক্তিক বিষয়ের নিষ্পীড়ন ও শাসনে দেহমন ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন করে তোলে।

একদল সুশিক্ষিত দুর্বল লোক অপেক্ষা অশিক্ষিত সবল মানুষ একটা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু সেই শক্তি যদি কল্যাণের পথে পরিচালিত না হয় তবে তা পশুশক্তির সমতুল্য। বুনিয়াদী শিক্ষা ঐ কথা কয়টি গভীর ভাবে চিন্তা করেছে কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা সে কথা চিন্তা করেনি। পরাধীন দেশে যা শোভা পেয়েছে, স্বাধীন দেশে তা আজ অভিশাপের সমান। আমাদের ঐ অভিশপ্ত যৌক্তিক শিক্ষা, যা সমাজজীবনের সহিত সম্পর্কহীন, স্বাধীন দেশের কল্যাণকামী শিক্ষাব্রতীরা তার মূলে

কুঠারাঘাত করেছেন। তাঁরা মানুষের শক্তিহীন দেহ-মনকে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলবার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় শরীরচর্চাকে মুখ্যস্থান দিয়েছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন সুশিক্ষিত ও শক্তিমান জাতির সঙ্গে সমান তালে চলবার মত বস্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় নিহিত আছে। আজকের যারা শিশু, আগামী ভবিষ্যতে তারাই হবে এই রাষ্ট্রের পরিচালক। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, শিশু খেলবে, কিন্তু কি ভাবে খেলবে? কি ভাবে খেললে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্র সুপ্রসারিত হবে। শিশুর শ্রেণীবিভেদে, তার দেহ মনের দিকে লক্ষ্য রেখে খেলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর শিশুদের কি ভাবে খেলালে দেহ মনের স্বাভাবিক উৎকর্ষ হয় সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করব। ৬।৭ বছরের শিশুকে নিয়ে অনুধাবী ব্যায়াম শিক্ষা দিলে তার শরীর মন দুইই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই যতদূর সম্ভব তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে হবে। ঐ বয়সের শিশুরা প্রতিদিন ২০ মিনিটের বেশী শরীর চর্চা করতে পারেনা। শরীর চর্চার মধ্যে আগ্রহ ও গতিশীলতা না থাকলে শিশুর কাছে তা নিরর্থক হয়ে পড়ে। তাই সব দিকে বিচার করে শিশুকে খেলার মাধ্যমে শরীরচর্চায় আগ্রহশীল করা উচিত। শিশু মই নিয়ে ওঠা নামা করবে, 'ব্যালান্সে' উঠে নিজের শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করবে, 'স্লাইডে' উঠে চিৎ হয়ে ছেড়ে দেবে নিজের শরীর, দোলনা আর ঝিলিং নিয়ে খেলবে মনের আনন্দে। ঐ প্রকার বহু খেলা আছে যা বাদ গেল। কিন্তু আমাদের দেশ গরীব। এই গরীব দেশের প্রতি শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিমাণে খেলার উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন। তাই বলে যদি কিছু ব্যয় আদৌ না করে শিশুর খেলার কথা চিন্তা করা বাতুলতা। যেমন 'কুমীর চোর', 'কে পাখী', 'ইঁদুর খেড়াল', 'কাক কাকাতুয়া', 'বাঘ ছুটেছে কোন খানে', ইত্যাদি খেলা শিশুকে দেওয়া যেতে পারে। ঐ সব খেলাতে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় হবে, মানসিক শক্তির স্ফুরণ ও সামাজিকতা বোধ, নেতৃত্ব মেনে নেবার গুণ— এসবের বিকাশ সাধন হবে।

গল্পপাগল শিশুর কাছে গল্পের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শরীর শিক্ষা দিলে সে বড়ই আনন্দ পায়। শিক্ষক বলবেন গল্প এবং শিশু মনের আনন্দে শিক্ষকের গল্পানুযায়ী অঙ্গভঙ্গি করবে। উপরোক্ত খেলা গুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভবপর তাই শুধু গল্পাভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর শরীরচর্চাকে কিভাবে চিত্তাকর্ষক করা যায় তাই বলব। মনে করা যাক 'সিংহ রাজার বিয়ে' গল্পটি শিক্ষক বলতে লাগলেন। গল্পটি বলার পূর্বে শিক্ষক গল্পের ব্যাঙ, সিংহরাজা ও শেয়াল, কে কি হবে বালকবালিকাদের মধ্যে নির্বাচন করে নেবেন। শেষে গল্পটি বলবার সাথে সাথে তিনিও অঙ্গভঙ্গী করে দেখাবেন। গল্পটির প্রথমাংশ এইরূপ :—'মাঠে মাঠে। ভয়ানক শীত। শেয়ালরা গোল হয়ে বসে আগুনে পা হাত গরম করে নিচ্ছে। তারা মনের আনন্দে 'হুক্কা হয়া' গান ধরেছে। এমন সময় সিংহ রাজার দূত ব্যাঙ্ লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত। সিংহ রাজার দূত ব্যাঙ্কে দেখে শেয়ালদের মুখ তো ভয়ে চুপ। তারপর রাজার দূত কি না খারাপ সংবাদ এনেছে। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে ব্যাঙ্কে নমস্কার করল। ব্যাঙ্ তাদের অভয় দিয়ে ব্যাঙর্ ব্যাঙ্ করে বলল, ওরে তোমাদের ভয় নাই। রাজদরবারে তোমাদের নিমন্ত্রণ—সিংহ রাজার বিয়ে। তোমরা এখুনি আমার সাথে চল। তাই না শুনে শেয়ালরা তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, দুহাত তুলে নাচতে লাগল আর মাটিতে ডিগ্‌বাজী খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। শেষে ব্যাঙ্ আগে আগে লাফাতে লাফাতে শেয়ালদের পথ দেখিয়ে মনের মধ্যে রাজদরবারের দিকে রওনা হল আর শেয়ালরাও

তার পেছন পেছন যেতে যেতে 'হালুম' শব্দ করে সিংহ রাজার অভিনয় দিতে লাগল।'

গল্পের ঐ অংশটুকুর মধ্যে শিশুরা শিক্ষকের অনুকরণে খুশীমত খেলবে। শিক্ষকের গল্প বলার সাথে সাথে তারা লাফাবে, নাচবে ও ঝিপ্‌ঝাঁপী খাবে। গল্পের প্রতিটি লাইনের কথাগুলির সাথে শিক্ষক অঙ্গভঙ্গী করবেন এবং শিশুও তা অনুকরণ করবে। এই সব করার মধ্যে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। একে খেলার পূর্বপ্রস্তুতিও বলা যেতে পারে। ঐটুকু অভিনয়ের মধ্যে একাগ্রতা বোধ, অনুকরণপ্রিয়তা, স্নায়ুর ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি, আনন্দ ও কল্পনা শক্তির উন্মেষ সাধন হবে শরীরের বিভিন্ন অংশের পুষ্টি সাধন হবে।

এরপর শিক্ষক গল্প আরম্ভ করলেন, 'রাজার দরবারে গিয়ে পেয়ালরা দেখতে পেল, সিংহ রাজা সিংহাসনে বসে আছে। পেয়ালরা লাইন করে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে কোমরে হাত রেখে সোজা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাল।

শিক্ষকের বলার সাথে সাথে শিশুরা ঐ ভাবে প্রণাম করবে। এর মধ্য দিয়ে শিশুরা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে শিখবে, প্রকাশ ভঙ্গিমা আয়ত্ত হবে এবং কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করবে।

শিক্ষক গল্পের তৃতীয় অংশ আরম্ভ করলেন, সিংহ পেয়ালদের প্রণাম গ্রহণ করে 'গোঁ গোঁ' শব্দ করে হুকুম করল, যে বাড়ীর তরকারি কোটা, বাইনা বাটা ও রান্না বান্নার ভার তোমাদের উপর রইল। যাও গিয়ে কাজে লেগে পড়। সিংহের হুকুম শুনে পেয়ালরা গোল হয়ে দাঁড়াল এবং গান গেয়ে নেচে নেচে কাজ করতে লাগল.

আয়রে সবাই মিলে তরকারি কুটি,
আয়রে সবাই মিলে বাইনা বাটি,
কুইনা কুটে বাইনা বেটে রান্না চড়াবে,
রান্না বান্না হয়ে গেলে খেতে বসব।

পেয়ালরা আবৃত্তি করে তরকারি কোটা, বাইনা বাটা, রান্না চড়ানোর অভিনয় নেচে নেচে করবে। শিক্ষক পেয়ালরূপী শিশুদের ঐ গানটির সাথে তালে তালে কিছু বাজাবেন। এর মধ্য দিয়ে শিশুর বিশেষ বিশেষ অঙ্গের ব্যায়াম হবে। তার হাত পায়ের মাংসপেশীর সঞ্চালন হওয়ায় ছন্দের তালে তালে শরীর মন নেচে উঠবে। অফুরন্ত আনন্দ ও খেলার উত্তেজনার মধ্যে সুখানুভবের আর ছন্দোবোধের বিকাশ হবে এবং সুষম ও ছন্দোবদ্ধ সঞ্চালনের ফলে স্নায়বিক ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি হবে।

আবার শিক্ষকের গল্প সুরু হল, "রান্না বান্না হয়ে গেলে সিংহ মহাশয় এসে বললেন, 'এস খাওয়া দাওয়ার আগে আমরা খেলা করি।' এখানে শিক্ষক শিশুদের খেলাটা বুঝিয়ে দেবেন। একটি গোলাকার বৃত্তে সিংহ দাঁড়াল এবং ঘুরে একটা নিরাপদ লাইনের ওপারে পেয়ালরা জোড়া জোড়া হয়ে পরস্পরের গলায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সিংহ ঐ 'নিরাপদ লাইনের' ওপারে যেতে পারবে না। পেয়ালরা শিক্ষকের বংশী ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে 'নিরাপদ লাইন' অতিক্রম করে সিংহের কাছে এসে সমস্বরে প্রশ্ন করবে, 'সিংহ মশায়, কয়টা বেজেছে?' সিংহ উত্তর দেবে, 'দশটা বেজেছে।' পেয়ালরা আবার প্রশ্ন করবে, সিংহ মশায়, সিংহ মশায়, কয়টা বেজেছে।' সিংহ উত্তর দিল, 'বারোটা বেজেছে।' বারোটার কথা শুনে পেয়ালরা 'নিরাপদ লাইনের' ওপারে দৌড়িয়ে পালিয়ে যেতে চাইবে এবং সিংহও তাদের পিছু পিছু ছুটে গিয়ে তাদের একজনকে ছুঁতে চাইবে। এই ভাবে পেয়ালরা বারে বারে প্রশ্ন করবে এবং সিংহও তাদের বিভিন্ন সময়ের উত্তর দেবে, কিন্তু যেই বলবে 'বারোটা বেজেছে', অমনি পেয়ালরা পালিয়ে যাবে এবং সিংহ তাদের ছুঁতে চাইবে। সিংহ যাকে ছোঁবে সেই হবে সিংহ। খেলাটি এই ভাবে চলবে।

এই খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর সহযোগিতা

বোধের উন্মেষ সাধন ও সংবর্ধনের উদ্যম হবে। আত্মপ্রধান (ego-centric) থেকে সমাজ-অভিমুখী (socio-centric) হবার শিক্ষা পাবে। স্বাস্থ্যপ্রদ প্রতিযোগিতা (healthy competition), শৃঙ্খলা বোধ, খেলোয়াড়ের মনোভাব, কর্মে দক্ষতা, কল্পনা শক্তি ও প্রবণশক্তি ইত্যাদির বিকাশ হবে।

শিক্ষক আবার গল্প বলতে আরম্ভ করলেন, 'সিংহ ও শেয়ালরা খেলতে এমন সময় খাবারের ঘণ্টা পড়ল। তাই শুনে সকলে দৌড় দিয়ে মাটিতে খেতে বসল। বাঘ, লাফাতে লাফাতে সকলকে খাবার পরিবেশন করল। তারা সকলে হাত দিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হলে মুখ ধুয়ে সকলে বিশ্রাম করতে বসল। তারা এত খেয়েছে যে শেষে ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তাদের মাথা, হাত, পা একদিকে হেলে পড়ল। তারা ঘুমিয়ে গেল। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে হাত পা টান করতে লাগল। হঠাৎ তাদের ঘুম ভেঙে গেল। দেখল, সকাল হয়ে গেছে। তখন তারা যেদিকে হাত রেখে লাফিয়ে উঠে ধীরে ধীরে বাড়ী চলে গেল।'

খেলার শেষে শিশুর বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজনীয়, তাই ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তারা ঐ ভাবে অঙ্গভঙ্গি করবে এবং ধীরে ধীরে চলে যাবে।

সুশিক্ষিত শিক্ষক এইভাবে বিভিন্ন খেলা শিশুকে দিয়ে করাতে পারেন। শিশুর বয়সের ভাগ হবে তাদেরই পরিচিত শব্দ ভাণ্ডার থেকে। উপরোক্ত গল্পটির মধ্যে শিশুর অঙ্গচালনাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শিশুর অঙ্গচালনার জন্য ঐ কয়টির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য। যেমন খুসিমত খেলা (activity), অঙ্গদের ভারসাম্য রক্ষা (balance), বিশেষ অঙ্গের ব্যায়াম (mobility), খেলা (games) ও বিশ্রাম (rest)। সকালে বিদ্যালয় খুললে দিনের প্রথমে এবং বৈকালে বিদ্যালয়ের কাজ হলে দিনের শেষেই শিশুর অঙ্গচালনার সময় নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক শিশুর স্বাস্থ্য, বয়স ও আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে নানা উপায়ে তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়ামের সুব্যবস্থা করতে পারেন। শিক্ষকের কৃতকার্যতা সেখানেই প্রমাণিত হবে যেখানে এই বয়সের শিশুর কাছে তিনি এমনিভাবে অঙ্গচালনাকে সরস ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারেন। এইজন্য শিক্ষককে হতে হবে কুশলী, অটুট ধৈর্য্যের অধিকারী এবং তাঁর বুকে থাকবে শিশুর প্রতি অফুরন্ত স্নেহ ও মমতার উৎস।

বরপল্লীর শিক্ষা ব্যবস্থা

একটি বিশেষ পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য স্থির হইল যে বরপল্লী এলাকার বিদ্যালয়গুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে। শিক্ষা-নীতি কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তাহা জানিবার জন্য নয়টি বিদ্যালয় হইতে তথ্যাদি অনুসন্ধান সুরু করা হয়। দুইটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়কে এই পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, কারণ এই পরীক্ষা কেবলমাত্র নিম্ন প্রাথমিক স্তরের উপর ভিত্তি করিয়া সুরু করা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার কার্য অল্পদিন হয় সুরু হওয়াতে ফলাফল সঠিক নির্ধারিত না হইলেও শিক্ষকগণের অভিমত, ছাত্রের মতামত ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রথমে সাধারণ ভাবে বিদ্যালয়গুলির একটি মোটামুটি চিত্র দেওয়া হইতেছে। সকল বিদ্যালয়ই সকালে বৈকালে দুই বেলা হয় তবে কাজের সময় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কোথাও নাই। কেবলমাত্র মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত বিদ্যালয়গুলি বর্ষাকালে ও শীতকালে সকালে ১০টা হইতে ১১টা অবধি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিক্ষকগণ দেরি করিয়া বিদ্যালয়ে আসেন। যদি কোন শিক্ষক স্থানীয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তিনি আগে আসিয়া নাম ডাকিয়া, এক শ্রেণীর পড়া লইতে থাকেন আর বাকি সকল ছাত্র এমনি বসিয়া থাকে, অন্য শিক্ষক আসিলে তবে তাহাদের পড়া সুরু হয়। বিদ্যালয় ছুটি হইবামাত্র ছাত্র এবং শিক্ষকগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখে গমন করেন। কোন বিদ্যালয়েই ছাত্রাবাস নাই, কারণ সকল ছাত্রই বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকায় বাস করে। গ্রামের নাম অনুসারে বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় একটি মাত্র ঘর লইয়া গঠিত। যেখানে দুইটি ঘর আছে তাহাও একটি ঘরকে পার্টিশন দিয়া ভাগ করা হইয়াছে। মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে; বাৎসরিক মেরামতের ব্যয়ও তাহারাই বহন করে। অন্য সকল ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরাই বিদ্যালয় স্থাপন করে, ব্যয়ও তাহারাই বহন করে। শিক্ষকগণের বেতন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সকল ক্ষেত্রেই দিয়া থাকে। সব বিদ্যালয়েই মাঠ আছে। ছাত্রগণ বাড়ী হইতে মাদুর লইয়া আসে, ও বিদ্যালয়ে তাহাদের জন্য ডেস্ক থাকে। দুই একটি বিদ্যালয় ব্যতীত ব্ল্যাকবোর্ড কোথাও নাই। দেওয়ালের এক অংশ নিমেন্ট করিয়া তাহাতে কালো রং করিয়া কাজ চালানো হয়। অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ের মাঠ বেড়া দেওয়া। সাধারণত মাঠ এমনিই পড়িয়া থাকে, তবে বর্ষাকালে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শাকসব্জি লাগান। তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কূপ কোথাও নাই। অবসর সময়ে ছাত্রগণ নিকটবর্তী পুকুরিণী হইতে নিজেদের কৃত্য নিবারণ করে। ছাত্রগণ পালা করিয়া বিদ্যালয় পরিষ্কার করে। ছাত্রগণের মল-মূত্র ত্যাগের কোন ব্যবস্থা নাই।

বিদ্যালয় মেরামত করা গ্রামবাসীগণের উপর নির্ভর করে। তাহারা চাঁদা তুলিয়া এই কাজ সমাধা করে। সাধারণত বিদ্যালয়গৃহ এত ছোট যে ছাত্রগণ ভাল করিয়া বসিতে পারে না।

লেখাপড়া ছাড়া ছেলেরা খেলাধুলা করে, গানও করে, কিন্তু কোন কাজই নিয়মিত ভাবে বা আন্তরিক ভাবে করে না। সাধারণত ছেলেরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খেলা করে। অনেকে

যথন্ত এবং নিজেদের জ্ঞানের অভাবে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোন সময় বাগান করা হয় না। শিক্ষকগণ ব্যবহারিক শিক্ষা অপেক্ষা পুঁথিগত শিক্ষার উপর বেশি জোর দেন। তাহাদের বলা হইয়া থাকে যে বাগানের তরিতরকারি বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া ছাত্রদের টিফিনের ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু কার্যত তাহা করা হয় না। ছাত্রগণ ইহা হইতে কিছু শিক্ষাও পায় না, উপকারও পায় না, সুতরাং এই কাজে তাহারা কোন উৎসাহ বোধ করে না। বাগানে বেড়ার অভাবে অনেক সময় তরিতরকারি উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না, কিন্তু শিক্ষকগণের যদি তেমন আগ্রহ থাকিত তবে বেড়া দিবার সাময়িক ব্যবস্থা যোগাড় করা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরেও অনেক কাজ করিতে হয় বলিয়া শিক্ষকগণ এইদিকে খুব বেশি মন দিতে পারেন না।

বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রদের সহিত শিক্ষকগণের কোন সম্পর্ক নাই। শিক্ষকগণের ছাত্রদের পারিবারিক অবস্থা জানিবার জন্য কোন আগ্রহ নাই। যদি শিক্ষকগণ দেখেন যে বহুসংখ্যক ছাত্র বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত, তাহা হইলে চাকুরি যাইবার ভয়ে অভিভাবকদের সহিত দেখা করিয়া আবেদন নিবেদন পূর্বক ছাত্রদের পুনরায় বিদ্যালয়ে লইয়া আসেন। কেবলমাত্র এই সময়েই বিদ্যালয়ের বাহিরে শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রগণের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়।

নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রগণ অবৈতনিক। তাহাদের লিখিবার পড়িবার জিনিস নিজেদের সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণ ভাবে ছাত্রদের বাৎসরিক খরচ হয়—শিশু বিভাগে ৫৲ টাকা, প্রথম শ্রেণীতে ৫৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৭৲ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীতে ৮৲ টাকা। যাহারা গৃহশিক্ষক রাখে তাহাদের ২৫৲ টাকা। বিবেচনা করিলে এই খরচ খুবই কম। নানা উপায়ে এই অর্থ অভিভাবকগণ সংগ্রহ করিতে পারেন। ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতনের হার ৩০৲—২৲—৪০৲; যাহাদের ট্রেনিং নাই তাহাদের ২৫৲—২৲—৩০৲ টাকা। শিক্ষকগণকে কেহ সহানুভূতির চক্ষে দেখে না, অনেক সময়েই শিক্ষকগণ নির্ধারিত বেতন পায় না, বা অনেক সময়েই বেতন বাকি থাকে। এই কারণে গ্রামে শিক্ষার অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয়। শিক্ষকগণ সকল ক্ষেত্রেই স্থানীয় লোক। সাধারণত এক এক বিদ্যালয়ে দুইজন করিয়া শিক্ষক থাকেন, তবে কোনও কোনও স্থানে বিদ্যালয় ছোট বলিয়া একজন করিয়া শিক্ষক আছেন। সাত বৎসর বিদ্যালয়ে অধ্যাপন করিয়াছেন ও ট্রেনিং প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি প্রধান শিক্ষক হন, সহকর্মীর কোন ট্রেনিং থাকে না। যে বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক থাকেন তিনি ট্রেনিংপ্রাপ্ত নহেন। বেশির ভাগ শিক্ষকেরই জমি আছে। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের আয় হইতে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। অনেক সময় বিদ্যালয়ের সময়েও তাহারা নিজেদের কৃষিকার্য করেন। অনেকে আবার জ্যোতিষ বিদ্যার চর্চাও করেন। গ্রামাঞ্চলে যে শিক্ষকগণ থাকেন এই কারণে তাঁহারা বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যগ্র থাকেন, বিদ্যালয়ে আসেনও দেরি করিয়া। দূর গ্রামের শিক্ষক হইলে তাঁহারা ঐ গ্রামেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া লন। নিজেরা রান্না করিয়া খান। দুই জন শিক্ষক হইলে একজন রান্না করেন, অপরজন পার্শ্ববর্তী যে গ্রাম হইতে ছাত্র আসে তথায় গিয়া খাবেন ও বিদ্যালয়ের সময় ছাত্রগণকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণের এক অভিযোগ। তাঁহারা বলেন, শুধুমাত্র লেখাপড়া শিখাইবার জন্য শিক্ষকতা গ্রহণ করেন নাই, ভাল ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য এই পথ লইয়াছেন। কিন্তু একাগ্রচিত্তে এই দিকে মন দিতে না পারায় তাঁহারা সফল হইতেছেন না।

যে নয়টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা

হইয়াছে তাহারা ধাবড়া, কুশারী, বৈরাগিক, কুশাণ্ডী, নিকিংধ সাংতলম', অগলপুর হেরিবল ও কুমারনে পুরী অঞ্চলের। উপস্থিতি রেকর্ড করিবার খাতায় ছাত্রসংখ্যা সব মিলাইয়া ৫০১ জন, কিন্তু পরিদর্শনের দিন উপস্থিত ছিল ৩২৯ জন। গ্রামে বিভিন্ন বর্ণের বাস, প্রত্যেক বর্ণের ৫-১৫ বছর ছেলে মেয়েরা সাধারণত পড়িতে আসে। সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাত্রই সর্বাধিক ৪৭'৭৫ জন আসে, শুণ্ডী (ব্যবসায়ী) মেয়ে ৪ জন আছে, তাহাদের মধ্যে তিনজনই পড়িতে আসে। গণ্ডা (গাঁড়ী) বর্ণের ছেলেমেয়ে আছে ২১৩ জন কিন্তু পড়িতে আসে মাত্র ৬৬ জন। সাধারণত তিয়র (জেলে), ব্রাহ্মণ, বৈরাগী ও শুণ্ডী শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই বেশি পড়িতে আসে। কোন কোন বর্ণের ছেলে মেয়েরা সংখ্যায় কম বিদ্যালয়ে আসে, কিন্তু শতকরা ৫০ দিনের বেশি উপস্থিত থাকে। কোন কোন বর্ণের ছেলেমেয়েরা সংখ্যায় বেশি আসিলেও শতকরা ১০ দিনও উপস্থিত থাকে না।

অনিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার কারণ, এই সব শ্রেণীর লোকেরা খুবই গরিব সুতরাং তাহাদের সন্তানদেরও অভিভাবকগণের সহিত বাড়ীতে বহু কাজ করিতে হয়। অভিভাবকগণও সন্তানগণকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার চাইতে শৈশবে কর্মধারায় যাহাতে নিপুণতা লাভ করিয়া যাইয়া তাহারা পরিয়া জীবিকা নির্বাহের যোগ্য হয় সেই দিকে বেশি নজর দেন। যে সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বেশি সংখ্যায় পড়িতে আসে তাহাদের অবস্থা ভাল এবং তাহারা নিজেদের উন্নতির জন্য সন্তানদিগকে শিক্ষা দান করিতে ইচ্ছুক। ছাত্রদের অনুপস্থিত হইবার কারণগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) বাড়ীর কাজ, (২) আগ্রহের অভাব, (৩) পুঁথির অভাব, (৪) রোগ, (৫) গ্রাম হইতে বিদ্যালয়ের দূরত্ব।

যাহারা কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তাহাদের উপস্থিতি বিভিন্ন ঋতুতে কমবেশি হয়। তাঁতীদের ক্ষেত্রে এই কারণ প্রযোজ্য নয়। ইহারা বিবাহের মাসে বা ফসল ফলার পরে খুব লাভ করে। যখন ফসল ফলাইবার কাজে শেষ হইয়া যায় সবাই নিশ্চিন্ত মনে গৃহের নানাকাজ কাজ করে। পুত্রকন্যার বিবাহের ব্যবস্থা, বৎসরের কাপড় জামা ক্রয় করা, এই সকল কাজ তখন করে। তাঁতীরা এই সময়টির জন্য উৎসুক থাকে, তখন বাড়ীর প্রতিটি লোক তাঁত চালায়। নানা রং নানা নমুনার কাপড় বাজার ছাইয়া যায়। নয় বৎসর বয়স হইতেই তাঁতীর ছেলেরা কাজ সুরু করে। যাহারা পিতল কাঁসার কাজ করে তাহাদের মেয়েরা ঘোমামোছার কাজ করে; কেওট জাতির মেয়েরা মুড়ি ভাজে এবং বাজারে তাহা লইয়া বিক্রয় করে; ধোপারা বাড়ী বাড়ী হইতে কাপড় লইয়া আসে, কিন্তু কাপড় কাচে মেয়েরা। পিতামাতা যাহাতে নিজেদের কাজ করিতে পারেন সেই জন্য বাড়ীর বড় ছেলেমেয়েরা ছোট শিশুদের দেখা শোনা করে। কুম্ভকারদিগের ছেলেমেয়েরা গৃহপালিত পশুর যত্ন করে, পিতার সহিত মাঠের কাজ করে। এই সকল নানা গৃহকর্মের ভার থাকায় তাহারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না।

পাঠ্যপুস্তক যদি চিত্তাকর্ষক হয় তবে পাঠক তাহা শেষ না করিয়া পারে না। কিন্তু ইহাদের পাঠ্য পুস্তক এমন বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহাতে লিখিত যাহা তাহারা কখনও ব্যবহার করে না; এমন বিষয় বস্তু লইয়া রচিত যাহা তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ বিদেশী, সুতরাং ছাত্রগণ কিছু না বুঝিয়াই উচ্চস্বরে পড়িতে থাকে, শিক্ষকগণও চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, ছাত্রদের মনে কৌতূহল জাগাইবার কোন চেষ্টা করেন না। পড়াইবার জন্য black board, ছবি, কোন কিছুরই সাহায্য লওয়া হয় না। এই সকল অসুবিধার মূলে রহিয়াছে শিক্ষকদের ট্রেনিংএর অভাব ও বিদ্যালয়ে জিনিসের

অভাব। সম্বলপুরের এই এলাকা অনেক কবি, নেতা প্রভৃতি বড় বড় লোকের আবাসস্থল ছিল, এই এলাকার ইতিহাসও খুব চিত্তাকর্ষক, স্থপোলের দিকেও এই এলাকার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পাহাড়, নদী, গাছের আবহাওয়া আকর্ষণীয় বিষয় বস্তু হইতে পারে কিন্তু ইহাদের পাঠ্যতালিকায় এই সব জিনিসের কোন স্থান নাই, অভিভাবকগণেরও সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার কোন আগ্রহ নাই। লেখাপড়া শিখিয়া কোট প্যান্ট পরিয়া "বাবু" হইতে যে অনেক সময় লাগিবে! এত দীর্ঘ দিন খরচ চালানো সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ হিসাবে তার মাথা বা অসুস্থতাকে ধরা যাইতে পারে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরা আধাধরা, শূল ব্যথা, জ্বর, বদহজম ইত্যাদি রোগে ভোগে। রোগের সহিত পুষ্টিহীনতাও যোগ হওয়া যাইতে পারে। সকালের বিদ্যালয়ে ছাত্ররা বেশীর ভাগই খাইয়া আসিতে পারে না, টিফিনও খায় না। যাহারা দুপুরে বিদ্যালয়ে আসে তাহারা বাড়ীতে দশটার আগে খাওয়া হয় না বলিয়া না খাইয়া আসে, টিফিনও খায় না, সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া শুধু রাত্রে খাইতে পায়। এই ভাবে অভুক্ত থাকিবার ফলে পুষ্টি ঠিকমত হইতে পারে না। সকল গ্রামে বিদ্যালয় নাই। তাহাদের পক্ষে গ্রামান্তরে যাওয়া সুবিধাজনক হয় না বলিয়া অনেকে প্রথমে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেও পরে আর তাহাদের উৎসাহ থাকে না।

শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকগণের অভিমত বেশ পরিষ্কার। তাঁহাদের মতে প্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক মিলিয়া বাগান করিবে। বাগান হইতে ছাত্রগণ কৃষি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে। ভাল বিদ্যালয়ের গৃহ পরিষ্কার ও সুগঠিত হওয়া উচিত। বৎসরে একবার মেরামত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিষয়ক সাজ সরঞ্জাম যেমন ম্যাপ, ব্লাক বোর্ড, ঘড়ি, পুস্তকাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, ছাত্রদের বসিবার প্রশস্ত আঙ্গিনা দিতে হইবে এবং শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষকগণকে আদর্শ মনোভাব লইয়া চলিতে হইবে। শিক্ষক ও গ্রামবাসীগণের মধ্যে সংযোগিতা রাখিতে হইবে। খেলাধূলার দিকে নজর রাখিতে হইবে। শারীরিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ছাত্রদের সমাজসেবায় উৎসাহ জাগ্রত করিতে হইবে।

কয়েকজন ছাত্রকে তাহাদের বর্তমান শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতামত দিতে বলা হইলে প্রথমেই তাহারা বলে যে শিক্ষকগণ তাহাদের এমন নির্দয় ভাবে মারেন যে, তাহারা বিদ্যালয়ে আসিতে ভয় পায়। তাহারা বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ঝেড়া দিয়া মিছিল বাগান করিতে চায় আর খেলাধূলার ব্যবস্থা চায়। তাহাদের মনে হয় বিদ্যালয় মেরামত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে আরও ছাত্র ভর্তি হইবে আর ইহারাও ভাল করিয়া বসিতে পারিবে। বিদ্যালয় গৃহ নানা ছবি, ম্যাপ ইত্যাদি দ্বারা সাজাইতে হইবে। তাহারা অভিযোগ করে যে, বাগানে যে শ্রমদান হয়, শিক্ষকরাই সব লইয়া যান, তাহারা কিছুই পায় না। তাহার পর, শিক্ষক নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন না, আসিলেও ছাত্ররা আসিবার অনেক পরে আসেন। ছাত্রদের হাতের কাজ শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই।

মোটামুটি ইহাই হইল এই এলাকার শিক্ষার অবস্থা। দেখা যায় যে লেখাপড়া ব্যতীত আর কোন প্রকার শিক্ষাই ইহারা পায় না যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রায় সুবিধা হইবে। আমাদের দেশে শিক্ষাবিদ্‌গণ এই জন্য basic training বা vocational ট্রেনিংয়ের সুপারিশ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার কাজের শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের কাজ শিখাইবার জন্য বাড়ীতে রাখেন কিন্তু বিদ্যালয় যদি সেই দায়িত্ব লয় তাহা হইলে এই সমস্যা ওঠে না। এইজন্য অভিজ্ঞ

শিশুমনস্তত্ত্ববিদ্ শিক্ষক রাখিতে হইবে। শিক্ষক গণের বেতনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মধ্যে সহযোগিতা রাখিতে হইবে। এইরূপ একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করিতে হইবে যেদিন অভিভাবক ও শিক্ষক মিলিত হইবেন। সেইরূপ আরেকটি দিন রাখিতে হইবে যেদিন বহু মাইল এলাকার শিক্ষকগণ মিলিত হইয়া শিক্ষার মান উন্নত করিবার জন্য কি করা প্রয়োজন, নিজেদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করিবেন। শিক্ষকগণের আন্তরিকতা, কর্মোৎসাহ, নিষ্ঠা-বত্তিতা হইল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে বংশলীর বিদ্যালয়-গুলি শিক্ষক ও ছাত্রগণের আনন্দ নিকেতন হইয়া উঠিবে এবং শিক্ষাদানের নীতি পরিবর্তিত হইয়া ছাত্রগণকে যথার্থ শিক্ষার সুবিধা দান করিবে।

বর্তমান সময়ে ভারতের সর্বত্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। এখনও দেশের শিক্ষাবিধি অপরিণত অবস্থায়। নানা দিক্ হইতে গড়াপেটা করিয়া তবে ইহাকে দেশকালের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ছাত্রগণ অন্য কাজের সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান করিতেছে। বিভিন্ন জায়গায় এইরূপ পরীক্ষার ফলে হয়তো নির্ভরযোগ্য এমন কতকগুলি তথ্য নির্ণীত হইবে যাহাতে সত্যকার কিছু উপকার পাওয়া যাইবে। এরূপ আলোচনা ও পরীক্ষা যাহাতর হউক এই আশায় প্রবন্ধটি এখানে মুদ্রিত হইল।

———

আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা—জর্জিয়া

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশানাল হাউসে থাকা-কালীন জর্জিয়া রাজ্যের রাজধানী আটলান্টা সহরের নিকটবর্তী এক হাইস্কুলের শিক্ষকের সাথে আলাপ করিয়া সেখানকার স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার কথা লিখিয়া লইয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় খুবই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, নম্র এবং ধীর। New Hampshire ইউনিভার্সিটি হইতে ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি হইতে ভাষাবিজ্ঞানে এম, এ, ডিগ্রী পাইয়াছেন। হার্ভার্ডে ইতিহাসে পি, এইচ, ডি, পড়িতেছেন। গবেষণার সময় এই নিউ-ইয়র্ক সহরের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পড়িতে আসিয়াছেন। অবশ্য তাহা পি, এইচ, ডি ডিগ্রী পাইতে সাহায্য করিবে।

তিনি যে স্কুলে পড়াইতেন তাহা Elementary (১ম-৮ম) এবং উচ্চ (৯ম-১২শ) বিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। তিনি হাই স্কুলে পড়াইতেন; সেইজন্য প্রাথমিকের খবর বিশেষ দিতে পারিলেন না। তবে স্কুলে কোন শ্রেণীতেই সাধারণতঃ কুড়িজনের বেশি ছাত্র রাখা হয় না। অবশ্য কোন কোনও ক্ষেত্রে তিরিশ জনও থাকে। স্কুলের নাম Dorion High School.

জর্জিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় আমেরিকানদের মধ্যে জাতিভেদ বড়ই প্রবল, যদিও সকলেই খ্রীষ্টান। নিগ্রোদের রং বড়ই কালো; অনেকের রং হাঁড়ির তলের মত। আবার, অনেকের রং আমাদের বাঙালীদের গায়ের রঙের চাইতেও পরিষ্কার;

অল্প কয়েকজনের রং গৌরবর্ণ। তবু এক বিষয়ে সকলেই সমান—মাথায় চুল কোঁকড়ান।

দক্ষিণ রাজ্যের সর্বত্র নিগ্রোদের স্কুল পৃথক; বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও তাহাদের জন্য বহু। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে The New York Times এ পড়িয়াছিলাম যে, টেনেসী রাজ্যের ধর্ম-শিক্ষাদান বিদ্যালয়ে নিগ্রো ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় কয়েকজন শ্বেতকায় শিক্ষক পদত্যাগ করিয়াছেন। কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয় শুধু এম, এ, এবং পি, এইচ, ডি, পড়িতে অনুমতি দেয়; কিন্তু বি, এ, ডিগ্রীর জন্য কোনও প্রকার সুবিধা দিতে প্রস্তুত নয়। সেখানে নিগ্রোদের ভাল ভাল বৃত্তি অবলম্বন করিতে নানা অসুবিধা; সেজন্য তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকে শিক্ষকতার দিকে ছুটিয়া আসেন। কারণ নিগ্রো-দের স্কুলে শুধু নিগ্রো শিক্ষকই রাখা হয়। ষোলো বছর পর্যন্ত পাঠ্য কালো শিশুরা সব শ্রেণীর আমেরিকানদের স্কুলে পড়া বাধ্যতামূলক—যদিও এই আইন সর্বত্র কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হয় না। দক্ষিণ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর; চাষবাস ক্ষেত-খামারই বেশি। সেজন্য ছেলেমেয়ে যাহা ভের বছরেই সংসারের কাজে মা বাবাকে সাহায্য করে। দক্ষিণাঞ্চলে আবার মজুরি বড়ই কম; উত্তর অংশে অনেক বেশি। কিন্তু সংসারের খরচার বেশিকম বিশেষ নাই—শুধু খাদ্যদ্রব্য ছাড়া। কাজের খাতায় দক্ষিণ অঞ্চল হইতে মজুর সরবরাহে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বছরের মধ্যে দুই একবার চলিয়া যায়। সেজন্য অনেকেই নামমাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে; আবার অনেকে মোটেই স্কুলে যায় না। The New York Times-এ ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে একটা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। তাহাতে আমিতে পারিলাম যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হিসাব করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, সে দেশে পঁচিশ লক্ষ লোক দুই মোটেই লেখাপড়া জানে না, না হয় অতি অল্পই লিখিতে পড়িতে জানে, যদিও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্রই বিনা বেতনে পড়িতে পারা যায় এবং সেজন্য কোনও প্রকার ফী দিতে হয় না। সর্বত্র স্কুলের পুস্তক ভাণ্ডার হইতে বছরে অল্প ভাড়ায় বই ধার করিবার ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা এক এক রাজ্যে এক এক প্রকার। রাজ্যের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো একটা নিয়ম বাঁধিয়া দেয় কিন্তু ঐ নিয়মের মধ্যে ধরা বাঁধা খুব বিশেষ কিছু নাই। স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট (ইন্সপেক্টর) ও স্কুল বোর্ড (ম্যানেজিং কমিটি) বই নির্বাচন করেন, অবশ্য প্রিন্সিপাল (হেড মাস্টার বা হেড মিস্ট্রেস কে এদেশে প্রিন্সিপাল বলে) মহাশয় কিছু পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ইংরাজী ও বীজগণিত আবশ্যিক; ঐচ্ছিক বিষয়কে এদেশে elective বলে। যে কোনও দুইটি বা তিনটি elective লইতে হইবে। Electives: বিদেশী ভাষা (স্প্যানিশ বা ফরাসি); বিজ্ঞান সিভিক্স্; গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (মেয়েদের জন্য); স্বাস্থ্যতত্ত্ব; শারীরিক শিক্ষা; আইন (সাধারণ আইন কানুন), কৃষিবিদ্যা, সঙ্গীত, হাতের কাজ (কাঠের কাজ, ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর কাজ)। দশম শ্রেণীতে ইংরাজী ও পৃথিবীর ইতিহাস আবশ্যিক; electives: উপরে যাহা লেখা হইল তাহার সাথে জ্যামিতি; জীববিদ্যা, একাদশ শ্রেণীতে ইংরাজী ও আমেরিকার ইতিহাস আবশ্যিক। Electives: উপরে যাহা লেখা হইল তাহার সাথে রীজগণিতের কিছু; কেমিস্ট্রি; ফিজিক্স্; বুক কীপিং; টাইপ রাইটিং; সর্টহ্যাণ্ড; স্পেনিশ ইত্যাদি। দ্বাদশ শ্রেণীতে ইংরাজী এবং আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের বিষয় আবশ্যিক পাঠ্য। Electives: উপরে লিখিত বিষয়গুলি। যে স্কুলে প্রথম আটটি শ্রেণী আছে তাহাকে প্রাথমিক বিদ্যালয় বলে। হাইস্কুলের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিতে কোনই আপত্তি নাই।

স্কুল সকাল ৮-৫৫ সময় বসে এবং বিকাল ৩-১০ মিনিটে ছুটি হয়; দুপুরের খাবার সময় ২০ মিনিটের অল্প বড় থাকে। ৪৫—৫০ মিনিটে এক পিরিয়ড হয়। মাস্টার মহাশয়গণ এক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ ছাত্রদের বাড়ীর কাজ (home task) দেন বটে কিন্তু অনেকে দেন না। বৈদিক শাস্তি খুবই কম। কোনও প্রকার কারণ না দেখাইয়া স্কুল বোর্ড যে কোনও শিক্ষককে বিদায় দিতে পারেন। হাই স্কুলে শতকরা ষাট জন পুরুষ শিক্ষক কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা প্রায় একশত জন। স্কুলের বৎসর সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া যে মাসে শেষ হয়। বছরে ১৮০ দিন অন্তই স্কুলের কাজ চালাইতে হইবে। আমাদের দেশের মত রবীন্দ্রজয়ন্তী বা কোনও মহান ব্যক্তির জন্য স্কুলের কাজ বন্ধ দেওয়া হয় না। যদিও বা দেওয়া হয়, তখন স্কুলের অন্য ছুটি কাটিয়া ঐ ১৮০ দিন ঠিক রাখিতে হইবে। ঐ বিষয়ে দেশের সর্বাংশে একই প্রকার। উত্তর অঞ্চলে শীতকালে ছুটি দেওয়া হয়; অনেক সময় এই সপ্তাহ স্কুল বন্ধ থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়া এই এক সপ্তাহ পড়াইতে হয়। দেশের সর্বত্রই শিক্ষক মহাশয়গণ স্কুলের শেষ পরীক্ষা লইয়া থাকেন; আমাদের দেশের মত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এখানেও ষোল বছর পর্যন্ত পড়া বাধ্যতামূলক।

মাস্টার মহাশয় নাম ঠিকানা প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় তাহা লিখিলাম না। এই প্রবন্ধ এক বছর আগে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪) কাগজে দেখিতেছি যে, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে দেশের সর্বত্র স্কুল কলেজে সাদা কালা ছাত্র একই সাথে পড়িবে, পৃথক্ ভাবে পড়াইলে তাহা বে-আইনি হইবে। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে অনেক জায়গায় সাদারা আইন অমান্য করিতেছে। সেখানে খাড়িতে অনেক সভাসমিতিতে খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে এই বিভেদ চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইতেছি। প্রাচীন রোমে যেমন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ভেদ দীর্ঘকাল পরে উঠিয়া গিয়াছিল আমেরিকাতেও তেমনি আস্তে আস্তে এই পার্থক্য উঠিয়া যাইবে।

———

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প

(ডি. এম. কোঠারী)

বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীরা যোগ্য শিক্ষা লাভ করিবে এবং তৎসহ বিদ্যালয়ের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জনও করিবে এই প্রত্যাশা করা হয়। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিল্প বা উপার্জনের কোন ব্যাপার নাই, ছাত্রছাত্রীরা কোন উৎপাদক কাজ না করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঞ্চিতে বসিয়া পুঁথিগত শিক্ষা পাইয়া থাকে। তজ্জন্য ইহাদের শিক্ষা বাস্তবতার সম্পর্কশূন্য এবং শিক্ষার্থীরা সমাজের কোন উৎপাদক কাজ করে না।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ছাত্রেরা স্কুলের চলতি খরচ অর্থাৎ শিক্ষকের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উপার্জন করিবে এরূপ প্রত্যাশা ছিল। নানা কারণে অদ্যাবধি কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয় উক্ত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই। তবে বর্তমানে এই শিক্ষা সম্বন্ধে যেখানে যে পরীক্ষাদি চলিতেছে তাহাতে জানিয়া রাখা উচিত যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা উত্তম শিক্ষা লাভের সঙ্গে কিছু উপার্জন করিতে পারে কি না।

উত্তম শিক্ষা এবং উপার্জন দুই দিক্ দিয়াই বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচেষ্টার যাচাই করা উচিত। পড়াশুনা বিষয়ে বার্ষিক পরীক্ষার দ্বারা ফলাফল যাচাই হইতে পারে। সে দিক্ দিয়া ফল নিঃসন্দেহে ভাল এবং সাধারণ স্কুলের চেয়ে উচ্চতর বলা যায়। কিন্তু এই যাচাই নির্ভুল নহে। ঠিক যাচাই করিতে হইলে শিক্ষা সমাপন করিয়া যে সব ছাত্রেরা বাহির হইয়াছে তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ইহাতে ছাত্রদের খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল পরীক্ষা লাগিবে। তজ্জন্য দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সময়ের প্রয়োজন।

শিল্প কর্মের প্রগতির যাচাই করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রসঙ্গত তিনটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ফলাফল আমরা নিম্নে উপস্থিত করিব, যথা,

(১) বল্লভবিদ্যালয়—বোচাসান (খেদা), (২) কুমার-শালা, মোরাজ (খেদা) (৩) কুমার মন্দির, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, আহমদাবাদ।

১ম ও ২য় স্কুল গ্রামাঞ্চলে এবং ৩য়টি আহমদাবাদের মত বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র সহরে অবস্থিত। বিভিন্ন আবহাওয়ায় নানা বয়সের ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে শিল্পকর্মে কত আয় করিতে পারিয়াছে দেখা যাউক :

বিদ্যালয়ের আয়

		বোচাসান	মোরাজ	আহমদাবাদ
		১৯৫৩-৫৪	১৯৫৩-৫৪	১৯৫২-৫৩
১।	ছাত্র সংখ্যা	৪—৭—৩	১—১৩—৭	১—৭—৭
২।	শিক্ষার্থী সংখ্যা	১০২	২২৪	১৩৩
৩।	বয়স বছর	১০—১৬	৭—১৩	৬—১৫
৪।	শিল্প কর্মে			
	গ্রোস আয়	২,১৩৬৲	৪৪১৲	৮৫৯৲
৫।	বিক্রয় বাদ	৮৩৯৲	৫৩৪৲	১৩৫৲
৬।	মাথাপিছু নিট আয়	১১৮৷০	৮৷১০ পাই	৪৷৬
৭।	প্রতি ঘণ্টায়			
	নিট আয় পাই	৪·৫	০·৮৭	১·৫

পূর্ব দুই বৎসরের হিসাব নিম্নরূপ : বোরাজ স্কুলের হিসাব পাওয়া যায় নাই

	বোচাসানে		আহমদাবাদ	
	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩
১। মাথাপিছু				
বার্ষিক নিট আয়	৭।০	৮৷৮৷৮	২৷৮৷৪	৪৷৬
২। প্রতি ঘণ্টায় মাথাপিছু				
নিট আয় পাই	২·৪	৩·১	১	১·৫
৩। প্রাইমারী স্কুল সার্টিফিকেট				
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১০০%	১০০%	৮৯%	৮৯%

পরিসংখ্যানে দেখা যাইতেছে যে, স্কুলগুলির শিল্পের আয়ের প্রগতি হইতেছে। অতএব বুনিয়াদী শিক্ষার অনুরূপ পদ্ধতি যদি অন্য পাঠশালাগুলিতেও অনুসৃত হয় তবে ছাত্রেরা শিল্পকর্মের দ্বারা পাঠশালার ব্যয়ের কিয়দংশ সংকুলান করিতে পারে। উহা দ্বারা অন্ত তত ব্যক্তিদেরকেই প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের সহায়তা হইতে পারে। অধিকন্তু কর্মঠ কর্মপটুতা অনুৎপাদক শিক্ষাব্যবস্থার দোষ বিদূরিত হইবে। শিল্পকর্মের ফলে শিক্ষার্থীরা যদি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে তবে আশ্রমের সমূহ লাভ হইবে।

দ্রষ্টব্য: স্কুলের শিল্পকর্মের আয় তুলনা করা কঠিন। বিভিন্ন স্কুলে আয় নির্ণয়ের হিসাব পদ্ধতি এক নহে। সর্বসেবা সংঘের (চরকা সংঘ) নির্দিষ্ট হারে সুতাকাটার মজুরী ধরিয়া আয় নির্ণয় করাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ছাত্রদের কাটা সুতা সংঘনির্দিষ্ট নিয়ম মত শক্ত বা মসৃণ হয় না। সেই অনুপাতে সংঘের অপেক্ষা মজুরী কম হইবে। ঐ সুতার বুনা কাপড় বাজারে কত দর পায় তাহা দেখিয়া তদনুপাতে কাটাই মজুরী ধার্য করা যায়।

স্কুলের বিভিন্ন বর্গের গুণ্ডি (লাছি) প্রতি নিম্নরূপ মজুরী (পাইএ) ধরা যায়: ১ম—৩, ২য়—৬, ৩য়—৯, ৪র্থ—১২ ৫ম—১৮, ৬ষ্ঠ—২১, ৭ম—২৪ পাই। সুতার গুণের তারতম্য অনুসারে উচ্চ বর্গের ছাত্রের সুতা নিম্নবর্গের বা নিম্নবর্গের ছাত্রের সুতা উচ্চ হারে মজুরী পাইবে। ভাল সুতার গড় মজুরী লাছি পিছু ২ আনা ধরা যায়।

মজুরীর শতকরা ১৫ ভাগ বিদ্যু পরিচালনার খরচ হিসাবে বাদ দিয়া বাকি আয়কে নিট আয় বলিয়া ধরা যায়।

উপরের পরিসংখ্যান এই নিয়মে করা হইয়াছে। কোন খরচ বাদ না দিয়া চরকা সংঘের হারে হিসাব ধরিলে উল্লিখিত আয় অন্তত ১০০% অর্থাৎ দ্বিগুণ বেশী দেখা যাইবে।

(হরিজন পত্রিকার সৌজন্যে)

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ তোতার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ তোতার লেন, পোঃ বালবিহারী এক্সটেনশন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।